আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির নির্বাচিত উপন্যাসের তুলনামূলক অধ্যয়ন

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর এর বাংলা বিভাগে
পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য নিবেদিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপক : নন্দিতা মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ

পিএইচ.ডি. পঞ্জীয়ন ক্রম : পিএইচ.ডি/৯০২/২০০৯, তারিখ : ১৭/০৮/২০০৯

বাংলা বিভাগ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন অনুষদ
আসাম বিশ্ববিদ্যালয়
শিলচর-৭৮৮০১১, ভারত

ডিসেম্বর, ২০১৩

DEPARTMENT OF BENGALI
Rabindranath Thakur School of
Indian Languages & Cultural Studies
Assam University, Silchar
(A Central University constituted under Act XIII of 1989)
Silchar - 788011, Assam, India.

CERTIFICATE

Certified that the thesis entitled "Ashapurna Devi O Nirupama Bargohain'r Nirbachita Upanyaser Tulanamulok Adhyayan" (A Comparative Study of Selected Novels of Ashapurna Devi And Nirupama Bargohain) for award of the Degree of Doctor of Philosophy in the Department of Bengali is the outcome of a bonafide research work. This work has not been submitted previously for any other degree of this or any other university. It is further certified that the candidate has complied with all the formalities as per the requirements of Assam University. I recommend that the thesis may be placed before the examiners for consideration of award of the degree of this university.

(Dr. Debasish Bhattacharya)
Supervisor
Department of Bengali
Assam University, Silchar

Declaration

I, Nandita Mandal, bearing Registration No. Ph.D./902/2009 dated 17.08.2009, hereby declare that the subject matter of the thesis entitled "Ashapurna Devi O Nirupama Bargohain'r Nirbachita Upanyaser Tulanamulok Adhyayan" (A Comparative Study of Selected Novels of Ashapurna Devi And Nirupama Bargohain) is the record of work done by me and that the contents of this thesis did not form the basis for award of any degree to me or to anybody else to the best of my knowledge. The thesis has not been submitted in any University/Institute.

This thesis is being submitted to Assam University for the degree of Doctor of Philosophy in Bengali.

Place : Assam University, Silchar **(Nandita Mandal)**
Date : Candidate

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির নির্বাচিত উপন্যাসের তুলনামূলক অধ্যয়ন

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা সংখ্যা

প্রাক্কথন ঙ্ম ১-২

প্রথম অধ্যায় ঙ্ম ৩-১০

ভূমিকা ঙ্ম তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

দ্বিতীয় অধ্যায় ঙ্ম ১১-৫৭

উনিশ ও বিশ শতকের বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজ ঃ সংযোগ, সারূপ্য ও স্বাতন্ত্র্য

তৃতীয় অধ্যায় ঙ্ম ৫৮-৮৫

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি ঃ জীবন ও সৃজনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

চতুর্থ অধ্যায় ঙ্ম ৮৬-১৬০

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির নির্বাচিত উপন্যাসে বিম্বিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবন

পঞ্চম অধ্যায় ঙ্ম ১৬১-২১৪

আশাপূর্ণা ও নিরুপমার রচনায় নারী ঃ একালের নারীচিন্তার আলোকে

ষষ্ঠ অধ্যায় ঙ্ম ২১৫-৩২১

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাসে চরিত্রায়ন ঙ্ম একটি তুলনামূলক আলোচনা

উপসংহার ঙ্ম ৩২২-৩৪৪

গ্রন্থপঞ্জি ঙ্ম ৩৪৫-৩৫৪

পরিশিষ্ট - ১ ঙ্ম ৩৫৫-৩৫৮

পরিশিষ্ট - ২ ঙ্ম ৩৫৯-৩৬২

প্রাক্‌কথন

পড়ার ঝোঁক ছিল ছোটবেলা থেকেই। মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সময় পাঠ্যসূচির বাইরেও বাংলার সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া সাহিত্য পাঠেরও সূত্রপাত। স্নাতকোত্তর পড়ার সময় নিরুপমা বরগোহাঞির কিছু উপন্যাস পড়ি। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস, গল্পও পড়া ছিল। নিরুপমাকে পড়তে গিয়ে আশাপূর্ণা দেবীর রচনার সঙ্গে ভাবগত ও বিষয়গত সাদৃশ্যের বিষয়ে প্রাথমিক একটা ধারণা হয়। দেখতে পেয়েছি দুই লেখিকাই সমাজে নারীর প্রতি হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ। দুই লেখিকারই রচনায় ফুটে উঠেছে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি হওয়া অত্যাচার অবজ্ঞা ও অবহেলার দিকটি। দুজনের রচনাতেই শুনতে পাই অত্যাচারে জর্জরিত নারীর আর্তনাদ এবং প্রতিবাদ। তখন মনে হয়েছে সমাজ ও পরিবেশভেদেও নারীর সমস্যা মূলত একই। দুজনের উপন্যাসে নারীর অবস্থান মূলত একই দেখে এই দিকটিকে আরও গভীরভাবে বোঝার তাগিদ অনুভব করি। এই তাগিদই আমার মধ্যে পরবর্তীতে প্রণালীবদ্ধ তুলনামূলক অধ্যয়নের অভীপ্সা তৈরি করেছে।

সাম্প্রতিক অতীতে মানবিকী বিদ্যাচর্চায় দেশ-কাল কিংবা ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে দেবার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। বাংলা ও অসমীয়া ভাষা দুটি একই মাগধী প্রাকৃতের সন্তান। বঙ্গ ও অসমের দেশ-কাল পরিবেশেও কোনো দুরতিক্রম্য ব্যবধান নেই। বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যের ইতিহাসের গতিধারাও অনেকটা একই রকমের। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রথম পর্বের অসমীয়া ঔপন্যাসিক রজনীকান্ত বরদলৈও রচনা করেছেন ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স। শরৎচন্দ্র ও চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়ার রচনা একই রকম করে, একই মেজাজে স্ব-স্ব অচলায়তন সমাজ বিধান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। সুতরাং আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির রচনায় সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের প্রণালীবদ্ধ পাঠ বাংলা ও অসমের সামাজিক ইতিহাসের পরম্পরাকে বুঝে উঠতে বিশেষভাবে সহায়তা করবে বলে আমার ধারণা। এই ধারণাকে যাচাই করবার তাগিদ থেকেই আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে 'আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির নির্বাচিত উপন্যাসের তুলনামূলক অধ্যয়ন' শিরোনামে গবেষণা প্রস্তাব পেশ করি। আমার সৌভাগ্য, প্রস্তাবটি বিভাগের অনুমোদন পায়।

গবেষণার কাজ করতে গিয়ে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে পেয়ে যাই ড. দেবাশিস ভট্টাচার্যকে। তাঁর অনুপ্রেরণা, অকৃত্রিম সহায়তা ও গঠনমূলক আলোচনা ও পরামর্শ ভিন্ন এই গবেষণা সন্দর্ভ নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ করা সম্ভব হত না। তাঁর উপদেশ, মূল্যবান কথা, স্নেহ ও সান্নিধ্য আমার পথের পাথেয় হয়েছে। শুধু পথনির্দেশ নয় গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থ সংগ্রহ করতে আমাকে সাহায্য করেছেন তিনি। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, প্রধান অধ্যাপক ড. রমা ভট্টাচার্য, অধ্যাপক ড. বেলা দাস, ড. বিশ্বতোষ চৌধুরী, ড. প্রিয়কান্ত নাথ এবং অন্যান্য

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আন্তরিক ধন্যবাদ। গবেষণা চলাকালে বিভিন্ন সেমিনারে আমার আলোচনাপত্রের উপর তাঁদের মন্তব্য ও মতামতে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণাকেন্দ্রের কর্ণধার শ্রীযুক্ত সন্দীপ দত্তের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

এই গবেষণার কাজ করতে গিয়ে আমি আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, তেজপুর জেলা গ্রন্থাগার, তেজপুর দরং কলেজ গ্রন্থাগার, তেজপুর এল.জি.বি. গার্লস কলেজ গ্রন্থাগার ও কলকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সাহায্য নিয়েছি। আমি নিরুপমা বরগোহাঞির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি এবং সন্দর্ভটি নিয়ে তাঁকে কিছু প্রশ্নও করেছি। এই আলাপচারিতা আমাকে খুব সাহায্য করেছে। এই আলাপনের কিছু অংশ পরিশিষ্ট অংশে সংযোজিত করা হয়েছে। নিরুপমা বরগোহাঞি এত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে সময় দিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করায় আমি ধন্য এবং তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

দরং কলেজের অসমীয়া বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক পূর্ণেশ্বর নাথ ও ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক কঙ্কন কুমার ডেকা বিভিন্ন সময়ে বইপত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের সহৃদয় বদান্যতা আমার চিরকাল মনে থাকবে। তাছাড়া আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে চাই দরং কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক নিরেন দে মহাশয়ের কাছে। আমার কাকু দিলীপ মণ্ডল আমাকে নানা সময়ে কলকাতা থেকে বইপত্র কিনে পাঠিয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তাঁর স্নেহ ভালোবাসা এবং সাহায্যে আমি ধন্য ও কৃতজ্ঞ। তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুজীব এবং জৈবপ্রযুক্তিবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড০ মানবেন্দ্র মণ্ডল আমাকে নিরুপমা বরগোহাঞির সঙ্গে আলাপের সুযোগ করে দিয়েছেন। এবং আমাকে কাজ করতে উৎসাহ ও নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। একই সঙ্গে আমি স্মরণ করতে চাই আমার মা, বাবা, ঠাকুরদা ও ঠাকুরমাকে যাঁদের আশীর্বাদ, সহানুভূতি, প্রেরণা এবং আর্থিক সাহায্য আমাকে উচ্চশিক্ষা নিতে সাহায্য করেছে। এই অবকাশে তাঁদের পুনর্বার প্রণাম জানাচ্ছি। তাছাড়াও আমি কৃতজ্ঞ আমার দাদা রতন মণ্ডল, ভাই রাজেশ মণ্ডল, বোন অরুন্ধতি মণ্ডল, বান্ধবী স্মৃতি মোদকের কাছে, যারা আমাকে নানাভাবে সাহায্যই করে নি, আমাকে যথেষ্ট উৎসাহও দিয়ে চলেছে এখন পর্যন্ত। এছাড়া যাঁরা আন্তরিকভাবে অলক্ষ্যে থেকে আমার সফলতা কামনা করেছেন তাঁদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সবশেষে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি শিলচর সানগ্রাফিক্স-এর কর্ণধার ও কর্মীদের প্রতি। গবেষণাসন্দর্ভটি যথাযথভাবে সু-সম্পন্ন করতে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। প্রাসঙ্গিক তথ্য ও তত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে আমার মতামত ব্যক্ত করেছি। প্রুফ দেখার ক্ষেত্রে যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি। কিছু ভুলত্রুটি থাকলে সেটি হয়েছে অনবধানতাবশত। তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর **নন্দিতা মণ্ডল**

তারিখ :

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

<u>প্রথম অধ্যায়</u>

ভূমিকা ঃ তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

সাহিত্য বলতে যে কোনো দেশের যে কোনো সময়ের লিখিত রচনাকেই আমরা বুঝে থাকি। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির সূত্রে সাহিত্য, বিজ্ঞান, মানবিকীবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, ভাষিক সীমা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ বেড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক সন্ধানমূলক অধ্যয়নের গুরুত্ব। বর্তমান সময়ে কলা এবং সমাজবিজ্ঞানের অধ্যয়নে গুরুত্ব লাভ করা বিভিন্ন লক্ষণের মধ্যে অন্তর্বিদ্যাবর্তিতা এবং তুলনামূলকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তুলনামূলক সাহিত্য বর্তমান যুগে বিশেষভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা বহু প্রাচীন। তুলনামূলক সাহিত্য কী, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলা যায় “তুলনা হল মানব চিন্তন এবং মননের সঙ্গে জড়িত এক বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া।”[১] তুলনা কী, কিসের তুলনা এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, দুটা বা তার থেকে বেশি সংখ্যার বস্তু একসঙ্গে রেখে সেই বস্তুগুলিতে থাকা মিল ও অমিল সমূহের বিষয়ে জানার জন্য করা পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজই হ’ল তুলনা। তবে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নের প্রসারিত পরিপ্রেক্ষিতের প্রতি লক্ষ্য রেখে এই বিদ্যাশৃঙ্খলাকে কোনো ক্ষীণ ও সীমিত ব্যাখ্যার দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। তুলনামূলক সাহিত্যের সংজ্ঞা আরও গভীর।

ফ্রঁসোয়া জস্টের মতে, “Comparative literature represents more than an academic discipline. It is an overall view of literature, of the world of letters, a humanistic ecology, a literary weltanschaunning (i.e World Philosophy, Outlook on the World), a vision of the cultural universe, inclusive and comprehensive.”[২] আবার কেউ কেউ মনে করেন তুলনামূলক সাহিত্য হল সাহিত্য অধ্যয়নের, সাহিত্য বিচারের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ।[৩] সৃজনশীল সাহিত্য নিত্য নতুন রূপে পাঠকের কাছে ধরা দেয়। সেইরূপে সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রেও নতুন নতুন পন্থার উৎপত্তি হয়। সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন নতুন ‘ism’ গড়ে উঠছে, যা বিশ্বসাহিত্যের আলোচনায় আগ্রহী। এই সমস্ত লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য, ইজম-এর সাজ সবকিছুকে একত্র করে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিভিন্ন ভাষার, বিভিন্ন genre বা গোত্রের সাহিত্য আলোচনা, আলোচনা পদ্ধতির বিকাশ এবং এর মাধ্যমে সাহিত্য আলোচনাকে বিস্তৃতি এবং গভীরতা দান করার দৃষ্টিভঙ্গিই হল তুলনামূলক সাহিত্য।

সাহিত্য অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি অন্যতম। কোনো এক ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে অন্য ভাষার সাহিত্যের বিভিন্ন দিক যেমন কলা, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান,

সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন দিকসমূহের প্রতিতুলনা ও বিশ্লেষণের সূত্রে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। সমগ্র পৃথিবীর মানবের মনে থাকা একই রকমের অনুভব অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায়। সাহিত্যে দেশকালীন বাস্তবের সঙ্গে সংলাপে মনের প্রতিক্রিয়া, তার প্রকাশের ক্ষেত্রেও যেমন থাকে অনন্যতা, তেমনি থাকে সারূপ্যও। সাহিত্যের গুণসমূহ এবং সনাতন মূল্য তথা মানবের শাশ্বত সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটে তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের মধ্য দিয়ে।

তুলনামূলক সাহিত্যের মূল স্বরূপের তিনটি প্রধান দিক হল —

(ক) তুলনামূলক সাহিত্যের ধারণা পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যকে এক অথবা একক সাহিত্যরূপে কল্পনা করে।

(খ) একক সাহিত্য হিসাবে ধারণা করা বিভিন্ন সাহিত্য সমূহের অধ্যয়ন সহজ এবং সুগম করে তোলার জন্য সব সাহিত্যের জন্য গ্রহণযোগ্য 'সার্বজনীন সাহিত্য শাস্ত্র' প্রণয়নের পোষকতা করে।

(গ) এক ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে অন্য ভাষার সাহিত্যের তথা সাহিত্য ভিন্ন বিষয় জড়িত করে সাহিত্যের অধ্যয়নকে অধিক বিস্তৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা তুলনামূলক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

'তুলনামূলক সাহিত্য' সংক্রান্ত ধারণার জন্ম হয় ইউরোপে ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে এবং সর্বপ্রথম এটি স্বতন্ত্র বিষয়ের মর্যাদা লাভ করে ১৮৪৮ সনে। বিখ্যাত ইংরাজ কবি মেথিউ আর্নল্ড সর্বপ্রথম 'তুলনামূলক সাহিত্য' (comparative literature) ধারণাটির কথা ব্যক্ত করেন, নিজের ব্যক্তিগত চিঠিতে comparative শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে তুলনামূলক শব্দটি নিশ্চিতভাবে প্রথমবারের জন্য ব্যবহার করা হয় ১৮৮৬ সনে পচনেট রচিত গ্রন্থ 'তুলনামূলক সাহিত্য' (comparative literature)-এ। তিনি ১৯০১ সনে 'দি সাইন্স অব্ কম্পারেটিভ লিটারেচার' প্রবন্ধ রচনা করে সেটিতে এই বিষয়টির পদ্ধতি, স্বরূপ ইত্যাদি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন। 'তুলনামূলক সাহিত্য' কোনো ধরণের সৃষ্টিশীল সাহিত্য নয়, সাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়নও নয়। তুলনামূলক সাহিত্য আসলে সাহিত্যের একটা স্বতন্ত্র বিভাগ, যার মধ্য দিয়ে আমরা সাহিত্য সম্পর্কে গভীর এবং বিস্তৃত জ্ঞান লাভের পথে অগ্রসর হতে পারি। সাহিত্য সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ মূলত এর অভ্যন্তরীণ গুণসমূহের উপর নির্ভরশীল। এ কথার প্রতিধ্বনিই শুনতে পাই এ আর মার্সের বর্ণনায়, তাঁর মতে তুলনামূলক সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য হল সাহিত্যিক প্রক্রিয়াসমূহের সম্পূর্ণ পরীক্ষা, তার তুলনা, একত্রীকরণ, বর্গীকরণ, কারণের অনুসন্ধান এবং পরিণাম নির্ধারণ — "To examine then the phenomena of literature as a whole to compare them to group them to classify them, to inquire into the causes of them to determine the results of them – this is the true talk of comparative literature."[৪] এ কথার সূত্র ধরে বলা চলে, তুলনামূলক সাহিত্য মূলত সাহিত্য অধ্যয়ন অথবা সাহিত্য সম্পর্কীয় চিন্তা

চর্চার এক পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয় যা সাহিত্যের সমালোচনা অথবা গবেষণায় নিকট সম্বন্ধীয়।১৮২৭ সনে গ্যাটে তাঁর 'Tasso' নাটকের ভূমিকায় তুলনামূলক সাহিত্যের গুরুত্ব প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ কয়েকটি কথা বলেছেন — "জাতীয় সাহিত্য বলে কথাটি বর্তমানে অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বিশ্বসাহিতের যুগ সমাগত এবং গতি ক্ষিপ্র করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য।"[৫] ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যয়ের মতে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস মানব ইতিহাসের মতো অবিচ্ছিন্ন। তাঁর মতে, "As in human history and civilization, there has been an unbroken continuity in man's literary endeavour and expression. But owing to constant transformation of language century by century ancient speeches became obsolete and became unintelligible without special study ..... the ancient Greek, Sanskrit, Avestan, Hebrew and Chinese literatures have an uninterrupted history for some 3000 years and more and we are now becoming alive to be submerged influences of the earlier literatures....".[৬] চার্লস মিলস ১৯০৩ সনে 'তুলনামূলক সাহিত্যকে স্বতন্ত্র চিন্তার বাহক ও মানবতার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ রূপে ব্যক্ত করে বলেছেন — ".... a distinct and integral medium of thought a common institutional expression of humanity differentiated, to be sure, by a social conditions of the individual by racial, historical, cultural and linguistic influences, opportunities and restrictions but, irrespective of age or guise, prompted by the common needs and aspirations of man, sprung from common faculties, psychological and physiological and obeying common laws of material and mode, of the individual and social, humanity."[৭]

দুই বা ততোধিক ভাষার সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারই তুলনামূলক সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। তুলনামূলক সাহিত্যে একটি ভাষার পরিবর্তে একাধিক ভাষার তুলনা করলে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। তুলনামূলক সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতবিরোধ দেখা গেছে। কারো মতে এ অভিধাটি কৃত্রিম এবং অসার্থক। আবার কেউ কেউ ব্যবহারিক দিক থেকে এর সার্থকতা বিচার করেছেন। তবে বর্তমান যুগে তুলনামূলক সাহিত্যকে সাহিত্য অধ্যয়নের একটি বিশেষ পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তুলনামূলক সাহিত্য এক ধরনের 'আন্তঃ সাহিত্যিক অধ্যয়ন' যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের সামগ্রিক অধ্যয়নকে নির্দেশ করে। ফলে তাৎপর্য ও পরিসর হয়ে উঠেছে ব্যাপক ও গভীর।

তুলনামূলক সাহিত্যের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও পরিসর নিয়েও পণ্ডিতমহলে মতভেদ দেখা যায়। তবে কিছু ক্ষেত্রে মতের মিলও রয়েছে। তাঁদের মতে "It will study all literature from an international perspective, with a consciousness of the unit of all literary creation and experience. In this conception ..... comparative literature is identical with

the study of literature independent of linguistic, ethnic and political boundaries. It can not be confined to a single method, description, characterization, interpretation, narration, explanation, evaluation are used in its discourse just as much as comparison."[৮]

তুলনামূলক সাহিত্যের লক্ষ্য একাধিক সাহিত্যের মধ্যে তুলনা। Anthony Thorlby বলেছেন — "Comparative literature does not in itself commit one to any other principle than that comparison is a most useful technique for analysing works of art, and that instead of confining comparisons to writings in the same language, one may usefully choose points of comparison in other languages."[৯]

তুলনামূলক অধ্যয়ন সাধারণ পর্যালোচনায় দৃষ্টিগোচর না হওয়া বিষয়গুলিকেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বের করে আনে। শুধু তাই নয় সাহিত্যজগতের পটভূমিস্বরূপ সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকেও নিয়ে আসে আলোচনার পরিসরে। সাংস্কৃতিক পরম্পরার ভিন্নতাই তুলনামূলক সাহিত্যের পরিসরে ব্যাপকতা বৃদ্ধি করেছে। ফলে তুলনামূলক সাহিত্যে যুক্ত হয়েছে সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব এবং যুগ বিশেষের আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া। একাধিক সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমেই সাহিত্যের যথাযথ মূল্যায়ন সম্ভব। এ ব্যাপারে ডেভিড হিউমও বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন যুগের মধ্যে থাকা বিভিন্ন বিষয়ের সম্যক জ্ঞানকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এ সম্পর্কে রেনের বক্তব্য — "In practice, the term comparative literature has covered and still covers rather distinct fields of study and groups of problems. It may mean, first, the study of oral literature especially of folk tale themes and their migration; of how and when they have entered 'higher', 'artistic' literature....... We must endorse the view that the study of oral literature is an integral part of literary scholarship, for it can not be divorced from the study of written works, and there has been and still is a continuous reaction between oral and written literature."[১০] বাস্তবিক তুলনামূলক সাহিত্য বিভিন্ন প্রকারের স্বতন্ত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রকে একবিন্দুতে নিয়ে আসে। মৌখিক সাহিত্য এবং এর প্রসার, মৌখিক সাহিত্যের উপাদানসমূহের কলাসম্মত সাহিত্যিক সৃষ্টিতে উত্তরণ — এগুলিও তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যয়নের বিষয়।

তুলনামূলক সাহিত্য দেশকাল - জাতি - ভাষার ঊর্ধ্বে সাহিত্যের সামগ্রিক অধ্যয়নকে গুরুত্ব দেয়। সাহিত্য অধ্যয়নকে নিয়ে যায় রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপট থেকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে। তুলনামূলক সাহিত্য পূর্ববর্তী ধ্যান ধারণাকে অস্বীকার করে। সাহিত্যের বাহ্যিক রূপের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও তত্ত্ব উৎঘাটনে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। সাহিত্যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও চিরন্তন মানবীয় সত্তার প্রতি আস্থা প্রদর্শন এবং বিভিন্ন ভাষা সাহিত্যের মধ্যে থাকা ঐক্যের সন্ধান করে।

রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক বন্ধন অতিক্রম করে বিশ্বমানবের আশা-আকাঙক্ষা, কামনা-বাসনা, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার মুক্ত অধ্যয়ন রয়েছে তুলনামূলক সাহিত্যে। বিশ্বমানবকে জানার জন্যও তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ্যাটে তাঁর 'Tasso' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথম বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখ করেছেন। তিনি 'Welt literature' শব্দ থেকে বিশ্বসাহিত্যের ধারণা নিয়েছেন। তিনি কালিদাসের শকুন্তলার জার্মান অনুবাদ পড়ে প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেন। গ্যাটের বিশ্বসাহিত্যের ধারণায় ছিল অন্যদেশ তথা ভাষার সাহিত্যকে মুক্ত মনে গ্রহণ করা, বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন তথা আদান প্রদান। রবীন্দ্রনাথ 'Comparative literature' অর্থে বিশ্বসাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করে বলেন "সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকাশের বিচিত্র-মূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্যরূপ দেখাইতে চায়, তাহাই বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিস।"[১১] তিনি সাহিত্যকে দেশকালের ঊর্ধ্বে দেখার কথা বলেছেন কারণ, সাহিত্যের মধ্যে বিশ্বমানবই আত্মপ্রকাশ করে, সেখানে লেখককে উপলক্ষ মাত্র হয়ে কাজ করতে হয়। লেখক নিজের লেখার মধ্যে যখনই সমগ্র মানুষের ভাব অনুভব করেন, তখনই সমগ্র মানুষের বেদনাকে নিজের লেখায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজের লেখাকে সাহিত্যে জায়গা দিতে পারেন। হৃদয় সব সময় ব্যাকুল থাকে নিজের আবেগকে বাইরের জগতে মিশিয়ে দিতে। তাই তো মানবাত্মা সমস্ত মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজের মনুষ্যত্বের মিলনকে সন্ধান করে। তাইতো হৃদয় ছোট আমি থেকে বৃহৎ আমি'র ধারণাতে উত্তীর্ণ হয়ে আনন্দ উপভোগ করে। মানুষ আপনাকে পর করে এবং পরকে আপনার মতো জেনে আনন্দ পায়। নিজের অনুভূতি অন্যের মধ্যে পেলে খুশি হয়।[১২] লেখকের ভাষায় — "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষায়, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"[১৩]

বিশ শতকের গোড়ার দিকেই ভারতবর্ষেও তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কীয় চিন্তা-চর্চার দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯০৭ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সাহিত্য পরিষদে 'Comparative literature' বিষয়ে ভাষণ প্রদান করতে গিয়ে 'Comparative literature' অর্থে 'বিশ্বসাহিত্য' শব্দটিই প্রয়োগ করেছেন। বিশ্বসাহিত্যের ধারণাটি বর্তমান যুগে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। বিশ্বসাহিত্য ও তুলনামূলক সাহিত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সাহিত্য বৃহত্তর বিশ্বসাহিত্যের অংশ বিশেষ।

১৯৫৬ সনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগ শুরু হয়। ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য সংস্থা (Indian Comparative Literature Association) ১৯৮১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক অধ্যয়নের কাজ শুরু করেছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর

'শকুন্তলা দেস্‌দিমোনা ও মিরন্দা' প্রবন্ধটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রথম, শকুন্তলা ও মিরন্দার তুলনা করেছেন লেখক। শকুন্তলা ও মিরন্দা উভয়ের মধ্যে লেখক বহুক্ষেত্রে মিল দেখেছেন। উভয়েই ঋষিকন্যা। মিরন্দা এরিয়ল রক্ষিতা এবং শকুন্তলা অপ্সরারক্ষিতা এবং দুজনেই আবার ঋষি-পালিতা। দুজনকেই লেখক বনলতা দেখেছেন এবং দুজনেরই সৌন্দর্যে উদ্যানলতা পরাভূতা। অরণ্যে প্রতিপালিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যেই রয়েছে সারল্য তবে শকুন্তলা শিক্ষিতা। তাঁর মধ্যে লজ্জা এবং সমাজ প্রদত্ত সংস্কারও রয়েছে কিন্তু মিরন্দা এতই সরল যে তাঁর মধ্যে লজ্জাও নেই, সমাজ প্রদত্ত সংস্কারও নেই। তবে লজ্জার মধ্যে থাকা স্ত্রী জাতির পবিত্রতার অভাব লেখকের অনুভূত হয় নি; তাই শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার মধ্যে যে সরলতা তা লেখকের নবীন এবং মাধুর্যময় মনে হয়েছে। সংস্কারবিহীন মিরন্দা পরদুঃখ কাতরা, লজ্জা না থাকলেও তাঁর মধ্যে পবিত্রতা রয়েছে। দুজনেই নায়ককে দেখামাত্রই প্রেমে পড়লেও দুজনের স্বভাব লক্ষণের পার্থক্যের জন্য দুজনের প্রেম নিবেদনেও পার্থক্য ফুটে উঠেছে। দুই ভিন্ন কবির রচনায় ফুটে উঠেছে প্রেম নিবেদনের ভিন্নতা। শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত সংস্কারসম্পন্না ও লজ্জাশীলা, তাই তার প্রণয়ের মধ্যে কেবল লক্ষণই ফুটে উঠেছে, মুখে তা করা হয়নি। যেহেতু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জাবোধ নেই তার তাই প্রণয় লক্ষণ বাক্যে ফুটে উঠেছে। পিতাকে ফর্দিনন্দকে পীড়নে উদ্যত দেখে নিজের প্রিয়জন বলে ফর্দিনন্দের প্রতি পিতার সহানুভূতি জন্মানোর চেষ্টা করেছে। অপরপক্ষে, শকুন্তলার প্রণয় সম্ভাষণ চলেছে লুকোচুরির মধ্যে। মিরন্দা ও জুলিয়েটের মত জলনিষেকে শকুন্তলা ফুটে ওঠেনি তাছাড়া শকুন্তলার মধ্যে বালিকার চাঞ্চল্য, বালিকার ভয়, বালিকার লজ্জা দেখা গেলেও রমণীর গাম্ভীর্য স্নেহ দেখা যায়নি। শকুন্তলার চরিত্রের এরূপ দেখানোর কারণ হিসেবে দেশ ও লোকাচারের ভিন্নতাকে বলা যায় না। কারণ দেশভেদে কালভেদে বাহ্যভেদ হলেও সব দেশে সব কালে মনুষ্যহৃদয় একই থাকে। বরং কারণ হিসেবে বলা যায় দুষ্মন্তের চরিত্র বিস্তারকে। দুষ্মন্তের চরিত্র গৌরবে শকুন্তলা ঢাকা পড়ে গেছে। লেখক এটিতে কবির গুণই দেখেছেন অপরদিকে ফর্দিনন্দ ক্ষুদ্র ব্যক্তি এবং নায়িকার সমবয়সী।[১৪]

শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনার তুলনা করতে গিয়ে লেখক অনুভব করেছেন দুজনেই তুলনীয়া এবং অতুলনীয়া। দুজনেই গুরুজনের অপেক্ষা না করেই আত্মসমর্পণ করেছেন প্রেমিকের কাছে এবং দুজনেই আত্মসমর্পণ করেছিলেন বীরপুরুষ দেখে তবে বীরমন্ত্রের মোহ দেস্‌দিমোনায় পরিস্ফূট শকুন্তলায় সেরূপ হয় নি। দুই নায়িকাই 'দুরারোহিণী আশালতা' পরবর্তীতে ভগ্ন হয়ে স্বামীর দ্বারা বিসর্জিতা হয়েছেন।[১৫]

এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়ে দিয়েছেন যে দেশভেদ কালভেদ মানুষের কেবল বাহ্য রূপেই ঘটে। সব দেশে সব কালে মনুষ্যহৃদয় এবং হৃদয়বৃত্তি একই থাকে। দেশকাল ভেদেও হৃদয়বৃত্তিতে 'শকুন্তলা দেস্‌দিমোনা ও মিরন্দা' একাকার হয়ে উঠেছে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে।

বর্তমান অধ্যায়ে বিদ্যাশৃঙ্খলা হিসাবে তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে

যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে আমাদের অভিসন্দর্ভের ভূমিকা হিসাবে। কীভাবে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়ন, কীভাবে সার্বভূমিক মানব সভ্যতার বিবর্তন রেখাগুলি 'তুলনামূলক সাহিত্য' নামক বিদ্যাশৃঙ্খলার চর্চাসূত্রে প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠতে পারে, সে সম্পর্কে পণ্ডিতজনদের মতের পাশাপাশি আমাদের সামান্য অনুভবও তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি।

তথ্যসূত্র :—

১. নাথ, প্রফুল্ল কুমার : 'তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য বিচার আরু বিশ্লেষণ', বনলতা প্রকাশন, পানবাজার গুয়াহাটি-১, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, পৃ. ১

২. Jast, Francois : 'Introduction to Comparative literature', Indianapolis, Bobbs Merrill, 1974, p. 29-30.

৩. নাথ, প্রফুল্ল কুমার : প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪. Bright, W. Games : 'The Comparative Study of literature', Publications of Modern Languages of America, II, 1896, No. 2

৫. নাথ, প্রফুল্ল কুমার : প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ১

৬. Chatterjee, S.K. : 'World literature and Tagore', Biswa Bharati, 1971, p. 8-9

৭. 'What is Comparative Literature?' Atlantic Monthly 92 (1903), Pp. 56-68

৮. Wellek, Rene : 'Discriminations', Yale University Press, 1970, p. 19

৯. Thorlby, Anthony : 'Yearbook of Comparative and General literature', XVIII. 1968, p. 78

১০. Wellek, Rene : 'Theory of Literature', Penguine Books, 1976, p. 46-47

১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য, 'বিশ্বসাহিত্য', বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪০১, পৃঃ ৭২

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য, 'বিশ্বসাহিত্য', তদেব, পৃঃ ৫৯-৭০

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : সাহিত্য, 'সাহিত্যের বিচারক', তদেব, পৃঃ ২৬

১৪. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র : 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা'; গুণ, সুমন (সম্পা.), তুলনামূলক সাহিত্য একটি তির্যক প্ররোচনা একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১১, পৃঃ ৪১-৪৫

১৫. তদেব, পৃঃ ৪৫-৪৬

<u>দ্বিতীয় অধ্যায়</u>

উনিশ ও বিশ শতকের বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজ : সংযোগ, সারূপ্য ও স্বাতন্ত্র্য

দ্বিতীয় অধ্যায়

উনিশ ও বিশ শতকের বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজ : সংযোগ, সারূপ্য ও স্বাতন্ত্র্য

উনিশ ও বিশ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোকে বর্তমান অধ্যায়ের বয়ান সাজাতে চাই আমরা। আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি দুজন লেখিকার রচনার তুলনাত্মক আলোচনা আমাদের অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য। দুজন লেখিকাই লেখার রসদ সংগ্রহ করেছেন চারপাশের জগৎ ও জীবন থেকে। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও উচ্চাবচতা তাদের রচনার আধেয়, দেশকালের উত্তাপ শুষে নিয়েছে উভয় লেখিকার বয়ান। দুই ভাষার দুজন লেখিকার মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়ন তখনই সার্থক হয় যখন রচনার পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে ধারণা থাকে। অর্থাৎ যে সমাজের কথা আলোচ্য সাহিত্যিকেরা ব্যক্ত করেছেন, সেই সমাজের গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে পাঠকের স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরি। তুলনামূলক অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এ জানা আরো গভীরতা ও ব্যাপ্তি দাবি করে। কেননা পট ও পটবিধৃত জীবনকে মিলিয়ে পড়াই হল আখ্যান পাঠ ও অনুধাবনের কার্যকর কৃৎকৌশল।

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি দুজন লেখিকার রচনায় যেসব পাত্র-পাত্রী, যেসব ঘটনাকে আমরা পাই, তার পটপ্রেক্ষিতকে জেনে নেওয়ার প্রয়োজনেই বর্তমান অধ্যায় পরিকল্পনা। নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে দুজন লেখিকাই দ্রোহাত্মক বয়ান প্রস্তুত করেছেন। বস্তুত বিশ শতকের বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজের মধ্যে অনেক জায়গাতেই সারূপ্য রয়েছে, যদিও স্বাতন্ত্র্যের কিছু ক্ষেত্রও উল্লেখ করবার মতো।

বাংলা ও অসম ভারতের দুই অঙ্গরাজ্য। তবে আধুনিক ভারতবর্ষের মানচিত্রের সঙ্গে অসমের যোগ কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। কামরূপ তথা নিম্ন অসমের সমতল অঞ্চল ছাড়া, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের মঙ্গোলয়েড অধ্যুষিত ভূখণ্ড কখনোই ভারতবর্ষের সঙ্গে অর্থনীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক প্যাটার্ন, সংস্কৃতি — কোনোদিক থেকেই ভারতভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। উত্তর-পূর্ব ভারত একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় আসে ১৮২৬-এর ইয়াণ্ডাবু সন্ধির পর থেকে। ধীরে ধীরে কলোনিয়াল শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়ীভূত হয়। ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসনিক বিভাগ পুনর্গঠনের সূত্রে বাংলার বিভিন্ন অংশ কখনো অসমের সঙ্গে যুক্ত ছিল, আবার কখনো বিচ্ছিন্ন। এই প্রক্রিয়া চলেছে স্বাধীনতা পর্যন্ত।

বাংলা ও অসম এই দুটি পার্শ্ববর্তী স্বাধীন রাজ্য ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে লিপ্ত হয়েছে যুদ্ধ-

বিগ্রহে। মোঘল শাসিত বঙ্গদেশ বিভিন্ন সময়ে অসমে আক্রমণ চালিয়েছে। অসম প্রতিহত করেছে সে আক্রমণ। আমাদের আলোচনায় মধ্যযুগের যুদ্ধবিগ্রহের সন-তারিখ ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমরা রূপান্তরশীল সামাজিক ইতিহাসকে বিহঙ্গ দৃষ্টিতে দেখে নিতে চাইছি। মধ্যযুগ শব্দবন্ধে যদি মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কে চিহ্নিত করি, তাহলে সেই সময়ের বাংলা ও অসম এই দুই প্রতিবেশি ভূগোল সীমার সমাজ জীবনে সারূপ্যের কিছু সূত্র খুঁজে পাই।

যেমন —

১. দুটি সমাজই ছিল রাজশাসিত।

২. অসম ও বাংলা উভয়েরই মূল উৎপাদন ছিল ভূমিভিত্তিক। উৎপাদন সম্পর্ক স্বভাবতই ছিল সামন্ততান্ত্রিক।

৩. তথাপি, বঙ্গদেশে জমিদারের যে দাপট ছিল, তা অসমে ছিল না।

উনিশ শতকের বাংলা ও অসম ঃ নবজাগরণের বাতিঘরে :

ব্রিটিশ আমলের পূর্বে এবং কলকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলার গ্রাম্যসমাজ ছিল পিরামিডের মতো স্তরবদ্ধ ও অচল। রাজা ও প্রজার মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। রাজা ও প্রজার সম্পর্ক ছিল এরূপ — "রাজা ও প্রজার মধ্যে দূরত্ব এত বেশি ছিল যে কেউ কাউকে চোখের দেখাও দেখতে পেত না। বহুদূর দিগন্তের ওপারে, প্রজাদের কল্পনার এক বিচিত্র অলোক রাজ্যে, অদৃশ্য দেবতার মতো, রাজা তাঁর মণিমুক্তার সিংহাসনে বসে থাকতেন, রক্ষী বেষ্টিত বিশাল গড়বন্দী রাজপ্রাসাদে। প্রজারা থাকত ছোট ছোট নিস্তব্ধ নিঝুম গ্রামে, খড়-পাতার কুটিরে। তারা হাল চাষ করত, মাছ ধরত, জাল বুনত, লোহা পিটত, তাঁত বুনত, যাজন-ভজন করত, গ্রাম্য মেলায় উৎসব-পার্বণে আনন্দ করত, রাজার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ও হত না।"[১] স্থানীয় রাজা ও জমিদাররা রাজার প্রতিনিধি হয়ে গ্রামের শীর্ষস্থানে থাকতেন। তবে এদের সঙ্গেও প্রজাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। নায়েব, গোমস্তা, সেপাই বরকন্দাজ প্রভৃতি জমিদারের রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীর সঙ্গেই প্রজার প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। যেহেতু তখন সমাজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিত্তনির্ভর নয় কুলবৃত্তি ভিত্তিক ছিল তাই সেকালে গ্রাম্য সমাজে মধ্যশ্রেণি থাকলেও ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট মধ্যশ্রেণির মত প্রভাবশালী ছিল না।

ইংরাজ সরকার ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে রাজস্ব আদায়ের নির্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করে জমিদারি ব্যবস্থায় পর্বান্তরের সূচনা করেন। অনুপস্থিত জমিদারদের তাঁদের জমিদারি নিরাপদে ভোগ করার, রক্ষণাবেক্ষণ করার, খুশিমত ইজারা দেবার অধিকার দিলেও গ্রাম্য সমাজ রক্ষা করার অধিকার বা দায়িত্ব তাদের দেন নি। আর সে মানসিকতাও নতুন জমিদারদের ছিল না। বিনিময়ে ব্রিটিশ সরকারের নানা প্রকার রাজস্ব সংগ্রহের কৌশল ও ১৭৭০ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার জমিদার ও কৃষক শ্রেণির চরম অবস্থা দেখা দেয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বেই।

ব্রিটিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও অন্যান্য ভূমি-বন্দোবস্ত, দেশীয় কুটীর ও হস্তশিল্পের বিনাশের ফলে কৃষকদের ওপর সৃষ্ট চাপ, কৃষক শোষণ ও কৃষক পীড়নের নতুন মাত্রা, রেলপথ সৃষ্টির ফলে খাদ্যশস্যের রপ্তানি ও সেচ ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা, কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ দেখিয়ে প্রজাগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া রাজস্ব ইত্যাদির ফলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছোট-বড় কৃষক বিদ্রোহের জন্ম হয়। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে কৃষক বিদ্রোহের দেখা দেয় ইংরাজদের বিরুদ্ধে তা ঘটেছিল ছোট ছোট জমিদারের সক্রিয় অংশগ্রহণে। যেসব জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব মেটাতে অক্ষম তাদের জমিদারি ইংরাজদের অধিগ্রহণ থেকে রক্ষা করার উপায় হিসেবে এই সমস্ত জমিদাররা কৃষক বিদ্রোহে যোগ দেন। এই সমস্ত বিদ্রোহের মধ্যে ছিল সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), বারাণসী বিদ্রোহ (১৭৮১), ত্রিপুরায় সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৬৭-৭০), মেদিনীপুরে চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৬৭-৭০), ইত্যাদি।[২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলার তথা ভারতের কৃষককুলের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ভয়ঙ্কর তিনটি শোষকশক্তি সেগুলি হল ব্রিটিশ শাসকের ভূমি রাজস্ব আদায়, ভূমি রাজস্বের উপর জমিদার আদায় করতে লাগল খাজনা, আর মহাজনেরা তাদের ঋণে-সুদ হিসেবে কেড়ে নিত কৃষকের অবশিষ্ট ফসলের প্রায় সবটুকুই। জমির ফসলের ভাল মন্দ, অজন্মা এসব নিয়ে কোনোপক্ষই মাথা ঘামাতেন না। শুধু প্রতি বছর শাসকদের হাতে অর্পণ করতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ, এই ছিল নতুন আইন। এই চিরস্থায়ী আইনের ফলে বাঁকুড়ার দক্ষিণ-পশ্চিম, মেদিনীপুরের উত্তর-পশ্চিম এবং মানভূম জেলার পূর্ব অঞ্চলের বিস্তীর্ণ আদিবাসী এলাকায় কৃষকদের বিদ্রোহ শুরু হয়। ইতিহাসে এই বিদ্রোহ 'চোয়াড় বিদ্রোহ' নামে প্রসিদ্ধ। এ সমস্ত অঞ্চলের কৃষকরা এই ব্যবস্থার পূর্বে বংশ পরম্পরায় স্বাধীনভাবে চাষবাস করত। ইংরেজরা কৃষকদের এই জমি কেড়ে নিয়ে জমিদারি হিসেবে বিক্রয় করতে থাকলে কৃষকরা ১৮৭৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে শাসক ও দেশীয় জমিদার-ইজারাদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।[৩]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহ বঙ্গদেশেই সব থেকে বেশি তীব্র আকার ধারণ করেছিল। মেদিনীপুরের নায়েক বিদ্রোহ, ময়মনসিংহের কাপাকি, গারো ও হাজং বিদ্রোহ, ফরিদপুরের ফরাজি বিদ্রোহ, খুলনা (সুন্দরবন) নোয়াখালি ও পাবনার কৃষক বিদ্রোহের মতো বেশকিছু স্থানীয় বিদ্রোহ ছাড়াও, সমগ্র বঙ্গদেশে আলোড়ন তুলে ঔপনিবেশিক শাসনের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কৃষক বিদ্রোহ ওয়াহাবি বিদ্রোহ (১৮২৪-৭০) এবং নীল বিদ্রোহ (১৮৫১-৬১)।[৪] ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মাটিতে গড়ে ওঠা কৃষক বিদ্রোহের মধ্যে সব থেকে বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছিল নীল বিদ্রোহ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাঁওতাল উপজাতীয় কৃষকদের জমিদার, মহাজন ও ব্যাপারিদের জুলমবাজির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলেছিল — ১৮১১, ১৮২০, ১৮৩১, ১৮৫৫-৫৬, ১৮৭১, ১৮৭৪-৭৫, এবং ১৮৮০-৮১ খ্রিস্টাব্দে। তার মধ্যে বেশি ব্যাপকতা ও গুরুত্ব পেয়েছিল ১৮৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ।[৫] বীরভূম জেলা, ভাগলপুর জেলার বিস্তীর্ণ অংশ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সাঁওতালরাই এই বিদ্রোহ করেছিল।

ইংরাজের রাজস্ব আদায়ের নানা কৌশল, ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে বাংলার কৃষক ও জমিদার শ্রেণির চরম অবস্থা, তার উপর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চাপে অনেক জমিদারি ভাঙনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং এই সুযোগে শহরের ধনিকশ্রেণি এইসব জমিদারি কিনে নিয়ে নতুন জমিদারে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর নতুন জমিদারের অধীনে নতুন মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হয়। তাছাড়া ইংরাজ আমলে আদালত ও নতুন বিচার ব্যবস্থার ফলে গ্রাম্যসমাজে নতুন এক শ্রেণির উদ্ভব হয় যাদের মামলা বিশারদ বলা হত। তারাও গ্রাম্য মধ্যবিত্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই মধ্যশ্রেণি সম্পর্কে বলা হয়েছে — "পত্তনিদার, দর-পত্তনিদার, ছে-পত্তনিদার, ইজারাদার, গাঁতিদার, তালুকদার, জোতদার প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্বভোগী, নায়েব, গোমস্তা, দেওয়ান, ম্যানেজার, তহশীলদার থেকে আরম্ভ করে পাইক-বরকন্দাজ, এমন কি জমিদারের বাজার সরকার আমলাবর্গ, নতুন পুলিশের দারোগা, কনেস্টবল, মহাজন এবং আইন-আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দালাল থেকে উকিল পর্যন্ত নানারকমের লোক নিয়ে বাংলার গ্রাম্যসমাজে যে বিপুল-কলেবর এক মধ্যশ্রেণির বিকাশ হল, অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক রইল না। পরনির্ভর স্বার্থপর অর্থ-পিশাচ বেতনভুক এই গ্রাম্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাজার নখদন্ত বাংলার কৃষকদের দিকে ধাবিত হল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র ভাষায় বাংলার কৃষকরা 'রজনীতে নায়েব, দারোগা, গোমস্তা, নালিশ, দণ্ড এই সকলই স্বপ্ন দেখে। সর্ব-সন্তাপ-নাশিনী নিদ্রাও তাদের উদ্বেগ দূর করতে সমর্থ নয়'।[৬]

ইংরাজ আমলে নতুন রাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে গ্রাম্য অভিজাতশ্রেণি ধ্বংস হয়ে এক নতুন গ্রাম্য অভিজাত ও ধনিকশ্রেণির উদ্ভব হয়। তারা এক পুরুষে হঠাৎ ধনী, শহরে দালালি, বেনিয়ানি কিংবা দেওয়ানি করে অর্থ রোজগার করে জমিদারি কিনে চিরস্থায়ী জমিদার হয়েছেন। এই শ্রেণির জমিদাররা বিদেশি ভোগ্যবস্তু ব্যবহারকে সামাজিক পদমর্যদা ভেবে বিদেশি বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ায় অনাদরে উপেক্ষায় পোষকতার অভাবে বংশানুক্রমিক কারুশিল্পের ধ্বংস হয়। তাছাড়া কারখানার বিলাতি দ্রব্যের কাছে সুলভ বিনিময় মূল্যের প্রতিযোগিতার বাজারে দেশীয় কারুশিল্প নিজেকে টিকিয়ে রাখতে না পেরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। কারুশিল্পের অবলুপ্তির কথা কার্লমার্ক্স এভাবে বলেছেন — "অতীতে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে যত পরিবর্তনই হোক না কেন, সেই সুদূর অতীত থেকে প্রায় উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত, তার সামাজিক জীবনের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। তাঁত ও চরকা ভারতের অসংখ্য তাঁতি ও সূতাকাট্‌নির জীবিকা ছিল এবং ভারতের স্থিতিশীল সমাজের প্রধান স্তম্ভ ছিল কারুশিল্প। ভারতের সমাজ জীবনে অনধিকার প্রবেশ করে ব্রিটিশ চরকা ও তাঁত ধ্বংস করেছেন।"[৭] ফলস্বরূপ পুরাতন কারুশিল্পীর একটা বড় অংশ আর্থিক কারণে কল-কারখানায় মজুর অথবা নতুন বৃত্তি অবলম্বন করেছেন।

কুলানুগামী বংশগত ধারা হিসেবে জীবিকা বাংলার সমাজে ছিল অচল ও স্থিতিশীল। ব্রিটিশ সরকারের শোষণ নীতি এই স্থিতিশীলতা ধ্বংস করে দেয়। গ্রামে জীবিকার অভাবে, অর্থের

অভাবে গ্রামের কৃষক ক্ষেত-মজুররা শহরে গিয়ে দিনমজুর বা গৃহভৃত্যের কাজ গ্রহণ করলেন। কারুশিল্পের ধ্বংসের ফলে কারুশিল্পীরা কারখানার মজুর বা দক্ষ শ্রমিক হয়েছেন। কেউ কেউ জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন এবং মধ্যবিত্ত চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ীর স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আবার জমিদারের মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যেও একটা অংশ শহরে চাকরিজীবী ও ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তের জীবন যাপন করেছেন। এই তিন শ্রেণির গ্রামবাসী শহরমুখী হলেও সম্পূর্ণরূপে গ্রাম থেকে নিজেকে উচ্ছেদ করে শহরবাসী হয়ে উঠতে পারেন নি। গ্রাম থেকে শহরে যারা কুলি-মজুর হয়েছেন তারা সম্পূর্ণ রূপে Proletarianised হতে পারেন নি। গ্রামের কৃষক কারুবর্গ যারা শহরের দিনমজুর, গৃহভৃত্য, কারখানার মজুর অথবা ছোট ব্যবসায়ী বা চাকরিজীবী — শহরের খরচবহুল জীবনে সপরিবারে শহরবাসী হওয়া সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। তেমনি যাঁরা গ্রামের জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী শহরে মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত শ্রেণি হলেও সম্পূর্ণ 'urbanised' হতে পারেন নি। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীরা শহরে জীবন বা চাকরি-ব্যবসায় করলেও নাগরিক জীবনের প্রতিষ্ঠা, বিলাসিতা, শিক্ষাদীক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গ্রামের জমিদারী আয়ের উপরই বেশি নির্ভরশীল থেকেছেন।[৮] সামন্তযুগ থেকে ধনতান্ত্রিক যুগে পদার্পণের সন্ধিক্ষণ হল ঊনবিংশ শতাব্দী।

ব্রিটিশ আমলে কলকাতা ছিল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও সরকারি কাজকর্মের কেন্দ্রবিন্দু। তারা কলকাতায় নানা অফিস-আদালত ও কলকারখানা স্থাপন করে কলকাতা মহানগরী প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরাজদের প্রশাসনিক কেন্দ্র কলকাতা হয়ে উঠলে তাদের প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার জন্য ও শহরের চাকচিক্যর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে দলে দলে গ্রামাঞ্চল থেকে লোক কলকাতাভিমুখে যাত্রা করে। তাই বোঝা যায় গ্রাম থেকে কলকাতা নগরকেন্দ্রিক জনপ্রবাহ শুধু শিল্পায়নের কারণে নয়। নানা প্রকার চাকরি, বাণিজ্যলব্ধ মুনাফা ও হঠাৎ লভ্য টাকার প্রলোভনে কলকাতার জনবসতি বৃদ্ধি হতে থাকলে গ্রামের পর গ্রাম গ্রাস করে সীমানা প্রসারিত করা হয় কলকাতা নগরের। স্বদেশীয় হাতে তৈরি চটশিল্প অন্যতম গৃহশিল্প যা ব্রিটিশের মূলধনে তৈরি পাটকলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে পারেনি। কিছু লোক পাটচাষ করে লাভবান হলেও অন্যান্য কৃষিকর্ম ও গৃহশিল্প থেকে উৎখাত কিছু লোক পাটকলের মজুরে পরিণত হয়। ব্রিটিশ সরকারের আনুকূল্য ছাড়াও বাঙালি স্বাধীন ব্যবসায়ী হতে পারেনি কারণ ধনিক বাঙালিরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে সাহেবদের অধীনে বেনিয়ানি ও মুচ্ছুদ্দিগিরি করলেও স্বাধীন ব্যবসা করার সাহস ছিল না। জমিদারির উপস্বত্ব থেকে আয় ও বাঁধা মাইনের চাকরির প্রতি ধনিক ও মধ্যবিত্ত বাঙালির বেশি ঝোঁক দেখা গেছে এর পেছনে বাঙালির শ্রমবিমুখতা বহু পরিমাণে কাজ করেছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।[৯] গ্রামের উৎখাত কৃষকেরা নিজের জমি হারিয়ে হয়তো বা গ্রামান্তরে চলে গেছেন বা কেউ কেউ শহরেই থেকে শহরের উন্নয়ন ও দৈনন্দিন কাজে কলকারখানার কুলিমজুর শ্রেণিভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু উৎখাত কৃষকের সংখ্যার মত দ্রুত কারখানার বৃদ্ধি হয় নি। মজুরের চাহিদা থেকে মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাজের অভাবে সে সময় ভিখারী ও চোর-

ডাকাতের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে যায়। কার্লমার্ক্সের ভাষায় — "They were turned on masse into beggers, robbers, vagabonds, partly from inclination, in most cases from stress of circumstances. ...The fathers of the present working class were classified for their enforced transformation into vagabonds and paupers."[১০] বাইরের গ্রামাঞ্চল থেকেও গৃহভৃত্য ও কুলিমজুরের কাজের জন্য লোক শহরবাসী হয়েছে বহু মানুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভাব হয় বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির। আধুনিক শিক্ষা ও ইংরাজি শিক্ষার প্রসার এই শ্রেণির প্রভাব ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল নতুন ক্ষেতমজুর শ্রেণি, জমিদার শ্রেণি, কারখানার মজুর শ্রেণি ও উদীয়মান বুর্জোয়ার সঙ্গে বাংলার নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির বিকাশ।

মধ্যযুগীয় গ্রামীণ স্বয়ং-সম্পূর্ণ কৃষিনির্ভর ভারতীয় সমাজকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজরা ভেঙে দিয়ে এক নতুন ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি করেন। ইংরাজগণ আপন কূটিল শাসনের কৌশলের দ্বারা ভারতীয় কুটিরশিল্পের ও কৃষির মূলোচ্ছেদ করেন। সামন্ততান্ত্রিক বাংলায় ইংরাজ বণিকগণ ধনতান্ত্রিক ইউরোপের যন্ত্রোৎপাদিত পণ্যের দ্বারা কুটিরশিল্পের বাজারে এক বিপ্লবের আনয়ন করেন। ভারতীয় বাজারে ভারতীয় শিল্প বাজারচ্যুত হয় এবং বিদেশি পণ্যের চাকচিক্যে বাঙালির মনপ্রাণ লুব্ধ হতে থাকে। এদিকে সরকার বাহাদুরের প্রচেষ্টায় গ্রামের কুটিরশিল্পের বিলুপ্তির ফলে গ্রামের জীবিকার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাড়ায় কৃষি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের কৃষির উপর আরোপিত নানা প্রকার কর ব্যবস্থায় কৃষিক্ষেত্রও ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। কর-ভারে ভারাক্রান্ত জমিদারগণ করের বোঝা সাধারণ প্রজাদের উপর চাপাতে চেষ্টা করেন। ফলে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হয়ে পড়ে। এমনকি সিপাহি বিদ্রোহ দমনে যে খরচ হয়েছিল সেটিও অতিরিক্ত কর আদায়ের দ্বারা তুলে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। কুটিরশিল্প ও কৃষির শোচনীয় অবস্থাতে বাঙালিকে একমাত্র প্রলোভিত করতে থাকে কেরানির চাকরি। ইংরাজ শাসন ও বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তখন প্রয়োজন দেখা দেয় ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় যুবকের। ফলে কেরানির চাকরির আশায় দলে দলে লোক কলকাতায় এসে ইংরাজি শিখতে শুরু করে। কৃষি ও কুটিরশিল্প ছেড়ে কেরানির চাকরিতে ঢুকে এরা হয়ে ওঠেন ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্তের ইংরাজি শিক্ষার কারণ সোমপ্রকাশ এভাবে দেখিয়েছেন— “আমাদিগের দেশের লোকেরা পুত্রকে যে লেখাপড়া শিখান, মূলে চাকুরীই তাহার উদ্দেশ্য। পুত্র লেখাপড়া শিখিয়া কৃতী হইবেন, তাঁহার দ্বারা দেশের উপকার হইবে, স্বাধীন প্রবৃত্তি ও মত হইবে, এই চেষ্টা আমাদিগের দেশের লোকের আন্তঃকরণে এক মুহূর্তের জন্যও বোধহয় স্থান প্রাপ্ত হয় না। সমাজে বল, সভায় বল, পিতামাতা গুরুজনের নিকট বল, চাকুরীর মত সমাদর এমন কিছুরই নহে। অন্য উপায়ে সহস্র সহস্র টাকা উপার্জন কর তথাপি চাকুরীর ন্যায় লোকের তাহা তত শ্রবণ সুখকর ও নয়ন তৃপ্তিকর নহে। সাহেবের সহিত দুটা কথা কহিলে, সাহেব ভাল

বলিলে চাকুরে ভাবে গদগদ হইয়া থাকেন।"[১১] পরিবারে চাকরির মর্যাদা বেশি দেখে গ্রামের স্বরোজগার ও শ্রম ত্যাগ করে ইংরাজি শিখে চাকরির প্রত্যাশায় লোক কলকাতায় গেলে চাকরির তুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। "সেই কারণে কৃষকেরা পর্যন্ত ভদ্র হইবার প্রত্যাশায় জাতিব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে। কর্ম অপেক্ষা প্রার্থী অধিক সুতরাং কর্মের মূল্য বাড়িতেছে। কাজেই দশ পনের টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য দশহাজার প্রার্থী পাওয়া যাইতেছে।"[১২]

অষ্টাদশ শতকে সাদা-কালোর বর্ণভেদ তেমন না থাকলেও উনিশ শতকে ইংরাজদের বসতি ক্রমে কলকাতার চৌরঙ্গির দিকে এগোতে থাকলে এই বর্ণভেদ প্রখর হয়। কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে হঠাৎ অভিজাত জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়। ইংরাজরা স্বার্থের পরিপোষক রূপেই এই শ্রেণিটি সৃষ্টি করেছেন। তারই সঙ্গে এদেশের লোকের হাত থেকে সরকারি চাকরির সুযোগও কমতে থাকে অপরদিকে শাসক শাসিতের মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বোধ বৃদ্ধি হতে থাকে। ওয়েলেসলি খাঁটি রাজকীয় মেজাজ নিয়ে এসে বিশেষ অনুষ্ঠানে এদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করাও কমিয়ে দিলেন। তাই ইংরাজ ও ভারতীয়দের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন না হলেও শাসক ও শাসিতের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের মতোই শীতল থেকে যায়। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে বিদেশিনী গ্রাহাম কলকাতা শহরে এসে ইংরাজ ও এদেশীয়দের সামাজিক সম্পর্ককে দেখে বলেছেন — "The distance kept up between the Europeans and the natives... is such that I have not been able to get acquainted with any native family... every Briton appears to pride himself on being out rageously a John Bull."[১৩]

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কলকারখানার স্থাপন ও প্রসারের কাজ শুরু হয়ে পড়ে। কলকারখানার স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে যোগাযোগ সাধন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। ধীরে ধীরে তড়িৎ শক্তির ব্যবহার শিল্প উদ্যোগকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়। ব্রিটিশ আমলে ভারতীয় শিল্পনীতি ব্রিটিশ স্বার্থেই রূপায়িত হয়েছে যা খুব বেশি ভারতীয় শিল্পায়নের পরিপন্থী ছিল না। তথাপি উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলাদেশের শ্রীরামপুরে প্রথম কাগজের কল প্রতিষ্ঠা করা হয়, ১৮২০ রানীগঞ্জে প্রথম কয়লাখনি খোঁড়ার পর প্রায় বিশ বছরের মত স্তিমিত ছিল তবে পরবর্তীতে রেলপথ নির্মাণের পর কয়লাখনির সংখ্যা বাড়তে থাকে। পাটচাষ প্রধানত বাংলাদেশেই কেন্দ্রীভূত থাকায় ১৮৫৪ সালে প্রথম পাটকল শ্রীরামপুরে স্থাপন করা হয়। ১৮৭৯-৮০ সনে রানীগঞ্জ ও এর আশেপাশে ৫৫টি কয়লাখনিতে কাজ শুরু হয়। ১৮৭২-৭৩ সনে কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। ১৮৮২ সালে সমগ্র ভারতে স্থাপিত ২০টি পাটকলের ১৮টি বাংলাদেশে স্থাপিত হয় তার মধ্যে ১৭টি কলকাতা শহরেই স্থাপিত হয়।[১৪]

জনৈক হীন সাহেব মাদ্রাজে উনিশ শতকে লোহা-ইস্পাত উৎপাদনে প্রয়াসী হলেও ব্রিটিশ

শিল্পনীতিতে ভারতীয় শিল্পায়নের প্রতি থাকা উদাসীনতা হেতু বেশি কার্যকরী হয়ে উঠতে পারেন নি। ১৮৮৯ সালে বাংলাদেশে 'বেঙ্গল আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি' পরিচালনায় লোহার কারখানায় অল্প লোহা তৈরি করলেও ইস্পাত তৈরি করা হয় নি। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশের লোহা ইস্পাত শিল্পের প্রতি ইংরাজ সরকারের প্রতিকূল মনোভাব থাকলেও বিশ শতাব্দীতে অনুকূল হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের বাঙালিদের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর গভর্নমেন্টের দেওয়ানি ছেড়ে স্বাধীন ব্যবসায়ে উদ্যমী হন। তিনি ১৮২৯ সনে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা ধার নেওয়ার জন্য। শিল্প বাণিজ্যের জন্য 'কার ট্যাগর অ্যাণ্ড কোম্পানি' স্থাপন করে অংশীদার হিসেবে প্রিন্সেস সাহেবকে নিলেও মূলধন বেশির ভাগ দ্বারকানাথেরই ছিল। তাছাড়াও উত্তরবঙ্গ, পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যা পর্যন্ত ভূসম্পত্তি কিনে তিনি জমিদার হন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি, দেশীয় শিল্পানুকূল্যের অভাব, তাঁর বিলাসিতা এবং একই সঙ্গে জমিদার ও শিল্পপতি হবার চেষ্টা তাঁর শিল্পপতি হবার বাসনায় ব্যর্থতা এনেছে। রামদুলাল (Fairlie Fergusson Co) বেনিয়ান থেকে শেষ জীবনে কোটিপতি হয়েছেন।

উনিশ শতকের একদিকে নগরায়ণ, গ্রাম্য অচল ও স্থবির জীবনে নাগরিক বাতাসের প্রবাহ, ইংরাজি-শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আবির্ভাব বাংলার সমাজ জীবনে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। ইংরাজি শিক্ষার প্রচার ও প্রসার বাংলার সমাজ জীবনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। উনিশ শতকে বাংলায় যে নবজাগরণের সূচনা হয় তা এসেছিল এই ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির হাত ধরে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার নবজাগৃতির ধারায় যে জোয়ার-ভাঁটা, উত্থান-পতন এবং তরঙ্গ-বিক্ষোভ দেখা দেয় তার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কলকাতা মহানগর। ধানকল, পাটকল, ছাপাখানা, বাষ্পীয় জাহজ, রেলপথ — এগুলি হল নবজাগরণের অগ্রদূত। কলকাতায় নানা রকম কলকারখানা স্থাপন, নাগরিক সভ্যতার উন্নতি স্থিতিশীল বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় আঘাত হানে এবং মানুষ শহরমুখী হয়। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সংস্কারমূলক আন্দোলনের কেন্দ্রও ছিল কলকাতা মহানগরী।

ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার জন্য ইংরাজ শাসকগণ দায়ী হলেও ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বহু সমাজ সংস্কারও হয়েছে তাঁদের হাতে। ধর্মীয় সংস্কার, জড়তা ও অন্ধ-বিশ্বাসে জর্জরিত সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা লগ্নে (১৭৭৪-১৮৩৩) যুগনায়ক রামমোহন রায়ের আবির্ভাব এক যুগান্তরকারী ঘটনা। তিনি চেষ্টা চালান সামাজিক বিকৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কার ও মানসিক জড়তা দূরীকরণের। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত রামমোহন শুধু আধুনিক শিক্ষার মূল্যই উপলব্ধি করেন নি, শিক্ষার আলোকেই যে ভারতবর্ষ তথা বঙ্গীয় সমাজকে সংস্কারমুক্ত করা যাবে তা বুঝতে পারেন। তিনি বুঝে উঠতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানশিক্ষা ও এই শিক্ষার বাহক ইংরাজি শিক্ষাই আধুনিক যুগের মানুষকে যুগের উপযোগী করে তুলতে পারবে। তাই তিনি

ইংরাজি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। ইংরাজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতা উনিশ শতকে বাংলাদেশে এক নবজাগরণের বার্তা বহন করে আনে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে আসা নবজাগরণে ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব যেমন রয়েছে তারই সঙ্গে রয়েছে সংস্কৃত ও বাংলাভাষার অনুশীলনের প্রভাবও। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে সিভিলিয়ানদের জন্য শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রী উইলিয়াম কেরিকে সংস্কৃত ও বাংলাভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। কলকাতা শহরে পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার প্রথম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় ১৮১৭ সনে। গৌড়ীয় সভা ১৮২৩ সালে স্থাপন করা হয় 'এতদ্দেশীয় লোকদের বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানোপার্জন'এর উদ্দেশ্যে। ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে সরকারি ব্যয়ে কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই কলেজে সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষা প্রদান ও কিছু শাস্ত্রগ্রন্থও প্রকাশ করা হয়। শাস্ত্র প্রকাশের কাজ পরবর্তীতে এশিয়াটিক সোসাইটির উপর ন্যস্ত হলে প্রাচীন পুঁথি থেকে হিন্দু শাস্ত্রসমূহ 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকা' গ্রন্থমালা নামে প্রকাশ করেন। রামমোহন রায় ছাড়া আরও কিছু কিছু ব্যক্তিও প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ অনুবাদে প্রয়াসী হন। রামমোহন রায় বেদ সহ পাঁচখানি উপনিষদেরও বাংলানুবাদ করেন। রামমোহন রায়ের পর রাধাকান্ত দেব 'শব্দকল্পতরু' নামে সংস্কৃত অভিধান প্রকাশ করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের ব্যাসকৃত মহাভারতের অনুবাদ তথা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠার সূত্র ধরে সংস্কৃতচর্চার মধ্য দিয়ে বাংলার বিদ্বৎসমাজ ক্রমশ আলোড়িত হতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। ১৮৩৬ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির স্থাপন করা মেডিকেল কলেজ আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য অবদান। বিজ্ঞান ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে কারিগরি বিদ্যা ও শ্রমশিল্পের উন্নতিকল্পে নব্য ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্যোগে ১৯৩৯ সালে মেকানিক্স ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। সংস্কৃত কলেজে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদেরই শিক্ষার অধিকার ছিল, বিদ্যাসাগর সব জাতির জন্য কলেজের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। ১৮৫৫-৫৬ সনে ২০টি মডেল স্কুল ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা শিক্ষার বিস্তারকে আরও তীব্রতা দান করে। তারই সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষার প্রসারে বাংলার জনগণ উন্নতমনা হয়ে গণতান্ত্রিক মন্ত্রে দীক্ষিত হতে থাকেন। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ক্ষেত্রেও আলোড়নের সৃষ্টি হয়। মধুসূদন দত্তের হাতে গড়ে ওঠে অমিত্রাক্ষর ছন্দ। দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের অনন্যসাধারণ নাটক রচনাসমূহ বাংলা সাহিত্য জগতে আলোড়ন তুলে দিয়েছিল। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে হতে লাগল নতুন সাহিত্য সৃষ্টি, যা বাঙালির সাহিত্য চিন্তাধারাকে নতুন পথে প্রবাহিত করতে সাহায্য করেছে। শুধু তাই নয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর বন্দেমাতরম্ বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা অভিযানের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছে। এই মন্ত্রেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু দীক্ষিত হয়ে দেশ স্বাধীনতার কাজে লেগেছিলেন। এর পাশাপাশি চলছিল বিজ্ঞান গবেষণার কাজ। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'

স্থাপিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নবজাগরণ দেখা দেয় তাতে একদিকে যেমন শিক্ষার প্রসার বাংলার সমাজকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল অপরদিকে বাংলার সমাজকে উন্নত ও জাগ্রত করে তুলেছিল নানা প্রকার সংস্কার সাধনের কাজ। ১৮০২ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট আইন করে সমুদ্রের জলে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হিন্দুদের সন্তান উৎসর্গ করার নিষ্ঠুর প্রথাকে বন্ধ করা হয়। রামমোহন রায় ১৮২৮ সনে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করে এক নতুন বার্তা বহন করে আনেন। তিনি যুক্তি-তর্ক ও বিচারের মাধ্যমে ভারতবর্ষে নতুন আলোড়নের সূচনা করেন। তিনি হিন্দুযুগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন এবং এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি করাতে চান ভারতবাসীকে। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধী হতে তাঁকে দেখা যায় নি। তিনি জাতিভেদ প্রথারও বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি বঙ্গীয় নারীদের দুঃখ ও লাঞ্ছনা অনুভব করে বহুবিবাহ ও সহমরণ প্রথার প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালান। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সতীদাহ প্রথা রোধে আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে আইন করে শিশুবলী প্রথা রোধ করার চেষ্টা করা হয়। বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে আইনসম্মতভাবে বিধবা বিবাহের প্রচলনের দ্বারা সমাজে এক অভূতপূর্ব সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন। ১৮৯১ সনে আইন প্রণয়ন করে বাল্যবিবাহ রোধ তথা বিবাহের নূন্যতম বয়স নির্ধারণ করা হয়।

বঙ্গীয় নবজাগরণে 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। এই সম্প্রদায়টি পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা, আধুনিক চিন্তা এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রতি ইতিবাচক মনোভাবই পোষণ করেছে। বিনয় ঘোষের মতে— "ইয়ং বেঙ্গল' দলের অর্থনৈতিক আদর্শ ছিল 'অবাধ বাণিজ্যের আদর্শ', টিপিকাল 'free enterprise' এর আদর্শ, সংস্কৃতিক্ষেত্রেও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের দানও যুগান্তকারী।"[১৫] রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের মতো মনীষীদের প্রচেষ্টায় ও 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের প্রভাবে সমাজে যে পরিবর্তনের জোয়ার দেখা দিয়েছিল তাই পরবর্তীতে সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা করে বিংশ শতকের জাতীয় আন্দোলনের জোয়ার আনতে সাহায্য করেছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গে বদুরুদ্দীন উমর মন্তব্য করেছেন — "রামমোহন সতীদাহ নিবারণের আন্দোলন করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রচলনের আন্দোলন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রামমোহন মূলত ধর্ম সংস্কারক এবং বিদ্যাসাগর মূলত সমাজ সংস্কারক। যে সমাজ-সংস্কার শুধু রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ব্যাপার ছিল না। সমগ্র বাঙালী হিন্দু মধ্যশ্রেণী ছিল সমাজ-সংস্কারের নানান আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত। উনিশ শতকে বাঙ্গালী মধ্যশ্রেণীর এই সমাজ-সংস্কার আন্দোলন প্রবাহিত হয়েছিল দুটি স্বতন্ত্র ধারায়। তার একটি ছিল ধর্ম সংস্কারের মাধ্যমে সমাজ-সংস্কার। অন্যটি ছিল ধর্মের প্রশ্নকে বাহিরে রেখে অথবা এড়িয়ে গিয়ে সমাজ-সংস্কার। রামমোহন ছিলেন প্রথম ধারার প্রবর্তক। দ্বিতীয় ধারার প্রবর্তক ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী এবং

পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যাসাগর ছিলেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ মুখপাত্র এবং সর্বপ্রধান চালিকা শক্তি।"[১৬]

১৮৫৭ সনে সেনাবাহিনীর দ্বারা ইংরাজের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা 'সিপাহী বিদ্রোহ' পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন কারণে গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। তবে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি এবং ব্রিটিশ আমলের নতুন জমিদারশ্রেণি এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করেন। তবে ইংরাজদের যুদ্ধ চলাকালীন অমানুষিক অত্যাচার এ দেশের জনগণের মনে ইংরাজ বিরোধী জাতীয় বিদ্রোহের সঞ্চার করে। এই মনোভাব নীল বিদ্রোহ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলার লক্ষ লক্ষ দরিদ্র চাষী নীলচাষের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করেন। উনিশ শতকের ষাট সত্তরে 'ইয়ং বেঙ্গলে'র ভূমিকায় অবতীর্ণ হন ব্রাহ্ম সমাজের নবীন গোষ্ঠী। ফলে ব্রাহ্মসমাজের ভেতরে নবীন ও প্রবীণের সংঘর্ষ ও বিচ্ছেদ দেখা দেয়। নবীন কেশবগোষ্ঠী গড়ে তোলেন 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' ও প্রবীণরা তাঁদের সমাজের নাম দেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ'। এই প্রবীণ ব্রাহ্মসমাজের নেতা রাজনারায়ণ বসু 'জাতীর গৌরব' সম্পাদনী সভা স্থাপন করে মাতৃভাষায় শিক্ষা, বাংলায় কথোপকথন ও বক্তৃতা, হিন্দু শাস্ত্রসম্মত সমাজ সংস্কার, দেশীয় (হিন্দু) উৎসব অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা, দেশীয় পোশাক পরিধান ইত্যাদি সংকল্প ঘোষণা করেন। ১৮৬৭ সনে প্রথম হিন্দুমেলা অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনের সম্পাদক হিন্দুমেলা সম্পর্কে বলেছেন — "এই মেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা।... একদিনে কোন এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখাশুনা হওয়াতে অনেক মহৎ কর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফূটিত হইতে পারে, যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা 'হিন্দু মেলা' ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্ধিত হইতে থাকে।"[১৭] হিন্দুমেলা হিন্দুত্বের সঙ্গে সঙ্গে স্বাদেশিকতারও প্রেরণা দেয়। এই স্বাদেশিকতাবোধ সিপাহি বিদ্রোহ ও পরবর্তীতে নীলবিদ্রোহের ফল। জাতীয়তাবোধের, নবজাগরণের এই পরিবেশে 'ভারতসভা' ও 'জাতীয় কংগ্রেসে'র মধ্যে থাকা জাতীয়তাবোধ হিন্দুত্বের বেশ ত্যাগ করে রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে।

ইণ্ডিয়ান লীগ ১৮৭৫এ গঠিত হয়। ভারতসভা গঠিত হয় ১৮৭৬ সালে। বাংলার তরুণদের মনে জাতীয়তাবোধ উজ্জীবনের জন্য সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, শিবনাথ ও তাঁদের সহকর্মীরা সচেষ্ট হন এবং ছাত্রদের 'ছাত্রসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতসভা দেশের একটি বড় রাজনৈতিক অভাব পূরণ করে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ইলবার্ট বিলের আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ডের ফলে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক চেতনার ব্যাপকতা বৃদ্ধি হয়। ১৮৮৬ সালে কলকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় আধিবেশন হয়। তবে উনিশ শতকে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতারা ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতের কথা চিন্তা করেন নি, তবে তাঁরা শুধু আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে শ্রেণিস্বার্থের আংশিক চরিতার্থর জন্যই আন্দোলন আরম্ভ করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত অসম এবং বাংলার বেশি স্বারূপ্য লক্ষিত হয় না। অসম নদীমাতৃক দেশ। অসমের পলিমাটি চাষাবাদের উপযোগী তাই সমগ্র মধ্যযুগ জুড়ে চাষবাসই ছিল অসমের

প্রধান জীবিকা। তবে অসমে শিল্পকলাও ছিল। অসমের মূগা সূতা প্রসিদ্ধ ছিল। আহোম যুগে অসম ছিল অর্ধ-জনজাতীয় ও অর্ধ-সামন্তীয়। অর্ধ-সামন্তীয় অসমে বঙ্গের মত জমিদারি প্রথার প্রভাব ছিল না। জমিদারি প্রথা না থাকায় কৃষক ও জমিদারের টানাপোড়ান তেমন লক্ষিত হয় নি। অসমে পাইক বা গোট প্রথার মধ্য দিয়ে ভূমি বন্টন চলত। কৃষি উপযোগী মাটি বছরে বছরে পাইকদের বিতরণ করা হত বা পুনর্বন্টন করা হত। আহোম যুগের অসম এরূপ ছিল — "আহোমর আমোলত সমাজ আছিল অর্দ্ধ-জনজাতীয় অর্ধ-সামন্তীয়। আর্য জনগোষ্ঠীর লোক সমষ্টিক বাদ দিলে বাকী সমূদায় জনসমষ্টি আছিল জনজাতিমূলীয়। বিভিন্ন জাতি-জনজাতিক লৈ মধ্যযুগর অসমত জনসমষ্টি গঠিত হৈছিল। আহোমসকলর অসম আগমনর সময়ত তেওঁলোকে মরাণ আরু চরাহী জনজাতির সৈতে পোনতে সামাজিক সম্পর্কলৈ আহে। দিন অতিবাহিত হোয়ার লগে লগে আরু আহোম রাজ্যর পরিসর বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে আহোম সকলক লাহে লাহে চুটীয়া, কছারী, বড়ো, বারভূএগ্রা, মিরি, লালুং (তিঁয়া), কোচ, কার্বী (মিকির) আদি বিভিন্ন ট্রাইবেল জনগোষ্ঠী আরু আর্য মূলোদ্ভব লোকর সংস্পর্শলৈ আহে আরু এই সকলোরে প্রচেষ্টাত, কোনো কোনো ক্ষেত্রত সংমিশ্রণ আরু কোনো কোনো ক্ষেত্রত সংহতি সমন্বয়েরে, অসমত এক বৃহৎ জাতি গঠন প্রক্রিয়ার সূচনা হৈছিল।"[১৮]

জমিদারি প্রথা না থাকায় অসমে কৃষির উপর ব্যক্তিগত স্বত্ব বা মালিকানা ছিল না। তাই মাটি কেনা বেচার ব্যবস্থা ছিল না। তবে সমাজের ওপরতলার সম্মানিত ব্যক্তি তথা সত্রাধিপতিদের কিছু মাটির উপর প্রতিপত্তি দেওয়া হয়েছিল। আহোম রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে যদিও রাজা উপাধি দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি ভোগ করতে দেওয়া হত প্রকৃত অর্থে তারা ছিল আহোম রাজার কর্মচারি। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজারাও আহোম রাজত্বে অভিজাত শ্রেণির অংশীদার ছিল। আহোম রাজত্বকালে রাজার পরে থাকা সামাজিক শ্রেণি বিভাজন ছিল — "অভিজাত শ্রেণী তথা ডা-ডাঙরীয়া শ্রেণীর প্রায় তলতে আছিল পুরোহিত, গোসাঁই, মহন্ত, সত্রাধিকারসকল। এওঁলোকেও নিজর ভরণ-পোষণ আরু মান-মর্যাদা অনুসারে পর্যাপ্ত পরিমানর নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি লাভ করিছিল। দেবোত্তর, ধর্মোত্তর, ব্রহ্মোত্তর আদি নিষ্কর ভূ-সম্পত্তিসমূহর গোসাঁই গরাকী আছিল প্রধানতঃ পুরোহিত ব্রাহ্মণ, আরু সত্রাধিকারসকল। এওঁলোকে আরু এওঁলোকর সত্রর ভকতসকলে রাজঘরত পাইক খটারপরা রেহাই পাইছিল।

দেশর সাধারণ প্রজাসকল দুই ভাগত বিভক্ত আছিল — চমুয়া আরু কাঁড়ী পাইক। কাঁড়ী পাইকে নিজর কর্ম দক্ষতা দেখুয়াব পারিলে 'চমুয়া' শ্রেণীলৈ উন্নীত হ'ব পারিছিল। চমুয়া শ্রেণীলৈ উঠা পাইকে রাজঘরত গা-খাটনি করিব অথবা রণলৈ যাব নালাগিছিল। চমুয়ার শ্রেণীলৈ উঠাটো এক মর্যদার প্রশ্ন আছিল। আহোম রাজত্বর শেহর ফালে বহু কাঁড়ী পাইকে রাজঘরত গা-খাটনি দিয়ার পরিবর্তে টকারে খাজনা দি চমুয়ার শারীলৈ উঠিছিল।"[১৯]

আহোম রাজত্বেও দেখা গেছে কৃষি নির্ভর অর্থনীতি। রাজা হওয়া বা সিংহাসন আরোহনের পূর্ব পর্যন্ত যুবরাজকেও চাষের জমিতে যেতে দেখা গেছে। অসমের পাহাড় অঞ্চলের জনজাতির

মধ্যে ঝুম খেতের প্রচলন ছিল। তারা একটি স্থানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করত না। তাই বসবাস করা স্থানের নিকটবর্তী জায়গায় বন-জঙ্গল কেটে পুড়ে দিয়ে সেই স্থানে বর্ষার জল পড়লে শস্যের উৎপাদন করত। তবে একবার চাষ করলে পরবর্তী এক দুবছর আর সে স্থানে চাষ করত না আবার পুরনো স্থানে চলে যেত। আহোম রাজত্বে গ্রাম সমূহ ছিল অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র ও আত্মনির্ভরশীল। পোষাক পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে খাদ্যশস্য নিজের ঘরেই উৎপাদন করত গ্রামের মানুষ। আর নিজের ঘরে না থাকা জিনিষগুলি অন্যের থেকে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে সংগ্রহ করত। আর্য এবং জনজাতীয় সংমিশ্রিত কাঠামোতে তৈরি অসমে উৎপাদন ক্ষেত্রে নারীপুরুষের সমানাধিকার ছিল। অসমে জাতিভেদ প্রথা থাকলেও প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে তথা মধ্যযুগে অঞ্চলভেদে তেমন বেশি কঠোর হতে দেখা যায় নি — "all the people of this country... eat whatever they get from the hand of any man, regardless of his caste... They dont abstain from eating food cooked by Muslims and non Muslims, and partake of every kind of meat, whether of dead or of slanghtered animals."[২০] আবার কোনো কোনো অঞ্চলে কঠিন জাতিভেদ প্রথা দেখা গেছে। "কোনো কোনো অঞ্চলত আরু কোনো কোনো লোক সমষ্টির মাজত জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বিরাজ করিছিল। সামাজিক রীতি-নীতি, খাদ্যর বাছ-বিচার হিন্দুধর্মাবলম্বী লোক সমষ্টির মাজত কঠোরভাবেই পালন করা হৈছিল। বর্ণ হিন্দু সমাজর লোকে অন্য জাতি বা বর্ণর লোকর পরা আহার গ্রহণ নকরিছিল। গো-মাংস আরু কুকুরা আরু গাহরীর মাংস বর্ণহিন্দু সমাজত অপ্রচলিত আছিল। সেই দরে মাছর ভিতরত শাল, শিঙি, গৌড়া সিরিকা আদি বর্ণহিন্দু লোকে ভক্ষণ নকরিছিল।"[২১] প্রাক্ ব্রিটিশ যুগে জাতিভেদ প্রথা ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ পরিবার ছাড়া অন্য কোথাও এত বেশি কঠিন ছিল না। মধ্যযুগের শেষের দিকে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা তীব্র রূপ ধারণ করে, আর্যসভ্যতার আগ্রাসনের পরে তথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীর প্রব্রজনের সঙ্গে। "মধ্যযুগত অসমর এই বিভিন্ন জাতি-জনজাতির মাজত, রাজনৈতিক দন্দ্ব-বিরোধ বাদে, সামাজিক সদ্ভাব সম্প্রীতি অটুট আছিল আরু উচ্চ বর্ণর হিন্দুসকলর বাহিরে বাকীসকলর মাজত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হৈছিল। প্রাচীন বা মধ্যযুগত ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মর কোনো উগ্র অনুগামী অথবা সমর্থক অসমর রজা বা শাসনকর্তা নথকাত (অবশ্য আহোম রাজা গদাধর সিংহ, শিবসিংহ আরু তেওঁর রাণী বররজা ফুলশ্বরীক বাদ দি) বিশেষকৈ মধ্যযুগত মুসলমান শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন নোহোয়াত, আরু শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে প্রচার করা মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব ধর্মর উদার মানবতাবাদে ধর্মীয় নির্যাতনর পরা অসমক প্রায়েই মুক্তি করি রাখিছিল।"[২২]

অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দল এবং বাহ্যিক আক্রমণ আহোম রাজত্বের ভীত শিথিল করে দেয়। পুরন্দর সিংহ স্বর্গদেব ১৮১৯ সনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে অসমকে মানের অত্যাচার থেকে মুক্তি দিয়ে সুস্থ রাজ্যে পরিণত করার অনুরোধ জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন।[২৩]

মানের আক্রমণ (১৮১৯-১৮২৬) থেকে রাজ্যরক্ষার্থে ও অসমের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রক্ষার

জন্যই ইংরাজরা অসমে এসেছিল বলে অসমের জনগণকে আশ্বস্ত করলেও ১৮২৬ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইয়ান্দাবু সন্ধির পর ইংরাজ অসমে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তার করতে আরম্ভ করেন। ব্রিটিশের সাম্রাজ্য বিস্তার নীতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে কিছু ভগ্ন মনোরথী অসমীয়া, মণিপুরী সামন্ত শাসক, খাসী, নাগা, চিংফৌ এবং গারো ইত্যাদি পার্বতীয় জনজাতিগুলো ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যদিও কিছু সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য তাঁদের হাতে সফলতা আসে নি।[২৪]

ব্রিটিশ সরকারের শাসন ও দ্রুত বাণিজ্য বিস্তার অসমের অর্থনীতিতে আঘাত হানে। আহোম আমলে অভিজাতশ্রেণি তথা ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, সত্রাধিকারিরা যথেষ্ট পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি ভোগ করতে পারত তারই সঙ্গে পাইক ভোগ করতে পারত। ব্রিটিশ আগমনে সামন্ততান্ত্রিক শাসনে পাওয়া সুবিধা ও মান-মর্যাদা হারিয়ে অভিজাত শ্রেণিটি অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। ব্রিটিশ সরকারও প্রাচীন অভিজাত শ্রেণিটির আনুগত্য লাভের জন্য তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক মর্যাদায় যাতে আঘাত না আসে তাই নতুন প্রশাসন ব্যবস্থায় সৃষ্টি হওয়া বিভিন্ন পদে কিছু কিছু অভিজাতকে নিযুক্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

কোম্পানির শাসন প্রবর্তন করতে ১৮২৮ সনে বঙ্গদেশের সরকার ডেভিড স্কটকে অসমে পাঠান। ব্রিটিশ সরকার অসমে এসে ভূমি বন্দোবস্তর ব্যবস্থা করেন। ব্রিটিশ অসমে এসে মূলত নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ঔদ্যোগিক বিকাশেরই উপর প্রাধান্য দেন। ব্রিটিশ সরকার অসমকে ১৮৭৪ সন পর্যন্ত বঙ্গদেশ থেকেই চালাচ্ছিলেন। অসম এবং সিলেটকে নিয়ে একটা আলাদা কমিশনারের অধীন প্রদেশ তৈরি করা হয় ১৮৭৪ সালে। এই সময় ইংরাজ সরকার আহোম রাজা পুরন্দর সিংহের রাজ্যচ্যুতি, মটক নাগা, খাসী, ভুটীয়া, গারো ইত্যাদি জনজাতির দমন, খাজনা বন্দোবস্ত, হাদিরা চকীর সীমান্ত বাণিজ্য কেন্দ্রের বিলুপ্তি, মিলিটারী শাসন, গড়কাপ্তানি বিভাগ সৃষ্টি, সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন, নতুন বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং স্থানীয় প্রতিপত্তিবানদের পরিচালিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থার লোপ সাধন, সিপাহি বিদ্রোহ দমন ইত্যাদিতে ব্যস্ত ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার অসমের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতিতে নজর দেন নি। তাছাড়া খেল তথা পাইক প্রথার ধ্বংসের ফলে অসমের কুটিরশিল্পেরও ক্ষতি হয়। মাটি বন্দোবস্তর ফলে কৃষকের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। মণিরাম দেওয়ান এবং হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন তথা অন্য একাংশ লোক ইংরাজের নতুন শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয়ে ওঠেন।

১৮২৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ধনঞ্জয় বরগোহাঁই সহ অন্যান্য বিদ্রোহী সামন্তরা যোরহাটের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের বশা নামক স্থানে রাজকীয় মর্যাদা এবং বাইলুংদের পূজার্চনার মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে গমধর কোঁয়রকে রাজা নির্বাচন করে দেয়। কোম্পানির সরকার যোরহাটে পঞ্চায়েত পেতে এই বিদ্রোহীদের বিচার করেছিলেন। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ১৮২৮ সনে গদাধর সিংহ নামে আহোম কুমারের উদ্যোগে দ্বিতীয়বার ইংরাজ রাজত্বকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা হয়। এই বিদ্রোহকে ইংরাজ সরকার কঠোরভাবে দমন করতে সমর্থ হয়। এই চেষ্টা ব্যর্থ হলে তৃতীয়বার

বিদ্রোহ ঘোষিত হয় ১৮৩০ সনে। ধনঞ্জয় বরগোহাঁই ছিলেন তৃতীয় বিদ্রোহের সংগঠক। এই কার্যের সমর্থন দেওয়ার জন্য মোয়ামরীয়াদের বরসেনাপতি, খামটী, চিংফৌ, খাসী, গারো, নাগা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে আবেদন করা হয়। এই সমস্ত বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ইংরাজ সরকার পুরন্দর সিংহকে বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে অসমের রাজ্যভার দেন ১৮৩৩ সনে চুক্তিপত্র সম্পাদন করে। পুরন্দর সিংহ রাজ্য পাওয়ার পূর্বে ইংরাজ সরকার আট বছর রাজত্ব করে থাকা সময়ে বঙ্গদেশ থেকে লোক এনে রাজত্ব চালিয়েছিলেন কারণ অসমের প্রাচীন অভিজাত শ্রেণিটিকে তারা শাসন পরিচালনার জন্য যোগ্য মনে করতে পারেন নি। পুরন্দর সিংহ রাজত্ব পাওয়ার পর খেল প্রথাকে অব্যাহত রাখেন। তবে ইংরাজকে প্রদেয় ধন আদায়ের জন্য সাধারণ প্রজার উপর অত্যাচার অক্ষুণ্ণ রাখেন।[২৫] ১৮৩৮ সনের ১৬ সেপ্টেম্বর কোম্পানির সরকার পুরন্দর সিংহকে ১০০০ টাকা মাসিক ভাতা দিয়ে আবার রাজ্যচ্যুত করেন।

ইংরাজদের ভূমি বন্দোবস্ত নীতি কৃষকদেরও বিক্ষুব্ধ করে। কোম্পানির সরকার ভূমির বন্দোবস্ত আর কর আদায়ের মধ্য দিয়ে অসমে আমূল পরিবর্তন আনেন। এই ব্যবস্থার ফলে মাটির মালিকের থেকে খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি বন-জঙ্গল, খাল-বিল, পার-ঘাট, হাট-বাজারের উপরও খাজনার ব্যবস্থা করা হয় এবং ব্রিটিশ সরকারের আয় বৃদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে কর বৃদ্ধিও করা হয়। ব্রিটিশ-পূর্ব অসমে ছিল বিনিময় ব্যবস্থা মুদ্রার প্রচলন ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের সময় মুদ্রার প্রচলনও অসমের অর্থনীতির একটি সংকটপূর্ণ দিকে নিয়ে যায়। অনগ্রসর ব্যবসা-বাণিজ্য এবং হাট-বাজারের সীমাবদ্ধতা ও তার উপর করের বোঝার জন্য নগাঁও জেলার এক অংশ কৃষক ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ১৮৩৬-৩৭ সনে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন।[২৬] নগাঁও জেলার কৃষকবিদ্রোহের পর ১৮৬১ সনে ফুলগুড়ি, ১৮৬৮ সনে দরং এবং কামরূপে কৃষকবিদ্রোহ দেখা দেয়।

ব্রিটিশ সরকার যে পরিমাণে খাজনা বৃদ্ধি করছিল সে পরিমাণে আসামের কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করে নি। ফলে করের বোঝা ও শস্যের কম উৎপাদন দুর্ভিক্ষের দিকে নিয়ে যায়। কোনো কোনো পরিবারকে গৃহ সামগ্রী বিক্রি করে খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করতে দেখা গেছে। অপরদিকে অভিজাত শ্রেণিটির অবস্থানও সংকটপূর্ণ ছিল কারণ বঙ্গদেশ থেকে লোক এনে প্রশাসনিক কার্য পরিচালনার ফলে তাঁরা কর্মসংস্থান হারাতে আরম্ভ করেন। তাছাড়া দাস প্রথার অবলুপ্তির ফলে ইংরাজ আমলে পুরোহিত এবং অভিজাত শ্রেণিটি খেতে-খামারে কাজ করা লোকের অভাবে অসুবিধার সম্মুখীন হতে থাকে। অভিজাত শ্রেণিটিকে শ্রমজীবী শ্রেণিতে নেমে আসতে হয়। ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, সত্রাধিকারদের নিষ্কর ভূমিগুলির অতিরিক্ত ভূমি কেড়ে নিয়ে খাজনা আরোপ করে সরকার। এই সংকটপূর্ণ সময়ে আবির্ভাব হয় মণিরাম দত্ত বরভাণ্ডার বরুয়া দেওয়ানের (১৮০৬-৫৮)। মণিরাম দেওয়ান নব্য ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থার আমলারূপে কার্যনির্বাহ করছিলেন। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণির মণিরাম দেওয়ান বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। শ্রেণিস্বার্থের প্রতি স্পর্শকাতর মণিরাম দেওয়ান পরবর্তীতে ইংরাজ বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

ইংরাজ আগমনে অভিজাততন্ত্রের ধ্বংস ও মধ্যবিত্তের আবির্ভাব ঘটে। মধ্যবিত্ত শ্রেণিটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। গ্রাম অঞ্চলের মৌজাদার, মণ্ডল, গাঁওবুঢ়া, সত্রাধিকার ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, শিক্ষক ইত্যাদি। দ্বিতীয় শ্রেণিতে মূলত নগরের চাকরিজীবী — কেরানি, পেসকাস, পুলিশ, দারোগা, ডাক্তার, উকিল, হাকিম ইত্যাদি। এদের জীবিকা চাকরি এবং ব্যবসায়। আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সবার পরিচয় না থাকলেও পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার প্রভাব তাঁদের উপর পড়েছিল। নিজ স্বার্থ চেতনাই তাদের ইংরাজের সংস্পর্শে নিয়ে আসে। তাঁদের ভিতর মণিরাম দেওয়ান, হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন, দীননাথ বেজবরুয়া, হরকান্ত বরুয়ার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজ অসমে এসে নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কোর্ট-কাছারী, আইন-আদালত, নতুন ভূমিনীতি, রাজস্ব ব্যবস্থা, মুদ্রার প্রচলন, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা করে। পুঁজিবাদী আদর্শে গঠিত চা-শিল্প, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় আসামের মানুষের মনে নতুন চেতনার জাগরণ করে।

ব্রিটিশ অসমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় যে সমস্ত উচ্চ এবং অভিজাত শ্রেণির ঘরের তরুণ ছেলে কলকাতায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ প্রশাসনের সহযোগী আধুনিক মধ্যশ্রেণি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন— হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন এবং তার ভাই যজ্ঞোরাম খারঘরীয়া ফুকন, রামদত্ত বরুয়া এবং পুত্র মণিরাম দেওয়ান, কাশীনাথ ফুকন, জাদুরাম ডেকাবরুয়া, দীননাথ বেজবরুয়া ইত্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুবিধার জন্য লেখা-পড়া শিখিয়ে উচ্চবংশজাত ক্ষমতাশালী সম্ভ্রান্ত অভিজাত শ্রেণিটির এক অংশকে নিজেদের সহযোগী করে নেয় ইংরাজগণ। এরাই হলেন নতুন মধ্যবিত্ত অসমীয়া শ্রেণির আদি পুরুষ। সংক্রান্তিকালে আসামের সত্রসমূহে ধর্মীয় সংস্কৃতি — ফার্সী চর্চা, কাব্য, ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, খেলাধূলা, চিত্রাঙ্কন বিদ্যার ক্রমশ অবনতি ঘটে। অসমীয়া সংস্কৃতি ও পরম্পরা রক্ষা করার কোনো উৎসাহ অসমীয়াদের মধ্যে দেখা যায়নি।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রশাসনের সহযোগী পুরনো অভিজাত শ্রেণি বাংলার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণিটির বিদ্যা শিক্ষার জন্য কলকাতায় গিয়ে থাকার সূত্রে অসমীয়া মধ্যশ্রেণি জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হয়। বাঙালিদের নিজের ভাষা সাহিত্যের প্রতি থাকা আগ্রহ ও আকর্ষণ তাঁদের মধ্যে জাতীয় চেতনার বীজ রোপন করে দেয়। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে বাংলাভাষায় আসাম বুরঞ্জী প্রকাশ করেন হরিরাম ঢেকিয়াল ফুকন। মণিরাম দেওয়ান বাংলাভাষার সঙ্গে অসমীয়া সংস্কৃত মিলিয়ে ‘বুরঞ্জী বিবেকরত্ন’ লিখেন। অসমীয়া ভাষিক জাতীয়তাবাদের জনক আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনও বাংলাভাষাতেই ‘দেওয়ান বন্দি’ এবং ‘আইন ও আইন ব্যবস্থা সংগ্রহ’ নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণির চরিত্র ছিল মূলত অর্ধসামন্তীয়।

মণিরাম দেওয়ানের ভারতীয় বণিক তথা বুর্জোয়া শ্রেণির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ব্যক্তিগত

পুঁজিতে চা-বাগান সৃষ্টি এবং দেওয়ান হয়ে থাকার সময়ে বিভিন্ন ব্যবসার উপর ইংরাজের একনায়কত্বের অবসান ঘটিয়ে সবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ খুলে দেওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। নতুন জীবনের বার্তা বহন করতে গিয়ে এক সময়ের ব্রিটিশ বন্ধু মণিরাম দেওয়ান ব্রিটিশের বিরোধিতা করার অপরাধে ব্রিটিশ সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং তাঁর অকালমৃত্যু ঘটে। ড. অমলেন্দু গুহর মতে — "মণিরাম প্রভাবিত হৈছিল বিদেশী বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা আরু নতুন শাসন-ব্যবস্থার অমোলত পোয়া অর্থনৈতিক সুবিধাবিলাক গ্রহণ করিবলৈ তেওঁ সম্পূর্ণ সাজু আছিল। কিন্তু লগে লগে ইয়াকো বিচারিছিল যে পুরণি কালর ডা-ডাঙরীয়াসকলে ভোগ করা সামাজিক সুবিধাবিলাকো থাকক। এই স্ব-বিরোধ আছিল সেই সময়র ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের প্রতীক। পুরণি আরু নতুনর মাজত, সামন্ততন্ত্র আরু ধনতন্ত্রর মাজত, রক্ষণশীল আরু প্রগাতিবাদর মাজত মণিরাম আছিল এখন সাঁকোর দরে।"[২৭] ব্রিটিশ সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণিটিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে পুঁজি সঞ্চয় করার সুবিধা দেন নি। মণিরাম দেওয়ান আপন পুঁজিতে চা-বাগান তৈরি করে ইংরাজকে চকিত করে দেয়।

কাজের সুবিধার্থে ১৮৩৬ সাল থেকে অসমের অফিস-আদালতের ভাষা বাঙলা করা হয়। ১৮৩৬-১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষা অসমের স্কুল-কলেজ তথা আদালতে আধিপত্য সঞ্চার করে থাকায় অসমীয়া সাহিত্যের বহু ক্ষতি সাধিত হয়। ১৮৩৫ গুয়াহাটীতে প্রথম ইংরাজি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পূর্বে অসমে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হয়নি। ১৮৪১ সনে অসমের শিবসাগরে দ্বিতীয় সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তবে পুরনো সম্পদশালী উচ্চবর্ণর হিন্দু অভিজাত শ্রেণির ছেলে-মেয়েরা এ সমস্ত বিদ্যালয়ে পড়ার অগ্রাধিকার লাভ করে। তাছাড়া সর্বসাধারণের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ইংরাজদের উদ্দেশ্য ছিল না। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-৫৯) হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫-৯৬) এবং গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৭-৯৪) — এই ত্রিমূর্তিই ইংরাজি শিক্ষিত আধুনিক মধ্যবিত্তের অগ্রজ। আত্মারাম শর্মার 'বাইবেলর অসমীয়া ভাঙনি'র দ্বিতীয় সংস্করণ হয় (১৮৩৩)। ১৮৩৮ সনে যদুরাম ডেকা বরুয়াই 'অসমীয়া বাংলা অভিধান' লিখে ভাষা দুটির স্বতন্ত্রতা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করেছেন। শ্রীরামপুরের রবিন্সন সাহেবের ইংরাজিতে লেখা 'অসমীয়া ব্যাকরণ' (১৮৩৯), আলিবর টিং কাট্রার পত্নী শ্রীমতী কাট্রারের 'অসমীয়া শব্দাবলী আরু খণ্ডকাব্য' (১৮৪০), বিশ্বেশ্বর বিদ্যাপতির 'বেলিমারর বুরঞ্জী' (১৮৩৩-৩৮) উল্লেখযোগ্য। কাশীনাথ তামুলী ফুকনের 'অসম বুরঞ্জী' (১৮৪৪), শিবসাগরের মিশনারি প্রেস থেকে ১৮৪৬ সনে অসমিয়া ভাষার প্রথম সাময়িকপত্র 'অরুনোদই' প্রকাশিত হয়। এই সাময়িকপত্রটিতে অসমীয়া সমাজকে দেশ-বিদেশের জ্ঞান দিয়ে বিস্তৃত জগতের সঙ্গে অসমীয়া জাতিকে পরিচয় করানো, পাশ্চাত্য ভাবধারার বীজ সিঞ্চন করে আধুনিক হতে সাহায্য করা, আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, নিধিরাম ফারবেল, হেমচন্দ্র বরুয়া, গুণাভিরাম বরুয়া প্রমুখের নানা বিষয়ে লেখা অসমীয়া সাহিত্যের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা ইত্যাদি লক্ষ করা গেছে। তাছাড়া অসমীয়া সংবাদপত্র প্রবর্তনের আদর্শ হিসেবে কাজ করেছে এই অরুণোদয় পত্রিকাটি। এরই সঙ্গে অসমীয়া ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবি ও

প্রচেষ্টা সফল হয় ১৯৭৩ সনে। ১৮৭৩ সনে মিশনারিদের এবং অসমীয়া মধ্যবিত্তের দাবিতে অসমীয়া ভাষা আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করে অসমের স্কুল, অফিস-আদালতে। এর পরবর্তীতেই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যের আত্মপ্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা। 'অরুণোদয়'কে অনুসরণ করে 'আসাম বিলাসিনী' (১৮৭১-৮৩) 'আসাম মিহির' (১৮৭২-৭৩) 'আসাম দর্পণ' (১৮৭৪-৭৫) ইত্যাদির জন্ম হয়েছিল। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'জোনাকী' পত্রিকাটি অসমীয়া সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের কিছু সংস্কারমূলক কার্যসাধনেও ব্রতী হতে দেখা গেছে। সংস্কারমূলক কার্যের মধ্যে ছিল বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ, আন্তঃ সাম্প্রদায়িক আহার এবং বিবাহ, পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, কন্যাপণ প্রথার অবসান, যৌতুক প্রথার অবলুপ্তি ইত্যাদি। সে সময়ে অসমে শিক্ষার প্রচার ছিল নগণ্য, যতটুকু ছিল তা ছিল শুধু ইংরাজ-স্বার্থে। তাছাড়া ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে তৎকালীন সমাজ রক্ষণশীল মনোভাবই দেখিয়েছিলেন। ইংরাজি শিক্ষায় জাত যাওয়ার মনোভাবও তাঁরা পোষণ করতেন। অসমের এই দুর্দিনের সময় আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন অসমবাসীকে বিদ্যাশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন। আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতার সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনই প্রথম নবজীবনের আগ বার্তা বহন করে আনেন অসমবাসীর সামনে। কলকাতায় শিক্ষা লাভ করতে থাকাকালীন সময়ে হঠাৎ বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করে ফিরে আসতে হলে ফিরে আসার সময় সেখান থেকে আধুনিক ধরনের চেয়ার টেবিল, ইংরাজি এবং সংস্কৃত গ্রন্থ নিয়ে আসেন তিনি — "গুয়াহাটীত আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনেই প্রথমতে আধুনিক ধরণে করা জীবন নির্বাহর আৰ্হি দেখুয়ায়। এওঁর ঘরর এটা কোঠালিত চকী-মেজ সজাই ইংরাজর ধরণে-কারণেরে বহা মেলার ব্যবস্থা করিছিল।"[২৮] এমনকি তিনিই প্রথম স্ত্রী শিক্ষার পথ তৈরি করে অসমীয়া সমাজের নারীর জীবনে শিক্ষার আলো দিয়ে অন্ধকার দূর করার সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে শিক্ষার পথ প্রশস্ত করেন। সে সময়ে সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন এবং সুবিধা না থাকার জন্য আনন্দরাম নিজের ঘরেই নিজ কন্যা ও স্ত্রীকে শিক্ষাদান করেছেন। অসমীয়া ছেলেরা জ্ঞানী হয়ে যাতে অসমের কৃষি ও উদ্যোগের উন্নতি করতে পারে সে আশাই করেছিলেন তিনি। অসমে পাঠশালা নির্মাণ, চিকিৎসালয় স্থাপন, যন্ত্র চালিত জাহাজ, উন্নত ঘর, মাদক দ্রব্য বর্জন, জাতীয়তাবোধ জাগরণ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। এই আহ্বান উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নবজাগরণের কাজ করেছে। এই আহ্বান ১৯২০ সন পর্যন্ত অসমীয়া সাহিত্য, ইতিহাস রচনা এবং শিক্ষার প্রসারে প্রেরণার কাজও করেছে। উনিশ শতকে কৃষির উন্নতি অসমীয়াদের মধ্যে না দেখা গেলেও চা-বাগান খোলার উদ্যোগ কিছু কিছু অসমীয়ার মধ্যে দেখা গেছে তবে অর্থ ও পরিচালনার দক্ষতার অভাবে চা উদ্যোগে তারা সফলতা অর্জন করতে পারেন নি।

বিংশ শতকের বাংলা ও অসম : সামাজিক জঙ্গমতার ধারাবাহিকতা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তথা কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল তা বলিষ্ঠতা লাভ করে বিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সংগঠন ও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে দেশের উচ্চশ্রেণি ও মধ্যশ্রেণিরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে শ্রেণিস্বার্থের আংশিক চরিতার্থতার জন্য আন্দোলন করলেও ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতের কথা তারা চিন্তা করেন নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবানল জ্বলে ওঠে বিংশ শতাব্দীতেই। ইংরাজ সরকারের বঙ্গ বিভাজনের পরিকল্পনার ফলে ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে বিপুল জাতীয়তাবোধের তরঙ্গ বাংলাদেশে দেখা দেয় তা পরবর্তীতে ক্রমে ক্রমে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়ে। দরিদ্র, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও মহামারীতে জর্জরিত বাঙালি সমাজের উপর আর একটি ঝড় নিয়ে আসেন ব্রিটিশ সরকার। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকার 'Devide and Rule' নীতির দ্বারা ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালান। আগা খাঁ ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মিন্টোর কাছ থেকে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি নেন। ফলস্বরূপ ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের দুই এক জায়গায় হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ দেখা দেয়। মর্লে-মিন্টো সংস্কারের দ্বারা ১৯০৯ সনে মিন্টো মুসলমানদের জন্য পৃথক ভোট ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন। বঙ্গভঙ্গ এবং এটিকে কেন্দ্র করে সমস্ত দেশ জুড়ে সৃষ্টি হওয়া সশস্ত্র স্বদেশি আন্দোলনের আঘাতে মানুষ পুরনো মূল্যবোধ হারাতে থাকে। সমগ্র দেশব্যাপী যে কৃষক সংগ্রাম শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীতেও তার দাবানল জ্বলতে থাকে; তাই কৃষক বিদ্রোহকে অহিংস পথে চালাবার জন্য ১৯১৭ সালে চম্পারণে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভারতবাসীকে স্বরাজ দেবার প্রস্তাব করা হয় কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ মন্টেগু চেমসফোর্ডের কৃপণ সংস্কার নীতিই প্রদান করা হয়। এই নীতির ফলে প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্ত শাসন হলেও অর্থনৈতিক ভাঙন দেখা দেয় যার ফলে বাংলাদেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। অপরদিকে কৃপণ সংস্কার নীতির ফলস্বরূপ অন্য প্রদেশে গিয়ে উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যায়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ১৯১৯ সালের রাওলাট আইন ভারতবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলে এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর প্রচেষ্টায় দেশজুড়ে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের যোগদানে অসহযোগ আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতায় ১৯৩০ সালে শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন। কংগ্রেসের ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের করাচি অধিবেশনে ভূমিসংস্কারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উনিশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সামনে চাকরির অভাব দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীতে এই অভাব আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। শিক্ষিতের তুলনায়

চাকরির সংখ্যা হ্রাস পায় তার উপর উনিশ শতকের কুটির শিল্প ও কৃষির ধ্বংসের ফলে আসা অর্থাভাব বিংশ শতাব্দীতে আরো প্রবল হয়। আধুনিক বাংলার নতুন রূপ গঠনে শিল্প বিস্তার ও যন্ত্র প্রগতির উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ সরকার উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে মনোনিবেশ না করলেও বিংশ শতাব্দীতে ইংরাজ সরকারকে এগুলিতে মনোনিবেশ করতে দেখা যায়। তার কারণ হিসেবে বলা যায় ভারতে রেলপথ তৈরির পর লোহা-ইস্পাতের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ব্রিটিশ সরকার নিজেদের দেশের লোহা-ইস্পাতের চাহিদা ইংলণ্ড থেকে আমদানি করা লোহা-ইস্পাত দিয়ে মিটাতে পারছিলেন না। তাই ইংরাজ সরকার বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের লোহা-ইস্পাত তৈরির কিছু সুযোগ-সুবিধা দান করেন। 'টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি' ১৯০৭ সালে স্থাপিত হয়। ১৯০৮ সালে টাটার কারখানা নির্মাণ আরম্ভ হয়, ১৯১১ সালে প্রথম লোহা তৈরি হয় এই কারখানায় এবং ১৯১৩ সালে হয় ইস্পাত।[২৯] ব্রিটিশ শিল্পনীতি ভারতীয় শিল্পের প্রতি উদাসীন থাকায় উনবিংশ শতাব্দীতে কারুশিল্পের ধ্বংস হয়। তাছাড়া স্বদেশীয় দ্রব্য বিক্রিতেও ব্রিটিশদের উদাসীনতাই দেখা গেছে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের চাহিদা মেটাতে গিয়ে তথা জাতীয় নেতৃত্বের দাবিতে সরকার এ দেশীয় শিল্পের প্রতি থাকা উদাস মনোভাবকে বর্জন করতে বাধ্য হন। তাছাড়া স্বদেশি আন্দোলন ও বিদেশী বর্জন নীতিও দেশীয় শিল্পকে প্রগতির দিকে তরান্বিত করেছে বিংশ শতাব্দীতে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমস্ত শিল্পই বিকশিত হতে থাকে। যুদ্ধের ফলে অস্ত্রশস্ত্র ছাড়াও শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যও ভারত থেকে চলে যেতে থাকে মিত্রশক্তির জন্য। দীর্ঘকাল থেকে শোষণ ও পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে ভারতীয় অর্থনীতির চরম অবনতি ঘটে, যার রেশ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়েও থেকে যায়। দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলে। উনিশ শতকীয় একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন দেখা দেয় বিংশ শতকে। জাতিভেদ প্রথা, বিবাহ, ধর্ম ইত্যাদিতেও বহু পরিবর্তন আসে বিংশ শতকে যা উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলনের আলোড়নও করতে পারেনি।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল সত্যাগ্রহ আন্দোলন। নেতৃবৃন্দকে সরকার কারারুদ্ধ করলে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে বিক্ষুব্ধ দেশবাসী জনগণ। এ সমস্ত সংগ্রাম মেদিনীপুরে তীব্র আকার নেয় 'আগস্ট বিপ্লব' নামে। বিপ্লবীরা সেখানে সতীশচন্দ্র সামন্তের অধিনায়কত্বে স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করে। সত্তর বছরের বয়স্কা মাতঙ্গিনী হাজরা পুলিশের গুলি অগ্রাহ্য করে সাহস দেখিয়ে ললাটে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় জাতীয় পতাকা মুষ্টিতে ধরেই মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয়। স্বাধীনতার ব্যাপার নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ক্যাবিনেট মিশন আসে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মীমাংসার জন্য।[৩০]

ভারতবাসী স্বাধীনতা পেয়ে যায় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। একদিকে বাঙালি পেল বহু বিপ্লবীর আত্মবলিদানে অর্জিত স্বাধীনতা অপরদিকে দেখল দেশভাগ, দাঙ্গা, প্রব্রজন, বাস্তুহীনতার অভিশাপ, হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি অস্বীকার। দেশ স্বাধীনতার ঠিক আগের

বছর ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে মুসলিম লিগের সংগ্রাম দিবস পালনের নামে বীভৎস দাঙ্গা সংঘটিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১১ এপ্রিল ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটনের কাছে বাংলার জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত ইউনিয়নের একটি নতুন প্রদেশ রূপে গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। অখণ্ড বঙ্গদেশে জনসংখ্যায় হিন্দু ও মুসলিম ধর্মভিত্তিক ভাগ ছিল। ১৯৪৭ এই উপমহাদেশটিকে ভেঙে তিন টুকরো করা হয়। প্রথম টুকরো ভারতবর্ষ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় টুকরো মিলে পাকিস্তান। এর ফলে অখণ্ড বঙ্গদেশও ভেঙে দু'টুকরো হয় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৪৭-৪৮ এ পূর্ববঙ্গ থেকে দেশত্যাগ আরম্ভ হলেও তা চরমতা পায় ১৯৫০ এর জানুয়ারির পর। নানা রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের পর ১৯৭১ সালে সংঘাতময় বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্ম নেয়।

উনিশ শতকে যে কৃষক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে আরও বলিষ্ঠরূপে আত্মপ্রকাশ করল। বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবেই সংগঠিত হয়েছিল এ সমস্ত কৃষক আন্দোলন। দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ির তিন জেলার যুক্ত অধিবেশনে জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। অবিভক্ত বাংলার 'তেভাগা আন্দোলন' (১৯৪৬-৪৮) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তেভাগা আন্দোলন হয়েছিল উৎপাদিত ফসলের তিনভাগের দুভাগ ভাগচাষীদের আদায়ের লক্ষ্য সামনে নিয়ে। এই আন্দোলনে বাংলার ১৩টি জেলার ৬০ লক্ষ কৃষক যোগদান করেছিলেন। তেভাগার লড়াই সামন্ততান্ত্রিক অর্থাৎ জমিদারি মহাজনি শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই নয় তা ছিল কৃষকদের জঙ্গি অর্থনীতিবাদী লড়াই। কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির ১৯৪৪ সালের জুন মাসে অধিবেশনে তিনটি ধ্বনিকে গ্রহণ করা হয়। এই তিনটি ধ্বনিই সংগ্রামের প্রধান ধ্বনি হয়ে ওঠে। ধ্বনি তিনটি হ'ল "(১) নিজ খোলানে (গোলায়) ধান তোলা (২) আধি (অর্ধেক) নাই তেভাগা চাই (৩) কর্জা (ধার) করা ধানের সুদ নাই।"[৩১] তবে পার্টি মাঝপথে সংগ্রাম ত্যাগ করায় এবং রাষ্ট্রশক্তির প্রবল আক্রমণে কৃষকেরা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। তবে সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত চালাবার এমনকি সংগ্রামকে উচ্চ আদর্শের দিকে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছাও পার্টির মধ্যে দেখা যায় নি। তেভাগা আন্দোলনের পর পশ্চিমবঙ্গে প্রণীত হয় বর্গাদারি আইন ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগ রাষ্ট্র কর্তৃক জমিদারি অধিগ্রহণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ৪৫ ধারায় সম্মিলিত একটি বিল নিয়ে আসেন। এই আইন অনুযায়ী পূর্ববঙ্গে মুসলিম লিগ ও পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নতুন বিল রচনা করে। ১৯৫৩ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ বিল বিধানসভায় উত্থাপন হয় এবং একই বছর নভেম্বর মাসে তা আইনে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৩ সালে জমিদারি বিলোপ আইন এবং ১৯৫৫ সালে ভূমিসংস্করণ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন মতে 'নিজে চাষ করলে প্রজা উচ্ছেদ' করা যাবে। ১৯৬০ সালে 'নিজ চাষের জমি' নামে গোপন প্রজাসত্ত্ব বেড়ে যায়। জমিদারের স্থান নেয় জোতদারেরা। এবং তারা ভালভাবেই বহাল রাখে রায়ত বা বর্গ ব্যবস্থা।[৩২]

পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি মহকুমার দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে ১৯৬৭ র বসন্তে মাথা

তুলে ওঠে নকশাল আন্দোলন। বজ্রনির্ঘোষ নকশালবাড়ি, খড়িবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া হয়ে কৃষক বিদ্রোহ সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নকশালবাড়ি জন্ম নিয়েছিল সংসদীয় ও শোধনবাদী রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে। নকশালবাড়ি স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হয়েছিল দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র এবং সংসদীয় বামপন্থী রাজনীতির। নকশালবাড়ির কৃষক অভ্যুত্থান যুগপৎ রাষ্ট্রশক্তির আক্রমণের শিকার হলেও ভারতীয় বিপ্লবের এক ঐতিহাসিক সন্ধিকাল হয়ে উঠেছিল। নকশালবাড়ির সংগ্রাম সামন্ততন্ত্রের রক্ষক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে বা সামন্ততান্ত্রিক শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক বিদ্রোহ ছিল না। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক সংগ্রাম যার মধ্যে লক্ষিত হয়েছে সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ ও তৃণমূল স্তর পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বৈজ্ঞানিক পথ ও পদ্ধতির। শিলিগুড়ি মহকুমা কৃষক সমিতি ২০মে ১৯৬৭ তারিখে প্রকাশিত প্রচারপত্রে দাবি করেছিল ভেস্টেড জমির মালিকানা। ১৯৫৯ সাল থেকে কৃষকরা চাষ-আবাদ করে আসছিল এই ভেস্টেড জমিগুলিতে কিন্তু ১৯৬৬ নাগাদ জমির মালিকরা এইসব ভেস্টেড জমির পুনর্দখল করার চেষ্টা চালায়। এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল নকশাল আন্দোলনের। জোর করে কৃষকদের উচ্ছেদ করতে চাইছিল নতুন মাটির মালিকরা। কৃষক ও নতুন মালিকদের সংঘাত বাঁধলে নতুন মালিককে সাহায্য করতে গিয়ে কৃষকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রস্তুত করে পুলিশের আধিকারিকরা। ফলে ১৯৬৭ র ২১শে নভেম্বর নকশালবাড়ি থানার হাতিঘিসার বড়জোত গ্রামে কৃষকের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে একজন পুলিশ অফিসারের মৃত্যু হয়। পরদিন কয়েকটি মিছিলের উপর পুলিশের বেপরোয়া গুলিবর্ষণে ও ব্যাপক উৎপীড়নের ফলে ৮ জন মহিলা ২টি শিশু সহ ১৮ জনের মৃত্যু হয়। ঠিক একইভাবে সন্ন্যাসী স্থানের চা-বাগানের ভেস্টেড জমি থেকে কৃষকদের উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা করা হয় চা-বাগানের মালিকদের দ্বারা। সেখানে খেতের উপর ঘর করে চা-শ্রমিকের থাকার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেন বাগানের মালিকরা। এখানেও কৃষক সমিতিই কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে।[৩৩] ১৯৬৭ সালের ১৮ই মার্চ শিলিগুড়ি মহকুমার কৃষক সম্মেলন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে — "গ্রামের সমস্ত ব্যাপারে কৃষক কমিটির বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করো। জোতদার ও গ্রামীণ প্রতিক্রিয়াশীলদের হামলা প্রতিরোধ করতে সংগঠিত ও সশস্ত্র হও। জোতদারের জমির একচেটিয়া মালিকানা ভেঙে দিয়ে নতুন বাঁটোয়ারা শুরু কর কৃষক কমিটির মারফৎ।"[৩৪]

নকশালবাড়ির প্রতিক্রিয়ায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারতীয় সরকার ভূমিসংস্কারে মন দেয়। ইন্দিরা গান্ধী সবুজ বিপ্লবের কার্যসূচি হাতে নিয়ে বিদেশ থেকে উচ্চ-ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও আনুসঙ্গিক কৃষি-সরঞ্জাম আমদানি করে নির্দিষ্ট কিছু সেচসেবিত অঞ্চলে জোতদার ও ধনী চাষিদের বিপুল পরিমাণে কৃষিঋণ ও ভরতুকি বরাদ্দ করালে (১৯৬৭-৬৮) পর্যন্ত কিছু পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি হয়। ফলে খাদ্যের সমস্যা ও বাজারের সমস্যা কিছুটা মিটলেও নিঃস্ব কৃষকের ভূমির সমস্যা না মেটায় গ্রাম অঞ্চলে শ্রেণিদ্বন্দ্বের তীব্রতা হ্রাস পায় নি। তেলেঙ্গানার কৃষক বিদ্রোহ "কৃষকের হাতে জমির যে প্রশ্ন তুলেছিল ষাটের দশকে নকশালবাড়ি পুনরায় এবং আরো জোরালো করে তা সামনে নিয়ে আসে এবং সমগ্র প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু ভূমিসংস্কার

আইন পাশ করলেই চলবে না তা সরকারের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল নকশালবাড়ি।"[৩৫]

১৯৬৯ সালের ৬ আগস্ট পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার বড় বড় জোতদারদের জমির যাবতীয় বে-আইনি হস্তক্ষেপও আইনসিদ্ধ করেছিল। ১৯৭৭ সালে সিপিআই(এম) চালিত বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্করণ পর্যায় শুরু হয়। তবে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বেই ১৯৭৪-৭৫ সাল থেকেই কংগ্রেস সরকার প্রত্যেক জেলায় ব্লক তৈরি করে ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের জন্য ভূমিসংস্কার উপদেষ্টা কমিটি খাড়া করেছিলেন।[৩৬]

শিল্পায়ণ, নগরায়ণ সেজ ও পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের পছন্দ ও চাহিদার মত জমি দেওয়ার স্বার্থে ১৮৯৪ সালে ব্রিটিশ সরকার যে ভূমি অধিগ্রহণ আইন প্রণয়ন করেছিলেন, জনগণের স্বার্থের কথাটি সামনে রেখে সেই অধিগ্রহণ আইন হিসেবে ১৯৮১ সালে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট শাসনের সময় শিল্পায়নের জন্য বড় আকারে জমি অধিগ্রহণ শুরু হয় ফলে পশ্চিম মেদিনীপুরের আদিবাসীদের বিতাড়নের চেষ্টা করেন সরকার ফলস্বরূপ পরবর্তীতে সংঘটিত হয়েছিল মাওবাদের।[৩৭] এইভাবেই দেখা গেছে বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজে এক অরাজকতার পরিবেশ যা পরবর্তীতে আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

সম্পূর্ণ বিংশ শতাব্দী জুড়েই অসমে এক অস্থির পরিস্থিতি লক্ষিত হয়। প্রাক ব্রিটিশ যুগে স্বাধীনতার আন্দোলন অসমের পরিস্থিতিকে চঞ্চল ও অস্থির করে রেখেছে। ১৯০৩ সনে অসম এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। ১৯২০-এ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই এসোসিয়েশন অসমের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা নেয়। ১৯১৩ সনে অসম কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৯১৭ সনে নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন রূপে অসম সাহিত্য সভার গঠন হয় এবং ১৯১৬ সনে অসম ছাত্র সম্মিলন গঠিত হয়। ফলে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক নতুন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক যুগের সূচনা করে সাংবিধানিক প্রশাসন, স্থানীয় শাসন এবং শিক্ষা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। ১৯২০ সনে গঠিত অসম কংগ্রেস কমিটি অসমে জাতীয়তাবোধ জাগরণের চেষ্টা চালায় পূর্বের ধ্যানধারণা ও আনুষ্ঠানিক ভিত্তির উপর। ১৯২১, ১৯৩০ এবং ১৯৪২-এর গণ আন্দোলনসমূহ এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আন্দোলনসমূহে মধ্যবিত্ত সাহেবি চাল-চলনের পরিবর্তে খদ্দর কাপড় পড়ার ও স্বদেশিয়ানার প্রেরণা যোগায়। স্বেচ্ছাসেবকেরা চরকায় সূতা কাটা ছাড়াও গ্রামেগঞ্জের লোককে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে ও প্রেরণা যোগায় গান্ধীজীর নেতৃত্বে হওয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করার।

১৯৩৫ সনে অসমে কমিউনিস্ট দল গঠন, ১৯৫৫-এর তেল শোধনাগার আন্দোলন, ষাট সনের ভাষা আন্দোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। ভাষিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে আরো গাঢ় করে তুলে ১৯৬২ সনের চীনের আক্রমণ, ১৯৬৫ সনের ভারত-পাক যুদ্ধ। ১৯৭১-এর পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনও অসমে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ধীরে ধীরে অসমের পরিস্থিতি আরও

চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং অসম বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে যায়। ১৯৭৮-৮৩ সালের সুদীর্ঘ অসম আন্দোলন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ, অসম চুক্তি, আঞ্চলিক দল গঠন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, উগ্রপন্থী সমস্যা, পাকিস্তানী কূটাঘাতমূলক কার্যাবলী, বেকার সমস্যা, দুর্নীতি এবং স্বজন-পোষণের অভিযোগ, সরকারি খণ্ডের বিপর্যস্ত অবস্থা ইত্যাদির ফলে বিংশ শতাব্দীতে অসমে এক ভয়াবহ সংকটপূর্ণ রূপ লক্ষিত হয়।

অসমে ইংরাজ শাসনের পর প্রশাসনিক কার্যের জন্য অসমের নিজস্ব মধ্যবিত্ত গড়ে তোলার আগে ব্রিটিশ সরকার বাইরে থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আনয়ন করে অসমে বসতি দান করেন নিজ সুবিধার্থে। তাছাড়া কৃষিকার্যের জন্যও বহু বাংলাভাষী মুসলমানকে আনয়ন করা হয়। এই সমস্ত ঘটনার ফলস্বরূপ অসমের ইতিহাসে মারাত্মক রূপ ধারণ করে। তাছাড়া কাজকর্মের সুবিধার জন্য অফিস আদালতে তথা বিদ্যালয়সমূহে বাংলাভাষার প্রবর্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অবস্থায় তেমন আলোড়ন না তুললেও পরবর্তীতে মারাত্মক রূপ ধারণ করে, সৃষ্টি হয় ভাষা-বিদ্বেষের। অসমের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মূলত উগ্র ভাষিক জাতীয়তাবাদ যা বিংশ শতাব্দীতে আরো বেশি ভয়াবহ রূপ লাভ করে। বিশ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস দেখলে দেখা যায় উনিশ শতকে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাঙালির আগমন এবং কৃষির বিকাশের জন্য শ্রমিকের আনয়ন পরবর্তী বিশ দশকে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে।

জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং অসমীয়া লোকের শ্রমিক রূপে কাজ করার অনীহা দেখে চা-বাগানের ইংরাজ মালিকেরা অসমের বাইরে থেকে শ্রমিক আনার ব্যবস্থা করেন। তবে অসমের কোনো কোনো জনজাতীয় লোকেরা কিছু সংখ্যক চা বাগানে শ্রমদান করে জীবিকার পথ নির্বাচন করেন। নতুন মধ্যবিত্তের সহযোগিতায় অসমের কৃষি উপযোগী ভূমির প্রাচুর্যতাকে লক্ষ রেখে কৃষিকার্যের জন্য বাইরে থেকে লোক আনয়ন করার ব্যবস্থা করা হয়। এমনকি আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনও (১৮২৯-৫১) 'অসম কোম্পানী'র সঙ্গে মিলিত হয়ে অসমে বাহিরের লোকের প্রব্রজনের ব্যাপারটি সমর্থন করেন। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন ও সমসাময়িক অন্যান্য মধ্যবিত্তের মত গুণাভিরাম বরুয়াও আধুনিকতার প্রয়োজন মেটানোর জন্য নতুন নতুন বৃত্তির লোকের প্রব্রজনের সমর্থন করেছেন। সরকার তথা মধ্যবিত্তর ইচ্ছা ও কর্ম তৎপরতা সত্ত্বেও অসমে বঙ্গদেশের প্রব্রজকের হার তেমন দেখা যায় নি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় পূর্ববঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যুক্ত করে ঢাকাকে রাজধানী করে 'পূর্ববঙ্গ' ও 'আসাম' নামের নতুন প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনায় বঙ্গদেশ থেকে অসমে প্রব্রজনের ইন্ধন যোগান দেয়। ঘনবসতি-পূর্ণ অঞ্চলে কৃষকের উপর জমিদারের শোষণ ও নির্যাতন থেকে কৃষকেরা বিশেষ করে ভূমিহীন কৃষকেরা রায়ত ব্যবস্থা প্রচলিত অসমে বসতি স্থাপনকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে অসমের দিকে প্রব্রজিত হন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে পূর্ববঙ্গ থেকে অসমে প্রব্রজিত হয়ে আসার পেছনে পাট চাষেরও যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কলকাতার আশেপাশে ইংরাজ সরকার কয়েকটি পাট কল প্রতিষ্ঠা করেন এবং পাট চাষের সম্প্রসারণ করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা প্রব্রজকের মধ্যে ৮৫ শতাংশই

মুসলমান হওয়াতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ গড়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গ থেকে অসমে আসা প্রব্রজনে যাতে স্থানীয় অধিবাসীর অস্তিত্ব নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ১৮২০ সনে ‘লাইন প্রথা’ প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু লাইন প্রথা আশানুরূপভাবে কার্যকরী না হওয়ায় এই প্রথাকে কেন্দ্র করে অসমের পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্যাকে সমাধানের জন্য ১৯২৮ সনে A. W. Botham পৌরোহিত্যে ন-জন সদস্য নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির সৃষ্টি করা ‘পমুয়া সংস্থাপন পরিকল্পনা’ (Colonization scheme) অনুযায়ী নির্ধারিত টাকার বিনিময়ে একটি ছোট পরিবারকে বিশ বিঘা মাটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।[৩৮]

এইভাবে দেখা গেছে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে অসমে প্রব্রজনের ব্যবস্থা করে অসমের জনসমষ্টির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনসমীয়াদের ভূমি পাট্টা প্রদান করে ভূমি সমস্যার সৃষ্টি করেন। এই সমস্যাই ক্রমে অসমে ভাষিক ও ধার্মিক ক্ষেত্রে উত্তেজনার সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অধিক বিভাজিত করে গণতান্ত্রিক রাজনীতিকে পঙ্গু করে তোলে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরেও পূর্ব পাকিস্তান এবং পরবর্তীকালের বাংলাদেশ থেকে ব্যাপক হারে প্রব্রজন চলতেই থাকে। ১৯৭৯ সনের থেকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত চলা অসম আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সুদীর্ঘ কাল থেকে অসমে চলে আসা অবৈধ অনুপ্রবেশকারীর বিরুদ্ধাচরণ। অসমের স্থানীয় জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই গড়ে উঠেছিল এই আন্দোলন। সামগ্রিকভাবে এই আন্দোলন ছিল জাতিবিদ্বেষপূর্ণ, নেতিবাদী এবং বামবিরোধী :

“বিংশ শতিকার আরম্ভণিতে সৃষ্টি হোয়া আঞ্চলিক রাজনীতিয়ে সত্তরর দশকত এক নতুন পরিধি লাভ করে আরু ফলশ্রুতিত আরম্ভ হৈছিল বহিরাগত বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন। কিন্তু আন্দোলনর আরম্ভণিরে পরাই অসমলৈ রাজ্য বহির্ভূত লোক প্রব্রজনর সমূদায় দায়-দায়িত্ব কেবল বামপন্থী রাজনৈতিক দল সংগঠন এবং নেতা, কর্মী, ব্যক্তির ওপরত জাপি দি অকথ্য নির্যাতন, আক্রমণর লক্ষ্য করি তোলা হৈছিল। অসমত আরম্ভ হৈছিল এক ভয়াবহ শ্বেত সন্ত্রাস। রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক, ঐতিহ্য পরম্পরা, মূল্যবোধ সকলো সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হৈছিল।”[৩৯]

১৯৭৯-১৯৮৫ অসম আন্দোলনে যদিও প্রব্রজন সমস্যাই প্রধান ছিল তথাপি আন্দোলনের প্রাক্ মুহূর্তে অনেক সমস্যা দেখা দেয় অসমে। যেমন খনিজ তেলের সমস্যা, বেকার সমস্যা ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে অসমবাসীর প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হল শোধনাগার আন্দোলন। অসমে থাকা অপর্যাপ্ত পরিমাণে খনিজতেলকে দেশের মধ্যেই শোধনাগার তৈরি করে শোধন করার দাবিতে গড়ে ওঠে এই আন্দোলন। আন্দোলনের সাফল্য স্বরূপ অসমবাসী মাত্র পায় ক্ষুদ্র একটি শোধনাগার। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৪৮ সনে অসমের উৎপাদিত খনিজ তেলের উপর রয়েলটির ক্ষেত্রে গ্রহণ করা অন্যায়মূলক নীতি অসমের জনগণকে অসন্তুষ্ট করে। যার ফলে অসমবাসী হারায় এক বৃহৎ পরিমাণের রাজস্ব। আশির দশকে দশ টাকা থেকে আরম্ভ হওয়া রয়েলটির হার একষট্টি টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি হয়। খনিজ তেলের সঙ্গে নির্গত হওয়া

প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য পেট্রোকেমিকেলস্ উদ্যোগ তথা আনুসঙ্গিক অন্যান্য উদ্যোগ গড়ে তোলার কোনো নীতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ না করায় প্রত্যেক বছর লাখ লাখ কিউবিক মিটার গ্যাস জ্বালিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়। একশ বছর পূর্বে আবিষ্কার হওয়া খনিজ তেলের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অসমে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিতে অসমবাসী অসন্তুষ্ট হয়। অসমের একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল চা উদ্যোগ। ১৯৭০ সনে চাপাতা বিক্রির জন্য গুয়াহাটীতে নিলাম বাজার তৈরি হলেও বহু অদৃশ্য শক্তি এই কার্যে বাধা দিতে তৎপরতা দেখিয়েছে। ফলে ১৯৭৬ সনে অসমের ৭৫৬টি চা-বাগানে উৎপাদিত চাপাতার পরিমাণ ২৭৬ নিযুত কিলোগ্রাম হওয়া সত্ত্বেও বিক্রিকেন্দ্রগুলি কলকাতা ও সুদূর লণ্ডন হওয়ার জন্য অসমে যে পরিমাণে রাজস্ব আসার কথা ছিল, তা আসে নি। কেবল চাপাতা ও তেল নয় রাজ্যটিতে থাকা অন্যান্য বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির আধারে গড়ে ওঠা প্লাইউড, কয়লা, চুণ ইত্যাদির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা উদ্যোগগুলি অসমের স্থানীয় জনসাধারণ তথা রাজ্যের বিশেষ কোনো উন্নতি করতে পারে নি। অসমের কৃষিক্ষেত্রেও সরকারকে তেমন বেশি মনোযোগ দিতে দেখা যায় নি। কৃষির উন্নতিতে সরকারের উদাসীনতার ফলে কৃষকদের মনে ক্ষোভ জন্মে। তাছাড়া বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ইন্দিরা গান্ধীর সবুজ বিপ্লবের পরিকল্পনায় নিঃস্ব কৃষকদের যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল নকশালবাড়িতে তা নকশালবাড়িতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ছড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গের সীমানার বাইরে। এর প্রভাব পড়েছিল অসমের কৃষকদের উপরও। কৃষকদের মনে জন্ম নেয় অসন্তোষ। রাজ্য সরকার সরকারি খন্ডের উদ্যোগে সামান্য পরিমাণই বিনিয়োগ করেন। আন্দোলনের প্রাক্ মুহূর্তে সত্তর দশকে আরো দুটি সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সে দুটি হল দারিদ্রতা ও বেকার সমস্যা। কারণ স্বরূপ ছিল অসমের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও শিক্ষিত বেকার যুবকের উদ্বেগজনক বৃদ্ধি। আন্দোলনের প্রাক্মুহূর্তে দেখা দেওয়া অসমের হতাশজনক অর্থনীতি থাকা সত্ত্বেও ১৯৮৫ সনের অসম আন্দোলনের নেতারা যে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে সেটিতে স্থানীয় লোকের আর্থনীতিক বিকাশের জন্য বিশেষ কোনো কার্যসূচী এবং পরিকল্পনা দেখা যায় নি।

স্বাধীনতার পূর্বে ১৯৪৫ সনে ১৮ আগস্ট কৃষ্ণনাথ শর্মা বহুদিন থেকে চলে আসা বিদেশি অনুপ্রবেশ সমস্যার বিষয়টি গান্ধীজীকে জানিয়ে তাঁর পরামর্শ চাইলে গান্ধীজী বলেন — "অপনালোকে যদি শুদ্ধ চিত্তে এতিয়াই কাম নকরে তেন্তে অসমর বিনাশ।"[৪০] তিনিই আবার ১৯৭৮ সনের ২১ আগস্ট তারিখে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা বাংলাদেশ, ব্রহ্মদেশ এবং নেপাল থেকে উত্তরপূর্ব রাজ্য সমূহ যেমন অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরাতে ব্যাপক অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্টি হওয়া গুরুতর পরিস্থিতি সম্পর্কে জনতা ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯৭৮ সনে অক্টোবর মাসে মুখ্য নির্বাচনী আয়ুক্ত শ্যামলাল শাকধারও বিদেশি অনুপ্রবেশ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সতর্কবাণী দেন। তিনি ১৯৭৮ সনে মঙ্গলদৈ সমষ্টির ভোটার তালিকা সম্পর্কে পাওয়া অভিযোগ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করিয়ে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় নাগরিক পঞ্জীকরণের কথা বলেন। ১৯৭৯ সনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করার আয়োজন করলে যোগেন হাজারিকার

নেতৃত্বে ভোটার তালিকায় বিদেশি নাগরিকের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে সরকারের উপর অভিযোগ করা হয়। ১৯৭৯ সনে ৬ নভেম্বরে অসমের জনসাধারণ গুয়াহাটীর জর্জফিল্ডে একত্রিত হয়ে বিদেশি বহিষ্কার এবং ১৯৮০ সনের নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকার সংশোধনের দাবিতে অসহযোগ আন্দোলনের কার্যসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সনে নির্বাচন আয়োগ সংসদীয় ও অসম বিধানসভার নির্বাচনের অধিসূচনা দেয়। অসমের চৌদ্দটা সমষ্টির মধ্যে মাত্র বরাক উপত্যকার শিলচর এবং করিমগঞ্জেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়। বেগম আবেদা আহমদ বরপেটা সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র দিতে গুয়াহাটী থেকে বরপেটা যাবার সময় জনতা তাঁকে বাধা প্রদান করলে তাঁর সুরক্ষার জন্য থাকা অসম রাজ্যিক পুলিশ প্রধান কে পি এস গিল ভবানীপুরে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীর উপর আক্রমণ করে যুবক খর্গেশ্বর তালুকদারকে হত্যা এবং অনেককে আহত করেন। খর্গেশ্বর এর মৃত্যু অহিংস আন্দোলনের উপর প্রভাব ফেলে এবং সমগ্র অসমে গড়ে ওঠে নির্বাচন প্রতিরোধ আন্দোলন। ১৯৮০ সনে ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রী হয়ে সেই বছর ২ ফেব্রুয়ারিতে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে ১৯৭১ সনের ভোটার তালিকার ভিত্তিতে ভোটার তালিকা সংশোধন ও বিদেশি বহিষ্কারের কথা বলেন। অবশ্য তিনি ১৯৬১ সনের ভোটার তালিকা পর্যন্ত যেতেও আপত্তি করেননি। কিন্তু অসম ছাত্র সংস্থা ১৯৫১ সনের ভোটার তালিকা ধরে থাকায় ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সনকেই বেশি জোর দেন, ফলে এই সভাতেও সমস্যার মীমাংসা হয়নি। অসম আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমনে অসমর্থ সরকার গণসত্যাগ্রহের সম্পর্কে ভুল প্রচার অভিযান চালিয়ে আন্দোলনকে ও অসমীয়া সমাজকে সাম্প্রদায়িক বলে কলঙ্কিত করে জনজাতি, উপজনজাতিকে জনগোষ্ঠীসমূহে বিভক্ত করে সংঘর্ষের বীজ রোপণ করে দেয়। সরকার সদৌ অসম ছাত্র সংস্থার সমান্তরাল প্রতিদ্বন্দ্বী করে গড়ে তুলেন সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্র সংস্থা (AAMSU)। এই আন্দোলনকে সরকার বড়ো বিরোধী, চা-জনজাতি বিরোধী, এবং কার্বি বিরোধী বলে প্রচার চালিয়ে আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে জনগোষ্ঠী সমূহকে উদ্দীপ্ত করে তুলেন। ফলে আন্দোলনকারী এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে হাতাহাতি, মারামারির মত ঘটনাও সংঘটিত হয়। আন্দোলনকারীরা প্রতিশোধ ভাবনায় স্থানে স্থানে পুলিশ, সি-আর-পি বাহিনী, কংগ্রেস নেতা, সি পি এম সমর্থককে আক্রমণ করার ফলে পরিস্থিতি জটিল রূপ ধারণ করে।[৪১]

আন্দোলনকারীরা ১৯৮৩ সনে আয়োজিত হওয়া নির্বাচনের সময় শুদ্ধ ভোটারের তালিকার দাবি জানায়। ১৯৮৩ সনের নির্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রের সম্পাদকীয়তে বেরিয়ে আসে সরকারের অত্যাচারের কথা —

"দৈনিক অসম ঃ বন্দুকের বলেরে আরু তেজর নৈ বোয়াই গণতন্ত্র আরু সংবিধানর পূজারীসকলে নির্বাচন পাতিল। আরু লটা-কটা রণত জিকি ইন্দিরা কংগ্রেছে চরকার পাতিলে।

অসম ট্রিউবন ঃ অসমত ১৯৮৩-র সাধারণ নির্বাচন যি ধরণে পাতা হ'ল, ভারতর গণতন্ত্রর ইতিহাসত আগতে কোনো সময়তে এইদরে পতা হোয়া নাছিল। নির্বাচনর প্রত্যেক স্তরতে করা

অনিয়ম আৰু বে আইনী কাম আৰু সাধাৰণ পৰিস্থিতি লৈ চাই কবই লাগিব যে এইটো ৰাইজক বন্দুকৰ ভয় দেখুয়াই জাপি দিয়া নিৰ্বাচনৰ বাহিৰে একো নহয়।

দৈনিক জনমভূমি ঃ এনে ধৰণৰ নিৰ্মম, হৃদয় বিদাৰক, দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা স্বাধীনোত্তৰ কালৰ ভাৰতত কেতিয়াও হোয়া নাছিল আৰু ভাৰতত কিয় নিৰ্বাচনৰ নামত এনে বিপুল লোকৰ হতাহতৰ সংখ্যা বিশ্বৰ কোনো এখন দেশৰ বুৰঞ্জীতে বিৰল।"[৪২]

১৯৮৩ নির্বাচনের পূর্বে বহু লোককে গ্রেফতার করা হয়। যুবক-যুবতী, পুরুষ-মহিলা, সরকারি কর্মচারি, আমলা, রাজনৈতিক নেতা, শিক্ষক, প্রবক্তা, সংবাদদাতা, ছাত্র সংস্থার নেতাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দি করে রাখা হয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মাঝে সংঘর্ষ ঘটে, তারই সঙ্গে চলে হরতাল, বন্ধ, প্রতিবাদ শিখা, নিষ্প্রদীপ, পথবন্ধ, জনতা সান্ধ্য আইন। বিভিন্ন স্থানে চলে বোমা বিস্ফোরণ, পুলিশের নৃশংস অত্যাচার, ঘর ভাঙা, ধন লুণ্ঠন ইত্যাদি। পুলিশের অত্যাচার থেকে শিশু, ছাত্র-ছাত্রী, পুরুষ-মহিলা, বৃদ্ধ কেউ অব্যাহতি পায়নি। ১৯৮৩ সনে গ্রহণ করা হয় আই এম ডি টি আইন যার দ্বারা ১৯৭১ সনের পরে অনুপ্রবেশ করা লোককে বিদেশি বলে ঘোষণা করে অনুপ্রবেশের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। তবে তারই সঙ্গে এটিও ঘোষণা করা হয় যে সন্দেহ করা বিদেশি থাকা স্থানের তিন কিলোমিটারের ভিতরে আপত্তি করা ব্যক্তিটির থাকার কথা। সরকারি নীতির উপর আসুর অনাস্থা প্রকাশ করার ফলে মুখ্যমন্ত্রী ও কয়েকজন দলীয় নেতার চেষ্টায় আসুর বিপরীতে গঠিত হয় সদৌ অসম ছাত্র প্রতিনিধি সংস্থা (All Assam Student Representative Union)। ১৯৮৪ সনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সচিব কৃষ্ণস্বামী রাও নেতাদের আমন্ত্রণ করেন এক সভা অনুষ্ঠিত করার জন্য। অনুষ্ঠিত সভায় ১৯৬৫ সনকে সময়সীমা রেখে ১৯৭১ সনের পরে আসা অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে পাঁচ বছর পর্যন্ত ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার মত প্রকাশ করেন। আসুও ১৯৬১ থেতে নেমে ১৯৬৫ পর্যন্ত সময়সীমাকে মেনে নিলেও কিন্তু অনুপ্রবেশকারীকে বিশ বছর ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখার কথার দাবি জানায়। কিন্তু হিতেশ্বর শইকিয়ার অনুমোদন ছাড়া কোনো মীমাংসা সম্ভব হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা যায় নি। তার উপর বিধানসভা ভঙ্গ হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই বলে মুখ্যমন্ত্রী শইকীয়ার স্পষ্ট উক্তি এবং তার মধ্যে ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থনের কথা স্পষ্ট করে দেন। ৩১ আগস্ট ইন্দিরা গান্ধীর অকস্মাৎ মৃত্যু হলে রাজীব গান্ধী পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ রেখে এবং কংগ্রেস দলের জনপ্রিয়তার প্রতি লক্ষ রেখে আন্দোলনকারীদের প্রতি নমনীয় হয়ে ওঠেন। ১৯৮৫ সনে তিনি দিল্লীতে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এই আলোচনা সভায় আসুর দাবি মতে শইকীয়া মন্ত্রীসভা ভঙ্গ, ১৯৭১ সনের পরে অনুপ্রবেশকারীর বহিষ্কার এবং ১৯৬৬-৬৭ সনের পরে অনুপ্রবেশকারীর দশ বছর পর্যন্ত ভোটদান থেকে বঞ্চিত করে রাখার আসুর যে দাবি তা মেনে নেয়। ১৯৮৫ সনের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার এবং আন্দোলনকারী নেতাদের মাঝে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৪৩] এ চুক্তির সঙ্গেই অন্ত হয় অসম আন্দোলনের। এদিকে আসুর একাংশ কর্মীর উদ্যোগে গড়ে ওঠে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী। ৮০'র দশকে আলফার বিপুল কার্যকলাপ ধীরে ধীরে অন্য জনগোষ্ঠীর কাছেও

অনুসরণযোগ্য হয়ে ওঠে। ৯০'র দশকে বড়োল্যাণ্ড এর দাবি সহ বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর উগ্রপন্থী সংগঠনের কার্যকলাপ অসমের রাজনৈতিক পরিসরকে অস্থির, ভয়ংকর করে তোলে। কার্যত অসম হয়ে ওঠে মৃত্যু উপত্যকা। এভাবেই সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়েই অসমে লক্ষ করা যায় এক অস্থির সামাজিক অবস্থাকে।

নারী অবস্থানের বিবর্তনের প্রেক্ষিতে বাংলা ও অসম

উনিশ শতকে পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে নারীর স্থান খুব বেশি উচ্চস্তরের ছিল না। পুরুষেরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ছলে বলে ও কৌশলে নারীকে ঠেলে দিয়েছিল অন্তঃপুরের অন্ধকারে। অন্তঃপুরে ঠেলে দিয়েই পুরুষশাসিত সমাজ ক্ষান্ত থাকেনি, তাকে আবদ্ধ করে দেয় নানারূপ কুসংস্কারের গণ্ডিতে। সমস্ত মধ্যযুগ জুড়ে সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা, শিক্ষালাভে মেয়েদের অনধিকার ইত্যাদি কুসংস্কারে জর্জরিত ছিল বঙ্গীয় সমাজ। তৎকালীন সমাজে থাকা বাল্যবিবাহের করুণ ছবি ফুটে উঠেছে রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' (১৮৬৬) এ। তিনি বলেছেন — "অনেক কষ্টে সকলে আমার মায়ের কোল হইতে আমাকে আনিলেন। ঐ সময় আমার কি ভয়ানক কষ্ট হইল। সে কথা মনে পড়িলে এখনও দুঃখ হয়। বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে ছাড়িয়া ভিন্ন দেশে গিয়া বাস এবং যাবজ্জীবন তাহাদের অধীনতা স্বীকার, মাতাপিতা কেহ নহেন — এটি কি সামান্য দুঃখের বিষয়।"[৪৪] শ্বশুরবাড়িতে যাবার পর সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পরিবেশে দিশেহার হয়ে পড়ল বালিকা বধূটি। ১৮৪৯ সনে বেথুল স্কুল প্রতিষ্ঠা হলেও তখন পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারটিকে সমাজ তেমন গুরুত্ব দেয় নি। তৎকালীন সমাজে মেয়েদের লেখাপড়ার সম্পর্কে সামাজিক মানুষের ধারণা সম্পর্কে রাসসুন্দরী দেবী বলেছেন — "তাঁহারা বলিয়া থাকেন, মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিয়া কি টাকা রোজগার করিয়া আনিবে; এখনকার মেয়েগুলা লেখাপড়া শিখিব বলিয়া পাগল হয়। মেয়েছেলে ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্ম করিবে, লজ্জা সরম করিবে, আমরা ইহাই জানি। আমাদের কালে আর এত বালাই ছিল না। শুনিতে পাই বলে লেখাপড়া শিখিলেই ভাল হয়। আমরা যে লেখাপড়া জানি না। তবে আমরা আর মানুষ নই।"[৪৫]

উনিশ শতকের রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের মত মনীষীরা নারী জাতিকে কুসংস্কার থেকে তুলে আনতে এগিয়ে এলেন। পুরুষই নারীকে নিজ স্বার্থে ঠেলে দিয়েছেন কুসংস্কারের অন্ধকারে আবার নারী জাগরণের ভাব আন্দোলনের উদ্যোক্তা হতেও দেখা গেছে পুরুষদেরই। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগরের মত মনীষীরাই প্রথম সংগ্রাম শুরু করলেন নারী মুক্তির দাবি নিয়ে। তাঁদের হাত ধরেই ঘটেছে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, স্ত্রী শিক্ষা প্রসার, বিধবা বিবাহের প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি সামাজিক সংস্কারমূলক কাজ। যেখানে নারীমুক্তি আন্দোলনে নারীরা নিজেরাই অংশগ্রহণ করেছে সেখানেও রয়েছে উন্নতমনা পুরুষেরই সমর্থন। সতীদাহ প্রথার শিকার হতে দেখেছেন রামমোহন রায় নিজের বউদিকে। রামমোহন রায় সমস্ত নারী জাতিকে এই ভয়াবহ

সংস্কার থেকে মুক্তি দেবার জন্য ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ৪ই ডিসেম্বর আইনসিদ্ধভাবে সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার ব্যবস্থা করেন ইংরাজ সরকারের সাহায্যে।

বাল্যবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার ফলে বহু নারী অকালে বিধবা হয়। বিধবাদের জন্য সমাজ নির্ধারিত কঠোর নীতি নিয়মের মধ্যে অনেক কষ্টের সঙ্গে থাকতে হয়েছে এই সমস্ত বালবিধবাদের। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অকাল বিধবা বালিকাদের দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটাতে ১৮৫৬ সনে আইনসম্মতভাবে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ব্যবস্থা করেন। বাল্যবিবাহের ফলে দশ বছরের আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতেন অভিভাবককুল গৌরীদানের পুণ্য লাভের আশায়। ১৮৯১ সনে আইন প্রণয়ন করে বাল্যবিবাহ রোধ তথা বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়। সামাজিক কুসংস্কার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসা অগ্রণী মনীষী রামমোহন ও বিদ্যাসাগর বুঝে উঠতে পেরেছিলেন আইনের দ্বারাই এ সমস্ত কুপ্রথাকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা যাবে তাই তাঁরা আইনের সাহায্য নিয়েছিলেন। এ বিষয়ে অতুল সুর বলেন — "রামমোহন ও বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। উভয়েই উপলব্ধি করেছিলেন যে, সমাজকে অপপ্রথা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হলে যে প্রয়াস চালাতে হবে, তার বিপক্ষে আসবে তথাকথিত রক্ষণশীল, নিষ্ঠাবান গোষ্ঠীর তরফ থেকে ভীষণ বিরোধিতা। উভয়েই সে জন্য ভেবে নিয়েছিলেন যে বিরোধিতাকে দমন করতে পারবে একমাত্র সরকারী হস্তক্ষেপ। তাই তাঁরা উভয়েই সতীদাহ প্রথা বিলোপ সাধনের জন্য ও বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য সরকারী সহায়তার মুখাপেক্ষী হয়েছিলেন।"[৪৬]

উনিশ শতকের প্রগতিশীল ব্যক্তিরা শিক্ষার দ্বারা যাতে নারী নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। মনীষীরা স্ত্রী শিক্ষার জন্য কলকাতায় মেয়েস্কুল স্থাপন করলেও সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা জাত যাবার ভয়ে সেখানে যায়নি। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাই সে সমস্ত স্কুলে পড়ত। সভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা গৃহ-শিক্ষিকার কাছে অধ্যয়ন করত। স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলকাতায় কয়েকটি খ্রিস্টান মহিলা সমিতির জন্ম হয়। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দে 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয় স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে। ১৮২৬ সনে বৈদ্যনাথ রায় সেনট্রাল স্কুল নামের বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তবে ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দের বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পরই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা স্কুলে গিয়ে প্রথাবদ্ধ শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হয়। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ২০-২৫ বছর পর দুএকটি মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে সমানভাবে পাল্লা দিয়ে লেখাপড়া শিখেন। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে বেথুন স্কুলের ছাত্রী কাদম্বিনী বসু ও সরলা দাস মেয়েদের মধ্যে প্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বসার অনুমতি পান। কাদম্বিনী দেবী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া প্রথম ছাত্রী, যার জন্য বেথুন স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হয়। তবে তখন পর্যন্ত বেথুন কলেজে শুধু হিন্দু মেয়েদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাদম্বিনী দেবীর বিবাহ হয়। বিয়ের পর পাঁচ বছর মেডিকেল কলেজে পড়েন, ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিলাত যান এবং

পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসেন। তিনি একজন সুবক্তা হিসেবেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম নারী বক্তা তিনি।[৪৭]

প্রগতিশীল পুরুষেরা স্কুল স্থাপন করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। বিভিন্ন সংস্থা ও পত্রিকার মাধ্যমে নারী প্রগতির পথ প্রশস্ত করে তুলেন। উনিশ শতকীয় বাঙালি সমাজ সংস্কৃতি শিক্ষা ও সাহিত্যের ক্রান্তিকালে বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যেও নারীর অবস্থান ও কষ্টকে ফুটিয়ে তুলার চেষ্টা করা হয়েছে। পুরুষদের কলম থেকেও বেরিয়ে এসেছে সামাজিক বিসংগতি, কুসংস্কারের অন্ধকারে জর্জরিত নারীর আর্তনাদ। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দের রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' সনাতনী সমাজের উপর কুঠারাঘাত হানে। তাছাড়া ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে রামনারায়ণ রচিত 'নব নাটক' নামক নাটকটি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জেহাদ স্বরূপ হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে মহিলা সাহিত্যিকের আবির্ভাবও দেখা গেছে। কখনও কখনও কোনো কোনো লেখিকার লেখনীর মধ্যেও ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও হতাশা প্রতিবাদ রূপে প্রকাশ পেয়েছে। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণকামিনীর 'চিত্ত বিলাসিনী' কাব্যগ্রন্থ, ১৮৬৬ কামিনীসুন্দরীর 'উর্বশী' নাটক, ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে হেমাঙ্গিনীর 'মনোরমা' উপন্যাস, ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। তাছাড়া ১৮৭৭ স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বনলতা দেবী 'অন্তঃপুর' নামে মাসিক পত্রিকা বের করে মেয়েদের লেখা ছাপার পথ প্রশস্ত করে দেন।

এভাবেই শিক্ষার দ্বারা নারীর অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করা হয়। ফলে নারী অন্তঃপুর থেকে বাইরের আলোতে আসার সুযোগ পান। ধীরে ধীরে মেয়েদের রাজনীতিতেও যোগ দিতে দেখা যায়। ১৮৮৫ সালে স্বর্ণকুমারী দেবী ও ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ডক্টর কাদম্বিনী দেবী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।

ঊনবিংশ শতকেই স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে নারীর অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করলেও, বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলেও উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে দেখা গেছে, তার অধিকাংশই হয়েছে বিদ্যাসাগরের নিজের ও ভক্তদের একান্ত প্রচেষ্টায়। কারণ হিসেবে বলা যায় নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতা, যৌথ পরিবার, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি — সমাজে অচল অবস্থায় থাকাকালীন এ সমস্ত প্রথা সংশ্লিষ্ট বিধবা বিবাহের প্রচলন ক্ষিপ্রতর না হওয়াই স্বাভাবিক। তবে বিশ শতকের গোড়াতেই সমাজে নারী সংক্রান্ত বহু সংস্কার কার্যকরী হতে দেখা গেছে। মোটামুটিভাবে বলা যায়, বিশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালির অন্দরমহল অত্যন্ত রক্ষণশীলই ছিল।

অর্ধ-জনজাতি এবং অর্ধ-সামন্তীয় ব্যবস্থায় গঠিত অসমীয়া সমাজে মধ্যযুগের আহোম রাজত্বে নারী অধিকার ছিল অন্য প্রদেশের তুলনায় বেশি। জনজাতীয় প্রভাবে সমাজ তথা পরিবারে নারী এবং পুরুষের মধ্যে কোনো রূপ বৈষম্যের সৃষ্টি দেখা যায় নি। জনজাতীয় সমাজে উৎপাদন

ক্ষেত্রে নারীকেও পুরুষের সমানে যোগদান করতে দেখা গেছে এবং অর্থনৈতিক উৎপাদন ক্ষেত্রেও নারী পুরুষের সমপর্যায়ের মর্যাদাই ছিল। সেইদিক থেকে মধ্যযুগে অসমের নারীরা সামাজিকভাবে মুক্ত ছিল। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের অসমে খাসী-জয়ন্তীয়া-গারো ইত্যাদি অষ্ট্রিক এবং তিবেটোবর্মন প্রজাতির লোকদের মধ্যে সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। আশেপাশের অন্যান্য অ-জনজাতির মধ্যেও এই মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব লক্ষিত হয় এবং এই মাতৃতান্ত্রিক জনজাতির প্রভাবের ফলে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত নারীপুরুষের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য অসমে লক্ষিত হয়নি। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে প্রচলিত পর্দাপ্রথা অসমে ছিল না। তবে আর্য গোষ্ঠীসম্ভূত পরিবারসমূহে এই প্রথা কিছু পরিমাণে থাকার কথা জানা যায়।[৪৮] মধ্যযুগে উচ্চ হিন্দুবর্ণের বাইরে বাকি সবার মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের প্রচলনও ছিল। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পরিবারের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা কঠোর থাকলেও সমাজের অন্যান্য শ্রেণির লোকের মধ্যে অঞ্চল ভেদে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা কম হতেও দেখা গেছে। মধ্যযুগের শেষের দিকে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধি পায়, আর্যসভ্যতার আগ্রাসন এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীর প্রব্রজনের ফলে। মধ্যযুগের অসমে সতীদাহ প্রথার কয়েকটি উদাহরণ পাওয়া গেলেও এর ব্যাপকতা লক্ষিত হয়নি। 'হরিদেব চরিত'-এ তাঁর মা-র পিতার চিতাতে উঠে সতী হবার কথা রয়েছে। রামরায়ের 'গুরুলীলা'তে ভট্টদেবের পুত্র গদাধরের দুই পত্নীর স্বামীর চিতায় সতী হবার কথা রয়েছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের মাতা সত্যসন্ধার স্বামীর সঙ্গে সতী হবার কথা 'দৈতারী ঠাকুর' এবং 'রামানন্দ দ্বিজ' উল্লেখ করেছেন।[৪৯] এগুলি ছাড়া অন্য কোথাও সতীদাহ প্রথার আর কোনো প্রমাণ মেলে না। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় অসমীয়া সমাজে মধ্যযুগে সতীদাহ প্রথা ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ পরিবারে কিছু পরিমাণে থাকলেও সমাজের অন্যান্য অংশে সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিল না। মধ্যযুগের আহোম আমলে আহোমদের মধ্যে তথা অন্যান্য জনজাতীয় সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না, মেয়েদের পূর্ণ বয়সে বিয়ে দেওয়ার প্রথাই প্রচলিত ছিল। সমাজে বহুবিবাহের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বিধবা বিবাহেরও প্রচলন ছিল তবে কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন থাকলেও বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না।[৫০] আহোম যুগে যৌতুক প্রথার প্রচলন হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তা নগণ্য।[৫১]

ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে অসমের স্ত্রীরা কুপ্রথা মুক্ত ছিল এবং সতীদাহ ও যৌতুক প্রথার মত কুসংস্কার অসমীয়া সমাজে ছিল না যদিও আহোম আমলে নগণ্য পরিমাণে যৌতুক প্রথার বীজ দেখা দেয়। অসমীয়া সমাজের নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে গুণাভিরাম বরুয়া লিখেছেন — "এই দেশর স্ত্রীসকল বর উদ্‌যোগী আরু পরিশ্রমী। পুরুষর সইতে প্রায় সমভাবে আর্জ্জে আরু গৃহকার্য্যত লিপ্ত থাকে। সেই হেতুকে অন্যান্য দেশতকৈ এই দেশীয় স্ত্রীসকল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।"[৫২] পোষাক পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে মধ্যযুগের অসমে আহোম পুরুষ এবং মহিলা উভয়ের একই ঢিলাঢালা পায়জামা এবং শরীরে দীর্ঘ কাপড় এবং মাথায় পাগড়ি পরত। কিন্তু পরবর্তীতে স্ত্রী পুরুষের পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে পার্থক্য এসেছে। মহিলারা মেখলা-চাদর ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।[৫৩] মধ্যযুগের অসমে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা না গেলেও পরবর্তীতে

প্রব্রজিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং সামন্ততান্ত্রিক প্রভাবে মধ্যযুগের শেষের দিকেই নানা প্রকার কুপ্রথার সঞ্চার হতে দেখা গেছে অসমে। তবে এ সমস্ত কুপ্রথার প্রভাব উচ্চবর্ণ হিন্দুর ভেতরেই বেশি লক্ষিত হয়েছে, এবং প্রভাব স্ত্রী সমাজেই বেশি করে পড়েছে, এবং স্ত্রীর অবস্থান ক্রমাগত অবনতির পথে গেছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সমাজ নারীর উপর বিভিন্ন কুপ্রথার সংস্কার চাপিয়ে দিয়ে জনজাতীয় মাতৃতান্ত্রিক প্রভাবের উপর পিতৃতান্ত্রিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে এবং সফলও হতে দেখা গেছে। নারীর উপর আরোপিত বিভিন্ন কুপ্রথার প্রভাব উনিশ শতকের সমাজে বেশি প্রকটিত হয়ে ওঠে। আবার উনিশ শতকেই নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মনে জাগ্রত নবজাগরণের চেতনা ও শিক্ষার প্রভাবে নারী অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কর্ষণা লক্ষ করা যায়। উনিশ বিশ শতাব্দীর সংস্কারকামী পুরুষেরা বিগত একশ বছরে সমাজ প্রচলিত ধর্মীয় গোঁড়ামি, অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, সংস্কার সাধন করেছেন। তাঁদের সংস্কারমূলক কাজসমূহ হল বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ, আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহ ও আহার, পুরোহিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, কন্যাপণ প্রথার অবসান, যৌতুক প্রথার অবলুপ্তি। এই সমস্ত কুপ্রথার সংস্কার সাধন করে নারীর অন্ধকারময় জীবনকে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার এক অদম্য প্রয়াস চালিয়েছেন শিক্ষিত শ্রেণি। মনীষীরা নারীর জীবনে সংস্কার সাধনই করেন নি নারীর সমাজে অবস্থানগত অবমাননাকে, লাঞ্ছনাকে তুলে ধরেছেন সাহিত্যের মধ্যে এবং সমাজকেও সেই অবস্থান সম্পর্কে অবগত করানোর প্রয়াস করেছেন। উনিশ শতকীয় সমাজে যেখানে স্ত্রী শিক্ষার অধিকার ছিল না সেই পরিবেশে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন নিজ কন্যা ও স্ত্রীকে শিক্ষিত করেছেন নিজের ঘরের মধ্যেই। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের শিক্ষিতা কন্যা পদ্মাবতীকে বিয়ে করার জন্য অসমীয়া ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের ছেলে নন্দীশ্বর বরুয়াকে একঘরে করে দেয়।[৫৪] এ থেকে উনিশ শতকীয় রক্ষণশীলতাই আমাদের সামনে ফুটে উঠছে। হেমচন্দ্র বরুয়াও স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন জানিয়ে 'অরুণোদয়ে' প্রবন্ধ লিখেছেন। গুণাভিরাম বরুয়া বিধবা বিবাহ সমর্থনই করেন নি নিজেও বিধবা বিবাহ করেছেন। পদ্মাবতী দেবী ফুকনের 'সুধর্মর উপখ্যান' (১৮৮৪)-এ পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দুর্ভাগ্যকেই দেখানো হয়েছে এবং নারী জীবনের মুক্তি সন্ধান করা হয়েছে। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন আধুনিকতার বার্তাবাহক হলেও তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহের দরুণ নিজ কন্যা পদ্মাবতীকে নয় বছরেই বিয়ে দিয়েছেন।

১৯২৮ সনে রচিত দণ্ডীনাথ কলিতার 'সাধনা' উপন্যাসে নারীর মুক্ত অবস্থাকে দেখানো হয়েছে। নায়িকা বাইরের সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পেরেছেন কিন্তু প্রধান পুরুষ চরিত্রের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে চরিত্রটির উপর। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নিজের ইচ্ছামতো চলাফেরার স্বাধীনতা পায় নি। সমাজে নারীর অবস্থানগত চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে 'রহদৈ লিগিরী' (১৯৩০) উপন্যাসে। বিশ শতকীয় উপন্যাসে উনিশ শকতীয় পটভূমি দেখিয়ে তৎকালীন সমাজে নারী পুরুষের স্বেচ্ছাসেবী গঠন করে মানের আক্রমণে অসমীয়া সৈন্যদের শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থার পরিবর্তনকে সূচিত করেছেন লেখক। উনিশ শতকের শেষের দিকে নারী শিক্ষার প্রস্তুতি

পর্বের মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারী শিক্ষার প্রচলন, নারী স্বাধীনতার প্রশ্ন আলোয় উঠে এসেছে। তারই দিক সূচক হিসেবে সত্রসমূহে ভক্তসমূহের স্থান থাকলেও নারীর স্থান নেই — এটিকে দেখিয়ে নারীর অধিকারের প্রশ্ন তোলা হয়েছে উপন্যাসটিতে। নায়িকা রহদৈ বলেছে — "অসমত এতিয়ালৈকে মাইকী মানুহে ধর্ম বিলাই ফুরা নাই। চারি সত্রীয়াসকল উদাসীন পুরুষ। মাইকী মানুহে থাকিবলৈ বেলেগকৈ সত্রর আৰ্হিৰে অসমত আশ্রম নাই।"[৫৫] উপন্যাসে এই প্রশ্নের অবতারণার মধ্য দিয়ে এটি বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে একশ বছরেও নারীর অবস্থানগত পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেনি। চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী 'পিতৃভিটা' (১৯৩৭) উপন্যাসেও নারীর অবাধ স্বাধীনতাকে দেখিয়েছেন তবে অবাধ স্বাধীনতায় নারীর জীবনে আনা দুর্বিসহ যন্ত্রণার ইঙ্গিতও দিয়েছেন লেখিকা। গোবিন্দ প্রসাদ শর্মা 'সুধর্মার উপাখ্যান', 'সাধনা', 'রহদৈ লিগিরী', 'পিতৃভিটা' আলোচনার মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অসমীয়া সমাজে নারীর স্থান ও ভাবমূর্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেছেন। এই উপন্যাস চারটি আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন — "ঊনবিংশ শতিকার সামৰণিলৈকে অসমীয়া সমাজত নারী পিতৃপ্রধান সমাজর পরম্পরার প্রতি আনুগত আছিল। কুরি শতিকার আরম্ভণিত আনুষ্ঠানিক আধুনিক শিক্ষা নারীর বাবেও সূচল হোয়াত সমাজত নারীর ভূমিকা সলনি হবলৈ ধরে। কুরি শতিকার আদি ভাগত অসমর শিক্ষিত নারীয়ে ঘরতেই আবদ্ধ নাথাকি বাহিরর কর্মজগততো ভাগ ল'বলৈ ধরিলে। স্বাভাবিকতে তেতিয়া জীবন আরু সমাজত নারীয়ে আপোন অধিকার সাব্যস্ত করিব ধরিলে। পুরুষর দরে তেওঁলোকেও ব্যক্তি স্বাধীনতা বিচারিলে। নারী ইয়ার বাবে যোগ্য হয়নে নহয়, সেই লৈ অবশ্যে সমাজত তেতিয়াও মতদ্বৈধ বিরাজমান। সি যি কি নহওক, পিতৃপ্রধান সমাজত নারীর স্থানর ধারণা আরু নারীর ভাবমূর্তি এই কালছোয়াত যে এনেদরে পরিবর্তিত হ'বলৈ ধরিলে তার কারণ নিশ্চয় এই কালছোয়াত নারীর বাবেও মুকলি হোয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষানুষ্ঠান; আরু সিপিনে স্ত্রী শিক্ষা আরু স্ত্রী স্বাধীনতার বাবে এনিবেসান্ট গান্ধীর নেতৃত্বর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আদির সামাজিক আন্দোলন।"[৫৬] নলিনীবালা দেবীর 'এরি অহা দিনবোর' (১৯৭৬) গ্রন্থটিতে অসমীয়া সমাজে থাকা বাল্যবিবাহের আভাস রয়েছে। প্রাচীন আর্যসমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না কিন্তু অসমীয়া সমাজ মনুর অনুশাসন মতে 'অষ্টম বর্ষে ভবেৎ গৌরী দশম বর্ষেষু রমণী' বচন অনুসরণ করে বাল্যকালেই অসমীয়া উচ্চ হিন্দুসমাজ মেয়ের বিয়ে দিয়ে ধর্ম পালন করতে আরম্ভ করে। ফলস্বরূপ বাল্যবিধবার কঠোর যন্ত্রণাকে ভোগ করতে দেখা যায় অসমীয়া বাল্যবিধবাদের। নলিনীবালা দেবীর এগারো বছরে বিয়ে হয় এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই বৈধব্য যন্ত্রণাকে ভোগ করেছিলেন তিনি। এই বাল্যবিবাহের নিষ্ঠুরতার বলি হয়েছিলেন অসমীয়া লেখিকা নির্মলপ্রভা বরদলৈ। তার আভাস পাই 'নির্মলপ্রভার গীত আরু নারীর জীবন-নদী' গ্রন্থে।

ব্রিটিশ অসমে উনিশ শতকে যে সমাজ চেতনা দেখা দেয় তা মূলত ছিল বাল্যবিবাহ এবং বিধবা বিবাহ ভিত্তিক। ১৯২৯ সনে সার্দা আইন প্রয়োগ করে নারীর বাল্যবিবাহ রোধ করার চেষ্টা করা হয়। ভারতীয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ এবং শিক্ষা গ্রহণ করতে এগিয়ে

আসা নারী প্রগতিকেই সূচিত করে। ১৯২৬ সনে অসম মহিলা সমিতি গঠন করা হয়। ‘মহিলা সমিতি’ নারীর কল্যাণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। এই মহিলা সমিতি সার্দা আইন কার্যকরী হবার জন্য আন্দোলনও করেছে। ‘নগাঁও মহিলা সমিতি’তে ভাষণ দিতে গিয়ে জ্ঞানদাভিরাম বরুয়া সার্দা আইন স্বপক্ষে মত পোষণ করে বলেছেন — “আপনালোকে চার্দা আইনর (বিয়া সম্পর্কীয় নতুন আইনর) কথা নিশ্চয় শুনিছে। আপোনালোকর কি মত কব নোয়ারো। মই হ’লে কওঁ যে এই আইনর দ্বারা মঙ্গল হ’ব অসমত। অসমত এই আইনর বিরুদ্ধে যোয়া মানুহ তাকর কিন্তু এই আইনর বিরোধী মানুহ ইয়াতো কিছু আছে।”[৫৭] অসমে নারী জাগরণের যিনি ধ্রুবতারা তিনি হলেন চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী। তিনি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে তৎকালীন জাতিভেদ প্রথার, পর্দা প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করেন। তিনি নারীদের সংগঠিত করার জন্য স্বতন্ত্র সংগঠন তৈরির কথা অনুভব করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় চন্দ্রপ্রভা সহ অন্যান্য শিক্ষিত মহিলার যোগদানে অসমে নারী প্রগতির দিকটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অসম মহিলা সমিতি নারীর প্রগতিতে করা কার্যসমূহ হ’ল — “স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন, পর্দা প্রথার উচ্ছেদ, মাতৃ আরু শিশু-মঙ্গল, বয়সীয়া মহিলার শিক্ষা আঁচনি, মাদক দ্রব্য নিবারণ, বাল্যবিবাহ বিরোধ, খাদী আরু কুটীর শিল্পর প্রসার, অসবর্ণ বিবাহত উৎসাহ, হরিজন সেবা, অনাথ আরু পরিত্যক্তার কারণে আশ্রয়গৃহ, হরিজন আরু নারীর মন্দির প্রবেশ আরু অস্পৃশ্যতা বর্জনর আচনিত অসম মহিলা সমিতিয়ে কিছু ক্ষেত্রত কৃতকার্যতা লাভ করিছিল। চার্দা আইন কার্যকরী করার বাবে মহিলা সমিতিয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিছিল। মহিলা সমিতির কর্মীসকলে এনে বিয়ার খবর পালেই সেই বিয়া ভাঙি দি কন্যাপক্ষক পিছত ছোয়ালীর বাবে উপযুক্ত দরা বাছি দিছিল।”[৫৮] এভাবেই উনিশ শতাব্দীর রক্ষণশীলতা থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধে ক্রমান্বয়ে নারী মুক্তির দিকে এগিয়ে গেছে এবং অবস্থার উন্নতি ঘটতেও দেখা গেছে অসমীয়া সমাজে।

বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজ ঃ সংযোগ, সারূপ্য, স্বাতন্ত্র্য

বাংলা ও অসম ভারতবর্ষের দুই অঙ্গরাজ্য। তবে আধুনিক ভারতবর্ষের মানচিত্রের সঙ্গে অসমের যোগ কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। কামরূপ তথা নিম্ন অসমের সমতল অঞ্চল ছাড়া, সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের মঙ্গোলয়েড অধ্যুষিত ভূখন্ড কখনোই ভারতবর্ষের সঙ্গে অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক প্যাটার্ন, সংস্কৃতি কোনো দিক থেকেই ভারতভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। উত্তরপূর্ব একটি মাত্র কেন্দ্রীয় শাসনের আওতায় আসে ১৮২৬ এর ইয়াণ্ডাবু সন্ধির পর থেকে। ধীরে ধীরে কলোনিয়াল শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়ীভূত হয়। ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসনিক বিভাগ পুনর্গঠনের সূত্রে বাংলার বিভিন্ন অংশ কখনো অসমের সঙ্গে যুক্ত ছিল আবার কখনো বিচ্ছিন্ন। এই প্রক্রিয়া চলেছে স্বাধীনতা পর্ব পর্যন্ত। ১৮২৬ সনের ইয়াণ্ডাবু সন্ধির পর অসম ব্রিটিশ শাসনাধীন হয়। ব্রিটিশ আগমনে বাংলার সঙ্গে সঙ্গে আসামেও গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এ পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে পাশ্চাত্যায়ন এবং বঙ্গায়ন। ব্রিটিশ ভারতে এলে বাংলার জমিদারি প্রথাকে ভেঙে

দিয়ে সামন্তীয় প্রতাপকে শিথিল করে দিয়ে সৃষ্টি করে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে যথেষ্ট পাশ্চাত্য ও ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইংরাজ শাসন অসমে প্রবর্তন হওয়ার পর প্রশাসনিক সুবিধার্থে অসমে শিক্ষিত শ্রেণির অভাবে বঙ্গদেশের থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আনয়ন করা হয়। এই শিক্ষিত বাঙালির সঙ্গে ইংরাজের সুসম্পর্ক এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ দেখে ক্রমশ বিলুপ্ত অসমীয়া অভিজাত শ্রেণির লোকের মধ্যেও দেখা দেয় ইংরাজের সান্নিধ্য লাভের ও কর্মক্ষেত্রের সুযোগ পাওয়ার আশা। এই উদ্যমেই তাদের মধ্যে শিক্ষিত হয়ে উঠার প্রয়াস দেখা দেয় এবং গড়ে ওঠে শিক্ষিত অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এই প্রয়াসে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উন্নত বাংলাভাষা সাহিত্যের প্রতিও আকর্ষণ লক্ষিত হয়। তাই ব্রিটিশ আগমনে অসমবাসীর উপর শুধু পাশ্চাত্য প্রভাবই লক্ষিত হয় নি বঙ্গদেশীয় প্রভাবও লক্ষ করা গেছে। ইতিহাসবিদ হেরম্বকান্ত বরপূজারীর রচনা থেকে জানা যায় এই বঙ্গায়ন বা এই অনুকরণ প্রক্রিয়ার ক্ষীণ বীজ রোপিত হয় আহোম রাজা রুদ্র সিংহের রাজত্বকালেই।[৫৯] ব্রিটিশ আমলের পর থেকেই বাংলা ও অসম একই শাসনের অধীনে আসার পর থেকেই শিক্ষিত অসমীয়ার ভাষা, সাহিত্য, সংস্কার, চিন্তা, রাজনৈতিক ধারণা ইত্যাদি প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাঙালির প্রভাব লক্ষিত হয়।

বঙ্গায়ন প্রক্রিয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় ব্রিটিশ আগমনের কালে অসমের সামাজিক শৈক্ষিক ক্ষেত্রে থাকা শোচনীয় অবস্থার ফলে নব্য শিক্ষিত অসমীয়ারা শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক দিক থেকে কিছু অগ্রগামী শিক্ষিত বাঙালির প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে। নব্য মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালির শাসক গোষ্ঠীর শিক্ষা, চিন্তা, আচরণ, মনোভাব ইত্যাদির প্রতি অনুরাগ হেতু নানারূপ সুবিধা প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত শিক্ষিত অসমীয়াকে বাঙালির প্রতি আকৃষ্ট করে। তাছাড়াও বঙ্গীয় মধ্যশ্রেণির আত্ম-উন্নতির চেষ্টা, স্বদেশ প্রীতি ও সংস্কার আন্দোলন শিক্ষিত অসমীয়াকে আকৃষ্ট করে, তাছাড়া ব্রিটিশ আগমনের পর বহুদিন অসমের শাসন বাংলাদেশ থেকেই করেন এবং কাজকর্মের সুবিধার্থে বহুদিন অসমের অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজে বাংলা শিক্ষার প্রচলন থাকায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সান্নিধ্যে আসতে হয় অসমবাসীকে।[৬০] বঙ্গায়ন প্রক্রিয়ায় প্রধান ও প্রভাবশালী ধারক ও বাহক ছিলেন যারা তারা উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় গিয়েছিলেন। তবে এই বাঙালি মধ্যশ্রেণির প্রভাবে চলা বঙ্গীয়করণ প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিপরীত দিক লক্ষিত হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে অসমীয়া শিক্ষিত মানসিকতায়। শিক্ষিত শ্রেণির জাতীয়তাবোধ ধীরে ধীরে পরিপক্কতা লাভ করে এবং এই পরিপক্কতার ফলস্বরূপ দেখা দেয় নিঃবঙ্গায়ন। সমগ্র ভারতব্যাপী যে de-westernisation প্রক্রিয়া চলছিল অসমেও তা মাথা তুলে ওঠে এবং পরবর্তীতে dewesternination-এ তা সীমাবদ্ধ না থেকে de-bengalisation (নিঃবঙ্গায়ন) এর রূপ ধারণ করে। এটিতে পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক চেতনা থেকেও বেশি কাজ করেছে স্বদেশানুরাগ এবং ভাষা প্রীতি যার ফলে জন্ম নিয়েছে জাতীয়তাবোধ। ইংরাজ ভারতে এসে কলকাতায় প্রথম উপনিবেশ গড়ে তোলায় শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে এবং অন্যান্য দিক থেকে কলকাতা নগরে বহু অগ্রগামিতা দেখা

দেয়। তাছাড়া অসম ইংরাজ শাসনে আসে বাংলার পরে তাই শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে অসম থেকে বাংলার অগ্রসর অবস্থা ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। তাছাড়া প্রথম অবস্থায় ইংরাজ অসমের প্রশাসনিক কাজে বাংলা থেকে মধ্যবিত্তের আনয়ন করে চালিয়ে দিচ্ছিলেন বলে অসমের শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতির জন্য ইংরাজকে বেশি উৎসাহী হতে দেখা যায় নি। তবে পরবর্তীতে অসমের শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে ইংরাজকে কিছুটা উদার হতে দেখা গেছে। অসমে তখন উচ্চশিক্ষার প্রচলন না থাকাতে উচ্চশিক্ষার জন্য অসমবাসীকে কলকাতাভিমুখী হতে দেখা গেছে। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের পিতা হলিরাম ফুকন বিদ্যোৎসাহী লোক ছিলেন। তাঁর ভাই যজ্ঞরাম খরঘরীয়া ফুকন কলকাতায় ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করা প্রথম অসমীয়া। বঙ্গীয় নবজাগরণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ১৮২৭-২৯ সনে কলকাতায় থাকাকালীন অবস্থায়। শুধু তাই নয় রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত 'ব্রাহ্মসভা'তে তাঁর উপস্থিতির সংবাদ মেলে। ইংরাজের প্রচেষ্টায় গুয়াহাটীতে ১৮৩৫ সনে প্রথম যে ইংরাজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয় তাতে যজ্ঞরাম খরঘরীয়া ফুকনের যথেষ্ট সহযোগিতা লক্ষিত হয়। এর পূর্বে অসমে আধুনিক শিক্ষার প্রচলন ছিল না। টোল, সত্র, পাঠশালাসমূহে মূলত ধর্মীয় শিক্ষার প্রচলন ছিল। অসমীয়া ভাষার দুর্যোগের সময় প্রবাসী অসমীয়া ছাত্রের মনে জাগ্রত হওয়া স্বদেশিক চেতনা ও ভাষাপ্রীতি তাদের মনে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যের উন্নতির তীব্র স্পৃহা জাগিয়ে তোলে এবং তাঁরা ভাষিক আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। ১৮৪৬ সনে প্রকাশিত 'অরুণোদয়' এবং ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'জোনাকী' পত্রিকার মধ্য দিয়ে তারা অসমীয়া ভাষা সাহিত্যের উন্নতির কাজে ব্রতী হন। উনিশ ও বিশ শতকের যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী এবং মনীষীরা অসমীয়া ভাষা সাহিত্যের উন্নতির তথা অসমীয়া জনজাগরণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, হেমচন্দ্র বরুয়া, গুণাভিরাম বরুয়া, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী, পদ্মনাথ গোহাঞি বরুয়া, বেণুধর রাজখোয়া, রজনীকান্ত বরদলৈ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের রচনার মধ্য দিয়ে স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। তারই সঙ্গে রয়েছে জাতীয় অধঃপতনে আক্ষেপ, পরাধীনতার গ্লানি এবং জন জাগরণের আহ্বান। বিশ শতকের স্বাধীনতা আন্দোলন বাংলা ও অসমের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত উভয় সম্প্রদায়কেই অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। উপনিবেশিক শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং জীবনবোধের সঙ্গে বাংলা ও অসমের পরিণত সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার সংঘাত যে সামাজিক গতিময়তা সৃষ্টি করেছিল তা উভয় সমাজেই প্রত্যক্ষ করা গেছে।

জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশের এবং জাতিগঠন প্রক্রিয়ার দিক থেকে দেখলে বাংলা অসম থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। ব্রিটিশ সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক কাজকর্ম কলকাতা নগরী থেকে পরিচালিত হবার জন্য কলকাতা হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। উনিশ শতকীয় সমস্ত ধর্মীয় সামাজিক সাহিত্যিক আন্দোলনের উৎসও ছিল কলকাতা নগরী। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত রামমোহন রায় ও কিছু প্রগতিশীল বাঙালির প্রচেষ্টায় সমস্ত ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার প্রচার ও প্রসার লক্ষিত হয়। তারা ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনের

দ্বারা সমাজে প্রচলিত নানা প্রকার সংস্কারকে উৎখাত করার প্রয়াস চালান। এই সমস্ত সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে বহুদিন থেকে চলে আসা সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা রোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গীয় সমাজে এক নবজাগরণের সৃষ্টি হয়। এই নবজাগরণের প্রভাব বঙ্গদেশ থেকে অসমেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পর বঙ্গীয় সমাজ জীবনের একটি অংশের চেতনা ও অভিজ্ঞতা নতুন মাত্রা লাভ করে। ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন, মিশনারিদের প্রভাব, সমালোচনা এবং আর্থসামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরম্পরাগত ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, আচার নীতি নিয়মের সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন সমাজ সংস্কারক উন্নতমনা মনীষীগণ। তাঁরা নতুন ভাবধারার আলো সঞ্চারে প্রয়াসী হন। যার ফলে বঙ্গীয় সমাজে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয় নবজাগরণের বার্তা বহনের মধ্য দিয়ে। নবজাগরণের জন্য রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ১৮২৮ সনে কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসেনজিৎ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী এ আর দেশাইয়ের মত পোষণ করে বলেছেন — "পুরণি ধর্মীয় দৃষ্টিভংগী, আচার আরু সংগঠনর স'তে নতুন আর্থসামাজিক বাস্তবতার বিরোধর ফলতেই বিভিন্ন সংস্কারমূলক ধর্মীয় আন্দোলনর সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্ম সমাজ হ'ল সেই দ্বন্দ্বরই জাতক।"[৬১] অস্পৃশ্যতা নিবারণ, স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন, জাতিভেদ প্রথা নির্মূল ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮৭৫ সালে দয়ানন্দ সরস্বতীর বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট 'আর্যসমাজ'ও সংস্কারমূলক আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান যুগিয়েছে। সংস্কারমূলক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা হলেও ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং অসমেও এর প্রভাব লক্ষিত হয়।

বঙ্গীয় নবজাগরণে 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কালোপযোগী এই নবজাগরণ নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রভাব অসমেও যথেষ্ট লক্ষিত হয়। প্রথম যে দুজন অসমীয়া ব্যক্তি বঙ্গীয় নবজাগরণের ঘাত-প্রতিঘাতের স্পর্শ পান তাঁরা হলেন হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন এবং যজ্ঞরাম খরঘরীয়া ফুকন। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন বাংলাভাষায় 'আসাম বুরঞ্জী' রচনা করেন। শুধু তাই নয় 'সমাচার দর্পণ'-এ স্ত্রী শিক্ষার স্বপক্ষে চিঠির মাধ্যমে মত প্রকাশ করার কথাও জানা যায়। যজ্ঞরাম কলকাতায় ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসভায়ও উপস্থিত থাকার কথা জানা যায়।[৬২] রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা রোধকে তিনি সমর্থন করে সমাচার দর্পণের মাধ্যমে ইংরাজ সরকারের সতীদাহ প্রথা রোধ আইন প্রণয়নকে সাধুবাদ জানিয়ে ইংরাজ সরকারকে অভিনন্দন জানান। ব্রাহ্ম ভাবধারার মতো 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ও তাঁর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

উনিশ শতকে কলকাতা ছিল দেশি-বিদেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। কলকাতা থাকাকালীন আনন্দরাম উপলব্ধি করেছিলেন ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্বারা কীভাবে আত্মোন্নতির পথ প্রশস্ত করে সমাজজীবনে নতুন উদ্যমের সঞ্চার করা যায়। এই সমস্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে তিনি অসম এবং অসমীয়া জাতির উন্নতি সাধনে ব্রতী হন। 'অসমীয়া-লরার মিত্র' রচনায়

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের স্বদেশ প্রীতির পরিচয় মিলে। হিন্দু কলেজের ছাত্র আনন্দরাম কলকাতা থাকাকালীন সেখানের সংস্কারমূলক আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি বেথুন সোসাইটির সদস্যও হয়েছিলেন। অসমীয়া লোকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানাটি আনন্দরাম কলকাতায় স্থাপন করেন। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন ছিলেন আধুনিকতার বার্তাবাহক। তিনি সমাজের উন্নতিতে শিক্ষার ভূমিকাকে মনেপ্রাণে অনুভব করেছিলেন। তিনি এটিও অনুভব করেছিলেন কেবল কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যের দ্বারাই সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন বিদ্যানুরাগী, দেশপ্রেমিক, সু-চরিত্রবান এবং মানুষ প্রেমিক লোকের। তিনি স্ত্রী শিক্ষারও সমর্থক ছিলেন। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন অসমে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্কুল প্রতিষ্ঠা ও নেটিভ ডাক্তারের প্রশিক্ষণের জন্য বঙ্গের মেডিকেল কলেজের সার্জনের সহায়তার জন্য সরকারকে আবেদনও করেছিলেন। তিনি বিবাহ পঞ্জীয়নকেও ইতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থন করেছিলেন। অসমে বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রভাবের কথা রয়েছে তাঁর একটি চিঠির মধ্যে। তিনি বলেছেন — "বংগদেশত 'যুবা-বংগালী' নামেরে একশ্রেণী মানুষ ওলাইছে। অসমত সিবিলাকর দোষ এরি গুণ লোয়া কিছুমান লোক এটি অংকুর হোয়া দেখি মোর মন আনন্দেরে পূর হৈছে, আৰু এনে আশা হৈছে যে সেই গজালিটি সোনকালে গছ হ'ব আরু সুগন্ধি ফুল আরু মধু ফলেরে অসমর শোভা আরু সুখ বঢ়াব।"[৬৩]

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের পরবর্তীতে হেমচন্দ্র বরুয়া বঙ্গীয় নবজাগরণের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁর সংস্কারমূলক কাজ চিত্তাকর্ষক। তাঁর সংস্কারমূলক লেখাতে বিদ্যাসাগরের মত শাস্ত্র নির্ভর বিচার পদ্ধতির মধ্য দিয়ে সংস্কারের পথ প্রশস্ত করার চেষ্টা দেখা যায়। তার আভাস মিলে স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে লেখা 'স্ত্রী শিক্ষা' শীর্ষক রচনাতে, যদিও তিনি আনন্দরামের মতো কলকাতায় শিক্ষালাভের সৌভাগ্য পান নি। যতীন্দ্রনাথ গোস্বামীর ভাষায় — "আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন আছিল বংগর নবজাগরণর তরঙ্গ দেখা মানুহ আরু হেমচন্দ্র হ'ল সেইটোর শব্দ শোনা লোক। প্রথম জনার প্রয়াস হ'ল ভাষা উদ্ধার আরু দ্বিতীয়জনর হ'ল ভাষার ভেটি দৃঢ় করা আরু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা।"[৬৪] তবে জীবনের মহত্তম ব্রত হল নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। নারী মুক্তির মধ্য দিয়ে তিনি যে দেশের মঙ্গলের কথা চিন্তা করেছিলেন এটিকে নিঃসন্দেহে বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রভাব বলা যায়। হেমচন্দ্র বরুয়ার প্রথা বিরুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মৃত্যুর পর তার শব দেহটি রক্ষণশীল আত্মীয়-স্বজন স্পর্শ করেন নি। কিছু বাঙালি লোক তাঁর সৎকারে এগিয়ে এলে পরে পরিবারের লোক তাঁর শবদেহটি স্পর্শ করেছিল। সামাজিক রক্ষণশীলতাকে হেমচন্দ্র বরুয়া সর্বদা কটাক্ষ করেছেন। তাঁর রচিত 'বাহিরে রং চং ভিতরে কোয়াভাতুরী' শীর্ষক প্রহসনে সামাজিক অবস্থা এবং রক্ষণশীল লোকের ভণ্ডামি তথা ভ্রষ্টাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এটিতে বাঙালি লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র প্রভাব পড়েছে বলে অনুমান করা হয়। হেমচন্দ্র বরুয়া বিধবা বিবাহেরও সমর্থক ছিলেন। তাঁর রচিত 'Notes on the Marriage System of the People of Assam' নামের পুঁথিতে তীব্রভাবে সে সময়ের সমাজে থাকা কন্যাপণ প্রথার নিন্দা করেছেন।

আনন্দরামের অনুগামী গুণাভিরাম বরুয়াও কলকাতায় উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পান। সংস্কারমুখী চিন্তাচর্চার স্নায়ুকেন্দ্র কলকাতায় থাকাকালীন সময়ে তিনি নতুন নতুন চিন্তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত আনন্দরামের প্রেসে তিনি কিছুদিন অধ্যক্ষের কাজ করেছিলেন। একেশ্বরবাদ এবং উদারনৈতিক চিন্তার দ্বারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে যে সংস্কার আন্দোলন সংঘটিত করেছিলেন তার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। উনিশ শতকের আলোড়নকারী আন্দোলনের মধ্যে বিধবা বিবাহ আন্দোলন অন্যতম। গুণাভিরাম বরুয়া কেবল বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক আন্দোলনের সমর্থনই করেননি 'অরুণোদয়'এ এর প্রচারও চালিয়েছেন এবং নিজের জীবনেও তা প্রয়োগ করেছেন। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রণয়ন আইনকে সমর্থন করে প্রথমা পত্নী ব্রজসুন্দরীর মৃত্যুর পর পরশুরাম বরুয়ার বিধবা পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। 'অরুণোদয়'এর পৃষ্ঠায় বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে লিখেছেন — "হে সম্পাদক চাহাব, আমি সর্বতিকালে বিধবা বিবাহ যে ভাল, এনে কির্তন করি থাকোঁ। যোয়া রাতির পরা আমার ভারতবরিষত এক নতুন শব্দ অর্থাৎ সকঁ চলিব পাই। কিয়নো কোনো প্রধান ঘটনার পরাহে সকঁ চলে। এতেকে এই ঘটনা ইমান কুসংস্কার ঠেলি থোয়ার বাবে আমি এটা নতুন সকঁ চলাব খোজো। এই সকঁর নাম বিধবা বিবাহ।"[৬৫] বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে 'অরুণোদয়'এ প্রকাশিত তাঁর 'রামনবমী' নাটকটি একটি উজ্জ্বল সৃষ্টি। গুণাভিরাম বরুয়ার পুত্র জ্ঞানদাভিরাম বরুয়ার রচিত স্মৃতিকথামূলক রচনা থেকে জানা যায় যে বিদ্যাসাগরের আয়োজিত প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে পিতা গুণাভিরাম উপস্থিত ছিলেন এবং তখন থেকেই গুণাভিরাম বরুয়া বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী।[৬৬]

বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক কাজ গুণাভিরাম বরুয়াকে অনুপ্রাণিত করেছে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণে 'ভারত বিলাপ' নামে একটি কবিতাও লিখেছিলেন তিনি। কলকাতা থাকাকালীন সময়ে তিনি রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্মের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। গুণাভিরাম বরুয়া রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম ও বিদ্যাসাগরের সংস্কার চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্ত্রী শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে মনোনিবেশ করেন। তিনি আরও অনুভব করেন যে মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে থাকা বিধিনিষেধই সমাজে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে থাকা ব্যবধানের মূল কারণ। শিক্ষার ক্ষেত্রে সমানাধিকার স্ত্রী পুরুষের ব্যবধানকে মিটাতে পারে। রক্ষণশীল অসমীয়া সমাজ গুণাভিরামের আধুনিক সংস্কারবাদী চিন্তাচর্চাকে সমাদর করেন নি। তাই জীবনের শেষ সময়টুকু তিনি কলকাতাতেই কাটিয়েছিলেন।

'অরুণোদয়' যুগে জন্মগ্রহণ করা অসমীয়া 'অগ্নিকবি' কমলাকান্ত ভট্টাচার্য বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করার সময়ে অসমে বিদ্যালয়সমূহে বাংলাভাষার প্রচলন ছিল। কমলাকান্তের সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলন, জঙ্গি অসমীয়া জাতীয়তাবাদের উত্থান ইত্যাদির দ্বারা অসমে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এইসব চাঞ্চল্যকর পরিবেশের প্রভাব কমলাকান্তের চেতনাকে স্পর্শ করে এবং এগুলিই তাঁর চিন্তাদর্শনের পটভূমি হয়ে ওঠে। তাঁর জাতীয় চেতনা প্রথম আলোড়ন তোলে ভাষিক চেতনায়। মাতৃভাষাকেই তিনি মানুষের জ্ঞান, শিক্ষা এবং বোধ ও বুদ্ধির প্রথম ভাষা মনে করেছেন। স্বাধীনতা

আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে ১৯০৫-০৬ সনের কলকাতায় হওয়া প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তিনি শিক্ষিত যুবকদেরকে পুরনো কুপ্রথা থেকে মুক্ত হয়ে সামাজিক সংস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেবার কথা বলেছেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেই তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা মনে করেননি। ব্রাহ্মসভা এবং আর্যসমাজের সংস্কারবাদী আন্দোলনসমূহ তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনি নিজেও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর হৃদয়ে ছিল নারীর প্রতি অগাধ প্রেম ও শ্রদ্ধা। বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বাল্যবিবাহ রোধকে তিনি সমর্থন করেছিলেন এবং রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন ও দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রচেষ্টাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি অনুভব করেছিলেন স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের দ্বারাই সমাজে নারীর উপর চলে আসা অন্যায়-অবিচারের রোধ করা সম্ভব। স্ত্রী শিক্ষা প্রচারেও তিনি বঙ্গদেশীয় নারীদের শিক্ষাগ্রহণের দিকটিকে দেখিয়ে অসমের নারীদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন।

এসমস্ত ছাড়াও রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখের সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্কার, ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটির বিপ্লবাত্মক ভূমিকা, সিপাহি বিদ্রোহ এবং বাংলা সাহিত্য জগতে বিশেষ করে মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনি স্পর্শে যে নতুন যুগের সূচনা হয় তা কলকাতায় অধ্যয়নরত প্রবাসী অসমীয়াকেও স্পর্শ করেছিল। তাছাড়াও লম্বোদর বরা, সত্যনাথ, লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, হেমচন্দ্র গোস্বামী প্রমুখ 'জোনাকী' যুগের কবিগণ আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, রজনীকান্ত বরদলৈ প্রমুখ সাহিত্যিকগণ আত্মজীবনীতে উনিশ শতিকার শেষাংশের বঙ্গীয় আবহাওয়ার প্রভাবকে স্বীকারও করেছেন।

ঔপনিবেশিক বাংলা ও অসমের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় উভয় সমাজেই গড়ে উঠেছে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তাদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে। ইংরাজি শিক্ষা তাদের মনকে সংস্কারমুক্ত হতে প্রেরণা দিয়েছে এবং এই শিক্ষিত শ্রেণিরাই আপন সমাজকে সংস্কারমুক্ত করতে ব্রতী হয়েছেন। বাংলা ও অসম দুটিই কৃষিপ্রধান দেশ তবে অসমে জনজাতীয় প্রভাবের ফলে বাংলার মত জমিদারের প্রভাব লক্ষিত হয় নি। ফলে কৃষকদের উপর জমিদারের অত্যাচারও লক্ষিত হয় নি। দুটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও চাষ পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সমতল ভূমিতে উভয় সমাজে একই কৃষিপদ্ধতি থাকলেও অসমে পাহাড়িয়া জনজাতির মধ্যে কিন্তু 'ঝুম খেতি'ই প্রচলিত। নারীর অবস্থানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেও দেখা যায় মধ্যযুগের বাংলা ও অসমের নারীর সামাজিক অবস্থানে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগেই বাংলার সমাজে নারী পুরুষের বিস্তর ব্যবধান দেখা গেছে। পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে অন্তঃপুরের অন্ধকারে ঠেলে দিতেই বেশি ব্যস্ত থেকেছে। মধ্যযুগ থেকে উনিশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজে নারীর জীবন ছিল কুসংস্কারের অভিশাপে ভারাক্রান্ত। তবে উনিশ শতাব্দীর বিভিন্ন সমাজ সংস্কারক মনীষীর প্রচেষ্টায় বাংলার নারীসমাজকে কুসংস্কার যেমন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, সতীদাহ প্রথার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার প্রয়াস চলছিল। তাদের প্রচেষ্টায় এবং

ইংরাজ সরকারের সাহায্যে আইন প্রণয়ন করে তারা বিভিন্ন সংস্কার সমাজ থেকে নির্মূল করতে চেষ্টা করেছেন। তাদের চেষ্টা কিছু পরিমাণে সফল হলেও সমাজ থেকে সেগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করতে তারা সক্ষম হন নি। বিংশ শতাব্দীতে এ সমস্ত সংস্কারগুলি লোপ পেলেও রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারে রক্ষণশীলতার জন্য প্রগতির আলো প্রায় বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্তও ঢুকতে পারে নি। তবে অসমীয়া সমাজ অর্ধ-জনজাতীয় ও অর্ধ-সামন্তীয় হওয়ায় মধ্যযুগে নারী পুরুষের মধ্যে সমাজে কোনোরূপ ব্যবধান লক্ষিত হয়নি। উৎপাদন কার্যে নারী পুরুষ সমানে অংশগ্রহণ করেছে। বঙ্গীয় নারীর তুলনায় অসমীয়া সমাজে নারী ছিল অনেক বেশি স্বাধীন। বঙ্গীয় সমাজে থাকা নানা কুপ্রথা যেমন বাল্যবিবাহ, যৌতুক প্রথা, কৌলিন্য প্রথার মত কুপ্রথা ও সংস্কার থেকে মধ্যযুগের অসমীয়া সমাজ মুক্ত ছিল। সতীদাহ প্রথার প্রচলনও ছিল না যদিও দু একজনের সতী হবার কথা শোনা গেলেও সেটি যৎকিঞ্চিত ছিল এবং তা বঙ্গীয় সমাজের মত দৃঢ় প্রোথিত ছিল না। মধ্যযুগে অসমে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যান্যদের অসবর্ণ বিবাহের আভাসও মিলে যা বঙ্গীয় সমাজে ছিল না। বঙ্গীয় সমাজের মত অসমীয়া সমাজেও বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। অসমীয়া সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। বাল্যবিবাহ না থাকার জন্য বালবিধবাদের দুঃখময় জীবন অসমীয়া সমাজে নেই বললেই চলে। বঙ্গীয় সমাজে বাল্যবিবাহ থাকার জন্য কম বয়সে মেয়েরা বিধবা হয়ে যেত এবং তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত সামাজিক কঠোর বাধা-নিষেধ। বঙ্গীয় সমাজে বিধবাদের সামাজিক কঠোর নিয়মে আবদ্ধ হয়ে অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে হত। বঙ্গীয় সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন করে বিদ্যাসাগর বিধবাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি নিজের চেষ্টায় কয়েকটি বিধবা বিবাহের আয়োজন করে বিবাহও দিয়েছিলেন কিন্তু রক্ষণশীল বঙ্গীয় সমাজ তা মেনে নিতে পারেনি। তাই উনিশ শতকের সমাজে বিধবা বিবাহের উদাহরণ খুব বেশি মেলে না তবে বিংশ শতাব্দীতে এর অল্প-বিস্তর প্রচলন হলেও মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারে এর প্রভাব দেখা যায়নি। অসমে বিধবা বিবাহের প্রচলন বহু আগে থেকেই প্রচলিত ছিল। অসমে বাল্যবিবাহ ও বিধবা বিবাহ সম্পর্কে রত্নেশ্বর মহন্তের উক্তি — "ভারতর অন্যান্য দেশর দরে আমার দেশত পিয়াহ খোয়া লরা-ছোয়ালীর বাল্য বা শিশুবিবাহ নাই — ব্রাহ্মণ ও গণকর বাদে আমার যাবতীয় ইতর জাতিয়েই বিধবা বিবাহ করে।"[৬৭] তবে পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণের অসমীয়াদের মধ্যে কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহ দেখা গেছে। আধুনিকতার বাহক আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের মেয়েকেও নয় বছরেই বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যাসাগর বহু চেষ্টা করেও বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলন তেমন সফলতা অর্জন করতে না পারলেও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক রামকুমার বিদ্যারত্ন শতাধিক বছর আগে থেকে অসমের অসমীয়া জন-সমাজের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন দেখে 'উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ'-এ বলেছেন — "তাহাদিগের (বঙ্গবাসীর) সমাজ সংস্কারকরা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া বঙ্গদেশে বিধবা বিবাহের প্রচলন করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু আসামীদিকের (অসমীয়ার) মধ্যে আবহমান কাল হইতে

তাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।”[৬৮]

তবে পরবর্তীকালে আহোম রাজত্বের শেষের দিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ অসমে প্রব্রজনের ফলে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাবে অসমীয়া মাতৃতান্ত্রিক দেশে সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব দৃঢ় হয়ে পুরুষতান্ত্রিক অসমীয়া সমাজে পরিণত হয়। অসমীয়া সমাজেও নারী পুরুষের বিস্তর ফারাক লক্ষিত হয়। নানা প্রকার কুসংস্কার ছড়িয়ে পড়ে বঙ্গীয় সমাজের মত অসমীয়া সমাজেও। শুরু হয় বাল্যবিবাহ প্রথা, যৌতুক প্রথা, জাতিভেদ প্রথা। যার ফলভোগ করেছে উনিশ ও বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সমাজ। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকেই শুরু হয়ে গিয়েছিলে কুসংস্কার থেকে নারীকে মুক্ত করার প্রয়াস। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মনীষীদের দ্বারা সংস্কারমূলক কাজ এই পর্বে শুরু হয়। স্ত্রী শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় বঙ্গদেশেই তা আগে শুরু হয়েছে। তৎকালীন সমাজে নারী শিক্ষার প্রচলন না থাকাতে নিজ স্ত্রী ও কন্যাকে বাড়িতেই শিক্ষা দান করেছেন আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন। স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন উনিশ শতকে হলেও বহু রক্ষণশীল পরিবারে শিক্ষার আলো বিশ শতকের প্রথম দিকেও প্রবেশ করেনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে আশাপূর্ণা দেবী তাই প্রথাবদ্ধ শিক্ষার সুযোগ পাননি। একইভাবে অসমেও দেখা গেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন বহু গ্রামে-গঞ্জে হয় নি। গ্রাম্য সমাজে মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন না থাকায় নারী মুক্তির ধ্বজাধারিণী চন্দ্রপ্রভাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য বহু কষ্ট করতে হয়েছে। একমাত্র পিতামাতার চেষ্টা ও নিজের অদম্য প্রয়াসে তিনি ছেলেদের এম ভি স্কুলে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রথাবদ্ধ শিক্ষানুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হতে দেখা গেছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রচারে বাংলা অসমের থেকে একটু এগিয়ে থাকলেও সামগ্রিকভাবে নারী কল্যাণের জন্য কোনো সংগঠন তৈরি করার প্রয়াস বঙ্গ রমণীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নি। কিন্তু অসমে নারীর সামগ্রিক বিকাশের জন্য ১৯২৬ সনে ‘অসম মহিলা সমিতি’ গঠন করা হয় এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বহু সাহসী বীরাঙ্গনাকে ছেলেদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজপথে বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে। সংযোগ, সারূপ্য এবং স্বাতন্ত্র্যের এই দিকগুলিকে মনে রেখেই আমরা বর্তমান অধ্যায়ে বিশ শতকের বাংলা ও অসমীয়া সমাজকে বুঝে উঠার চেষ্টা করেছি। আমাদের পর্যবেক্ষণ এই দুটি সমাজের সামাজিক বাস্তবতাই আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির লিখনবিশ্বে নানাভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আধুনিকতার উদ্ভব, চেতনার পালা বদলের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া দুটি সমাজেই সাধারণভাবে একই রকমের। এই ইতিহাসের এক ধরণের, বলা ভালো, নারীবাদী দলিলীকরণ ঘটেছে আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির কথনবিশ্বে।

তথ্যসূত্র :—

১. ঘোষ, বিনয় : ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা’, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬৮, পৃ: ১০

২. দাস, চিত্তরঞ্জন : ‘পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি’, মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট রিসার্চ সেন্টার ১০ নেতাজি সুভাষ রোড কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মে ২০০৯, পৃ: ২৩-২৪

৩. তদেব, পৃ: ২৪-২৫

৪. তদেব, পৃ: ২৫

৫. তদেব, পৃ: ২৬-২৭

৬. ঘোষ, বিনয় : ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা’, প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০

৭. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ: ৪৩

৮. তদেব, পৃ: ৪৯

৯. তদেব, পৃ: ১২৭-২৯

১০. ঘোষ, বিনয় : ‘বাংলার নবজাগৃতি’, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা ; প্রথম সংস্করণ ১৯৭৯, উদ্ধৃত, পৃ: ৫০

১১. ঘোষ, বিনয় : ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা’, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ: ২০৩

১২. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ: ২০৩

১৩. Spear, Percival : ‘The Nobobs’, London, 1963, P. 139

১৪. Gadgil, D. R. : ‘Industrial Evolution of India’, London 4th edition 1946 P. 48-62, 76-80

১৫. ঘোষ, বিনয় : ‘বাংলার নবজাগৃতি’, প্রাগুক্ত, ১৩৬

১৬. মহন্ত, প্রফুল্ল : ‘অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণির ইতিহাস’; ভবানী প্রিন্ট এণ্ড পাবলিকেশন, গুয়াহাটি, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৯৯১, উদ্ধৃত, পৃ: ১৫৯-৬০

১৭. ঘোষ, বিনয় : ‘বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা’, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ: ৩০০

১৮. কলিতা, রমেশচন্দ্র : ‘ঔপনিবেশিক আমোলত অসম’, অশোক বুক স্টল, পানবাজার, গুয়াহাটি-১, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৮; পৃ: ১৮

১৯. তদেব, পৃ: ২০-২১

২০. Quoted in Gait Sir Edword : ‘A History of Assam’, 1981, P. 145

২১. কলিতা, রমেশচন্দ্র : ‘ঔপনিবেশিক আমোলত অসম’, প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪-২৫

২২. তদেব, পৃ: ২৭-২৮

২৩. ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র কুমার : ‘ডেরশ বছরর অসমীয়া সংস্কৃতিত এভুমুকি’, অসম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৯৭৮, পৃ: ৬

২৪. তদেব, পৃ: ৩

২৫. কলিতা, রমেশচন্দ্র : ‘উপনিবেশিক আমোলত অসম’, প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৮-৯৯

২৬. তদেব, পৃ. ১০৫

২৭. গুহ, অমলেন্দু : 'অসমর জাতীয় জীবনত মণিরাম দেওয়ানর দান আরু স্থান', প্রবাহ, গুয়াহাটী, ১৮৭৭ শক, পৃ: ৮২

২৮. তালুকদার, নন্দ (সম্পা) : 'আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর রচনা সমগ্র', লয়ার্স বুকস্টল, গুয়াহাটী প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭ পৃ: ৮-৯

২৯. Gadgil, D. R : 'Industrial Evolution of India', প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭১

৩০. সুর, অতুল : 'বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন', বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৬, পৃ: ৩৫০-৫১

৩১. দাশ, চিত্তরঞ্জন : 'পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি', প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১

৩২. তদেব, পৃ: ৪৯-৫১

৩৩. তদেব, পৃ: ৫৭-৫৯

৩৪. সান্যাল, কানু : তরাইয়ের কৃষক আন্দোলনের সম্পর্কে রিপোর্ট, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮, পৃ: ৭

৩৫. দাশ, চিত্তরঞ্জন : 'পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি', প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৮

৩৬. তদেব, পৃ: ৯৫-৯৬

৩৭. তদেব, পৃ: ১৫৭-৫৯

৩৮. কলিতা, রমেশচন্দ্র : 'প্রব্রজনকারীর সমস্যা আরু অসম ঃ আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর পরা গোপীনাথ বরদলৈ লৈকে', গোঁহাই হীরেন এবং বরা দিলীপ (সম্পা), অসম আন্দোলন প্রতিশ্রুতি ও ফলশ্রুতি, বনলতা, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ ২০০১, উদ্ধৃত, পৃ: ১০-৩০

৩৯. বরুয়া, ভুবন : 'অসম আন্দোলনর প্রাককালর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি', উদ্ধৃত, পৃ: ৩৪

৪০. শর্মা, অজিতকুমার : 'অসম আন্দোলনর প্রথম পর্যায় ঃ মঙ্গলদৈ ভোটার তালিকার পরা চরকারর লগত আলোচনালৈ', গোঁহাই হীরেন এবং বরা দিলীপ (সম্পা), উদ্ধৃত, পৃ: ৫৪

৪১. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ: ৫৪-৬৭

৪২. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ: ৮৬-৮৭

৪৩. তদেব, পৃ: ৮১-৯৫

৪৪. দেবী, রাসসুন্দরী : 'আমার জীবন', বন্দোপাধ্যায়, চিত্রিতা (সম্পা), প্রয়াস প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২৯শে নভেম্বর, ২০০২, পৃ: ৮

৪৫. তদেব, পৃ: ১৪-১৫

৪৬. সুর, অতুল : 'বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন', প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৩

৪৭. তদেব, পৃ: ৩৩০-৩৩২

৪৮. কলিতা, রমেশচন্দ্র : 'ঔপনিবেশিক আমলত অসম', প্রাগুক্ত, পৃ: ২২

৪৯. তদেব, পৃ: ২৪

৫০. তদেব, পৃ: ২৪

৫১. দেবী, মীরা : 'অসমীয়া উপন্যাসত নাৰীবাদ', লোকায়ত প্ৰকাশন দিশপুৰ গুৱাহাটী-৬, প্ৰথম প্ৰকাশ ১৯৯৬, পৃ: ৫৬

৫২. বৰুয়া, গুণাভিৰাম : 'আসাম বুৰঞ্জী', অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, গুৱাহাটী ১৯৭২, পৃ: ২০৪

৫৩. কলিতা, ৰমেশচন্দ্ৰ : 'ঔপনিবেশিক আমলত অসম', প্ৰাগুক্ত পৃ: ৩৫

৫৪. তালুকদাৰ, নন্দ (সম্পা) : 'আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ ৰচনা সংগ্ৰহ', লয়াৰ্ছ বুক স্টল, গুৱাহাটী ১৯৭৭, পৃ: ১৩

৫৫. ৰজনীকান্ত, বৰদলৈ : 'ৰহদৈ লিগিৰী', সাহিত্য প্ৰকাশন, গুৱাহাটী ১৯৮৭, পৃ: ২০৮

৫৬. শৰ্মা, গোবিন্দ প্ৰসাদ : 'নাৰীবাদ আৰু অসমীয়া উপন্যাস', 'অসমীয়া সাহিত্যত নাৰীৰ স্বাধীনতা, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, গুৱাহাটী, প্ৰথম সংস্কৰণ ডিসেম্বৰ ২০০৭, পৃ: ২৩

৫৭. ভূঞা, যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ (সম্পা) : 'জ্ঞানদাভিৰাম বৰুয়া ৰচনাৱলী', অসম সাহিত্য সভা যোৰহাট ১৯৮১, পৃ: ৪১৭

৫৮. দাস, পুষ্পলতা : 'বিদোহিনী চন্দ্ৰপ্ৰভা', লোকায়ত প্ৰকাশন হোমেন গোহাঞিঃ ৰঙালি বিহু সংখ্যা গুৱাহাটি ১৯৮২, পৃ: ৩৩

৫৯. ড. হেৰম্বকান্ত, বৰপূজাৰী : 'অসমৰ নৱজাগৰণ অনা অসমূয়াৰ ভূমিকা', যোৰহাট, ১৯৮৭, পৃ: ৩৪-৩৫

৬০. Barpujari, H.K.(ed) : 'Political History of Assam', Guwahati, 1977, P. 127

৬১. মজুমদাৰ, পৰমানন্দ : 'বৌদ্ধিক ঐতিহ্য যুক্তিবাদী চিন্তাৰ অন্বেষণ', ভবানী প্ৰিন্ট এণ্ড পাবলিকেশনস্, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ ডিসেম্বৰ ২০১১, উদ্ধৃত, পৃ: ৪৮

৬২. তদেব, 'আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন আৰু সংস্কাৰবাদী ঐতিহ্য', পৃ: ১-২

৬৩. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ: ১১

৬৪. তদেব, 'ঊনবিংশ শতিকাৰ অসমৰ সমাজ', শিক্ষা আৰু হেমচন্দ্ৰ বৰুয়া, পৃ: ১৫

৬৫. চৌধুৰী, প্ৰসেনজিৎ : 'উনিশ শতিব্দ সমাজ আৰু সাহিত্য', স্টুডেন্টস্ স্টৰস্ গুৱাহাটী, প্ৰথম সংস্কৰণ নভেম্বৰ ২০০১, উদ্ধৃত, পৃ: ৫৪

৬৬. তদেব, পৃ: ৫৬

৬৭. ভূঞা, যোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ (সম্পা) : 'ৰত্নেশ্বৰ মহন্ত ৰচনাৱলী', গুৱাহাটী, ১৯৭৭, পৃ: ২৮৭

৬৮. বিদ্যাৰত্ন, ৰামকুমাৰ : 'উদাসীন সত্যশ্ৰবাৰ আসাম ভ্ৰমণ', কলকাতা, ১৮৮১, পৃ: ১০৬

তৃতীয় অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী এবং নিরুপমা বরগোহাঞি : জীবন ও সৃজনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

<u>তৃতীয় অধ্যায়</u>

আশাপূর্ণা দেবী এবং নিরুপমা বরগোহাঞি : জীবন ও সৃজনের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

কালের বিচিত্র গতিতে এগিয়ে চলে দিন মাস সাল। একই গতিতে প্রবাহিত হয়ে চলে মানব জীবন, জীবনের উত্থান পতন, হাসি কান্না নিয়ে কালের প্রবাহে বাহিত হয় মানব জীবন। কালের গতিতে একদিন ঢেউ-এর ফেনার মতো মানব জীবনও বিলীন হয়ে যায়, কিন্তু তারই মধ্যে ঢেউ-এর সঙ্গে ভেসে আসা ঝিনুকের মধ্যে থাকা মুক্তোর মত ঝলমলিয়ে ওঠে কিছু মানব মানবীর জীবন; যারা নিজের কীর্তি দিয়ে সময়কে পেরিয়ে যান, হয়ে ওঠেন কালাতীত। বিশ শতকের ভারতীয় সাহিত্যের আকাশের এমন দুই স্রষ্টা নক্ষত্র হলেন আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি।

আশাপূর্ণা দেবী এবং নিরুপমা বরগোহাঞি যথাক্রমে বিশ শতকের বাংলা ও অসমীয়া ভাষার দুই শক্তিশালী কথা সাহিত্যিক। দুজনের রচনার মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও, জীবনদৃষ্টি, সমাজবোধ ও রূপনির্মিতির দিক থেকে বৈসাদৃশ্য থাকলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিষয়বোধে উভয়ের নৈকট্যও পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। দুই লেখিকাই বিংশ শতাব্দীর লেখিকা। তাঁদের জীবন ও সৃজনকে যে সামাজিক মূল্যবোধ, রাজনৈতিক পরিসর প্রভাবিত করেছিল তা সামান্য তারতম্য সত্ত্বেও কম বেশি পরিমাণে একই। আশাপূর্ণা দেবী নিরুপমার থেকে ২৭ বছরের বড়ো। কিন্তু দুজনের প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছে ১৮ বছরের ব্যবধানে। আশাপূর্ণার প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে, আর নিরুপমার প্রথম উপন্যাস 'সেই নদী নিরবধি' প্রকাশের আলো দেখে ১৯৬৩ তে। নিরুপমার শেষ উপন্যাস প্রকাশিত হয় আশাপূর্ণার মৃত্যুর ২ বছর আগে। আশাপূর্ণার শেষ উপন্যাস যখন প্রকাশিত হয় (স্মৃতি সত্তা জীবন ১৯৯৮), ততদিনে বেরিয়ে গেছে নিরুপমা বরগোহাঞির দুই ডজন উপন্যাস।

দুই ভাষার দুই লেখিকা একই সময়ের তলে দাঁড়িয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছেন। বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের রূপান্তরিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বাস্তবতা বঙ্গীয় এবং অসমিয়া সমাজের প্রেক্ষিতে অনেকটা একই রকমের। উভয়েরই প্রধান উপন্যাস সমূহের কেন্দ্রে রয়েছে স্বাতন্ত্র্যসন্ধানী নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, হতাশা, স্বপ্নভঙ্গ ও উত্তরণের আলেখ্য। নারীর স্বাতন্ত্র্য সন্ধান, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পরিবেশে 'অপর' হিসাবে নারীকে প্রত্যাখ্যানের পরম্পরার বিরুদ্ধে দুজন লেখিকাই উচ্চকণ্ঠ। নারী পুরুষ সম্পর্কের বিন্যাস ও সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অভ্যস্ত সংস্কারগুলির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দুই লেখিকাই। সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন সমস্যার স্পর্শ এড়াতে পারেনি এই দুই লেখিকার জীবনও। মেয়েদের সমস্যাকে

সাহিত্যে স্থান দেওয়া দুই লেখিকারই নিজের জীবনে ঘটে গেছে বিচিত্র উত্থান পতন, মোকাবিলা করতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতার, এবং সব সমস্যাকে অতিক্রম করে সৃজনের মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন সৃজনশীল সাহিত্যিক রূপে। এই দুইজন সাহিত্যিকের জীবন ও সৃজনের একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের চেষ্টা করব সন্দর্ভটির বর্তমান অধ্যায়ে। প্রবল ইচ্ছাশক্তির বলে তাঁরা সব সমস্যাকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন, এই জীবনীশক্তিই তাঁদের অন্যদের থেকে পৃথক করে তুলেছে। এই ব্যতিক্রমী শক্তি শুধু যে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যই নিয়োজিত হয়েছে তা নয়, এর দ্বারা সামাজিক কল্যাণও সাধিত হয়েছে। নারীর অন্তরবেদনাকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে নারীপুরুষ সমস্যা ও সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিভূমিকে নাড়া দিয়েছেন দুইজন লেখিকাই।

আশাপূর্ণা দেবীর জীবন ও সৃজন

বাংলা সাহিত্য জগতে আশাপূর্ণা দেবী একটি স্মরণীয় নাম। মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের নিপুণ রূপকার তিনি। তাঁর সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ব্যক্তি(, পরিবার ও গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করে শু(হলেও পরে তা পল্লবিত হয়ে বাঙালির বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় বিকশিত হয়েছে। বাঙালির সংসার জীবনের মোহজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন তিনি।

১৯০৯ সালে ৮ই জানুয়ারি কলকাতার পটলডাঙায় মামাবাড়িতে আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম হয়। কলকাতার বৃন্দাবন বসু লেনবাসী বৃহৎ গুপ্ত পরিবারের মেজবৌ সরলাসুন্দরী ছিলেন আশাপূর্ণা দেবীর মা। অঙ্কন পারদর্শী হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছিলেন আশাপূর্ণা দেবীর পিতা। তিনি সেকালের বিখ্যাত সিল্যাজারাস কোম্পানিতে নকশা আঁকার কাজ করতেন। তাঁদের আদি নিবাস ছিল হুগলী জেলার বেগমপুরে।

আশাপূর্ণা দেবী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন সে সময়ে মেয়েদের শি(ালাভের উপযুক্ত(পরিবেশ ছিল না। তাছাড়া আশাপূর্ণা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন র(ণশীল পরিবারে, যার প্রধান কর্ত্রী ছিলেন তাঁর ঠাকুরমা। ঠাকুরমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আশাপূর্ণা দেবী বলেছেন — ''ঠাকুমা পুরানো কালের মানুষ ছিলেন। তার ধারণা ছিল লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বাচাল হবে ও অকালেই বিধবা হবে।''[১]

আশাপূর্ণা দেবী র(ণশীল হিন্দু সমাজের একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান। স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করা তো দূরের কথা গৃহশি(ক রেখে বিদ্যা অর্জনের সুযোগও তার ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি। তবে নিজের অদম্য পড়ার বাসনা ও মায়ের সাহিত্যতৃষ(া তাঁর মধ্যে তীব্র জেদ সৃষ্টি করেছিল। তাই দাদারা যখন পড়তে বসতেন তখন উল্টোদিকে বসে নীরবে পাঠের অভ্যাসও করে ফেলেন তিনি। ফলস্বরূপ তার অ(র পরিচয় উল্টোদিক থেকেই শু(হয়েছিল।[২]

আশাপূর্ণা দেবীর মায়ের মধ্যে থাকা অসাধারণ সাহিত্যপ্রীতিই তাঁদের তিন বোনের মধ্যে সাহিত্য পাঠের তৃষ(া জাগিয়ে তোলে। মায়ের হাত ধরেই তাঁরা সাহিত্য রসের আস্বাদন করতে শিখলেন। ছোটবেলায় কবিতা মুখস্থ করা তাঁদের এক প্রিয় খেলা ছিল। প্রাতিষ্ঠানিক শি(ালাভের কোনো সুযোগ না পেলেও শিল্পী পিতার সাহচর্য এবং শিল্প ও সাহিত্যের এক সুন্দর পরিবেশই পেয়েছেন তাঁরা বাড়িতে। শিল্পী পিতার থেকে তিনি যেমন পেয়েছেন সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সংবেদনশীলতা তেমনি জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে অদম্য অনুসন্ধিৎসা তাঁর মধ্যে জাগিয়েছেন তাঁর মা।

পড়ার নেশাই তাঁর মধ্যে জাগিয়েছিল লেখার প্রেরণা। মাত্র ১৩ বছর বয়সে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় 'বাইরের ডাক' (১৩২৯ সাল) নামে কবিতা লিখে পাঠালেন আশাপূর্ণা। তারপর তাঁকে পত্রিকাতে গল্প লিখতে বলা হল। এই শু(হয়ে গেল লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য জীবন। ১৩ বছর বয়সে তিনি যে লেখালেখি শু(করলেন তা আমৃত্যু বজায় ছিল। নিজের সাহিত্যকর্মের সম্পর্কে তিনি বলেছেন — "তারপর আর কি! পীচঢালা রাস্তায় গড়গড়িয়ে গাড়ী চালিয়ে যাই। সে গল্প ছাপার পর আবার চিঠি এসে যায়। আবার লিখি।...... অন্য শিশুপত্রিকা থেকেও চিঠি এসে পড়ে। 'মৌচাক', 'রংমশাল', 'খোকাখুকু' ইত্যাদি।"[৩] তিনি আরও বলেছেন — "প্রথম লেখাটি একটি আকস্মিক ঘটনা। যেন লেখা নয় লিখে ফেলা। আর ওই লিখে ফেলার পেছনে রয়েছে একটি অদৃশ্য শক্তি(। যে শক্তি(হঠাৎ কখন ভিতরে ঢুকে পড়ে প্রভু হয়ে বসে অবিরত ধাক্কা মারে। যার ফলে ঐ লিখে ফেলা থেকে লিখে চলা।"[৪]

মাত্র ১৫ বছর বয়সে একটি কবিতা প্রতিযোগিতায় 'স্নেহ' শীর্ষক কবিতার জন্য প্রথম সাহিত্য পুরস্কার পান আশাপূর্ণা (১৯২৪ সালের জুলাই মাসে)। লেখালেখির মাঝখানে কৃষ(নগর নিবাসী কালিদাস গুপ্তর সঙ্গে আশাপূর্ণা দেবী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন। গুপ্ত পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ হয়ে স্বামীর সঙ্গে কৃষ(নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এখানে জীবনের এক নতুন অধ্যায় শু(হয়। শু(হয় তাঁর সাংসারিক জীবন। "সে এক অভাবিত আনন্দের অনুভূতি।..... পুরস্কারলব্ধ অনেকগুলো ভালো ভালো বই যার মধ্যে ছিল 'রাজকাহিনী', '(ীরের পুতুল', 'নোলক', 'নীলপাখী', 'টমকাকার কুটীর', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' ইত্যাদি ট্র্যাঙ্কে পুরে নিয়ে একগলা ঘোমটা টেনে শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে গোয়াড়ি কৃষ(নগরের ট্রেনে চেপে গুটি গুটি (শুরবাড়ি যাত্রা। সেটা হচ্ছে বাংলা ১৩৩১ সাল। ব্যাস্ সেইখানেই ছেলেবেলার ইতি।"[৫]

বৈবাহিক সূত্রে কলকাতা ছেড়ে কৃষ(নগরে চলে যেতে হলেও কলকাতাই আশাপূর্ণার কর্ম(েত্রের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। স্বামী কালিদাস গুপ্ত কর্মসূত্রে কলকাতায় চলে আসেন। ফলে কালিদাস গুপ্ত, স্ত্রী আশাপূর্ণা দেবী, মাতা সরোজিনী দেবী, পিতা নরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও আরও দুই ভাইকে নিয়ে ভবানীপুরে থাকতে শু(করেন। র(ণশীল পরিবারের কন্যা আশাপূর্ণা বিয়ের পূর্বে যেভাবে মায়ের কাছ থেকে সাহিত্য সাধনার প্রেরণা পেয়েছিলেন তেমনি র(ণশীল পরিবারের গৃহবধূ হয়েও বিয়ের পর স্বামীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছিলেন সাহিত্য সাধনার। বিয়ের পরও

তার লেখালেখির অন্ত ঘটেনি। স্বামী, সন্তান, সংসারের দায়িত্ব সব পালন করে তারই ফাঁকে ফাঁকে নিজের লেখার কাজটিও চালিয়ে গেছেন তিনি।

দুই পুত্র, এক কন্যার জননী আশাপূর্ণা দেবী সংসারের খুঁটিনাটি সব দায়িত্ব পালনের অবকাশেও ছোটদের জন্য লেখেন 'ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা' যা প্রকাশিত হয় ১৩৪৫ সালের শ্রাবণ মাসে। 'ছোট ঠাকুর্দার কাশীযাত্রা'ই তাঁর ছোটদের জন্য প্রথম সংকলিত গল্প। এরই সঙ্গে আরও তিন-চারখানি বইও বেরিয়ে যায় তাঁর।

আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্য সাধনার জন্য স্বামীর কাছ থেকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেলেও বিয়ের পর তাঁকে সাহিত্য সাধনার (ত্রে কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা তিনি জানিয়েছেন। স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন, ''. . . . . মেয়েদের প(তো আর (শ্বশুরবাড়ি জায়গাটা কুসুমকোমল নয়। তাছাড়া সে তো আবার পিতৃগৃহের 'পর্দার' থেকেও অনেক ঘোরালো। স্রেফ যবনিকার অন্তরাল। কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধে ঘটেছিল মফস্বলের (শ্বশুরবাড়িতে বইয়ের অভাবে। জলের মাছ ডাঙায় পড়া আর কি।''[৬]

যখন তিনি শারদীয় বাজার পত্রিকায় 'প্রেম ও প্রেয়সী' (১৯৩৬) নামে গল্পটি লেখেন তখন তাঁর বয়স ২৮ বছর। এটি তাঁর বড়দের জন্য লেখা প্রথম গল্প। তাঁর কিছু পরে (১৯৪৪) সনে তিনি বড়দের জন্য প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' লেখেন ''প্রয়াত প্রীতিভাজন বন্ধু, বিশু মুখোপাধ্যায়ের প্রেরণায় ও তাগিদে।''[৭] সমগ্র জীবন ধরে তিনি প্রায় লিখেছেন দেড়শোর বেশি উপন্যাস, দেড় হাজারের বেশি ছোটগল্প, লিখেছেন অজস্র কবিতা, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, ধর্মীয় ভাবনামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি। তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারে নাটক মাত্র একটি।

'ছোট ঠাকুরদার কাশীযাত্রা', 'হাফ হলিডে', 'রঙিন মলাট', 'রহস্যের সন্ধানে', 'ভাগ্যি যুদ্ধ বেধেছিল' এবং 'বলবার মতো নয়' এই গল্প সংকলন ছটিতে এবং 'কিশোর সাহিত্য সমগ্র'তে সংকলিত গল্পগুলিতে নির্ভেজাল কৌতুকের মধ্য দিয়ে অশ্রুজলকেও প্রত্য(করা যায়, যেখানে অন্তর্লীন হয়ে রয়েছে মানবিকতার সুর।

আশাপূর্ণার রচনায় কোনো মনোস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও ইতিহাস-ভূগোলের অভিজ্ঞতা তেমন পাওয়া যায় না। তিনি মূলত অন্তঃপুরের রূপকার। চার দেয়ালই তাঁর রচনার প্রেরণা ও কেন্দ্রবিন্দু যেখানে তিনি খুঁজেছেন চিরন্তন মানবজীবনের সুখ-দুঃখের চাবি। তাঁর রচনায় রয়েছে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা সম্পর্কের টানাপোড়েন। সমাজে নারীর অবস্থান সংত্র(ান্ত জিজ্ঞাসা রয়েছে তাঁর সিংহভাগ রচনার কেন্দ্রে। কিন্তু সেখানে তিনি যেমন পুরোনো মূল্যবোধের জয়গানও করেন নি, তেমনি তথাকথিত শূন্যগর্ভ আধুনিকতাকেও প্রশ্রয় দেন নি। তিনি আলোর সঞ্চার চেয়েছেন কিন্তু আগুনের তাপ নয়। ''মানুষ সুখের আশায় নিরন্তর ছুটলেও শেষ পর্যন্ত জীবনের শ্রেয়বোধের মধ্যেই সে পেতে পারে প্রশান্তি ও প্রসন্নতা''[৮] — এ কথা তাঁর জানা ছিল। রাজনীতি কোনোদিনই

তাঁর প্রিয় বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি। তিনি তাঁর উপন্যাসগুলিতে কাহিনির স্বল্প পরিসরের মধ্যে অসংখ্য চরিত্রকে স্থান দিয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে এটাকেও ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে নারীর ভাগ্যের জন্য পু(ষই শুধু দায়ী নয়, নারীও এর জন্যে সমপরিমাণে দায়ী। 'এলোকেশী' (প্রথম প্রতিশ্রুতি), 'মো(দা' (প্রথম প্রতিশ্রুতি), 'মুক্ত(কেশী' (সুবর্ণলতা) প্রভৃতি চরিত্রর কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

আশাবাদী লেখিকা আশাপূর্ণা নারীকে ব্যক্তি(স্বাতন্ত্র্যসম্পন্না ও আত্মমর্যাদাবোধে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে নারীর কল্যাণমূর্তিকেও দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তারই সঙ্গে নারীর অবস্থার উন্নতির স্বপ্ন দেখেছেন। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন ''আমি একসময় অধিকারমাত্রহীন, অবরোধের অন্ধকারে বন্দী আগেকার মেয়েদের যন্ত্রণা, বেদনা আর নি(পায় অসহায়তার কথা নিয়ে কিছু লেখালেখি করেছি। আর সেই লেখালেখির সময় স্বপ্ন দেখেছি মেয়েদের বন্দিত্ব মোচনের। ভাবতে চেষ্টা করেছি পাথরের দেয়ালে মাথা কুটে মরা মেয়েরা যদি ঐ পাথরের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে পায়, যদি খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে নিঃশ্বাস নিতে পায়, যদি বৃহৎ বিশ্বের কর্মযজ্ঞের শরিক হতে পায় আর জগতের আনন্দযজ্ঞে তাদেরও নিমন্ত্রণ জোটে, কি অনির্বচনীয় হবে সেই দৃশ্য। কেমন মহিমময় হয়ে উঠবে আমাদের পুরোনো পচা সমাজ।''[৯]

বিশ শতকের প্রথম পর্বের মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের স্বা(র বহন করে আশাপূর্ণা দেবীর বেশিরভাগ উপন্যাস। এরই সঙ্গে প্রকট করে তুলে একক ব্যক্তি(র সমস্যা — একক অস্তিত্বের নিঃসঙ্গ, তিক্ত(আত্মজিজ্ঞাসা। 'মিত্তিরবাড়ি' (১৯৪৭), 'যোগবিয়োগ' (১৯৫৩), 'উত্তরলিপি' (১৯৬০), 'উত্তরণ' (১৯৬৪), 'অবগুণ্ঠিতা' (১৯৬৭) প্রভৃতি উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণা দেবী মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাঙনের চিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন আর 'উন্মোচন' (১৯৫৭), 'অতিত্র(ান্ত' (১৯৫৭), 'সোনার হরিণ' (১৯৬২) এর মত রচনার মধ্য দিয়ে একক ব্যক্তি(র সমস্যাকে ফোটাতে স(ম হয়েছেন। শুধু উপন্যাসই নয়, পাশাপাশি প্রায় বত্রিশটি ছোটগল্প সংকলন এবং ঊনপঞ্চাশটি ছোটদের গল্প প্রকাশিত হয়। কিন্তু যে তিনটি রচনা সাহিত্যের জগতে আশাপূর্ণাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল, সেই তিনটি উপন্যাসের অ(য় কীর্তির কথা পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। প্রাসঙ্গিক হতে পারে সুমিতা চত্র(বর্তীর ব্যঞ্জনাগর্ভ মন্তব্য — ''আশাপূর্ণা অনেক লিখেছেন সারাজীবনে — কিন্তু অসংশয়েই বলা যায় 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' (১৯৬৪), 'সুবর্ণলতা' (১৯৬৭), 'বকুলকথা' (১৯৭৪) এই ত্রি-পর্ব উপন্যাসই বাংলা সাহিত্যে তাঁর অমরত্ব অর্জনের প্রাসাদস্তম্ভ'।''[১০]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র শুরুতেই লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন এক তৃতীয় প্রজন্মের নারীকে। সে হল বকুল। সত্যবতীর তৃতীয় প্রজন্ম বকুল স্বপ্রতিষ্ঠ, আশাপূর্ণা যে নারীর সত্তাকে প্রত্যাশা করেছেন স্বপ্নে ও কল্পনায়। আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসের ঘটনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি তিন প্রজন্মকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'। অন্তঃপুরের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নারীর উত্তরণের

কাহিনিকে তিনি দেখিয়েছেন এই ত্রয়ী উপন্যাসে। নারীমুক্তির প্রচেষ্টা কখনো হয়েছে প্রবল কখনো স্তিমিত। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতীর মুক্তির স্বপ্ন 'সুবর্ণলতা'র সুবর্ণর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে 'বকুলকথা'র বকুলের মধ্যে এসে পূর্ণতা পেয়েছে। এ যেন শুধু নারীর উত্তরণের কাহিনি নয়, কালেরও উত্তরণের গল্প।

অনেকে এই ট্রিলজিকে আত্মজৈবনিক মনে করেন। অবশ্য আশাপূর্ণা নিজেও সুবর্ণলতার চরিত্রের মধ্যে নিজের মায়ের ছায়া রয়েছে বলে স্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন — "আমিহীন লেখা কি হয়? সবার লেখাতেই তার নিজের 'আমিটা' অন্তরালে কাজ করে চলে। আমার তো তাই ধারণা।"[১১] তিনি আরও বলেছেন— "আমরা তিন বোন ট্রিলজির অখণ্ড সংস্করণ, একই মলাটে তিনখানি বই।'[১২] আশাপূর্ণা দেবী বহির্জগতের সংস্পর্শে সরাসরি আসার সুযোগ না পেলেও তাঁর সময়ে যে রাজনৈতিক সংঘাতের দোলা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রভাব আশাপূর্ণা দেবীর মনকেও নাড়া দিয়েছিল অল্পবিস্তর। অন্তঃপুরের ঘুলঘুলি থেকেই তিনি বাইরের জগতকে দেখে নিয়েছেন। তাই তাঁর 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে সুবর্ণর চরিত্রের মধ্যে স্বদেশিয়ানার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশি আন্দোলনে অন্তঃপুর থেকে সুবর্ণও সাড়া দিয়েছিল। সুবর্ণ বাড়ির ছাদে বিদেশি কাপড় পুড়িয়েছিল, স্বদেশি মেলাতে যোগদান করেছিল।

আশাপূর্ণা দেবী সাহিত্য সাধনার জন্য কোনোদিন একান্ত নিভৃত গৃহকোণ খোঁজেন নি, সংসারের কাজকর্মের ব্যস্ততার মধ্যেই তিনি তাঁর সাহিত্য জীবনকে অব্যাহত রেখেছেন। তিনি কোনো আবেগেই বেশি মেতে উঠেন নি কোনোদিন। সুখ ও শোক দুঃখকে তিনি জীবনের অঙ্গ হিসাবে সমানভাবে উপভোগ করেছেন। দুঃখে কাতর ও আনন্দে আহ্লাদিত হতে দেখা যায়নি তাঁকে। স্বামী, ভাই বোনদের মৃত্যু তাঁকে আঘাত দিলেও ভেঙে পড়েন নি তিনি। আবার জীবনে একের পর এক সাফল্য তাঁর মধ্যে অহংকারও আনতে পারে নি। আশাপূর্ণার রচনাবলীর প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় নূপুর গুপ্ত জানিয়েছেন — "সাফল্য লাভের পর সভা অনুষ্ঠানে যখন নিমন্ত্রণ পেয়েছেন, বাইরের এই ডাকে আনন্দ পেয়েছেন। পাঠককুলের সঙ্গলাভে, বিশিষ্ট জনেদের সঙ্গলাভে আনন্দ পেয়েছেন। জনপ্রিয়তার চূড়া ছোঁবার অহংকারে নয়, আলোর প্রত্যাশী আশাপূর্ণা প্রতিষ্ঠা লাভের দম্ভে নয় অন্তরঙ্গ আলাপচারিতায় বড়ই আনন্দ পেয়েছেন।"[১৩]

জীবনজোড়া সাহিত্যচর্চার স্বীকৃতিস্বরূপ আশাপূর্ণা পেয়েছেন নানা সম্মান। ১৯৫৪ সালে 'লীলা পুরস্কার' দিয়ে পুরস্কার প্রাপ্তির যে সূত্রপাত ঘটে তা ক্রমশ চলতেই থাকে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের জন্য 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুরস্কার পান ১৯৬৬ তে। 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার ১৯৭৬ তে। 'ভুবনমোহিনী দাসী' স্বর্ণপদক (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২), 'ভুবনেশ্বরী পদক' (শিশুসাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৬), 'হরনাথ ঘোষ পদক' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৮), 'শরৎ পুরস্কার' (১৯৮৯), 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩), ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' খেতাব (১৯৭৬) ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যজীবনের সম্মান। এছাড়াও জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৩), রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৭), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮৮), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৯০) তাঁকে

ডক্টরেট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৮৯ সালে আশাপূর্ণাকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হয় বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে। সাহিত্য আকাদেমির ফেলো নির্বাচিত হন ১৯৯৪ সালে।

আশাপূর্ণা দেবীর লেখার ভাণ্ডার অফুরন্ত। তাঁর রচনাবিশ্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে তুলে ধরা হল।

রচনাকাল অনুসারে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসগুলিকে এভাবে সাজানো যেতে পারে :

প্রেম ও প্রয়োজন ১৯৪৪,	অনির্বাণ ১৯৪৫,	মিত্তির বাড়ি ১৯৪৭,
বলয়গ্রাস ১৯৪৯,	অগ্নিপরীক্ষা ১৯৫২,	যোগবিয়োগ ১৯৫৩,
নবজন্ম ১৯৫৪,	কল্যাণী ১৯৫৪,	নির্জন পৃথিবী ১৯৫৫,
শশীবাবুর সংসার ১৯৫৬,	উন্মোচন ১৯৫৭,	নেপথ্য নায়িকা ১৯৫৭,
আশিক ১৯৫৭,	জনম জনম্‌কে সাথী (১৯৫৭),	অতিক্রান্ত ১৯৫৭,
ছাড়পত্র ১৯৬১,	উত্তরলিপি ১৯৬০,	মেঘ পাহাড় ১৯৬০,
প্রথম লগ্ন ১৯৬১,	সমুদ্র নীল আকাশ নীল ১৯৬১,	মুখর রাত্রি ১৯৬১,
তিনছন্দ ১৯৬২,	দিনান্তের রং ১৯৬২,	আর এক ঝড় ১৯৬২,
নদী দিক হারা ১৯৬২,	একটি সন্ধ্যা একটি সকাল ১৯৬২,	সোনার হরিণ ১৯৬২,
জহুরী ১৯৬২,	দোলনা ১৯৬৩,	উড়োপাখী ১৯৬৩,
বহিরঙ্গ ১৯৬৩,	জীবনস্বাদ ১৯৬৩,	জলছবি ১৯৬৩,
আবহসঙ্গীত ১৯৬৩,	বেগবতী ১৯৬৩,	উত্তরণ ১৯৬৪,
জনতার মুখ ১৯৬৪,	লঘু ত্রিপদী ১৯৬৪,	দুয়ে মিলে এক ১৯৬৪,
শক্তি সাগর ১৯৬৪,	রাণী শহরের কানাগলি ১৯৬৪,	প্রথম প্রতিশ্রুতি ১৯৬৪,
আলোর স্বাক্ষর ১৯৬৫,	মায়াজাল ১৯৬৫,	সুখের চাবি ১৯৬৫,
সুয়োরাণীর সাধ ১৯৬৫,	সুরভি স্বপ্ন ১৯৬৫,	বৃত্তপথ ১৯৬৫,
রঙের তাস ১৯৬৬,	যুগলবন্দী ১৯৬৬,	মায়াদর্পণ ১৯৬৬,
শেষ রায় ১৯৬৬,	দুই মেরু ১৯৬৬,	রাতের পাখি ১৯৬৬,
সুবর্ণলতা ১৯৬৭,	স্বর্গ কেনা ১৯৬৭,	নীলাঞ্জনা ১৯৬৭,
বিম্ববতী ১৯৬৭,	বালুচরী ১৯৬৭,	সেই রাত্রি এই দিন ১৯৬৭,
সমুদ্রকন্যা ১৯৬৭,	অন্য মাটি অন্য রং ১৯৬৭,	অনবগুণ্ঠিতা ১৯৬৭,
অন্তর বাহির ১৯৬৭,	যাহা চাই তাহা ১৯৬৮,	দুই নায়িকা ১৯৬৮,
বিজয়ী বসন্ত ১৯৬৮,	সময়ের স্তর ১৯৬৮,	শুধু তারা দুজনে ১৯৬৮,

জালি কাটা রোদ ১৯৬৯, মনমর্মর ১৯৬৯ (দ্বিতীয় অধ্যায় ১৯৬৯),
দর্শকের ভূমিকায় ১৯৬৯, নীলবন্দর ১৯৬৯, বিরহী বিহঙ্গ ১৯৬৯,
নয়ছয় ১৯৭০, মনের মুখ ১৯৭০, অনিন্দিতা ১৯৭১,
নিভৃত আকাশ ১৯৭১, মধ্যে সমুদ্র ১৯৭১, দূরের জানালা ১৯৭১,
কী পাইনি ১৯৭২, চাঁদের জানালা ১৯৭২, দর্পনে ছায়া ১৯৭২,
রাত্রির পরে ১৯৭২, রেললাইন ১৯৭২, যার যা দম ১৯৭২,
শিকলি কাটা পাখি ১৯৭৩, তরঙ্গহীন ১৯৭৩, ওরা বড় হয়ে গেল ১৯৭৩,
বকুল কথা ১৯৭৪, ভালোবাসার মুখ ১৯৭৪, হারানো খাতা ১৯৭৪,
যে যার দর্পণে ১৯৭৫, কখনও দিন কখনও রাত ১৯৭৫, হয়তো সবাই ঠিক ১৯৭৫,
হে ঈশ্বর তোমার যবনিকা ১৯৭৫, পলাতক সৈনিক ১৯৭৬,
লোহার গরাদের ছায়া ১৯৭৬, বংশধর ১৯৭৬, উত্তর পুরুষ ১৯৭৬,
সময় অসময় ১৯৭৬, এই যুগ এই মন ১৯৭৬, আবৃতা-অনাবৃতা ১৯৭৭,
পাখির খাঁচা ও খাঁচার পাখি ১৯৭৭, চার দেওয়ালের বাইরে ১৯৭৭,
ওরা ভাঙে না ১৯৭৭, সোনার কৌটা ১৯৭৭, শরণার্থী ১৯৭৭,
ত্রিনয়নী ১৯৭৭, শূন্যতার বাসা ১৯৭৮,
যুগান্তের যবনিকা পারে ১৯৭৮, পয়সা দিয়ে কেনা ১৯৭৮, সুখের ঠিকানা ১৯৭৯,
সাপের ছোবল ১৯৭৯, মোম জ্বলে মোম গলে ১৯৭৯, তিন ভুবনে কাহিনি ১৯৭৯,
অবিনশ্বর ১৯৭৯, প্রতীক্ষার বাগান ১৯৮০, বালির নীচে ঢেউ ১৯৮০,
সুখের নিলয় ১৯৮০, এই তো সেদিন ১৯৮০, পুঁথির লেখা ১৯৮০,
অহল্যা উদ্ধার ১৯৮১, সূর্যোদয় ১৯৮১, স্বপ্নের বাঁশি ১৯৮১,
অফুরন্ত ১৯৮১, সন্ধিক্ষণ ১৯৮২, তুলির টানে আঁকা ১৯৮২,
ঘর ১৯৮৩, আমিও আপনার ১৯৮৪, সূর্যাস্তের রঙ ১৯৮৪,
নাটকের শেষ দৃশ্যে ১৯৮৫, নির্ণয় ১৯৮৫, খবর বলছি ১৯৮৫,
উৎসমূল ১৯৮৫, অচল পয়সা ১৯৮৫, নীটফল ১৯৮৫,
অভয়ারণ্য ১৯৮৬, নিজস্বরমণী ১৯৮৬, রমণীর মন ১৯৮৬,
মানসম্ভ্রম ১৯৮৬, হঠাৎ একদিন ১৯৮৭, সাদায় কালোয় নক্সা ১৯৮৭,
ছায়াতে আলোতে ১৯৮৭, চিত্রকাল ১৯৮৯, পরমেশ্বরী ১৯৮৯,
যার বদলে যা ১৯৮৯, এখানে ওখানে সেখানে ১৯৯০, সৃষ্টি ছাড়া ১৯৯০,

লীলা চিরন্তন ১৯৯১, কখনও কাছে কখনও দূরে ১৯৯২,
চাবি বন্ধ সিন্দুক ১৯৯২, পথ জনহীন ১৯৯২,
নিমিত্ত মাত্র ১৯৯২, সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক ১৯৯২,
নষ্টকোষ্ঠী ১৯৯৩, ছোট সে তরী ১৯৯৩,
দিব্যহাসিনীর দিনলিপি ১৯৯৪, ভি.আই.পি. বাড়ির লোক ১৯৯৪,
ভুল ট্রেনে উঠে ১৯৯৪, তনুশ্রীর জগৎ ১৯৯৪,
একটি মিথ্যাভাষী নায়ক ১৯৯৪, ত্রৈরাশিক ১৯৯৪, শূন্যে সেতু ১৯৯৪,
স্থান কাল পাত্র ১৯৯৫, যাচাই ১৯৯৫, দ্বিতীয় বসন্ত ১৯৯৫,
চশমা পাল্টে যায় ১৯৯৫, অনমনীয়া ১৯৯৫, ছোট উপন্যাস ও বড় গল্প ১৯৯৬,
শাঁখা কাটা করাত ১৯৯৬, নীল চশমা ১৯৯৬, কাঁটাপুকুর লেনের কমলা ১৯৯৬,
বিশ্বাস অবিশ্বাস ১৯৯৭, স্মৃতি সত্তা জীবন ১৯৯৮।

আশাপূর্ণা দেবী বহু গল্প রচনার দ্বারাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তার মধ্য থেকে কিছু গল্পকে প্রকাশ কালসহ দেখানোর চেষ্টা করেছি।

রচনাকাল অনুসারে লেখিকার গল্পসমূহ এরূপে সাজানো যায় :—

পত্নী ও প্রেয়সী ১৩৪৩, রাধার কি হইল অন্তরে ব্যাথা ১৩৪৪,
রাজুর মা ১৩৪৪, পূর্ববরাগে রসনার স্থান ১৩৪৬,
ক্ষণগোধূলি ১৩৪৬, মেকী টাকা ১৩৪৭, বিস্ফোরণ ১৩৪৭,
বিচিত্রা ১৩৪৭, অঘটন ১৩৪৭, শিশু ১৩৪৭,
জ্বালাতন ১৩৪৭, সমাধান ১৩৪৭, মাটির পৃথিবী ১৩৪৭,
ধাঁধার উত্তর ১৩৪৪-৪৭, পূণ্যভূমি ১৩৪৪-৪৭, তাসের ঘর ১৩৪৪-৪৭,
ব্যবধান ১৩৪৪-৪৭, বিচারক ১৩৪৪-৪৭, ফল্গুধারা ১৩৪৪-৪৭,
বেশ ছিলাম ১৩৪৪-৪৭, ভাঙ্গন ১৩৪৪-৪৭, অমর ১৩৪৪-৪৭,
সে নদী মরুপথে ১৩৪৪-৪৭, তুমি আর আমি ১৩৪৪-৪৭, বিড়ম্বনা ১৩৪৪-৪৭,
নিগড় ১৩৪৪-৪৭, ধূলি-ধূসর ১৩৪৪-৪৭, রুদ্ধ কপাট ১৩৪৮,
খরস্রোতা ১৩৪৮, দেবাঃ ন জানন্তি ১৩৪৮, পাগল ১৩৪৮,
কারও পৌষমাস ১৩৪৮, সংস্কার ১৩৪৮, শকুন্তলার পরাজয় ১৩৪৮,
অপদার্থ ১৩৪৯, বীরাঙ্গনা ১৩৪৯, সিঁধকাঠি ১৩৪৯,
হাসির গল্প ১৩৪৯, প্রগলভা ১৩৪৯, উৎসব ১৩৫০,
নবকথামালা ১৩৫০, ইনোসেন্ট ১৩৫০, নির্লজ্জ ১৩৫০,

জীবননাট্য ১৩৫০,	প্রগল্‌তা ১৩৪৯-৫০,	ছুটির একবেলা ১৩৫০,
কঙ্কাবতীর ইতিহাস ১৩৪৯-৫০,	পূরবী ১৩৪৯-৫০,	
উপসংহার ১৩৫১,	মায়াকজয়ে ১৩৫১,	
বিপদ আর কাকে বলে ১৩৫১,	তাজমহল ১৩৫১,	
আগাম আগামীকাল ১৩৫১,	মধু ও হূল ১৩৫২,	না ১৩৫২,
জগৎ সিংহ বনাম ওসমান ১৩৫২-৫৪,		পোড়া কপাল ১৩৫২,
কার্য্যকারণ ১৩৫২,	মাপকাঠি ১৩৫২,	যুদ্ধোত্তর ১৩৫২,
ছিষ্টিছাড়া ১৩৫২,	মোহমুক্তি ১৩৫২,	গলায় দড়ি ১৩৫২,
জর্জ্জেট শাড়ী ১৩৫২,	দুপুর রোদে ১৩৫২,	লালশাড়ী ১৩৫২,
হোমশিখা ১৩৫২,	আমায় ক্ষমা করো ১৩৫২,	না দিলে খুল দ্বার ১৩৫৩,
হোঁচট ১৩৫৩,	দাওয়াই ১৩৫৩,	ঘোর কলি ১৩৫৩,
বিনা মাশুলে ১৩৫৩,	সাগর শুকায়ে যায় ১৩৫৩,	দশচক্রে ১৩৫৩,
ঘুমকাতুরে ১৩৫৩,	বৈজয়ন্তী ১৩৫৩,	সেফটি ম্যাচ ১৩৫৩,
অব্যাহত ১৩৫৩,	অবলা ১৩৫৩,	মুস্কিল আসান ১৩৫৩,
প্রস্তাব ১৩৫৩,	জনমত ১৩৫৩,	ধ্বংসের মুখে নারী ১৩৫৩,
সত্যাসত্য ১৩৫৩,	অঙ্গার ১৩৫৩,	এক্সপেরিমেন্ট ১৩৫৩,
রাহু ১৩৫৩,	পদ্মলতার স্বপ্ন ১৩৫৩,	নিরুপমা ১৩৫৩,
দুই নারী ১৩৫৩,	স্বপ্ন ভগ্ন ১৩৫৩,	অপদস্থ ১৩৫৩,
অভিশপ্ত ১৩৫৩,	দুই আর দুয়ে ১৩৫৩,	কঙ্কন ১৩৫৩,
একাঙ্কিকা ১৩৫৩,	আফিং ১৩৫৩,	যথা পূর্বং ১৩৫৩,
লড়াই ১৩৫৪,	আদিম ১৩৫৪,	অনুপমার ঘর ১৩৫৪,
নবাগত ১৩৫৪,	বহুরুপী ১৩৫৪,	কামধেনু ১৩৫৪,
সমাধান ১৩৫৪,	আসামী ১৩৫৪,	ছেঁড়া তার ১৩৫৪,
অপচয় ১৩৫৪,	বিঘ্ন ১৩৫৪,	ছিন্নমস্তা ১৩৫৪,
সভ্যতার সংকট ১৩৫৪,	একরাত্রি ১৩৫৪,	বাজে খরচ ১৩৫৪,
দৃষ্টি ১৩৫৪,	অভাব ১৩৫৪,	দ্বন্দ্ব ১৩৫৪,
সর্পশিশু ১৩৫৪,	সিঁড়ি ১৩৫৪,	আত্মহত্যা ১৩৫৪,
চেঞ্জ ১৩৫৪,	বন্দিনী ১৩৫৫,	অভিমত ১৩৫৫,
চক্র ১৩৫৫,	কুটীর শিল্পী ১৩৫৫,	সমঝদার ১৩৫৫,
ক্ষমতা হস্তান্তর ১৩৫৫,	পৌণঃপুনিক ১৩৫৫,	কালের হাওয়া ১৩৫৫,
দাসত্ব ১৩৫৫,	ডিরেক্টর রাসুদা ১৩৫৫,	উদ্বাস্তু ১৩৫৫,
সূর্যে ও ভূত ১৩৫৫,	ডেলি প্যাসেঞ্জার ১৩৫৫,	অপরাধ ১৩৫৫,

সামনের বাড়ি ১৩৫৫,	আকস্মিক ১৩৫৫,	বেঁহুশ ১৩৫৬,
সম্ভ্রম ১৩৫৬,	নীলরক্ত ১৩৫৬,	অসম্ভব কি? ১৩৫৬,
কাকজ্যোৎস্না ১৩৫৬,	দৈন্য ১৩৫৬,	চৌরঙ্গী ১৩৫৬,

এখনও নেভেনি হোমের আগুন ১৩৫৬, শুন পুণ্যবান ১৩৫৬,

মলাট ১৩৫৬,	পদাতিক ১৩৫৬,	
মৃত্যুবাণ ১৩৫৭,	একটু কথোপকথন ১৩৫৭,	পার্টনারশিপ ১৩৫৭,
প্রতিপক্ষ ১৩৫৭,	মানদণ্ড ১৩৫৭,	অসতর্ক ১৩৫৭,
একটি করুণ কাহিনি ১৩৫৭,	কাপুরুষ ১৩৫৭,	পলাতক ১৩৫৭,
লোকরহস্য ১৩৫৭,	দেশত্যাগী ১৩৫৭,	ব্যাঙ্কফেল ১৩৫৭,
সোনালী মেঘ ১৩৫৭,	বাকী খাজনা ১৩৫৭,	পাকা ঘর ১৩৫৮,
মৌলক সখ ১৩৫৮,	স্খলন ১৩৫৮,	নেশা ১৩৫৮,
দুজনে একলা ১৩৫৮,	লোকসান ১৩৫৮,	একটি ভাঙাচোরা গল্প ১৩৫৮,
মহাগদ্য ১৩৫৮,	শাড়ী মাহাত্ম্য ১৩৫৮,	স্বাধীনতার সুখ ১৩৫৮,
নীলকণ্ঠ ১৩৫৮,	অভিনেত্রী ১৩৫৮,	একটি ফুটো পয়সার জের ১৩৫৯,
অনাচার ১৩৫৯,	ঐশ্বর্য ১৩৫৯,	মানবতা ১৩৫৯,
স্বজাতি ১৩৫৯,	পাখির বাসা ১৩৫৯,	আগুনের শেষ ১৩৫৯,
বড়কর্তা ১৩৬০,	নিন্দিতা ১৩৬০,	স্বর্গাদপি ১৩৬০,
বিঘ্ন ভয় ১৩৬১,	অ্যাক্সিডেন্ট ১৩৬১,	ভগবান আছেন ১৩৬১,
শোলার ফুল ১৩৬১,	ইজিচেয়ার ১৩৬১,	বারশো আটানব্বইর গল্প ১৩৬১,
গুণ্ঠনবতী ১৩৬২,	যা নয় তাই ১৩৬২,	ভদ্রলোক ১৩৬২,
নিরাশ্রয় ১৩৬২,	আবেদন ১৩৬২,	ক্ষণজাত ১৩৬২,
ভান ১৩৬২,	সচিবঃ ১৩৬২,	ঊর্ণনাভ ১৩৬২,
ভাড়াটে বাড়ি ১৩৬২,	স্পেশাল ট্রেন ১৩৬২,	পত্রাবরণ ১৩৬২,
অন্যঘরে ১৩৬২,	যা নয় তাই ১৩৬২,	টেক্কা ১৩৬২,
আগুন নিয়ে ১৩৬২,	অবিনশ্বর ১৩৬২,	স্বপ্নশর্বরী ১৩৬২,
প্রলাপ ১৩৬২,	পাতাল প্রবেশ ১৩৬২,	আর এক দিন ১৩৬২,
এ যুগের আগে ১৩৬২,	মন্দাকিনীর তীর্থযাত্রা ১৩৬২,	কিংকর্তব্য ১৩৬২,
পরীরা মাটিতে নামে ১৩৬২,	ফাউন্টেন পেন ১৩৬২,	বদ্ধ পাগল ১৩৬৩,
নিছক গল্প ১৩৬৩,	ভবিষ্যৎ বাণী ১৩৬৩,	সংক্রামক ১৩৬৩,
মধ্যবিত্ত ১৩৬৩,	যুগলপত্র ১৩৬৩,	নির্ভেজাল ১৩৬৩,
অন্তরালে ১৩৬৩,	হাস্যকরুণ ১৩৬৩,	তুচ্ছ ১৩৬৩,
স্বার্থপর ১৩৬৩,	ফলিত জ্যোতিষ ১৩৬৩,	গোলক ধাঁধা ১৩৬৩,

হুঁশিয়ার ১৩৬৩,	পতঙ্গ ১৩৬৩,	একে আর একে এক ১৩৬৩,
স্বর্গচ্যুত ১৩৬৩,	জীবনের আইন ১৩৬৩,	দিলদরিয়া ১৩৬৩,
স্বীকারোক্তি ১৩৬৩,	মহত্তম উপন্যাস ১৩৬৩,	নিখাদ ১৩৬৩,
মফস্বলবার্তা ১৩৬৩,	অগ্নিকণা ১৩৬৩,	সমারোহ ১৩৬৩,
পেশা ও নেশা ১৩৬৩,	ঘটনাটা সত্য ১৩৬৪,	মনি অর্ডার ১৩৬৪,
মণিকোঠা ১৩৬৪,	মৃদুভাষিণী ১৩৬৪,	ভীষ্ম ১৩৬৪,
মনোনয়ন ১৩৬৪,	হাসির জবাব ১৩৬৪,	লাভের অঙ্ক ১৩৬৪,
কাঁচের দেওয়াল ১৩৬৫,	বয়ঃসন্ধি ১৩৬৫,	কাঠামো ১৩৬৫,
মৃত্তিকা ১৩৬৫,	পুরুষ সিংহ ১৩৬৫,	অজানিত ১৩৬৫,
গোড়েমালা ১৩৬৫,	অবোধ ১৩৬৫,	কসাই ১৩৬৫,
নারী প্রকৃতি ১৩৬৫,	একটি দেশলাই কাঠির জন্য ১৩৬৫,	বৈরাগ্যের রং ১৩৬৫,
নিঃসম্বল ১৩৬৫,	অবোধ্য পৃথিবী ১৩৬৫,	রৌদ্রলোক ১৩৬৫,
মেরুদণ্ড ১৩৬৫,	আত্মসর্বস্ব ১৩৬৫,	চাবি ১৩৬৫,
অপমান ১৩৬৫,	মায়াজাল ১৩৬৫,	ছোটলোক ১৩৬৫,
দেশলাই বাক্স ১৩৬৫,	ব্রহ্মাস্ত্র ১৩৬৫,	আশাভঙ্গ ১৩৬৫,
অনর্থ ১৩৬৫,	অসাবধান ১৩৬৫,	ফুল ঠাকরুন ১৩৬৫,
এক যে রাজা ১৩৬৫,	অনাগত ১৩৬৫,	অবিশ্বাস্য ১৩৬৫,
বসন্ত বিদায় ১৩৬৫,	বিবি বেগমের শিবতলা ১৩৬৫,	চোরাদরজা ১৩৬৫,
মন্টি ১৩৬৫,	চলন্ত জগৎ ১৩৬৫,	খেলাঘর ১৩৬৫,
নীলছায়া ১৩৬৫,	উচিত জবাব ১৩৬৫,	পথ নির্দর্শন ১৩৬৫,
মোড় ১৩৬৫,	গোকুল মল্লিক ১৩৬৫,	পক্ষী মহল ১৩৬৬,
ঠাকুরমার ঝুলি ১৩৬৬,	দৃষ্টিলাভ ১৩৬৬,	অগ্নিদহন ১৩৬৬,
অন্ধ ১৩৬৬,	বাসনার নেশা ১৩৬৬,	চলমান জগৎ ১৩৬৬,
হার ১৩৬৬,	অগ্রগতি ১৩৬৬,	পরাভব ১৩৬৬,
চাওয়া পাওয়া ১৩৬৬,	রংবদল ১৩৬৬,	স্বর্ণসূত্র ১৩৬৬,
নবনীড় ১৩৬৭,	প্রেম ১৩৬৭,	প্রেমাধার ১৩৬৭,
বেচারা ১৩৬৭,	দাঁও ১৩৬৭,	বাঁচতে হবে ১৩৬৭,
মোমবাতি ১৩৬৭,	ক্ষণমুহূর্ত ১৩৬৭,	পরিশিষ্ট ১৩৬৭,
অপচয় ১৩৬৭,	ছলনাময়ী ১৩৬৭,	ঘর ১৩৬৭,
জীবন মৃত্যু ১৩৬৭,	সবচেয়ে বেশী ১৩৬৭,	ক্যাশমেমো ১৩৬৭,
নিমিত্ত ১৩৬৭,	অবচেতন ১৩৬৭,	কেশবতী কন্যা ১৩৬৮,
পরাভব ১৩৬৮,	পাশের জানালা ১৩৬৮,	পুণ্যাশ্রয় ১৩৬৮,

আত্মজ ১৩৬৮, সৃষ্টিকালে ১৩৬৮, সীমারেখা ১৩৬৮,
হে পৃথিবী ১৩৬৮, দুঃস্থ, বনেদী ১৩৬৮, সংক্ষিপ্ত সমাচার ১৩৬৮,
ভদ্রতার দায় ১৩৬৮, যে যুগে যা ১৩৬৮, সঠিক সাধনা সিদ্ধি ১৩৬৮,
মহুয়া মাদল ১৩৬৮, স্বপ্নলীলা ১৩৬৮, চুলোয় যাক ১৩৬৮,
অবস্থা বুঝে ১৩৬৮, একটুর অভাবে ১৩৬৮, বিনামা ১৩৬৮,
ব্যর্থ নমস্কার ১৩৬৮, এতকম ১৩৬৮, কলঙ্কিনী ১৩৬৮,
লাভ ১৩৬৮, ছায়াসূর্য ১৩৬৯, জয়ী ১৩৬৯,
ধূসর ১৩৬৯, মিসেস বোসের গানের স্কুল ১৩৬৯, একান্ত ১৩৬৯,
দুর্জ্জেয় ১৩৬৯, অতলান্তিক ১৩৬৯, সাবিত্রী ১৩৬৯,
ছদ্মবেশী ১৩৬৯, তাহলে ১৩৬৯, পার্থক্য ১৩৬৯,
বায়স মাহাত্ম্য ১৩৬৯, ওরা ভুল করেছিল ১৩৬৯, ভঙ্গুর ১৩৬৯,
মুখরক্ষা ১৩৬৯, নিরুপায় ১৩৬৯, আত্মবিস্তৃত ১৩৬৯,
চিঠিখানি ১৩৬৯, তপঃসিদ্ধা ১৩৬৯, ভালোমানুষ ১৩৬৯,
চাকা ১৩৬৯, শিলাবতী ১৩৬৯, প্রথম ও শেষ ১৩৬৯,
নির্মোক ১৩৬৯, সর্পিল পন্থা ১৩৬৯, অঙ্কফল ১৩৬৯,
কেউটে বিষ ১৩৬৯, কস্তুরী মৃগ ১৩৬৯, শুধু একটি রাতের জন্য ১৩৬৯,
সাজবদল ১৩৬৯, পারিত্রিক ১৩৬৯, দৃষ্টিপাত ১৩৬৯,
সুখের হীরে ১৩৬৯, হারানো ঠিকানা ১৩৬৯, দুই চোখ ১৩৬৯,
নিরুত্তর ১৩৬৯, অভীষ্ট ১৩৬৯, ছোবল ১৩৬৯,
পুতুল ১৩৬৯, আভা ১৩৬৯, অহিনকুল ১৩৬৯,
আমি ১৩৬৯, ঘোড়ার আড়াই ১৩৬৯, তন্দ্রা যা ভাবলো ১৩৬৯,
প্রতিযোগিতা ১৩৬৯, বৃত্ত ১৩৬৯, রক্তধারা ১৩৬৯,
ছুরির ধার ১৩৭০, অভাবিত ১৩৭০, হাতে রইলো ১৩৭০,
নীচের তলা ১৩৭০, নবজীবনের যাত্রাপথে ১৩৭০, প্রথম পাঠ ১৩৭০,
প্রত্যুত্তর ১৩৭০, উসুল ১৩৭০, উদ্‌ঘাটন ১৩৭০,
আহত ফণা ১৩৭০, কার্বনকপি ১৩৭০, কি বিচিত্র দেশ ১৩৭০,
বঞ্চক ১৩৭০, অলৌকিক ১৩৭০, অতীতের স্বর্ণযুগে ১৯৭০,
বেলা সেন বনাম বুলা সেন ১৩৭০, ভেজাল ১৩৭১, লগদচাঁদা ১৩৭১,
ছাঁচের পুতুল ১৩৭১, কন্যাদায়ের বেশি ১৩৭১, পকেটমার ১৩৭১,
পুতুলের কাঁচ ১৩৭১, রূপান্তর ১৩৭১, সীমারেখার সীমা ১৩৭১,
ঘরণ মঞ্জুরী ১৩৭১, কাঁচ পুঁতি হীরে ১৩৭১, দৃশ্যান্তর ১৩৭১,
অক্ষয়ঘাট ১৩৭২, তৈল সংবাদ ১৩৭২, উপহারের সেরা ১৩৭২,

অকিঞ্চিৎকারের কিঞ্চিৎ ১৩৭২, আলো আগুন ছায়া ১৩৭২, ভিতর পৃষ্ঠা ১৩৭২,
বসুধৈব ১৩৭২, জলের দরে ১৩৭২, নাম ভূমিকায় ১৩৭২,
সোনারপুর ১৩৭২, আকাশমাটি ১৩৭২, আদ্যোপান্ত ১৩৭২,
আয়োজন ১৩৭২, আউট হাউস ১৩৭২, মূল্যমান ১৩৭২,
মূল্যায়ন ১৩৭২, নিঃসঙ্গ ১৩৭২, প্রহরী ১৩৭২,
মাটির নীচে ১৩৭২, একজাতি এক প্রাণ ১৩৭২, অন্ধকার বনচ্ছায়ে ১৩৭২,
অসহায়া ১৩৭৩, মহিলা সমিতি ১৩৭৩, বুভুক্ষু ১৩৭৩,
হাতের পাঁচটি আঙুলে ১৩৭৩, ঝাঁকুনি ১৩৭৩, যুদ্ধ-শান্তি-জ্বালা ১৩৭৩,
জগার খিচুড়ি ১৩৭৩, কলকাঠি ১৩৭৩, খাঁচা ১৩৭৩,
কোঠাঘর ১৩৭৪, দন্তাপহারক ১৩৭৪, ধাক্কা ১৩৭৪,
দণ্ড ১৩৭৪, লঘুদণ্ড ১৩৭৪, এই পৃথিবী ১৩৭৪,
চন্দনের জন্য ১৩৭৪, বুলা আর আকাশ ১৩৭৪, দুর্বোধ্য ১৩৭৪,
গুহামানব ১৩৭৪, সিঁড়ির শেষ ১৩৭৪, স্বাক্ষর ১৩৭৪,
প্রতারক ১৩৭৪, অবধারিত ১৩৭৫, অসহায় ১৩৭৫,
চাপরাশি ১৩৭৫, চোখের চামড়া ১৩৭৫, এক চক্ষু হরিণ ১৩৭৫,
কথা যাহা ছিল মনের তলায় ১৩৭৫, পদপাত ১৩৭৫, ঋণশোধ ১৩৭৫,
স্টিয়ারিং ১৩৭৫, সকালের রং ১৩৭৫, ঘুষ ১৩৭৫,
দেশলাই বাক্স ১৩৭৫, আদর্শবাদ ১৩৭৫, ধূলির প্রাপ্য ধূলিরে না দিলে ১৩৭৫,
ফাঁস ১৩৭৫, যা ছিল সেখানে ১৩৭৫, পাতাচাপা ১৩৭৩,
রন্ধ্রপথে ১৩৭৩, ক্যাকটাস ১৩৭৩, মলাটের মুখ ১৩৭৩,
পাপপুণ্য বিবেক ১৩৭৩, অব্যক্ত ১৩৭৪, আলোর পোকা ১৩৭৪,
এক কাঁটা সোজা এক কাঁটা উল্টো ১৩৭৪, প্রেম ১৩৭৪,
প্রার্থনা ১৩৭৪, প্রতারক প্রতারণা ১৩৭৪, সৌরভ সার ১৩৭৪,
স্বর্গদর্শন ১৩৭৪, টিকবে না এদেশ ১৩৭৪, নদীর চরে ১৩৭৪,
নতুন নামে ১৩৭৪, নিরীক্ষা ১৩৭৪, নিক্তি ১৩৭৪,
নির্বোধ ১৩৭৪, হারজিত ১৩৭৪, পসারিণী ১৩৭৪,
পৌরুষ ১৩৭৪, পরিপূরক ১৩৭৪, পরাজিতা ১৩৭৪,
প্রতিভাস ১৩৭৪, উত্তরপত্র ১৩৭৪, যান্ত্রিক ১৩৭৪,
যা ইচ্ছে ১৩৭৪, মশাল ১৩৭৪, মুরুব্বী ১৩৭৪,
আলোকপথ ১৩৭৪, অভিযোগ ১৩৭৫, নির্দায় ১৩৭৫,
পুঁজি ১৩৭৫, স্নেহ ১৩৭৫, ইস্পাতের পাত ১৩৭৫,
একটি শতবর্ষ জয়ন্তী ১৩৭৫, তারপর ১৩৭৫, বিদ্ধমৃগ ১৩৭৫,

অনধিকারিণী ১৩৭৬,	আপনজন ১৩৭৬,	অনিষ্ট ১৩৭৬,
অন্ধ ১৩৭৬,	বাস্তবিক ১৩৭৬,	বাতাস ১৯৭০,
যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে ১৩৭৬,	মোজাইক হাউস ১৩৭৬,	মতবাদ ১৩৭৬,
পরিচয়লিপি ১৩৭৬,	রাজী ১৩৭৬,	শরতের কড়চা ১৩৭৬,
স্মারকগ্রন্থ ১৩৭৬,	অমূলক ১৩৭৬,	তুচ্ছ নয় ১৩৭৬,
জানা ছিল না ১৩৭৬,	নজর ১৩৭৬,	আড়ি পাতি নি ১৩৭৭,
আতঙ্কিত ১৩৭৭,	যাচাই ১৩৭৭,	ক্ষমতার উৎস ১৩৭৭,
মার্ভেলাস ১৩৭৭,	মুক্তিসেনা ১৩৭৭,	প্রতারক পৃথিবী ১৩৭৭,
স্বর্গমর্ত্য ১৩৭৭,	তিলক তুমি ১৩৭৭,	ভালোবাসার নাম প্রতারণা ১৩৭৭,
মাথাধরা ১৩৭৭,	ওরা কথা বলে না ১৩৭৭,	অনায়ত্ত ব্যাধি ১৩৭৭,
ইচ্ছাশক্তি ১৩৭৭,	বিপন্ন সুখ ১৩৭৭,	সামান্য ক্ষতি ১৩৭৭,
অর্দ্ধমূল্যে ১৩৭৮,	আদি ও অকৃত্রিম ১৩৭৮,	আদি অনন্তকালের ১৩৭৮,
বিবেচক ১৩৭৮,	বাঘ ১৩৭৮,	এ যুগের চশমা ১৩৭৮,
লাল অক্ষরে লেখা ১৩৭৮,	ওরা অকারণে চঞ্চল ১৩৭৮,	রুম নম্বর ১৩৭৮,
সর্বস্ব ১৩৭৮,	সম্ভাবনা ১৩৭৮,	সেই কান্না ১৩৭৮,
সাফ জবাব ১৩৭৮,	পারা না পারা ১৩৭৮,	প্রাণাধিকাসু ১৩৭৮,
জালিয়াত ১৩৭৮,	অন্তরের মাঠ ১৩৭৮,	সর্বনাশ ১৩৭৮,
আঘাত ১৩৭৯,	অবরোহণ ১৩৭৯,	ভালোবাসার আয়ু ১৩৭৯,
বুঝে গেছি ১৩৭৯,	বিশ্বাসের মূল ১৩৭৯,	ছেলেমানুষ ১৩৭৯,
দয়ার আগে ১৩৭৯,	ঘুরঘুরে ১৩৭৯,	হাতে খড়ি অথবা হাতে কয়লা ১৩৭৯,
জীবনে যত পূজা ১৩৭৯,	লজ্জাবস্ত্র ১৩৭৯,	ম্যানেজ ১৩৭৯,
নিরেট ১৩৭৯,	রাতের মত দিন ১৩৭৯,	স্বর্গরাজ্যের বাসিন্দা ১৩৭৯,
সেই খোলা দরজাটা ১৩৭৯,	তৃতীয় নয়ন ১৩৭৯,	ধারশোধ ১৩৭৯,
সংকল্পভ্রষ্ট ১৩৭৯,	অর্থপূর্ণ ১৩৭৯,	হয়তো এমনই হয় ১৩৭৯,
শুধু একটি ঠিকানা ১৩৭৯,	ভর দুপুর বেলা ১৩৭৯,	নিউ মডেল ১৩৭৯,
বরফজল ১৩৭৯,	ভেজাল ১৩৭৯,	অন্তর্লোক ১৩৮০,
অর্বাচীন ১৩৮০,	বেড়াজাল ১৩৮০,	চোরের মার ১৩৮০,
একতরফা ১৩৮০,	কতবার বলেছে ১৩৮০,	ক্ষুদিরাম কলোনীর সিতিকণ্ঠ ১৩৮০,
লজ্জাহরণ ১৩৮০,	নিতান্ত নিরুপায় ১৩৮০,	নিকটাত্মীয় ১৩৮০,
নরচরিত্র ১৩৮০,	সং ১৩৮০,	সেটা সইবে না ১৩৮০,
শনৈঃ পন্থা ১৩৮০,	স্বল্পভাষণ ১৩৮০,	শাসক ১৩৮০,
সংসারের মানে ১৩৮০,	নিবারণ চন্দ্রের শেষকৃত্য ১৩৮০,	দশায় শনি ১৩৮০,

একটু অসাবধানে ১৩৮০,	ছোট লোক ১৩৮১,	চক্ষুলজ্জা ১৩৮১,
গরীব দুঃখী ১৩৮১,	যুদ্ধ ১৩৮১,	সত্যভ্রষ্ট ১৩৮১,
পরিবর্ত ১৩৮১,	আর এক ঘরে ১৩৮১,	মাধ্যম ১৩৮২,
স্বর্গ মর্ত্যে ১৩৮২,	অমানবিক ১৩৮২,	বুঝে সুঝে দিন ১৩৮২,
পাগলা ভাগ ১৩৮২,	একটি সত্য গল্প ১৩৮২,	সমীক্ষা ১৩৮২,
পাবলিক ১৩৮২,	মোমবাতি ১৩৮২,	অসম্ভব ১৩৮৩,
অমরলতা ১৩৮৩,	ভাঙা আয়না ১৩৮৩,	ডাক্তারের চেম্বারে ১৩৮৩,
প্রসঙ্গ ১৩৮৩,	সত্যমিথ্যা ১৩৮৩,	সেই দুঃখে ১৩৮৩,
কুয়াশা ১৩৮৩,	আশ্চর্য রহস্য ১৩৮৩,	কালান্তর রূপান্তর ১৩৮৩,
বিচারফল ১৩৮৩,	একটি অদ্ভুত মেয়ের গল্প ১৩৮৩,	
কাঠ খড় পুড়িয়ে ১৩৮৩,	বুঝলাম ১৩৮৪,	শান্তি ১৩৮৪,
সাপ ১৩৮৪,	আগুন ১৩৮৪,	কাঁটা পেরেক ১৩৮৪,
ফসল তোলার দিনে ১৩৮৪,	নিত্যদিনের কাহিনি ১৩৮৪,	যুবপ্রণাম ১৩৮৫,
অভাব ১৩৮৫,	অতি পুরাতন ১৩৮৫,	
বিধাতার রুদ্ররোষে ১৩৮৫,	বুড়ো হয়ে গেছি ১৩৮৫,	যন্ত্রণা ১৩৮৫,
খুন ১৩৮৫,	মেয়েরা ১৩৮৫,	সুরের খেলা ১৩৮৫,
নতুন অঙ্ক ১৩৮৫,	থার্ড ক্লাস ১৩৮৫,	রেল লাইনের ধারে ১৩৮৫,
বাড়ির লোক ১৩৮৫,	অমরকণ্টক ১৩৮৫,	অর্থহীন ১৩৮৫,
ঘূর্ণমান পৃথিবী ১৩৮৫,	শক্তির উৎস ১৩৮৫,	চশমা ১৩৮৫,
পরিত্রাণ ১৩৮৫,	একটি অমোঘ মৃত্যু ১৩৮৫,	
কেন যে? ১৩৮৫,	হঠাৎ দোলা ১৩৮৬,	পরাজিত ১৩৮৬,
স্বর্গোদ্ধার ১৩৮৬,	ইজ্জত ১৩৮৬,	বরফজল ১৩৮৬,
দুঃসাহস ১৩৮৬,	চরিত্রহীন ১৩৮৬,	অনুক্ত প্রশ্ন ১৩৮৬,
নিরূপায় ১৩৮৬,	অহমিকা ১৩৮৭,	ভগীরথ ১৩৮৭,
দৃষ্টিভঙ্গি ১৩৮৭,	দিন আর রাত্রি ১৩৮৭,	হাস্যরসাত্মক ১৩৮৭,
ঈর্ষা ১৩৮৭,	উত্তরোত্তর ১৩৮৭,	স্থিরচিত্র ১৩৮৭,
বলভরসা ১৩৮৮,	হিসেবে ভুল ১৩৮৮,	কিছু না ১৩৮৮,
উত্তরাধিকারী ১৩৮৮,	উদঘাটন ১৩৮৮,	ভয় ১৩৮৮,
পরিবর্তন ১৩৮৮,	বাড়ি ১৩৮৮,	রেহাই ১৩৮৮,
দুঃসাহসিক ১৩৮৮,	নিমিত্ত ১৩৮৮,	তারপর ১৩৮৮,
বেহুলা ১৩৮৯,	চশমাটা পাল্টে দেখুন ১৩৮৯,	ধরণী ১৩৮৯,
যন্ত্রণা ১৩৮৯,	মানবচরিত্র ১৩৮৯,	প্রকৃত বন্ধু ১৩৮৯,

পরমার্থ ১৩৮৯, আশুতোষ ১৩৮৯, বন্ধ দরজার সামনে ১৩৯০,
বেহায়া ১৩৯০, ব্রেকফেল ১৩৯০, ছেঁড়া কথা ১৩৯০,
প্রত্যাশিত ১৩৯০, পাকা দলিল ১৩৯০, তাসের বিবি ১৩৯০,
আত্মহত্যা ১৩৯০, আপদ ১৩৯১, অসহনীয় ১৩৯১,
বাস্তব অবাস্তব ১৩৯১, ভবিষ্যতের জন্যে ১৩৯১, ভাব ভালোবাসা ১৩৯১,
পরাজিতা নায়িকা ১৩৯১, হৃদয়হীন ১৩৯১, শিল্পী ১৩৯১,
আবির্ভাব ১৩৯২, কাটা ঘুড়ি ১৩৯২, সিদ্ধান্ত ১৩৯২,
হাতিয়ার ১৩৯২, নিজের আয়নায় দেখা ১৩৯২, অবোধ ১৩৯৩,
ভুল গল্পে ভুল জায়গায় ১৩৯৩, চালাঘর ১৩৯৩, মাতাল ১৩৯৩,
স্বয়ম্বরা ১৩৯৩, কুয়াশার আড়ালে ১৩৯৩, শেকল তুলে দিয়ে ১৩৯৩,
আতঙ্ক ১৩৯৪, এ যুগের শিক্ষাদীক্ষা ১৩৯৪, আজও সেইখানেই ১৩৯৫,
এই প্রজন্ম ১৩৯৫, প্রত্যাশা ১৩৯৫, ভয়ঙ্কর অচেনা ১৩৯৫,
একই বেড়া আগুনের মধ্যে ১৩৯৬, একান্তই জরুরি ১৩৯৬, একটি হত্যারহস্য ১৩৯৬,
জন্ম দিলেম উপহার চিন্তায় ১৩৯৬, ভালোভাবে থাকা ১৩৯৭,
একটি উত্তরণের দলিল ১৩৯৭, বরবাদ ১৩৯৮, মহামুহূর্ত ১৩৯৮,
সংকল্পে কঠোর ১৩৯৮, স্বর্গহারা ১৩৯৯, সহজপথ ১৩৯৯,
দুঘরা ফ্ল্যাট ১৩৯৯, বেওয়ারিশ ১৩৯৯, বিরোধীপক্ষ ১৩৯৯,
অজানা ভয় ১৩৯৯, আসল শিক্ষা ১৩৯৯,
আপন দর্পণে এক দর্পিনী ১৪০০, বিলম্বিত লয়ে ১৪০০,
বাঁচার বাসনায় ১৪০০, লজ্জা ১৪০০,
নীল সমুদ্রের স্বপ্নে ১৪০০, সুখের হন্তারক ১৪০০,
একাক্ষরী ১৪০১, দ্রুত সিদ্ধান্তে ১৪০১,
আততায়ী ১৪০১, জানা অজানা ১৪০১, ঋণশোধ ১৪০২,
প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি ১৪০২, একটি মিনিট কয়েকের নায়িকা ১৪০৪,
সমস্যার সমাধান ১৪০৫ ইত্যাদি ছাড়াও আরও অনেক গল্প রয়েছে।

কবিতার তালিকা : প্রকাশকাল সহ

বাইরের ডাক ১৯২২, প্রশ্ন ১৯৩০, আয়রে বুকে ফিরে ১৯২৭,
অভিনব বৈরাগ্য ১৯৩২, পালিয়ে যাব বনে ১৯৩৩, তোমাকে ১৯৮১,
স্বরাজপ্রাপ্তির পরবর্তী অঙ্ক ১৯৮১, বোমাপালানির প্রতি ১৯৮১,
রবীন্দ্র শতবার্ষিকীয় কার্যবিবরণী ১৯৮১, চিরচেনা ১৯৬১,
সীমিত ১৯৬১, নম্র প্রণতি ১৯৬৭, ভেবেছিলাম ১৯৬৯,

দুষ্টু যারা ১৩৭৬, প্রত্যাশা ১৩৭৬, নারী ১৩৮২,

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের আশিবর্ষে পদার্পণে সংবর্ধনা সভায় শ্রদ্ধাপ্রণাম ১৯৬৮,

শতবার্ষিকী কার্যবিবরণী ১৯৭৮, তোমরা আর আমরা ১৯৮২,

সেই যে সেই জিনিসটা ১৯৮৩, শেষটাতো দেখতে হবে ১৯৮৪,

কবি রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ষাট বছরে ১৯৮৪, ছড়া ১৯৯০,

'চার' এর চর্চায় একাল সেকাল ১৩৯৭ (১৯৯০), বিশ্বজয়ী ১৩৯৭ (১৯৯০),

কবির লড়াই-এর ছড়া ১৯৯০, পুষ্পরথ ১৪০১ (১৯৯৪),

ছড়াকারে কয় ১৪০৩ (১৯৯৬), অটোগ্রাফ ১৪০৩ (১৯৯৬),

জীবন মানে তো ১৪০৩ (১৯৯৬), মনোহর মান্না ১৪০৬ (১৯৯১),

স্মৃতির বেদনা রসে ১৪০৬ (১৯৯১), বনফুলকে ১৪০৬ (১৯৯১)।

<u>নাটক</u>

মহিলা সমিতি ১৩৭৩ (১৯৬৭)।

<u>রম্যরচনা</u>

বই নয় — বই এর মতো ১৩৬১ (১৯৫৪), আচমকা ১৩৬৩ (১৯৫৬), রঙ্গ বিচিত্রা ১৯৬৪, ঘটনা সামান্য ১৯৭৬, আমি ১৯৮৩, আশাপূর্ণা দেবীর সরস শুভেচ্ছা ১৩৯১ (১৯৮৪), ভয় ১৯৮৬, স্ট্যাটাস বিলম্ব যুগে যুগে ১৯৮৭, ভ্রমণ বিবিধ ১৩৯৯ (১৯৯২), দ্বৈত সত্তা দৈত্যাকার নয় ১৩৯৯ (১৯৯২), মেয়েরা ১৯৯২, কে বলে বাঙালির কিস্যুই নেই ১৪০১ (১৯৯৪), দূরদর্শনে জীবনদর্শন ১৯৯৫, একটি হাস্যকর ঘটনা, ফটোগ্রাফ, পালকি, সময় বেতার জগৎ, আদর্শ স্বামীর কি গৃহই একমাত্র আকর্ষণ, কী ছিল তখন কী আছে এখন, এছাড়াও রয়েছে গল্প সংকলন, ছোটদের উপন্যাস ও গল্প সংকলন, কিশোর সাহিত্য সমগ্র, উপন্যাস সংকলন ও রচনাবলী।

আশাপূর্ণা দেবীর ৭১ বছরের সাহিত্য সাধনায় ২৫০ টি উপন্যাস ও ৬৭ টি ছোটগল্পের বই আমরা পাই যেখানে হাজার দেড়েকের উপর ছোটগল্প এলোমেলো হয়ে রয়েছে। অধ্যাত্মবাদের মানবিক ব্যাখ্যা করেছেন তিনি তাঁর ধর্মভিত্তিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে। ভেঙে-পড়া শরীরেও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অনলস সাহিত্যসাধনা করে গেছেন তিনি। 'অনন্ত ভালবাসার অফুরন্ত প্রাণময়ী'[১৪] স্বপ্ন নিয়ে 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস'[১৫] রেখে সাহিত্য পথে এগিয়ে গেছেন তিনি যতদিন না শরীর বিদ্রোহ করেছে। তারপর 'চলতি খাতার হিসেব নিকেশ' শেষ করেন সবার মতো তিনিও। ১৯৯৫ সালের ১৩ জুলাই আপন সমস্ত কর্মের সমাপ্তি টেনে লোকান্তরিত হয়েছেন তিনি। শরীর নশ্বর তাই তিনি শরীরি রূপে পাঠক পাঠিকাদের কাছে, তাঁর প্রিয়জনদের কাছে না থাকলেও তিনি বেঁচে আছেন সাহিত্যের মধ্যে। 'যা অবিনশ্বর শুধু সেইটুকুই'[১৬] থেকে গেছে সাহিত্যরূপে 'স্ফটিক সিন্দুকে'[১৭]।

তাই বলা যায় তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাবে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে নয় সাহিত্যে। নূপুর গুপ্তর মতো বলা যায় —

"মৃত্যু নিয়ে গেল নীরবে নতশিরে
জীর্ণ দেহখানা জীবন নদীতীরে,
কীর্তি রয়ে গেল বঙ্গ ইতিহাসে,
লুপ্ত হবে না কালের নিঃশ্বাসে।।"[১৮]

সত্যিই তো আশাপূর্ণা দেবী নিজের অমর কীর্তির মধ্য দিয়ে কালোত্তীর্ণ হয়ে আছেন। সাহিত্যসৃষ্টিতে এবং পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে আশাপূর্ণা দেবী যথাযথ সমন্বয়ে পৌঁছাতে পেরেছিলেন বলেই আজ তিনি সুখী গৃহকোণের মহিমাময়ী স্রষ্টা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছেন তারই সঙ্গে স্বীকৃতি পেয়েছেন বহু উপন্যাস, ছোটগল্প, কিশোর কাহিনি ও আরও অনেক বিষয়ের যথার্থ শিল্পী রূপে।

নি(পমা বরগোহাঞি(র জীবন ও সৃজন

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মহিলা লেখিকা নি(পমা বরগোহাঞি(নিজের রচনাবলীর মধ্য দিয়ে অসমীয়া সাহিত্য, সমাজ ও জাতির উন্নতিতে বিশেষ অবদান যুগিয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলন তথা দ্বিতীয় বি(েযুদ্ধের মতো অস্থির পরিস্থিতির বাস্তবকে নি(পমা দেখেছেন কৈশোরে। অসম আন্দোলনের সময়কার নির্ভীক ও সাহসী লেখিকা নিজের লেখা এবং সত্রি(য় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উগ্রজাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিতরের কুটিল রূপকে অনুভব করে সেগুলির নেতিবাচক ফলাফলকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। নারীবাদী লেখিকা নি(পমা বরগোহাঞি(পু(ষশাসিত সমাজে 'অপর' হিসাবে নারীর উপর হওয়া অত্যাচারকে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। নারীর উপর হওয়া অত্যাচারের বি(দ্ধে উচ্চকণ্ঠ নি(পমার জীবনে কী আসেনি হতাশা, নিরাশা ও স্বপ্নভঙ্গের মতো যন্ত্রণা? এখানে আমরা এক সৃজনশীল ও সাহসী নারীর জীবনে আসা বিড়ম্বনা, যন্ত্রণা, বিপর্যয় এবং সাহসের বলে সেই সমস্ত বাধা বিঘ্নকে জয় করার অদম্য প্রয়াসকে দেখানোর চেষ্টা করব। নিজের সাহসের বলে নি(পমা বরগোহাঞি(নিজের ভাগ্যকে জয় করেছেন। তাঁর জীবনকথাই সংগ্রাম ও উত্তরণের একটি আকর্ষণীয় কাহিনি।

নির্ভীক লেখিকা নি(পমা বরগোহাঞি(র জন্ম হয় ১৯৩২ সনে গৌহাটি মহানগরীতে। তাঁর পিতার নাম যাদব তামুলী ও মাতা কাশী(েরী তামুলী। যাদব তামুলীর আসল বাড়ি পাগলাদিয়া নদীর তীরবর্তী শিমলীয়া গ্রামে যা নলবারী থেকে সাত মাইলের মতো দূরে। মা কাশী(েরীর বাড়িও ছমারকুটি গ্রামে। কর্মসূত্রে যাদব তামুলী গৌহাটি থাকতেন, তাই নি(পমা গৌহাটিতেই বড় হয়েছেন। পিতা যাদব তামুলী ছিলেন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসের বড় কেরানি। নি(পমা তাঁর আত্মজীবনী 'বি(াস আ(সংশয়র মাজেদি'তে পিতা সম্পর্কে বলেছেন যে তিনি সৎ চরিত্রের লোক। তাঁর

'উত্তরাধিকারী' গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটি যাদব তামুলীকে অনুসরণ করেই সৃষ্ট। তাছাড়া তাঁর বিভিন্ন লেখনিতে নানাভাবে তিনি তাঁর পিতার কথা অল্প-স্বল্প লিখেছেন প্রসঙ্গত্র(মে।

নি(পমা বরগোহাত্রি(ছোটবেলা খুবই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। ছোট ছোট কথাতে ভাবপ্রবণ হয়ে যেতেন তিনি। গান্ধীবাদী আদর্শে বি(াসী পিতা তাঁদের জীবনে কষ্টের সম্মুখীন হবার শি(াও দিয়েছেন। তাঁদের সময়ে মেয়েদের তেমন স্বাধীনতা ছিল না কিন্তু পিতা যাদব তামুলী নি(পমাকে ছোট থেকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন — ''আমার দিনত গাভ(ছোয়ালীর বন্ধু থকার প্র(েই নুঠিছিল, কিন্তু আমার ঘরত মোর স্বাধীনতা আছিল ভাই ককাইর দরে, মই স্বাধীনভাবে অকলে ঘুরি ফুরিছিলোঁ, মোর কেইবাজন ল'রা বন্ধু আছিল, তেওঁলোক আমার ঘরলৈ মোক লগ ধরিবলৈ নিঃসংকোচে আহিছিল।''[১৯] সেকালের হয়েও তাঁর পিতা মাতা পুরাতন কুসংস্কারকে আকড়ে ধরে থাকেন নি, তাঁরা ছিলেন উদার হৃদয়ের অধিকারী। তখনকার দিনে থাকা জাতপাতের ভেদাভেদকেও তাঁরা মানেন নি। তাঁদের উদার মনের পরিচয় পাওয়া যায় যখন নি(পমা বান্ধবী তুলতুলকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন তখন তিনি বাড়ি থেকে কোনো ধরনের বাধা পান নি। পুরানো মূল্যবোধের সমর্থক হলেও তাঁর মা তাঁকে বলেছেন ''এজনক স্বামী হিচাপে গ্রহণ করার পিছত দ্বিতীয় একজনক বিয়া করালে তাই দ্বিচারিণী নহ'বনে? তুলতুল সতী সাধ্বী ছোয়ালী। তাই যদি অপঘাত হৈ মরে? বন্ধু হিচাপে তুমি তাইক সহায় করিবই লাগিব।''[২০] বাবা, দাদা, ভাইও ছিলেন এই মতেরই সমর্থক। শুধু তাই নয় তাঁর মা দ্বিতীয় ছেলে পবিত্রকে দ্বিতীয়বার একজন বিধবার সঙ্গে বিনা সংকোচে বিবাহ দিয়েছেন। পরিবারের এই মুক্ত(হাওয়া নি(পমার মানস গঠনকে স্বভাবতই প্রভাবিত করেছে।

নি(পমা বরগোহাত্রি(তাঁর প্রাথমিক স্কুল শি(া শু(করেন গুয়াহাটির উজানবাজার বালিকা বিদ্যালয় থেকে। তারপর পানবাজার উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে একবছর পড়ার পর উজানবাজার স্থিত তারিণীচরণ স্কুলে চলে আসেন। তখনকার দিনে মাধ্যমিক পরী(াও গৌহাটি বি(েবিদ্যালয় থেকে পরিচালিত হত। তিনি মাধ্যমিক পরী(ার গৌহাটি বি(েবিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের ছাত্রী। বরাবর ভাল ছাত্রী নি(পমা মাধ্যমিকে ৭৩% পেয়ে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। বাড়ি থেকে প্রথমে তাঁকে ডিব্রুগড়ের একটি কলেজে তাঁর ইচ্ছার বি(দ্ধে কলা শাখায় ভর্তি করে দেওয়া হয়। কিন্তু পরে তাঁর জেদের ফলে তাঁকে কটন কলেজে আই এস সি পড়তে পাঠানো হয়। আই এস সি পাশ করে বিজ্ঞান শাখায় আর পড়াশোনা না করে ভর্তি হলেন কলা শাখায় শি(াবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে। তিনি সংস্কৃত ও ইতিহাসে লেটার পেলেন। কলা বিভাগে বি এ পাশ করার পর তিনি চলে যান কলকাতা বি(েবিদ্যালয়ে এম এ পড়ার জন্য। সেখান থেকে ১৯৫৪ সনে তিনি ইংরাজিতে এম এ পাশ করেন এবং ১৯৫৬ সনে তিনি অসমীয়াতে এম এ পাশ করেন। বিয়ে ও দুই পুত্রের জন্মের পর নর্থ ল(ীমপুর কলেজে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি আবার গৌহাটি বি(েবিদ্যালয় থেকে অসমীয়াতে এম এ পাশ করেন ৫৬% পেয়ে। এ নিয়ে তিনি তিন বার এম এ পাশ করেন। ছোট থেকে তিনি নিজের সব সিদ্ধান্ত নিজেই নিতেন। নিজের পড়াশোনার ব্যাপারে নেওয়া সিদ্ধান্তের

কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন — ‘‘পঢ়াশুনাত জীবনত মই স্কুলীয়া জীবনরে পরা ভুল সিদ্ধান্তকে লৈ আহিলোঁ এক ধরণর উন্নাসিকতাই মোক বিষয়বোরলৈ ঠেলি লৈ গৈছিল, যিবোরত মোর কোনোধরণৰ প্রতিভা নাছিল। মই কলার বিষয় ললোঁ যেতিয়া মেট্রিক আরু ইন্টারমিডিয়েট আরু বেছি ভাল করার সম্ভাবনা আছিল, তেতিয়া কিন্তু কলা নললোঁ।’’[২১]

বিয়ের ব্যাপারেও নি(পমা বরগোহাঞি(সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা মনোভাবই পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন — ‘‘এতিয়া মই পঢ়িম, তার পিছত বিয়া করাম(লাগিলে নিজর পছন্দর লরা নিজে বিয়া করাম।’’[২২] ১৯৫৮ সনে তিনি নলবারী কলেজে অধ্যাপিকা হিসাবে নিযুক্ত(হন। সেখানেই তাঁর হোমেন বরগোহাঞি(র সঙ্গে পরিচয় হয়। এই পরিচয়ই ত্র(মশ গভীর হয়। তাঁরা একসময় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫৮ সনের মার্চ মাসের ১২ তারিখে পিতার শিমলীয়া গ্রামের বাড়িতে আড়ম্বরহীন ভাবে তাঁদের বিয়ে হয়। সেখানে একমাত্র উপস্থিত থাকেন নি(পমার মা বাবা, ছোট ভাই অজিত ও হোমেন বরগোহাঞি(র কাকুর ছেলে ফুনু।

নি(পমা বরগোহাঞি(তাঁর চাকরি জীবন শু(করেন পাণ্ডুস্থিত নেতাজী বিদ্যাপীঠ-এ শি(য়িত্রী হিসাবে ১৯৫৬-৫৭ সনে। তারপর তিনি চলে যান নলবারী কলেজে অধ্যাপিকা হিসাবে। সেখানে কর্মরত অবস্থায় তাঁর বিয়ে হয় এবং একবছর পর তিনি চাকরি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে চলে যান মাজুলিতে। সেখান থেকে তাঁরা চলে যান ছয়গাঁও-এ। সে সময় তিন বছরের মতো নি(পমা কর্মজীবন থেকে বিরত ছিলেন। ডেপুটি কমিশনার স্বামীর ঘন ঘন বদলির সুবাদে বিভিন্ন স্থানে যেতে হতো নি(পমাকে। তারপর ১৯৬১ সনে তাঁরা যান গোয়ালপাড়াতে। সেখানে কলেজে তিনি ইংরেজির অধ্যাপিকা হিসাবে চাকরি পান। তিনি ল(ীমপুর কলেজেও তিন বছরের মত শি(কতা করেন। তারপর যোরহাটে বদলি হন হোমেন। যোরহাট কলেজেও তিনি অস্থায়ীভাবে কাজ করেন।

(মতাবান লেখক হোমেন বরগোহাঞি(সরকারি চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাংবাদিকতা শু(করে গৌহাটিতে চলে আসেন। গৌহাটিতে এসে নি(পমা বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপিকার চাকরির জন্য চেষ্টা করেন(পরে হতাশ হয়ে তিনিও সাংবাদিকতার কাজে যুক্ত(হন। ১৯৬৮ সনের ২রা অক্টোবর থেকে ‘সাপ্তাহিক নীলাচল’ প্রকাশ পায় এবং তখন থেকে তাঁদের জীবনেও নতুন অধ্যায় শু(হয়। হোমেন বরগোহাঞি(র সম্পাদনায় ‘সাপ্তাহিক নীলাচল’ সাফল্য লাভ করে। নি(পমা সাপ্তাহিক নীলাচলের সহ সম্পাদক ছিলেন। ততদিনে তাদের দুই ছেলে অনিন্দ্য ও প্রদীপ্তর জন্ম হয়ে গেছে। সাংবাদিকতার কাজে তাঁরা দুজনেই এত ব্যস্ত থাকতেন যে ছেলেদের পড়াশোনা ও অন্যান্য বেশিরভাগ (ে ত্রেই তাঁরা উদাসীন ছিলেন। অবশ্য তাঁর দুই ছেলেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সৎ আদর্শের অধিকারী হয়ে ওঠে।

দীর্ঘ ১৯ বছর বৈবাহিক জীবন কাটানোর পর নি(পমা বরগোহাঞি(ও হোমেন বরগোহাঞি(র দাম্পত্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭৭ সনে। তখনই হোমেন বরগোহাঞি(‘সাপ্তাহিক নীলাচল’

থেকে কাজ ছেড়ে দেন। একদিকে দুই পুত্রের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও অন্যদিকে বিবাহবিচ্ছেদ, অর্থাভাব ইত্যাদি সংকটময় সময়েও নি(পমা নীলাচলে সহ সম্পাদিকার কাজে একমন ও একপ্রাণ ছিলেন। ১৯৭৯ সনে অসমে বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন শু(হয়। তখন সব সংবাদপত্রের শীর্ষস্থান অধিকার করে এই আন্দোলন। সংবাদপত্রগুলি তখন কিছু মিথ্যা প্রচার অভিযান শু(করেছিল। ১৯৮০ সনে নি(পমা যখন বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে অনসমীয়াদের দুরবস্থা দেখে তাদের দুঃখে ব্যথিত হলেন এবং তিনি অন্যান্য সাংবাদিকের মতো মিথ্যা প্রচার করলেন না এবং আন্দোলনের নামে এরূপ নিষ্ঠুরতা যে সুসভ্য জাতিগঠনের সহায়ক নয় সেরূপ মত প্রকাশ করলেন। তাঁর এরূপ মতের ফলে তাঁকে বাংলাদেশির প্রশ্রয়দাত্রী অপবাদ দেওয়া হয় এবং সাপ্তাহিক নীলাচল থেকে বের করে দেওয়া হয়। অসম আন্দোলনের পরিপ্রে(তে জাতীয় সংহতির যে আলোচনা চত্রে(র ব্যবস্থা করা হয় কলকাতা ও আগরতলায় সেখানে নি(পমা বরগোহাত্রি(কেও নিমন্ত্রণ জানানো হয়। শিলচরের ‘দিশারী’ নামক সংস্কৃতি গোষ্ঠীর আয়োজিত ‘মৈত্রী উৎসবে’ও তাঁকে ডাকা হয়।

১৯৭৭ সনে হোমেন বরগোহাত্রি(র সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তাঁর সংগ্রামী জীবন শু(হয়। জীবনে নেমে আসে একের পর এক সংকট। ১৯৮০ সনে ‘সাপ্তাহিক নীলাচল’ থেকে বরখাস্ত, গুয়াহাটির মেয়েদের প্রকাশ্য সভায় বাংলাদেশির সহযোগী বলে ধিক্কার, আর্থিক অনটন, প্রগতিশীল সংবাদপত্র ‘সাপ্তাহিক সাঁচিপাত’র মুখ্য সম্পাদিকা রূপে নির্বাচন ও মালিক আগরওয়ালার প্রতারণা ইত্যাদি নানারূপ তিক্ত(অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে নি(পমা বরগোহাত্রি(কে। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯৩ সন পর্যন্ত তিনি তাঁর বড় ছেলে অনিন্দ্যর সঙ্গে কলকাতা থাকেন। তারপর থেকে তিনি তাঁর ছোট ছেলে প্রদীপ্তর সঙ্গে থাকেন।

নি(পমা তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর জীবনের সমস্ত ছোট বড় ঘটনাকে স্থান দিয়েছেন। যে সমস্ত লোকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হয়েছেন এবং যাদের কাছ থেকে তিনি অনেক ভালোবাসা ও বিভিন্ন(ত্রে সাহায্য পেয়েছেন তাঁদের কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। তাঁর স্কুল জীবনের বান্ধবী কনকের হঠাৎ মৃত্যুতে তিনি শোকাচ্ছন্ন হয়েছেন, ‘‘কনকর মৃত্যুত মোর হিয়া ভাঙি গৈছিল, জীবনটো শূণ্য বোধ হৈছিল। মৃত্যুর রহস্যময় আরু ট্রাজিক চেতনাত মই আচ্ছন্ন হৈ গৈছিলোঁ।’’[২৩] তিনি তাঁর জীবন ও সৃজনে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির প্রভাবের কথাও আত্মজীবনীতে লিখেছেন। কলকাতা থাকাকালীন জেঠামশাই এর বাড়ির কথা, সেখানের সুস্বাদু খাবারের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর সাহিত্যে তিনি বার বার বিভিন্ন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গান ও কবিতা উদ্ধৃত করেছেন। রবীন্দ্র সংগীতের প্রতি তাঁর প্রবল আশক্তি(রয়েছে। আশাপূর্ণা দেবীর একটি গল্প ‘আমায় (মা করো’ তিনি স্কুলে পড়াকালীন দিনে পড়েছিলেন এবং সেটি পড়ে তিনি মুগ্ধ হন। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণিতেই তিনি শরৎচন্দ্রের ‘শেষপ্র(’, ‘চরিত্রহীন’ ইত্যাদি পড়ে ফেলেন।

নি(পমা বরগোহাত্রি(ব্যক্তি(ত্বময়ী, নির্ভীক, প্রতিবাদী, প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে আপসহীন, ঈ(রে অবি(াসী, প্রচলিত রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারের প্রতি উদাসীন এবং কুসংস্কার বিরোধী।

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তিনি প্রত্য(ভাবে না হলেও পরো(ভাবে কম্যুনিস্টদের কাজকর্মে অল্পস্বল্প জড়িত ছিলেন। কিন্তু রাজনীতি থেকে সাহিত্যই তাঁকে বেশি টানত। লেখিকা নি(পমার সাহিত্য জীবন শু(হয় স্কুলে পড়া অবস্থাতে। পানবাজার স্কুলে একক চেষ্টায় 'শলিতা' নামের একটি পত্রিকা বের করেন হাতে লিখে। যার সম্পাদিকা এবং লেখিকা নিজেই। টি চি স্কুলে গিয়েও তিনি হাতে লিখে 'আসাম গৌরব' নামে একটি পত্রিকা বের করেন যার সম্পাদিকা এবং লেখিকা ছিলেন নিজেই। এর মলাটে ছিল (cover page) মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহ(র অসম ভ্রমণের ছবি।

নি(পমা বরগোহাঞি(নিজের পরিচিত পৃথিবীকেই সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। পরিচিত চরিত্রগুলিই তাঁর রচনার মধ্যে হাজির হয়েছে। তাঁর স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা যেন সৃষ্টির মধ্যে মিলে মিশে একাকার হয়ে আছে। তিনি রচনার মধ্য দিয়ে খুঁজেছেন নিজেকে, তারই সঙ্গে খুঁজেছেন জীবনের অর্থ এবং তাৎপর্যকে। সামাজিক ব্যবস্থার জন্য নারীজাতির যে দুঃখ-কষ্ট, নি(পমা তা তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে সহমর্মিতার সঙ্গেই প্রকাশ করেছেন। শ্রেণিবিভক্ত(সমাজে অর্থনৈতিক নিপীড়নকেও তিনি দেখিয়েছেন। তবে বেশিরভাগ (্ত্রেই তাঁর কলম তী(হয়ে উঠেছে অবহেলিত, বঞ্চিত নারীজাতির দুঃখ, বেদনাকে দেখাতে। তিনি তাঁর সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে সন্ধান করেছেন, কল্পনা করেছেন অধ্যয়নপ্রিয়, যুক্তি(বাদী, সহানুভূতিশীল, রোমান্টিক, অন্যায়ের বি(দ্ধে জাগ্রত এবং নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন এক অনন্যা নারীর। তাঁর শেষের দিকের উপন্যাসগুলির মধ্যে এই নারী আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আত্মমর্যাদা লাভের পথ বের করার সঙ্গে সঙ্গে দলবদ্ধভাবে সামাজিক বৈষম্য দূর করার চিন্তাও করেছে। মার্কসবাদ এবং পাশ্চাত্য নারীবাদের প্রভাব তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে ল(করা যায়(বোঝা যায় লেখিকার ভাবাদর্শগত অবস্থানও।

কলেজে পড়ার সময়েই, ১৯৫১ সনে তিনি লিখেছেন 'সেই নদী নিরবধি', যাতে রয়েছে দ্বিতীয় বি(্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে গ্রামে থাকার অভিজ্ঞতা। অবশ্য এটি ছাপানো হয় নি(পমা বরগোহাঞি(র বিয়ের পর। বিয়ের পর স্বামীর উৎসাহে ১৯৫৮ সনে তিনি 'সেই নদী নিরবধি'র দ্বিতীয় খণ্ড লিখেন এবং দুটি খণ্ডে সম্পূর্ণ উপন্যাসটি ১৯৬৩ সনে প্রকাশ পায়। কটন কলেজে পাঠরত অবস্থাতে তিনি 'এনথপ'লজির সপোনর পিছত' নামের গল্পটি লিখেছেন তাঁর দিদির জাকে নিয়ে। যুদ্ধের সময় গ্রামে থাকাকালীন সময়ে সা(াৎ পাওয়া গোবিন্দ নামের ছেলেটিকে নিয়ে 'তেন্তালাচ' নামের গল্পটি লিখেন যেটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত 'Modern Indian Short Stories' এর অন্তর্ভুক্ত(হয়। পরিচিত পাগলাদিয়া নদীকে নিয়ে তিনি দুটি উপন্যাস লেখেন সেটি হল 'সেই নদী নিরবধি' এবং 'ইপারর ঘর, সিপারর ঘর'। বান্ধবী গীতার নামে তিনি তাঁর 'সামান্য অসামান্য' নামের উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন।

ছয়গাঁও থাকাকালে নি(পমা কয়েকটি গল্প নিয়ে 'অনেক আকাশ' নাম দিয়ে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ওই গল্পগুলিতে তাঁদের সঙ্গে থাকা বাচ্চা ছেলে মেয়েগুলিকে নিয়ে লেখা।

আইকণ নামের মেয়েটিকে নিয়ে লেখেন ‘ভাইটির ছবি’ নামের গল্পটি। অনিল নামের গৃহ পরিচারককে নিয়ে লেখেন ‘শিল্পী’ নামের গল্পটি। একজন পিওনের মা-কে নিয়ে লিখেছেন ‘জয় পরাজয়’ নামের গল্পটি। তার অনেক পরে গৌহাটির ঘরে কাজ করা হরে্বরকে নিয়ে লিখেছেন ‘নালন্দা বি্ববিদ্যালয়র ছাত্র’ নামের গল্পটি। ‘ভবিষ্যতর রঙাসূর্য’ নামের উপন্যাসটি লিখেছেন জিতেনকে নিয়ে। অসমের বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলনের সময় তিনি সমকালীন ঘটনাপ্রবাহকে কেন্দ্র করে লেখেন ‘গোহাঁলী আই গোসাঁনী আই’ নামের উপন্যাসটি। কলকাতার বাসগৃহে কাজ করা শেফালীকে নিয়ে তিনি লেখেন ‘এথোপা গোলাপ’ নামের গল্পটি। ১৯৯২ সনের ‘আজির বাতরি’র পূজা সংখ্যায় নিরোধ চৌধুরীর প্রেমের গল্প সংকলন এ তিনি লেখেন ‘মধ্যবর্তিনী’ নামের গল্পটি। যোরহাটে থাকাকালীন সময়ে সেখানের প্রাকৃতিক অপূর্ব সৌন্দর্য নিয়ে তিনি ‘(ণিকা’ গল্পটি লেখেন। ছেলের সঙ্গে কলকাতা থাকার সময়ে তিনি লেখেন ‘অভিযাত্রী’ উপন্যাসটি।

তাঁর সাহিত্য জীবন উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে উপন্যাস, গল্প, বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ ইত্যাদি বিভিন্ন রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁর বিভিন্ন সময়ের উপন্যাস সমূহ হল —

‘সেই নদী নিরবধি’ (১৯৬৩), ‘এজন বুঢ়া মানুহ’ (১৯৬৬), ‘দিনর পিছত দিন’ (১৯৬৮) , ‘অন্তঃস্রোতা’, (১৯৬৯), ‘হৃদয় এটা নির্জন দ্বীপ’ (১৯৭০), ‘সামান্য-অসামান্য’ (১৯৭১), ‘সময় অসময়ে’ (১৯৭১), ‘ছায়া আরু ছবি’ (১৯৭১), ‘কেক্‌টাচর ফুল’ (১৯৭৩), ‘নামি আহে এই সন্ধিয়া’ (১৯৭৭), ‘তিনকন্যা’ (১৯৭৮), ‘ইপারর ঘর সিপারর ঘর’ (১৯৭৯), ‘ভবিষ্যতর রঙা সূর্য’ (১৯৮০), ‘দিন প্রতিদিন’ (১৯৮২), ‘গোহাঁনী আই গোসাঁনী আই’ (১৯৮৭), ‘চিনাকি অচিনাকি’ (১৯৮৭), ‘অন্যজীবন’ (১৯৮৭), ‘চম্পাবতী’ (১৯৯০), ‘অভিযাত্রী’ (১৯৯৩) তাছাড়া রয়েছে ‘পুয়ার পূরবী সন্ধ্যার বিভাস’, ‘ব্রহ্মার অস্ত্র’, ‘পখী ঘুরি যায় নিজর পরা নিলগত’, ‘এখন শ্রাদ্ধত আনন্দাশ্রু’, ‘এলবামত হেরোয়া ছবি’, ‘সৌগন্ধ’, ‘অন্যদ্বীপ অন্য ঢৌ’, ‘ইপার সিপার’, ‘মার প্রতি মরম আরু শ্রদ্ধারে’, ‘আলহী পখীর বাহ’, ‘পিতা-পুত্রী’, ‘একেই জোন একেই বেলি’, ‘শত্রু’ ইত্যাদি।

নি(পমার গল্পসমূহ — ‘রেহাই মূল্য’, ‘এনথোপলজির স্বপনর পিছত’, ‘ঢেকির স্বরগ’, ‘মধ্যবর্তিনী’, ‘আকাশছোয়া’, ‘তেন্তালাচ’, ‘ভাইটির ছবি’, ‘শিল্পী’, ‘জয় পরাজয়’, ‘নালন্দা বি্ববিদ্যালয়র ছাত্র’, ‘এথোপা গোলাপ’, ‘(ণিকা’ ইত্যাদি। তাছাড়া তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখা ‘বি্বাস আরু সংশয়র মাজেদি’ রচনাটি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এটিতে রয়েছে তাঁর জীবনের ছোট বড় ঘটনা এবং তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাহিনি। এই আত্মজীবনীতে রয়েছে তাঁর বাল্যজীবন, স্কুল কলেজ, বি্ববিদ্যালয়, কর্মজীবন থেকে সাংসারিক জীবন পর্যন্ত। তাঁর পিতা-মাতা, ভাই-বোনদের কথাও রয়েছে এটিতে।

নি(পমা বরগোহাত্রি(তাঁর জীবন জোড়া সাহিত্য সাধনার জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর পুরস্কার পাওয়ার পরম্পরা শু(হয়েছে ১৯৮৭ সন থেকে। ‘অন্যজীবন’ উপন্যাসটির জন্য

তিনি ১৯৮৭ সনে (ৰা(ৰতী পুরস্কার পান। অসম সাহিত্য সভা থেকে ১৯৮৯-৯০ সনে 'অন্যজীবন' রচনার জন্য পান 'বাসন্তী দেবী বরদলৈ' পুরস্কার। চন্দ্রপ্রভা শইকিয়ানীর জীবনীর উপর রচিত 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের জন্য ১৯৯৪ সনে হেমব(য়া পুরস্কার পান অসম সাহিত্য একাডেমি থেকে। ১৯৯৬ সনে অভিযাত্রীর জন্য পান 'সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার'। ২০০০ সনে পান 'প্রবীণা শইকীয়া' পুরস্কার এবং অসম রাজ্যিক দলিত সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার। ২০০৩ সনে পান 'অদ্বৈত মল্লবর্মন' স্মৃতি পুরস্কার।

ভ্রমণপ্রেমী নি(পমা বিদ্যার্থী জীবন থেকেই বহু স্থান ভ্রমণ করেছেন। তিনি অ(ণাচল প্রদেশ থেকে শু(করে ভারতের অনেক পাহাড়েই গেছেন। তিনি ভারতের এবং বিদেশের বহু ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করেছেন। তিনি ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক স্থান বিশেষ করে যেখানে শেক্সপিয়রের স্মৃতি রয়েছে সেখানে গেছেন। তিনি শুধু ভ্রমণই করেননি অনেক ভ্রমণমূলক রচনাও লিখেছেন। তাঁর এই গোত্রের কিছু রচনা হল 'গানর নিসিনা দিন', 'এই দ্বীপ এই নিরবাসন' ইত্যাদি গল্প। 'জীবনর বাটে ঘাটে', 'এটি দুটি কথা', 'নানা রংগী জীৱনর স্বপ্ন স্মৃতি বিষাদ', এই রচনাগুলিও ভ্রমণ অভিজ্ঞতার ফসল। প্রথমটি উপন্যাস, অন্য দুটি মূলত ধারাবাহিক ভ্রমণ বিষয়ক কলাম বা ফিচার।

প্রতিবাদী, প্রকৃতিপ্রেমী, সাহসী নারীবাদী লেখিকা নি(পমা নিজের জীবনের নানা সমস্যা এবং উত্থান পতনের মধ্য দিয়েও নির্ভীকভাবে সমস্ত সমস্যাকে অতিত্র(ম করে (ুরধার লেখার মধ্য দিয়ে সমাজের দোষ ত্রুটিকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। অনেক সময় নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদীতার জন্য তাঁকে নিজের জীবনেও অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। এমনকি স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদও ঘটেছে। অসম আন্দোলনের ত্রু(র রূপকে তুলে ধরার জন্য সাপ্তাহিক নীলাচলের কাজও তাঁর হাতছাড়া হয়েছে। লড়তে লড়তে তিনি এগিয়ে গেছেন, কষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু ভেঙে পড়েন নি। ১৯৯০ সনের যোরহাট লেখিকা সংস্থার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের স্মরণিকা থেকে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করে তাঁর সৃজন কর্মের সাফল্যের ইশারা করা যেতে পারে —

''অসমীয়া সাহিত্য জগতর নতুন দৃষ্টিভংগীর এক নতুন অধ্যায়র সূচনা করা এক নির্ভীক লেখিকা আপুনি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষালৈ অনুদিত আপনার গল্প-উপন্যাসর যোগেদি সর্বভারতীয় সন্মান আপনি অর্জন করিছে। . . . . . ।

আত্মপ্রত্যয়র কঠিন বর্মরে আবৃতা হে নির্ভীক লেখিকা! সময়ে সময়ে সত্য প্রতিষ্ঠার প্রতি থকা আপোনার একান্ত অনুরাগে ঐতিহাসিক রূপ লয়। বাস্তব সত্যর ভয়ংকর রূপ প্রত্য(করি তাক অভিনন্দিত করিবলৈ গৈ আপুনি বাজী রাখিব পারে জীবন আরু জীবিকার সমস্ত নিরাপত্তা, মধ্যবিত্ত মানসিকতার অমোঘ জটাজাল ফালি এনেকৈ ওলাই আহার ফলতে আপনি প্রকৃতার্থত নিরুপমা।

আপোনার তী(ু ধার মেধা, দুঃসাহসী লিখনীয়ে অজস্র বাধা-বিঘিনি নেওচি নারিত্বর পরা মানবতালৈ উত্তরণর পথত অসমর তরুণী সকলক দিক্‌দর্শন করাওক।''[২৪]

আশাপূর্ণা ও নি(পমা দুজনেই আপন আপন সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে বাংলা ও অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছেন। দুইজন লেখিকারই সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত নিতান্ত কিশোরী বয়সে। আশাপূর্ণা লিখে গেছেন আমৃত্যু, নি(পমা বর্তমানে, ৮২ বছর বয়সেও সৃজনশীল। আশাপূর্ণা প্রাতিষ্ঠানিক শি(ার সুযোগ পান নি, র(ণশীল পরিবারে বড়ো হয়েছেন। ২৭ বছর পর জন্ম হওয়া নি(পমা বেড়ে উঠেছেন প্রগতিশীল এক পারিবারিক প্রতিবেশে। উচ্চশি(া গ্রহণ করে, তিনি দস্তুরমতো এলিট হয়ে উঠেছেন। আশাপূর্ণা যেখানে লিখেছেন মূলত অন্দরের কথা, নি(পমা সেখানে ব্যষ্টি ও সমষ্টি, অন্দর ও বহির্মহলের বাস্তবকে চমৎকার গ্রন্থনায় উপস্থাপন করেছেন। আশাপূর্ণার প্রগতিচিন্তায় কোথাও রয়েছে আরোপিত নারীত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে খানিকটা সমর্থনসূচক ধারণা, নি(পমার প্রগতিচিন্তায় রয়েছে স্পষ্ট মতাদর্শগত স্থিতি। তবু, এই দুই কথাশিল্পীর রচনার সংলাপ গড়ে উঠতে পারে। কেননা, নারী-পু(ষ সম্পর্কে প্র(, নারীর সামাজিক অবস্থান ইত্যাদিকে ঘিরে দুজনেরই কথনবি(বিচিত্র প্র(তুলেছে। এই ধারণা থেকেই, দুই ভাষার নন্দিত দুই কথাশিল্পীর নির্বাচিত রচনার তুলনামূলক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েছি আমরা।

তথ্যসূত্র :—

১. দেবী, আশাপূর্ণা : 'আর এক আশাপূর্ণা' ; খেলা থেকে লেখা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১, পৃ. ৪

২. গুপ্ত, নূপুর : 'আশাপূর্ণা দেবী একটি স্মরণীয় জীবন' ; আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী প্রথম খণ্ড, গুপ্ত সুশান্তকুমার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ৮ই জানুয়ারি ২০০০, উদ্ধৃত পৃ. (iii)

৩. দেবী, আশাপূর্ণা : 'আর এক আশাপূর্ণা' ; আমার ছেলেবেলা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৪. তদেব : 'খেলা থেকে লেখা', পৃ. ৩

৫. তদেব : 'আমার ছেলেবেলা', পৃ. ৪৪

৬. তদেব : 'খেলা থেকে লেখা', পৃ.

৭. গুপ্ত, নূপুর : 'আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী প্রথম খণ্ড', প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. (iii)

৮. বসু, নিতাই : 'আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড', গুপ্ত, সুশান্তকুমার, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০১, উদ্ধৃত, ভূমিকা

৯. তদেব : উদ্ধৃত, পৃ. x

১০. গুপ্ত, নূপুর : 'আশাপূর্ণা দেবী একটি স্মরণীয় জীবন' ; আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড, গুপ্ত সুশান্তকুমার, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ৮ই জানুয়ারি ২০০০, উদ্ধৃত, পৃ. ২

১১. দূর্বা, দেব : 'সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র', পাল কস্তুরী (স), শতবর্ষে আশাপূর্ণা; বরাক নন্দিনী প্রকাশনী ২৯শে মে ২০০৮, উদ্ধৃত, পৃ. ১৭

১২. বড়ুয়া, অনন্যা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণী পাঠ', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০৬, উদ্ধৃত, পৃ. ৩০

১৩. গুপ্ত, নূপুর : 'আশাপূর্ণা দেবী একটি স্মরণীয় জীবন' ; আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী প্রথম খণ্ড, গুপ্ত সুশান্তকুমার, প্রাগুক্ত, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ৮ই জানুয়ারি ২০০০, উদ্ধৃত, পৃ. (iii)

১৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'আমার সাহিত্যচর্চা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১৫. তদেব : পৃ. ২১

১৬. তদেব : 'সাহিত্যে অবিনশ্বরতা', পৃ. ৮২

১৭. তদেব : পৃ. ৮২

১৮. গুপ্ত, নূপুর : 'আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী প্রথম খণ্ড', গুপ্ত সুশান্তকুমার, আশাপূর্ণা দেবী একটি স্মরণীয় জীবন ; প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. xii

১৯. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'বিশ্বাস আরু সংশয়র মাজেদি', জ্যোতি প্রকাশন, যশোবন্ত রোড, পানবাজার গুয়াহাটী-৭৮১০০১, তৃতীয় প্রকাশ মে ২০০০, পৃ. ৮

২০. তদেব : পৃ. ৮৭

২১. তদেব : পৃ. ৬২

২২. তদেব : পৃ. ৭০

২৩. তদেব : পৃ. ৩৪

২৪. স্মরণিকা থেকে উদ্ধৃত, তদেব, পৃ. ২৭৭

চতুর্থ অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির নির্বাচিত উপন্যাসে বিম্বিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবন

চতুর্থ অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির নির্বাচিত উপন্যাসে বিম্বিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবন

সাহিত্যিকের কাজ অভিজ্ঞতা-অনুভবের রসাত্মক প্রকাশ। ব্যক্তির অনুভব-অভিজ্ঞতার জগৎ গড়ে ওঠে দেশ কালের সঙ্গে নিরন্তর সংলাপে। সাহিত্যিক তাঁর সঞ্চয়ী অভিজ্ঞতায় সাহিত্যে, বিশেষত, আখ্যানজাতীয় রচনায় ফুটিয়ে তুলেন সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। উপন্যাসে ফুটে ওঠে সামাজিক মানুষের নানা সমস্যা, শোনা যায় তাদের কলধ্বনি। সমালোচকের ভাষায় — "উপন্যাসে পাই সমাজ মধ্যগত মানুষের জীবন যাপনের একটা যথাসম্ভব বাস্তব চেহারা। একলা মানুষ নয়, নিঃসঙ্গ মানুষ নয়, উপন্যাসে পাই ঘরোয়া মানুষকে, পারিবারিক মানুষকে, সামাজিক মানুষকে — নানা দিকের সম্পর্কজালের মধ্য দিয়ে গড়ে-ওঠা জীবনের বহু বিচিত্র রূপের সমগ্রতাকে। মানুষ যখন একই সঙ্গে আত্মসচেতন এবং সমাজ সচেতন, নিজের ব্যক্তিসত্তা এবং নিজের বাস্তব পরিবেশ একই সঙ্গে যখন মানুষকে উত্তেজিত করে, তখনই আসে উপন্যাসের কাল।"[১]

সমাজ জীবনের বাস্তবতা উপন্যাসের অন্যতম আধেয়। উপন্যাস যে মানুষকে ধরে, সে দেশকালীন বাস্তবের সঙ্গে সংযুক্ত, ক্রনোটপ এর পটে ধৃত মানুষকে। মানুষ ব্যক্তিগত হয়েও, সামাজিক; অনেকগুলি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার স্বাভাবিক সম্পর্ক। প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিবার, সমাজবিশ্ব, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্মসংঘ ইত্যাদি নানা নামে চিহ্নায়িত করা যেতে পারে। এই দ্বিবাচনিক সম্পর্ককে কথাবয়নে তুলে ধরতে গেলে একজন সাহিত্যিকের পক্ষে সবচেয়ে দরকারি যা, তা হল প্রভূত অভিজ্ঞতা। তন্নিষ্ঠ বা objective দেখার চোখ, আবার এর ভেতর থেকে সামাজিক বাস্তবের নানা স্তর ও স্বরকে বোঝবার ক্ষমতা কথাসাহিত্যিকদের এক আবশ্যিক অর্জন হিসাবে বিবেচিত হয়। সমাজ পরিবার কিংবা রাষ্ট্রের আপাত নিস্তরঙ্গ প্রবাহের অন্তরে যেসব নানামাত্রিক দ্বন্দ্ব রয়েছে, সে সম্পর্কে বিষয়নিষ্ঠ ধারণা না থাকলে, বিষয়ীর যাকে বহমান বাস্তবের পলিফোনিকে উপন্যাসে ধারণ করা অসম্ভব। আমাদের নির্বাচিত দুই কথাকারের সৃজনীপ্রতিভার ছিল সে শোষণশক্তি। ফলত নারীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা গৃহজীবন বা পারিবারিক জীবন এবং সেই সূত্রে সামাজিক জীবনের বাস্তব, স্ব স্ব সমাজের সমকালীন প্রেক্ষিতে, দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলেছেন দুজনেই, নিজেদের কথাবয়নে। বিশ শতকের লেখিকা হিসেবে দুজন সাহিত্যিকই দেখেছেন দুটি বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, অর্থনৈতিক মন্দা ও তার পরবর্তী অর্থ-সামাজিক কাঠামোর ভাঙন, বিশ্বাসের অপমৃত্যু এবং সেগুলির প্রতি থাকা উদাসীন নিরাসক্তিকে। এসবেরই কম বেশি প্রতিফলন ঘটেছে দুই লেখিকার উপন্যাসবিশ্বে। তাঁদের ভাষিক ও ভৌগোলিক পরিসর স্বতন্ত্র হলেও আশাপূর্ণা দেবী ও

নিরুপমা বরগোহাঞিঞর সামাজিক পরিসর কমবেশি পরিমাণে একই। বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের রূপান্তরশীল সামাজিক পারিবারিক জীবনের বাস্তবতা বঙ্গীয় এবং অসমীয়া সমাজের প্রেক্ষিতে অনেকটা একই রকমের। তবে দুই লেখিকা একই সময়ের তলে দাঁড়িয়ে গল্প ও উপন্যাস রচনা করলেও উভয়ের অভিজ্ঞতার জগৎ একেবারে স্বতন্ত্র। অভিজ্ঞতার জগৎ স্বতন্ত্র থাকার দরুন একই সময়ের দুই লেখিকার রচনায় ফুটে ওঠা সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রতিবেদনে সাদৃশ্য যেমন রয়েছে তেমনি বহু বৈসাদৃশ্যও আমাদের চোখে ধরা পড়ে। তাছাড়া দুই লেখিকার রচনা কৌশলের ভিন্নতাও তাঁদেরকে স্বতন্ত্রতা দান করেছে।

আশাপূর্ণা ও নিরুপমা দুজনেই নাগরিক পরিবেশে বড় হলেও আশাপূর্ণা নিরুপমার মতো উচ্চশিক্ষালাভের ও বাইরের জগৎকে কাছ থেকে জানার তেমন সুযোগ পাননি। তাই আশাপূর্ণার রচনায় যে সমাজকে আমরা দেখতে পাই সেটি হল পরিবারের চার দেয়ালের গণ্ডির মধ্য থেকে দেখা সমাজের রূপ। নিরুপমা সমাজের বাহ্যিক রূপকে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার দরুন তাঁর রচনায় সমাজের একটি সামগ্রিক ছবি ফুটে উঠেছে। শিক্ষা ও কর্মসূত্রে নিরুপমা অসমকে যতখানি জেনেছেন, বুঝেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন রক্ষণশীল পরিবারের গৃহবধূ আশাপূর্ণার কাছে গ্রাম বাংলাকে জানার ও বোঝার ততখানি সুযোগ হয়ে ওঠেনি। তাই আশাপূর্ণার লিখনবিশ্বে গ্রাম বাংলার বিস্তৃত বর্ণনা আমরা পাই না, তাঁর রচনায় নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের পারিবারিক ছবিই বেশি ফুটে উঠেছে। অপরদিকে নিরুপমার রচনায় নাগরিক সমাজের পাশাপাশি গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতাও ফুটে উঠেছে। আশাপূর্ণার তিনটি উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা'র সঙ্গে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে রচিত নিরুপমার 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', 'অন্যজীবন' এবং 'অভিযাত্রী' এই উপন্যাসগুলিতে বিম্বিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের পরিচয় তুলে ধরার সবিনয় প্রয়াস রইল এই অধ্যায়ে।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে বিম্বিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবন :

আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসের সময়সীমা ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দীর্ঘ একশ বছর ব্যাপী সময়ের পটভূমিতে রচিত ত্রয়ী উপন্যাসে লেখিকা সমাজের গতিময় বিবর্তনশীল রূপকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, আর তারই সঙ্গে তুলে ধরেছেন সমাজে নারীর বিবর্তিত সত্তাকে। আশাপূর্ণা পুরোনোকে আঁকড়ে ধরে থাকার পক্ষপাতী নন, তাই তাঁর উপন্যাসের নতুন সময়ের ব্যাকুল আহ্বান লক্ষ করা যায়। পরিবর্তনের আশায়ই আশাপূর্ণা ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে রচিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে সত্যবতীর মত ব্যতিক্রমী চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন।

সময়ের ঘড়ি যত এগিয়ে চলে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে সমাজেও আসে বহু পরিবর্তন। বহমান সময়ের সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে সমাজে চলে বহু ভাঙাগড়া। আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী ও স্বাধীনতা পরবর্তী কালের রূপান্তরপ্রবণ সমাজের এক বিপুল

আলেখ্য আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ছবি উপন্যাসে তুলতে গিয়ে আশাপূর্ণা দেবী এই শ্রেণির মানসিক টানাপোড়েনের ছবিও তুলে ধরেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর চোখের সামনে সমাজের পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং ইতিহাসের পাতায় বেঁধে রাখতে গিয়ে সৃষ্টি করেছেন ত্রয়ী উপন্যাস। সমাজের বহির্জগতে পরিবর্তনে অন্তঃপুরেও আসে বহু পরিবর্তন ভাঙা গড়া। তবে ইতিহাস এই পরিবর্তনে সর্বদা উদাসীন। এই বহির্জগতের পরিবর্তনে অন্তঃপুরে কী ধরনের আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তারই প্রকাশ ঘটেছে আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসে। তাইতো 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র ভূমিকায় আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন — "বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনি নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা, উন্মাদনা, রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের, যুগের, সমাজ মানুষের মানসিকতায়। চোখ ফেললে দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলাদেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।"[২] নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরের অবহেলিত মেয়েদের অন্তঃপুর থেকে বহির্বিশ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রাই ত্রয়ী উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীনতার পূর্ব থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং উত্তর স্বাধীনতা পর্ব পর্যন্ত সময়ের এক ধরনের দলিলিকরণ লক্ষ করি আশাপূর্ণার লিখনবিশ্বে বিশেষত তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসে। যেখানে রয়েছে আভিজাত্যহীন ক্ষয়িষ্ণু যৌথ পরিবারের ভাঙনের চিত্র, ব্যক্তিসত্তার মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং অন্তঃপুরের নারী মনোস্তত্ত্বের আন্তরিক চিত্র। বিশ শতকের লেখিকা হয়েও তিনি উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমি। তাঁকে পীড়িত করত, তাঁর মনে প্রশ্ন আসত মেয়েদের অধিকারহীনতা নিয়ে। এই বিষয়টিকে তিনি সামাজিক ইতিহাসের পটে স্থাপন করেছেন। এই প্রশ্নই তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে সত্যবতী, সুবর্ণর মত প্রতিবাদী নায়িকা সৃষ্টির। উনিশ শতাব্দীর পটভূমিতেও তিনি নিয়ে এসেছেন সত্যবতীর মত ব্যতিক্রমী নারী। নারী স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষী লেখিকা সত্যর মধ্য দিয়ে বৃহৎ সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন। যথার্থই বলেছেন একজন সমালোচক — "বাংলার সমাজ ও সংসারের অন্তঃপুরে গত শতবর্ষে যে অভাবনীয় ও অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে — বহু অসমসাহসিক বীরাঙ্গনার বুকের রক্তেই তা ঘটতে পেরেছে; তারা নিজেরা জ্বলে আলোকিত করে দিয়ে গেছে জীবনের প্রশস্ত রাজপথ, আত্মবলির মূল্যে খুলে দিয়ে গেছে মহৎ সম্ভাবনার সিংহদ্বার। লেখিকার আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি বাংলা কথাসাহিত্য ক্ষেত্রে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র আবির্ভাবও একটি স্মরণীয় ঘটনা।"[৩]

আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসে নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থাই বেশি গুরুত্ব পেলেও 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে সত্যর বাপের বাড়ি নিত্যানন্দপুর ও শ্বশুরবাড়ি বারুইপুর এই দুটি গ্রামের বর্ণনা রয়েছে। পিতৃগৃহের গ্রাম্যজীবন বর্ণনা করতে গিয়ে সেকালের গ্রামের জীবনের আচার, রীতিনীতি,

জীবনচর্যা, বিশ্বাস, সংস্কারের ছবি ফুটে উঠেছে। অপরপক্ষে, 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে শুধু শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজের ছবি। অন্তঃপুরের বন্দিত্বকে যেভাবে অনুভব করেছেন তেমনি বন্ধন ভেদ করে রাজপথে আসার আকাঙ্ক্ষাকেও অনুভব করেছেন আশাপূর্ণা। গ্রাম ও শহরের পটভূমিতে বন্দিত্ব ও বন্ধনমোচনের অভিযানই ফুটে উঠেছে ত্রয়ী উপন্যাসে। তারই সঙ্গে ফুটে উঠেছে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন, সামাজিক জীবনে থাকা বিভিন্ন প্রথা, সংস্কার, কুসংস্কার, আচার, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির পরিবর্তন ও অবক্ষয়কেও তুলে ধরেছেন লেখিকা। তিনটি উপন্যাসে ফুটে উঠেছে বঙ্গের সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিক রূপ।

ইংরাজ শাসন, ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্তন, ইংরাজি শিক্ষার ফলে উনিশ শতকে বাংলার সমাজ জীবনে যে নবজাগরণ দেখা দেয় সেই নবজাগরণের বার্তা বহু রক্ষণশীল পরিবার গ্রহণ করতে পারছিল না। তাইতো বিশ শতকের পটভূমিকায়ও আমরা 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে মুক্তকেশীর রক্ষণশীল পরিবারকে পাই। পুরোনো মূল্যবোধকে ক্ষয়িত হতে দেখে, নিজেদের অস্তিত্বের সংকটকে দেখে পুরোনোকে মূল্যবোধকে আরও বেশি করে আঁকড়ে থাকার প্রয়াস করে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন মানুষ। নতুনের আগমন ও পুরোনোকে ধরে রাখার প্রয়াস দুটিই লেখিকা দেখিয়েছেন — মুক্তকেশীর বক্তব্যে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে — "সে বুড়ীর ক্ষ্যামতা নেই তাই চড়ে। পালকি আর আছেই বা কই? দেখতেই তো পাই না। যাবে আস্তে আস্তে সবই উঠে যাবে। পালকি যাবে, আব্রু যাবে, গুরুজনে ভক্তিছেদ্দা যাবে, ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যি সবই যাবে। স্বদেশীর হুজগে দেশ ছারেখারে যাবে পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ..... সাহেবের রাজ্যিপাট, তোরা যাচ্ছিস তাদের উৎখাত করতে। বলি ওদের উচ্ছেদ করে করবি কি! রাজ্যি চালাবি? হুঁ! সুখের পৃথিবীতে ইচ্ছে করে আগুন জ্বালা!"[৪] পালকির প্রচলন হ্রাস, স্বদেশি হুজুগ এবং স্বাধীনতার পরবর্তী সমাজ বিবর্তন ইত্যাদি পরিবর্তনের আভাসের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তকেশীর মনোভাবে রক্ষণশীলতার আভাস আমাদের সামনে ফুটে ওঠে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে জমিদারি ব্যবস্থা, ব্রিটিশ শাসন, ব্রাহ্মসমাজ, স্ত্রী শিক্ষার প্রচার, বিধবা বিবাহ প্রচলন, বাল্যবিবাহ রোধ ইত্যাদি সংস্কারমূলক বহু ধ্যান ধারণার আভাস এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের তেমন ব্যাপকতা না থাকায় সময়টি ব্রিটিশ রাজত্বকাল অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ বলে আভাসিত হয়। তাছাড়া সন তারিখের উল্লেখ না থাকলেও রামমোহন গত হলেও বিদ্যাসাগরের বেঁচে থাকার কথা, বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা (১৮৪৯), কেশবচন্দ্রের ঘরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের আগমন, সাহেব স্কুলে সুহাসের পড়তে যাওয়া, পিরালি বাড়ির বউ-এর বিদেশ যাওয়া, ভবতোষ মাস্টারের ব্রাহ্ম হওয়া ইত্যাদির উল্লেখ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র ঘটনাপ্রবাহকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সামাজিক ইতিহাসের চিহ্নায়ক করে তুলেছে। উনিশ শতকের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের যৌথ পরিবারের গৃহবধূ হলেও সত্যবতীর মধ্যে ব্যতিক্রমী ও বিদ্রোহী সত্তা প্রকাশ পায়। কারণ সত্যবতীর চোখের সামনে ছিলেন আদর্শস্বরূপ সেকালের সমাজ সংস্কারক মহাপুরুষগণ ও দেশ

স্বাধীন করার কাজে ব্রতী দেশপ্রেমিকরা। সত্যবতীর ধারাকে বহন করেছে সত্যবতীর মেয়ে, ‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসের সুবর্ণলতা। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’তে সত্যবতীর জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে বাংলার গ্রাম্য জীবন ও কলকাতার নাগরিক জীবনের ছবি আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে।

‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাস সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন — “আমার ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। সে যোগসূত্র কাহিনীর প্রয়োজনে নয়, একটি ভাবকে পরবর্তীকালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে।”[৫] সত্যবতী অচলায়তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। অচলায়তনকে ভাঙার জন্য আঘাত হেনেছে আর তারই মেয়ে সুবর্ণলতা অচলায়তন পিতৃতান্ত্রিক সমাজ পরিস্থিতিতে থেকে আমরণ সংগ্রাম করেছে পরিস্থিতির সঙ্গে, নিজের হৃদয়ে সঞ্চিত অগ্নিশিখা দিয়ে। সুবর্ণলতার কাল সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন — “সুবর্ণলতা হচ্ছে সেই যুগের, যে যুগকে আমার শৈশব বাল্যে প্রত্যক্ষ করেছি। দেখেছি শহর-জীবনের চারখানা দেওয়ালের মধ্যে মেয়েদের কী অসহায়তা। কী অবমাননার মধ্যে তাদের সুখের শয়ন পাতা।”[৬] সুবর্ণলতা আশাপূর্ণার শৈশবকালের সমাজ বলে লেখিকার নিজের উল্লেখ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রবল আলোড়ন, সুবর্ণলতার স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থনে বিদেশি বস্ত্র বর্জন ও দাহ, চরকায় সূতাকাটা ইত্যাদি ঘটনা স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কালীন প্রেক্ষাপট ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সময়সীমার পরিসরই আভাসিত করে। উনিশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলনের ফলে নতুন মূল্যবোধের সূচনা হলেও বহু রক্ষণশীল পরিবারে নবজাগরণের আলো প্রবেশ করে নি। সুবর্ণলতার মধ্যে উনিশ শতকের সেই নবজাগরণের ছোঁয়া লাগায় সুবর্ণলতা সেই রক্ষণশীল মানসিকতাকে আঘাত হেনে সংস্কারবিহীন মুক্তকেশীর রক্ষণশীল পরিবারে ভব্যতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুক্ত প্রবাহ আনার চেষ্টা করেছে। তাইতো সুবর্ণলতার কাল সম্পর্কে লেখিকা ‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসের ভূমিকায় জানিয়েছেন — “সুবর্ণলতা একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। ‘সুবর্ণলতা’ সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।”[৭] সুবর্ণলতার মধ্যে লেখিকা বিবর্তনশীল সময়ের রেখাচিত্র আঁকার প্রয়াস করেছেন। সুবর্ণলতার পরবর্তী খণ্ড ‘বকুলকথা’ যেখানে সত্যবতী ও সুবর্ণলতার সংগ্রাম সার্থকতা লাভ করেছে। ‘বকুলকথা’ উপন্যাসে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক সমাজের ছবিই তুলে ধরেছেন কথাকার। প্রথম প্রতিশ্রুতি ও সুবর্ণর সেকাল পেরিয়ে বকুলকথার সমাজ একালে অর্থাৎ বর্তমানের আধুনিক কালে এসে পৌঁছেছে। এক অস্থির আধুনিক সমাজকে দেখা যায় ‘বকুলকথা’য়। সত্যবতী ও সুবর্ণর মুক্তির আশা বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে।

‘বকুলকথা’ উপন্যাসে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বঙ্গদেশের আধুনিক সমাজ জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। যেখানে বহু কষ্টের, সংগ্রামের, বলিদানের মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত মুক্তিকে পেয়ে গেছে বকুল ও শম্পারা। বহু কাঙ্ক্ষিত মুক্তিকে অনায়াসে পেয়ে আবার আজকের বহু নারী স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করে চলেছে। আশাপূর্ণা দেবী স্বাধীনতার পক্ষপাতী কিন্তু স্বাধীনতার নামে

স্বেচ্ছাচারিতাকে তিনি সমর্থন করেন না। তাই 'বকুলকথা' উপন্যাসে আশাপূর্ণা দেবী শম্পাকে অনামিকা দেবীর মুখ দিয়ে আধুনিকতার পরিভাষা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন — "আধুনিকতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা এক বস্তু নয়।"[৮] 'বকুলকথা' উপন্যাসে লেখিকা বকুলের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলেছেন — "বকুলকথায় বকুলের ভূমিকা নায়িকার নয় দর্শকের। সে তার ঘরোয়া লেখিকা জীবনের মধ্যে আজকের সমাজকে যতটুকু দেখতে পেরেছে, যতটুকু ধরতে পেরেছে তারই কথা।"[৯] অনামিকা দেবী দর্শকের ভূমিকায় থেকে আধুনিক সমাজকে দেখেছেন এবং অস্থির সমাজকে নিয়ে চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। সত্য ও সুবর্ণলতার আকাঙ্ক্ষা ফলবতী হয়েছে বকুলের লেখিকা অনামিকা দেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। অনামিকা দেবী নতুন সমাজে মা ও দিদিমার সাধনার প্রাপ্তি 'মুক্তি'র মুমূর্ষু অবস্থা দেখে আহত হয়েছেন। আশাপূর্ণা দেবী স্বাধীনতার পরিভাষা খুঁজেই রচনা করেছেন 'বকুলকথা' — "কিন্তু বকুল তথা অনামিকা কি তার সমাজের নতুন রূপে মা ও দিদিমার সাধনার সাফল্য দেখতে পাচ্ছে? না দেখছে শেকল-ছেঁড়ার এক ভয়াবহ উন্মাদনার নারী-প্রগতির নামে চলছে স্বেচ্ছাচার। এই জিজ্ঞাসাই বকুল বা অনামিকা দেবীকে বারে বারেই উন্মনা করে তুলেছে। আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতী ট্রিলজির এই শেষ খণ্ডে এই প্রশ্নই বড় হয়ে উঠেছে — স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচার এই দুইটির সীমারেখা কোথায়? সে সীমারেখার অন্বেষাই বকুলকথা উপন্যাসের মূল উপজীব্য।"[১০] আধুনিক সমাজের অস্থিরতা ও আয়িত্বও আশাপূর্ণা দেবীর কাছে সংশয়ের রূপ ধারণ করেছে। "কিন্তু আজকের এই নিয়ত অস্থির সমাজকে কি দেখতে পাওয়া যায়? ধরতে পারা যায়?"[১১] তাই তিনি উপন্যাসে বকুলের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন — "রোজ রোজ যে নতুন নতুন ঘটনা ঘটছে তার হিসেব রাখতে পারছি না, মুহূর্তগুলোকে ধরে ফেলতে পারছি না, হারিয়ে যাচ্ছে, অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে তারা।"[১২] অনামিকা দেবী ওরফে বকুল মুহূর্তগুলোকে অনেক চেষ্টা করেও ধরতে পারছেন না, "চেষ্টা করছি হচ্ছে না। ওই মুহূর্তগুলো তো স্থায়ী কিছু দিয়ে যাচ্ছে না, ওরা শুধু সাবানের ফেনার মতন রঙিন বুদ্বুদ কেটে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।"[১৩] এভাবেই লেখিকা আধুনিক সমাজের দ্রুত পরিবর্তনকে আমাদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন।

পরিবার ব্যবস্থা

উনিশ শতকের সমাজ বাংলার পারিবারিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল যৌথ পরিবার ব্যবস্থা। উনিশ শতকের পটভূমিতে রচিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে আমরা যৌথ পরিবারের স্পষ্ট ধারণা পাই। উপন্যাসে পরিবারগুলির মধ্যে রয়েছে রামকালী চাটুয্যের পরিবার, নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের পরিবার, ভুবনেশ্বরীর বাপের বাড়ির পরিবার ইত্যাদি। এই পরিবারগুলির মধ্য দিয়ে লেখিকা বাংলার পারিবারিক জীবনের নানা ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মধ্যযুগীয় যৌথ পরিবারের ছবি ফুটে উঠেছে আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে। বিশাল একান্নবর্তী পরিবারসমূহ অন্দরমহল ও বহির্মহলে বিভক্ত থাকত। এই একান্নবর্তী পরিবারসমূহে বয়স্ক গৃহকর্ত্রীদের বিশেষ দাপট দেখা যেত। এমনকি অন্তঃপুরের ছোট বড় সমস্ত মহিলাকুল পরিচালিত হত তাদের কঠোর

নিয়মের শাসনে। এইসব গৃহিণীরা এক নির্মম নিষ্ঠুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে অন্তঃপুরের অল্পবয়সী মেয়েদের, বউদের এবং অল্পবয়সী বিধবাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে আপন কর্তৃত্ব খাটাতেন। তারা কাজ করতেন পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক হিসেবে। হয়তো অল্পবয়সে নিজেরাও একইভাবে অত্যাচারিত হয়েছিলেন এবং বর্তমানে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছেন অধস্তনের উপর অত্যাচার করে, এসবের মধ্যেই হয়তো তারা একপ্রকার খুঁজে নিতে চাইছেন মানসিক তৃপ্তি। কৃষিভিত্তিক ব্যবস্থার পতন ও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব ধীরে ধীরে এই সমস্ত যৌথ পরিবারের ভাঙন অনিবার্য করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারের জন্ম দিয়েছে। ত্রয়ী উপন্যাসেও ক্রমশ যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের সৃষ্টি হতেও দেখা যায়।

উনিশ শতাব্দীতে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি বর্তমান থাকায় যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই সকল যৌথ পরিবারসমূহ একজন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও নেতৃত্বে পরিচালিত হত। পরিবার সমূহে সদস্য সংখ্যা থাকত প্রচুর। মা, ভাই, বোন, সন্তান সন্ততি ছাড়াও কিছু কিছু পরিবারে নিকট ও দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়কেও আশ্রয় নিতে দেখা যেত, যা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র রামকালীর পরিবারেও দেখা গেছে। এই পরিবারটি অন্দর ও বহির্মহলে বিভক্ত ছিল। মহিলারা ছিল অন্দরমহলের বাসিন্দা, বহির্মহলে অবাধ বিচরণের তাদের কোনো অধিকার ছিল না। তবে বয়স্ক গৃহিণীদের এক্ষেত্রে কিছু স্বাধীনতা ছিল। আবার বহির্মহলের বাসিন্দা ছিল পুরুষেরা এবং অন্দরমহলে বিভিন্ন সম্পর্কের নারীরা থাকার জন্য তাদের অন্দরমহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। এই পরিবারসমূহে মতবিরোধ থাকলেও পরিবারসমূহে একজন প্রধান ব্যক্তির কর্তৃত্ব থাকায় সেগুলি পরিবারের ভাঙন আনতে সমর্থ হয়ে উঠতে পারে নি, যা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তেও লক্ষিত হয়েছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা সত্যবতীকেও একটি যৌথ পরিবার থেকে ওঠে আসতে দেখা গেছে। রামকালীর একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা রামকালী। রামকালীর মা দীনতারিণী, রামকালীর পরিবার এবং দাদা কুঞ্জবিহারীর পরিবার ছাড়াও বহু-আশ্রিতের স্থান মিলেছিল পরিবারটিতে। মোক্ষদা, শিবজয়া, শশীতারা, নন্দরাণী, কাশীশ্বরী, শংকরী ইত্যাদি বিভিন্ন আত্মীয়ের দ্বারা রামকালীর পরিবারটি জমজমাট ছিল। এই যৌথপরিবারটির কর্তা রামকালী হলেও স্ত্রী ভুবনেশ্বরী কিন্তু কর্তৃত্ব পান নি। অবশ্য ভুবনেশ্বরী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে যৌথ পরিবারের রক্ষণশীলতায় বিশ্বাসী কর্ত্রীস্থানীয় মহিলাদের আচার নীতি এবং কঠোর অনুশাসনের মধ্যে থাকা পরাধীন গৃহবধূর ছবি ফুটে উঠেছে। সংসারের কর্তৃত্ব ছিল গৃহিণী যেমন দীনতারিণী, সেজজা শিবজয়া, দীনতারিণীর দুই ননদ কাশীশ্বরী ও মোক্ষদার উপর এবং তাদের কঠোর নিয়মের তত্ত্বাবধানে পরিবারটি পরিচালিত হয়েছে। ফলে অন্তঃপুরে চলত দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের পালা। এই সমস্ত যৌথ পরিবারে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কের উপরও কঠোর বাধা নিষেধ আরোপিত হত। স্বামী স্ত্রীর দিনের বেলা মিলনে আপত্তি ছিল। রাত্রিতে গুরুস্থানীয় সবার ঘুমানোর পর স্বামী স্ত্রীর সাক্ষাৎ সম্ভব ছিল। এই সমস্ত যৌথ পরিবারে গৃহবধূদের স্বামী, ভাসুর ও দেবরদের মেনে চলতে হত। রামকালীর যৌথ পরিবারে রামকালীর দাদা কুঞ্জ চরিত্রটি ব্যক্তিত্বহীন অলস জীবন কাটানো পুরুষের প্রতিনিধি স্বরূপ এবং

কুঞ্জবিহারীর পত্নী অভয়াকে অলস স্বামীর হওয়ার জন্য বয়স ও মানে বড় হয়েও পরাধীন জীবন কাটাতে হয়েছে। এই যৌথ পরিবারসমূহে বিধবাদের সমস্যা এবং মোক্ষদার মত আশ্রিতের সমস্যাকেও তুলে ধরা হয়েছে উপন্যাসে। এই সমস্ত যৌথ পরিবারে সমস্ত উৎসব, পূজাপার্বণ, বিয়ে আচার অনুষ্ঠানে সবার সামগ্রিক অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করতে দেখা গেছে। রামকালীর পরিবারেও দেখা গেছে দুর্গোৎসবের সময় সব মহিলাদের একসঙ্গে মিলে বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করতে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে শক্তিশালী যৌথ পরিবারেরই আভাস মিলে। বিভিন্ন কারণ যেমন বিবাহ ও মৃত্যুর ফলে রামকালীর পরিবারে সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়া এবং দীনতারিণী ও পত্নী ভুবনেশ্বরীর মৃত্যুর পর রামকালী মানসিকভাবে ভেঙে পড়ায় রামকালীর যৌথ পরিবারে অবক্ষয় দেখা দিলেও যৌথপরিবারের ভাঙনকে সূচিত করে নি উপন্যাসে।

সত্যর শ্বশুরবাড়িতে বিশাল একান্নবর্তী পরিবার না থাকলেও শ্বশুর শাশুড়ি স্বামী ছাড়াও নবকুমারের এক পিসতুতো বোন সৌদামিনী তাদের বাড়িতে থাকত। সত্য শ্বশুর শাশুড়িকে গ্রামের বাড়িতে রেখে ছেলে মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় কলকাতায় গেলেও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নি। শ্বশুরের অসুস্থতার সময় দীর্ঘদিন গ্রামে এসে শাশুড়ির সঙ্গে থেকেছে শ্বশুরবাড়ি বারুইপুরে। শ্বশুর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের মৃত্যুর পর শাশুড়িকে নিজের সঙ্গে কলকাতায় নিয়ে যেতে চেয়েছে।

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসেও আমরা কলকাতা শহরের এক আভিজাত্যহীন মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবারের ছবি পাই। এই যৌথ পরিবারটিতে রয়েছে মুক্তকেশীর ছেলে মেয়ে ও নাতি নাতনিরা। পরিবারটির কর্তৃত্ব মুক্তকেশীর হাতে। মুক্তকেশীর রক্ষণশীল পরিবারে তাঁর চার ছেলে সুবোধ, প্রবোধ, প্রভাস এবং প্রকাশ অত্যন্ত মাতৃভক্ত। তাদের জন্য মা মুক্তকেশীর আদেশ বেদবাক্যের মত। পরিবারটিতে মুক্তকেশীর প্রবল প্রতাপ, তাঁর নীতি নিয়মে সবাই তটস্থ, নিয়ম ভাঙার বা প্রতিবাদ করার কারো অধিকার নেই। মুক্তকেশী বউদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে সংসারে আপন কর্তৃত্ব বহাল রাখতেন। মুক্তকেশীর ধারণা — "প্রথম থেকেই বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা ভাল। নইলে জায়ে জায়ে একদল হলে পৃষ্ঠবল বাড়বে না। শাশুড়িকে কি তাহলে গ্রাহ্য করবে?"[১৪] এভাবেই পরিবারগুলির ভিতরে চলা ষড়যন্ত্রের আভাসও দিয়েছেন লেখিকা।

প্রথমদিকে একমাত্র উপার্জন করা পুরুষ ছিল কেরানি চাকরিজীবী সুবোধচন্দ্র। মুক্তকেশীর একক নেতৃত্ব ও সুবোধচন্দ্রের উপার্জনের উপর নির্ভরশীল থাকায় প্রথমদিকে পরিবারটিতে কোনোরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে দেখা যায় নি। পরে অবশ্য প্রবোধের উপার্জন সুবোধের থেকে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সংসারের ভাতকাপড়ের দায়িত্বে থাকতে সুবোধকেই দেখা গেছে। তাই তাকে একটু বেশি প্রাধান্য দেওয়া হত পরিবারে — "তা সুবোধের অবশ্য সাতখুন মাপ। কারণ প্রবোধ আজকাল প্রচুর কাঁচা পয়সা রোজগার করলেও, এখনো গৃহকর্তা হিসেবে সমগ্র সংসারের ভাত-কাপড়ের দায়টা সুবোধই টেনে চলেছে। নিজের সারি সারি ছেলেমেয়েতে ঘর ভরে উঠলেও এদিকে কার্পণ্য করে না সে।"[১৫]

রক্ষণশীল নীতি নিয়মে আস্থাশীল মুক্তকেশীর পরিবারে সুবর্ণলতা নিয়ে আসে প্রগতিশীল, উদারনৈতিক ও সংস্কারকামী মনোভাব। সুবর্ণলতা শ্বশুরবাড়িতে এসে পেয়েছে যৌথ পরিবার যেখানে সমাজের গতানুগতিক ছাঁচে গড়া শাশুড়ি, ভাসুর, স্বামী, দেবর, ননদ ও জাদের ও তাদের ছেলেমেয়েদের। এ পরিবারের পুরুষের কাছে পুরুষার্থ হল অর্থ রোজগারের জন্য কাজ ও কাজের শেষে অবসর বিনোদনের জন্য তাস খেলা আর মেয়েদের জগতের সীমা হল রান্না আর খাওয়া। সৌন্দর্য রুচিবোধ, শিল্প সাহিত্য, সংস্কৃতির কোনো প্রবাহ সেখানে নেই। তাই তো পরিবারের কারো সঙ্গে সুবর্ণলতার কোনো মেল খায়নি কোনদিন। শাশুড়ি থেকে শুরু করে পরিবারের সবাই তাকে বিরোধীপক্ষ ভেবে অবহেলা করেছে। সুবর্ণলতার শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন — "বাড়িটা তিনতলা, ঘরদালানের সংখ্যা কম নয়, দুদিকে দুটো রান্নাঘর, শানবাঁধানো উঠোন, গোটা তিন-চার কল-চৌবাচ্চা, অসুবিধের কিছু নেই কোথাও। তবে ওই পর্যন্তই। বাড়িটা যেন সাদামাটার একটা প্রতীক, না আছে শ্রী না আছে ছাঁদ, বাড়ি না পাড়ি।"[১৬] "শোভা সৌন্দর্য শিল্প-রুচি"[১৭] এগুলো ছিল সুবর্ণর শ্বশুরবাড়ির লোকদের বুদ্ধির বাইরের জিনিস। সুবর্ণ এই রক্ষণশীল পরিবারের মধ্যে সভ্যতা সংস্কৃতির মুক্ত প্রবাহ আনতে চেয়েছিল।

উনিশ শতকে প্রবাহিত নবজাগরণের হাওয়া বঙ্গদেশের সমাজে বহু পরিবর্তন আনলেও কিছু কিছু রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার বিংশ শতকেও নবজাগরণের বাতাস নিজের পরিবারে ঢুকতে দেয় নি। তাই বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে আমরা সাক্ষাৎ পাই মুক্তকেশীর দুয়ার আটা দর্জিপাড়ার বাড়িটিকে। যেখানে সুবর্ণলতার প্রবেশ প্রগতির বাতাস বাহকরূপে কাজ করেছে। রক্ষণশীল মুক্তকেশীর বাড়ির বউদের দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে দেখা করা নিষিদ্ধ ছিল। তাই তো লেখিকা বলেছেন — "না দিনের বেলায় নয়, দিনের বেলায় ছেলে মানুষ বৌ বরের সঙ্গে গল্প জুড়বে, এমন অনাচার আর যার সংসারে হোক, মুক্তকেশীর সংসারে কদাপি ঘটতে পারে না।"[১৮] এমনকি রক্ষণশীল মুক্তকেশী কেরোসিনের বাতির চলন করতেও দেয়নি বাড়িতে। "বৌদের এদিকে আসতে দেখেই মুক্তকেশী গম্ভীর চালে সলতে পাকাতে বসলেন। সলতে তো সংসারে কম লাগে না। ঘরে ঘরে হিসেব করেন, কোন্ না দশ বারটা পিদ্দিম জ্বলে। কেরোসিনের চলন অন্য কোথাও যদি হয়েও থাকে, মুক্তকেশীর অন্দরে তার প্রবেশ নিষেধ। নতুন আলোর পক্ষপাতী নন মুক্তকেশী।"[১৯] এত রক্ষণশীলতার মধ্যেও সুবর্ণলতা পরিবর্তনের হাওয়া নিয়ে আসে। খবরের কাগজ আনা, আতুর ঘরে নোংরা বিছানার পরিবর্তে পরিষ্কার বিছানার ব্যবস্থা, মেয়েগুলোকে সুদ্ধ পড়তে বসানো, মেয়েদের সেমিজ পড়ার প্রচলন, বাড়িতে রাঁধুনি রাখা ইত্যাদি। মুক্তকেশীর জীবিত অবস্থাতেই যৌথ পরিবারের ভাঙন দেখা দেয় তার প্রমাণ রয়েছে উপন্যাসে। সুবর্ণলতা ও প্রবোধ ভিন্ন বাড়িতে আলাদা হয়ে চলে যাওয়ার কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে — "হাঁড়ি ভেন্ন করা সে কথা স্বতন্ত্র, যেমন করেছে ছোট বৌ বিন্দু, তা বলে বাড়ি ভিন্ন।"[২০]

ছোট ছোট সংঘর্ষ থেকে মুক্তকেশীর জীবিত অবস্থায়ই তার যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরে। লেখিকা যৌথ পরিবারের ভাঙনকে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন সুবর্ণলতা উপন্যাসে — "সেই

বাঁধানো সংসার আর নেই এখন। বড় বৌয়ের শরীর ভেঙেছে, মন ভেঙেছে, মেজবৌ বরের পয়সার দেমাকে এ বাড়ির ভাগ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বাড়ি হাঁকড়েছেন। সেজ, ছোট দুই বৌ একই রান্নাঘরে ভিন্ন হাঁড়ি ..... মুক্তকেশী এখন ভাগের মা।"[২১] বিশ শতকের নগর সভ্যতার অন্যতম ঘটনা যৌথ পরিবারের ভাঙন। ছোট ছোট পারিবারিক দ্বন্দ্ব নয়, এ হল সমাজ বিকাশের বিশেষ স্তরের আর্থ সামাজিক বাস্তবতার অনিবার্য পরিণতি। আশাপূর্ণার প্রতিবেদনে এই পরিণতি সামাজিক অর্থনৈতিক কার্যকারণের শৃঙ্খলায় অন্বিত হয়ে অবশ্য উপন্যাসে ধরা পড়ে নি। এতৎসত্ত্বেও, সময়ের চাপে যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবার গড়ে ওঠার বাস্তব 'সুবর্ণলতা'য় খোদাই হয়ে আছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র শক্তিশালী যৌথ পরিবার ব্যবস্থা 'সুবর্ণলতা'য় ক্ষয়িত হতে শুরু হলেও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নি। 'বকুলকথা'য় এই অবক্ষয় তীব্র রূপ নেওয়ায় যৌথ পরিবার লুপ্ত হয়। 'সুবর্ণলতা'য় যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় ফাটল দেখা দিলেও এবং সুবর্ণলতা আলাদা সংসার পেতে আলাদা বাড়িতে চলে এলেও পরম্পরাগত রীতিনীতির অবলুপ্তি ঘটে নি। মুক্তকেশীর পুরনো বাড়ির সঙ্গে এবং মুক্তকেশীর সঙ্গে সুবর্ণলতার যোগসূত্র ছিল। সুবর্ণলতা জীবিত অবস্থাতে তিন পুত্রের বিয়ে হলেও সবাই একান্নবর্তী রূপেই জীবন যাপন করছিল। সুবর্ণলতা ও প্রবোধের মৃত্যুর পর 'বকুলকথা' উপন্যাসে এসে যৌথ পরিবারটির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে। একদিন প্রবোধচন্দ্র ও তার ছেলেরা একান্নবর্তী পরিবারের অন্ন-বন্ধন ছিন্ন করে যে বাড়িতে আপন সংসারটি প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেই বাড়িটার নকসাও প্রবোধচন্দ্রের নাতিদের কাছে পুরনো হয়ে ওঠে, শুধু তাই নয় বাড়িটা প্রবোধচন্দ্রের অদূরদর্শীতার প্রমাণ হয়ে যায়। তাদের মনে হতে লাগল বাড়িটার আশেপাশের দু-চার কাঠা জমি কিনে রাখলেও এখন তারা জমি বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারত। প্রবোধচন্দ্র শুধু নিজের মাপের জমি কিনে আজেবাজে প্ল্যানে একটা বাড়ি বানিয়েছে যেখানে তাদের মাথা গোঁজাই সম্ভব হয়েছে। সুপরিকল্পিত প্ল্যানে ফ্ল্যাট তৈরি না করার জন্য তারা প্রবোধচন্দ্রকে ধিক্কারও দিয়েছে। ফ্ল্যাট হলে তারা ভালভাবে থাকার সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা অন্তত ভাড়া দিতে পারত সেই কথাও তাদের মনে এসেছে। বাসা ভাড়া, ঘর ভাড়া, বাড়ি ভাড়া বকুলদের সময় থাকলেও ফ্ল্যাটের ধারণা যে অত্যন্ত আধুনিক ধারণা তাও আশাপূর্ণা দেবী বুঝিয়ে দিয়েছেন — "এদেরও অথচ খেয়ালে আসে না, ফ্ল্যাট্ শব্দটাই তখন অজানা ছিল তাঁদের কাছে। তখন সমাজে ফ্ল্যাটের অনুপ্রবেশ ঘটবার আভাসও ছিল না। বাসা ভাড়া, ঘর ভাড়া, বাড়ি ভাড়া এই কথা।"[২২]

প্রবোধচন্দ্রের ছেলেরা আর একান্নভুক্ত হয়ে নেই 'বকুলকথা'তে। তাই এখন প্রবোধচন্দ্রের বাড়ির লম্বা দালানটা অকেজো হয়ে গেছে, একান্নবর্তী থাকার সময় সপরিবারে 'পংক্তি ভোজনে'র ব্যবস্থা ছিল যেখানে। প্রবোধচন্দ্রের বড় ছেলে এ পৃথিবীর অন্নজল ছিন্ন করে চলে গেছে। তার বিধবা স্ত্রী নিজস্ব একটি 'পবিত্র এলাকা' বেছে নিয়ে হবিষ্যান্নের মধ্য দিয়ে শুচিতা রক্ষা করে চলেছে। তারই জ্যেষ্ঠ পুত্র অপূর্বর স্ত্রী শৌখিন, মেয়েকে মানুষ করতে চায় আধুনিক স্টাইলে। ভেড়ার গোয়ালে খুড়শাশুড়ির সঙ্গে থাকতে রাজি নয়, তাই অপূর্ব বাড়ির মধ্যেই কাঠের স্ক্রীন্ দিয়ে তৈরি করেছেন নিজের জায়গা। দোতলার ঘরবারান্দা ঘিরে নিজের মেলেচ্ছপনার গণ্ডি তৈরি

করে নিয়ে সেখানে বিরাজমান। অপূর্বর পরিবারটি সম্পূর্ণরূপে সংস্কারমুক্ত। বকুলের বড়দার অন্য দুই ছেলে চাকরির সূত্রে ঘরভাড়া করে অন্যত্র রয়েছে। কখনো বাড়িতে এলে তাদের মার কাছে খায় কখনোবা তাদের বউদির সঙ্গে আর কোনো কোনোদিন কাকাদের ঘরে, শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়ের ঘরে নেমন্তন্ন খেয়ে চলে যায়।

প্রবোধচন্দ্রের মেজছেলে কানু দোতলার এক অংশে থাকে। তার স্ত্রী বাতরোগী ও ছেলেমেয়েরা চাপা হওয়ায় তাদের সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না। কানু মেয়েদের তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছেন। কানু আয়-ব্যয় এর ব্যাপারে সতর্ক হওয়ায় মেয়েদের বাড়িতে আসা-যাওয়া কম। সেজছেলে মানুর রান্নাঘরেই বকুলের ঠাঁই হয়েছে। তবে মৃত্যুকালে বাবা প্রবোধচন্দ্র অন্য পুত্রদের বিচলিত ও গোত্রান্তরিতা কন্যাদের ঈর্ষান্বিত করে অবিবাহিতা বকুলকে বাড়ির নবনির্মিত তিনতলার ঘর বারান্দা ও ছাদ লিখে দিয়ে যান। বকুলের অংশের সংলগ্ন ছোট ঘর একটি রয়েছে যেটিতে বকুল ইচ্ছে করলে রান্নার কাজে লাগালে লাগাতে পারে কিন্তু বকুল ছোড়দা মানুর রান্নাঘরেই নিজের জায়গা করে নিয়েছে। আর সে ঘরটিতে স্থান পেয়েছে অনামিকা দেবীর ফালতু কাগজের বোঝা। আর ছোট ছেলে সুবল প্রবোধচন্দ্রের সংসারে নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। বকুলদের বাড়িতে সবাই একই বাড়িতে নিজের নিজের জায়গা আলাদা করে ভাগ করে নিয়েছে। বকুলদের শুধু দালানেরই ভাগ হয় নি সে বাড়িতে থাকা মানুষের মধ্যেও যথেষ্ট ব্যবধান দেখা দিয়েছিল। একই বাড়িতে বাস করেও একে অপরের জন্য একেবারে অপরিচিত ছিল। একই পরিবারের মানুষগুলি পরস্পর নিঃসম্পর্কিত হয়ে পড়েছে 'বকুলকথা'য় এসে। তিন পুরুষের আখ্যানে পারিবারিক জীবনের ভাঙনের ইতিহাস বিধৃত রয়েছে।

পারুলের ছেলের বউ রেখা শাশুড়ির সঙ্গে মিলে থাকতে পারে নি শুধু তাই নয় নিজের অভিমানের কাছে স্বামীর একক সংসারও বিসর্জন দিয়ে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ করে নিয়েছে। বর্তমানের নারীরা স্বামীকে ছাড়া আর কারো সঙ্গে থাকতে রাজি নয় যৌথ পরিবারের কথা তাদের মানসকল্পনার বাইরের জিনিস তাই ফুটে উঠেছে 'বকুলকথা'য়। বর্তমান নারীর মানসিকতাকে লেখিকা এভাবে বুঝিয়েছেন বকুলের মেজদি চন্দনের মুখ দিয়ে — "বর হলেই অমনি তাকে ট্যাকে পুরতে হবে? দুদিন সবুর কর। যেখানে বিয়ে হলো তাদের সঙ্গে একটু চেনাজানা কর! তা নয়, জগতে শুধু বরটি আর বৌটি। যেন - জীবজন্তু, পাখী-পক্ষী। ত্রিভুবনে আর কেউ নেই, শুধু উনিটি আর আমিটি। তাও তো সেই জুটিটিও ভাঙছে, যখন ইচ্ছে তখন আর একটার সঙ্গে জোড় বেঁধে ভাঙা সংসার জুড়ে নিয়ে দিব্যি আবার সংসার করছে।"[২৩] আধুনিকতা শুধু যৌথ পরিবারকেই ভাঙছে না পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান যে মমত্ব ও প্রিয়ত্ববোধের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, আধুনিক সময় যেন তাকেই অপাংক্তেয় করে দিচ্ছে। একাকীত্ব, অনিকেত বোধ, বিচ্ছিন্নতার ক্লেশ - আধুনিক নাগরিক সমাজের অপ্রতিরোধ্য নিয়তি হয়ে উঠেছে যেন।

নারীর অবস্থান

ইতিহাসের পাতা খুললে দেখা যায় বহুদিন পর্যন্ত ভারতীয় নারীরা পর্দাপ্রথা, সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথার দ্বারা শোষিত হয়েছে। বঙ্গীয় সমাজেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে নির্যাতন করেই অভ্যস্ত, আর নারী নির্যাতনের জন্য তারা তৈরি করে নিয়েছিল নানা প্রকার সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতির। বহুবিবাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, পণপ্রথাকে হাতিয়ার বানিয়ে নিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর স্পেস কেবলই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চায়। আশাপূর্ণা দেবী যে সময়ের ভাষ্যকার, সে সময়ে মেয়েদের সবকিছুতে ছিল অধিকারহীনতা। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে ও বধূ আশাপূর্ণা মেয়েদের অধিকারহীনতাকে নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন তাই তিনি 'আর এক আশাপূর্ণা'তে বলেছেন — "সব জায়গাতেই দেখতাম পুরুষের প্রবল প্রতাপ। মেয়েদের খুব নতজানু হয়ে থাকতে হয়। তবে যাঁরা গিন্নিবান্নি হয়ে গেছেন তাঁদেরও দারুণ প্রতাপ ছিল। অল্পবয়সী মেয়েদের, বিশেষ করে বৌদের জীবন ছিল দুঃখের নিরুপায়ের, যেগুলো মনকে দারুণ অস্থির করত, কেন এমন অবিচার? কেন মেয়েদের এমন অধিকারহীনতা?"[২৪] মেয়েদের এই অবরোধের জীবন যাপন ও অবরোধ থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টাই তাঁকে প্রেরণা দেয় ত্রয়ী উপন্যাসের। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সুবর্ণলতা ও বকুলকথায় নারীর বিবর্তিত অবস্থান আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে।

যুগসন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী। যখন পুরনো যুগ অর্থাৎ সেকালকে ধীরে ধীরে বিদায় দিয়ে একাল অর্থাৎ নতুন যুগের আলো প্রবেশ করছে সমাজে। বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনে সেকাল ও একালের দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রভাব ফেলেছে তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। একদিকে পুরুষশাসিত সমাজ বিভিন্ন প্রথা ও ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে অন্তঃপুরে ঠেলে দেবার ষড়যন্ত্র চালিয়েছে অপরদিকে সেই ষড়যন্ত্রকে ভেদ করে অন্তঃপুরচারী নারী বাইরে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এই ব্যাকুলতাই তাদের প্রেরণা যুগিয়েছে বিদ্রোহিণী হবার। তারা চেষ্টা করেছে সমাজ মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে, তাই তারা আঘাত হেনেছে পুরনো সংস্কারের উপর। নারী সেকালের অন্তঃপুরের বন্দিত্বকে ভেঙে মুক্ত পৃথিবীর স্বাদ পেয়েছে একালে এসে। সেকাল থেকে একালে পাড়ি দেবার পথে চলেছে বহু ভাঙা গড়া, তারই সঙ্গে রয়েছে বহু বলিদানের ইতিহাস।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র রামকালীর একান্নবর্তী পরিবার তথা তৎকালীন সমাজে থাকা অন্যান্য পরিবারের অন্তঃপুরচারী নারীদের অবস্থান সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে নারীর অপাংক্তেয় অবস্থান যেভাবে দেখানো হয়েছে তেমনি সত্যবতীর দ্বারা সামাজিক অচলায়তন ভাঙার চেষ্টার মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের নবজাগরণের ফলে আসা প্রগতির আলোকে ধরবার প্রয়াস রয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে। তিনি দেখিয়েছেন, উনিশ শতকের গ্রামসমাজে নারীরা

নিজস্ব পরিচয়ে চিহ্নিত নয়। লেখিকা বলেছেন — "না নাম কেউ জানে না, জানবার চেষ্টাও করে না 'জটার বৌ' এই তার একমাত্র পরিচয়, এরপর শেষে অমুকের মা।"[২৫] তাই তো 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নারীগুলি আমাদের সামনে ব্যক্তিগত সত্তা নিয়ে হাজির হয় নি, তারা কারো বউ অথবা মা হয়েই এসেছে। যেমন কুঞ্জ বউ, সত্যর মা, কাটোয়ার বউ, জটার বউ ইত্যাদি। অন্তঃপুরচারী এই সমস্ত নারীরা পুরুষতন্ত্রের নানা প্রকার অত্যাচারের স্বীকার হয়েও পতিগৃহের আশ্রয়টিকে আঁকড়ে থেকেছে। তবে নারীদের মধ্যে সবাই অত্যাচারিত হয় নি। গৃহিণীর মর্যাদা প্রাপ্ত বয়স্ক নারীরা পুরুষতন্ত্রের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেয়েছে এবং সংসারে সবার উপর নিজেদের কর্তৃত্ব খাটিয়েছে। এই প্রাপ্তবয়স্ক মহিলারা গৃহিণীর মর্যাদা পেয়ে অল্পবয়সী মেয়ে বউদের উপর অত্যাচার করে নিজের কর্তৃত্ব বহাল রাখার প্রয়াস করেছে। এ যেন অধস্তনের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখার প্রয়াস। এই সমস্ত গৃহিণীদের কঠোর নীতি নিয়মেই অন্তঃপুরের অন্যান্য মেয়ে বউরা পরিচালিত হত। যেমন প্রথম প্রতিশ্রুতিতে দীনতারিণী, শিবজয়া ও মোক্ষদার অনুশাসনেই পরিচালিত হয়েছে পরিবারের অন্যান্য মেয়ে বউরা। বাইরের জগৎ পুরুষের, অন্দর মহিলাদের। অন্দরমহল ও বহির্মহলের এই বিভাজন যেন শ্রেণিবিভাজনের মতো ধ্রুব, অমোঘ। তাই তো লেখিকা বলেছেন — "অবিশ্যি পুরুষের তত্ত্ববার্তা নেবার প্রয়োজনই বা কি মেয়েদের? দুজনের জীবন যাত্রার ধারাতো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। পুরুষের কর্মধারার চেহারা যেমন মেয়েদের অজানা, সেদিকে উকি মারার সাহস মেয়েদের নেই, তেমনি পুরুষের নেই অবকাশ মেয়েদের কর্মকাণ্ডের দিকে অবহেলার দৃষ্টিটুকুও নিক্ষেপ করার।

একই ভিটেয় বাস করলেও উভয়ে ভিন্ন আকাশের তারা।"[২৬]

স্বামীর অত্যাচারকে শুধু গৃহিণীরাই স্বীকৃতি দেয় নি, সেকালের সমাজ মানসিকতায় স্বামীর অত্যাচার স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবেই স্বীকৃত ছিল। তাই তো সত্য পুঁটির স্বামীকে নোড়া মারার কথা বললে ভাবিনী বলেছে — "তোমার যে কী ছিষ্টিছাড়া কথা দিদি। আমরা সে কাজ করে পার পাবো? হাতে দড়া পড়বে না? বিয়ে করা পরিবারকে মারতে পারো, কাঁটতে পারো, ছেঁচতে পারো, কুটতে পারো, আর কাউকে করা যায়?"[২৭] ঠিক একইভাবে সত্যর শাশুড়ি এলোকেশীও ছেলে নবকুমারকে সত্যকে পিটিয়ে সায়েস্তা করার কথা বলার মধ্য দিয়ে পুরুষের অত্যাচারের পক্ষ নিতে দেখা গেছে মেয়েদেরও। স্বামীর অত্যাচারকে সহ্য করে তৎকালীন সমাজে নারীরা স্বামীকে ত্যাগ করার কথা চিন্তাও করতে পারে নি। স্বামীর অত্যাচার শুধু তারা সহ্য করেনি অত্যাচারিত স্বামীর অত্যাচার ভুলে গিয়ে অতি সহজেই তারা আবার স্বামীর সঙ্গে ভাবও করে নিয়েছে। তাই তো জটার বউ জটার উপর সত্যর রাগকে দেখে বলেছে — "আমার সোয়ামী আমায় মেরেছে তোমায় মারতে যায় নি ঠাকুরঝি?"[২৮]

আশাপূর্ণার রচনায় এলোকেশী মুক্তকেশীদের মতো অত্যাচারী শাশুড়িরা বারবার আসেন। এর মধ্যেও সামাজিক বাস্তবের জটিল অভিব্যক্তি রয়েছে। মুক্তকেশী কিংবা এলোকেশীর মতো মেয়েরা বালিকা বধূ হিসাবে একদিন ত্রস্ত পদবিক্ষেপে খেলার পুতুল সঙ্গে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পা

রেখেছিলেন। তারাও তো শাশুড়ির দাপট সহ্য করেছেন, সহ্য করেছেন পতি আর অপর পুরুষের অবহেলা। প্রান্তিকায়িত অবস্থান থেকে হঠাৎ যখন পরিবারের কর্ত্রী হবার অবকাশ আসে, ভাঁড়ারের চাবিটা শুভক্ষণে বাঁধা পড়ে আঁচলে, তখনই জীবনে অর্জিত সব আঘাত ফিরিয়ে দেবার উগ্র বাসনা জন্মে। এই প্রতিক্রিয়ার সূত্রেই, এলোকেশীরা শাশুড়িদের অত্যাচারী ভূমিকার পরম্পরাকে বহন করে চলেন।

তৎকালীন সমাজে যৌথ পরিবার সমূহে গৃহবধূরা শাশুড়ি, অন্যান্য গুরুস্থানীয় গৃহিণীকে ও অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠদের ভয় করে মুখ বুজে থেকেছে। তাই তো রামকালী জটার বউয়ের জন্য ঔষধ পাঠালে শাশুড়ির ভয়ে ঔষধ খেতে চায়নি এবং পাঠিয়ে দিতেও সাহস হয়নি তার রামকালীকে অসম্মান করার ভয়ে। তাই তো সত্যর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে — "এই সেরেছে! ব্যায়রামে পড়ে দেখছি তোমার ভীমরতি ধরেছে বৌ। শাউড়ির ভয়ে ওষুধ খাবে না, আবার ফেরতও দেবে না, তবে বড়িগুলো কি আমি খেয়ে নেব? দাও তাহলে একখোরা পানের রস করে দাও, সবগুলো একসঙ্গে গুলে গিলে ফেলি।"[২৯] বউরা শুধু ভয়ই করে নি শাশুড়ির অনুগত হয়ে থেকেছে ঘোমটা দিয়েও থাকতে দেখা গেছে তাদের। সত্যর মা ভুবনেশ্বরী কর্তা রামকালীর স্ত্রী হলেও সব সময় ঘোমটায় আবৃত থেকেছে এবং শাশুড়িকুল ও স্বামীর ভয়ে ভীত থেকেছে। পড়ন্ত বেলাতে কাজ সেরে গিন্নিদের বা অভিভাবক দলের দিবানিদ্রার সুযোগ থাকলেও মেয়ে বউদের দিবানিদ্রার সুযোগ ছিল না। খাবার দাবারের ক্ষেত্রেও সদস্যদের শ্রেণি হিসেবেই ভাগ করতে দেখা গেছে। আমের দিনে কর্তাদের জন্য জোড়কলম, ক্ষীরসাপাতি, নবাব পসন্দ, বাদশা ভোগ, ঢাউস ফলসী ইত্যাদি গিন্নীদের ভোগের জন্য সরানো থাকে পোয়ারাফুলি, বেলুসুবাসী, কাশীর চা চিনি, সিঁদুর মেঘ, আর বউ ঝি ছেলেপুলেদের ভাগে থাকে 'রাশি'র আম।

ভারতীয় সমাজ নানা কুসংস্কারে পূর্ণ। কুসংস্কারের চর্চার সঙ্গে কোনোভাবে আধিপত্যবাদেরও সম্পর্ক রয়েছে। কার্যকারণের ধারণা থেকে যত দূরে মানুষকে সরিয়ে রাখা যায়, ততই একটি গোষ্ঠীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুবিধা হয়। নারীকে নরকের দরজা বলে ভাবা হয়েছে আর্য প্রতিবেদনে। সমস্ত অমঙ্গলের জন্য, অশুভের জন্য দায়ী করা হয় মেয়েদেরই। পটলীর বিয়ের আগেই বরের মৃত্যুরোগের লক্ষ্মণ দেখা দিলে পটলীর লগ্নভ্রষ্টা হবার কথা ভেবে মহিলারা দুঃখ করেছে। লগ্নভ্রষ্টা হবার জন্য যেন পটলীই দায়ী। "ওরে পটলী, তোর কপালে এমন ছাই পোরা ছিল, একথা তো কেউ কখনও চিন্তে করি নি রে। ওরে লগন-ভ্রষ্ট মেয়ে গলায় নিয়ে আমরা কী করব রে। ওরে এর চাইতে তোকে কেন শমনে ধরল না রে, সে যে এর থেকে ছিল ভাল।"[৩০] এমনকি মহিলাকুল পটলীর এহেন বিপদের জন্য পটলীকেই কুলক্ষণী বলতে দ্বিধা করেনি। তাদের মানসিকতা বোঝাতে গিয়ে লেখিকা জানিয়েছেন — "সকলেই ফিসফাস বলাবলি করছে মেয়ে, নাকি তার আস্ত রাক্ষসী, তাই বাসরে না উঠতেই সোয়ামীর মাথা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেল।"[৩১] অলক্ষণা - সুলক্ষণা ইত্যাদি ধারণাও পুরুষের আধিপত্যের সূচক।

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় নারীরা পুরুষদের চরিত্র পতনকেও দ্বিধাগ্রস্তহীনভাবে মেনে নিতো। যেভাবে এলোকেশী স্বামী নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের বাগদীপাড়ায় যাওয়াকে মেনে নিয়েছিলেন। স্বামীর চরিত্রপতনের জন্য এলোকেশীর মধ্যে কোনরূপ গ্লানিবোধও দেখা যায় নি। এমনকি পুত্র নবকুমার পর্যন্ত পিতার এই চরিত্র পতনকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মেনে নিয়েছিল। রোজ একবার শ্বশুরকে প্রণাম করার যে রেওয়াজ ছিল শ্বশুরের চরিত্র পতনের জন্য সত্য তা করতে অস্বীকার করলে বরং সত্যকে সবাই গঞ্জনা দিয়েছে। পুরুষের চরিত্র পতনকে তৎকালীন সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে সবাই মেনে নিয়েছে। সদু বলেছে — "তোর আবার বড্ড বেশি বাড়াবাড়ি বৌ। স্বভাব দোষ কটা বেটাছেলের নেই?"[৩২] তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার জন্যও মেয়েদের তাচ্ছিল্যময় জীবন অতিবাহিত করতে হত। বহু বিবাহকেও সবাই মেনে নিয়েছিল। স্বামীকে একা ভোগ করার অধিকার ছিল না এর প্রমাণও রয়েছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে। তাই তো মোক্ষদা বলেছেন — "সোয়ামী কি মণ্ডা মিঠাই, যে একলা আস্তটা না খেতে পেলে পেট ভরবে না, ভাগ হয়ে গেলে প্রাণ ফেটে যাবে?"[৩৩] রাসুর দ্বিতীয় বিয়েতে সারদার অন্তরবেদনা আর কেউ না বুঝতে পারলেও সত্যবতী বুঝতে পেরেছিল। তাই বাবার এরূপ সিদ্ধান্তে সত্যবতীর হৃদয় ভরে আসে। বাবার বুদ্ধিহীনতার কথা মনে করে সে ভেবেছে — "এত বোধবুদ্ধি বাবার, অথচ সোয়ামী আর একটা বিয়ে করে আনলে মেয়েমানুষের প্রাণ ফেটে যায় কিনা সেই জ্ঞান নেই।"[৩৪] তৎকালীন সমাজে মেয়েদের সতীন জ্বালার বেদনা ন' বছরের মেয়ে সত্যকেও নাড়া দিয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল নারীর মনে নবজাগরণের প্রভাবকেও লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহের প্রচলনের জন্য সৌদামিনীর মত মেয়েরা স্বামীর বহু বিবাহের শিকার হয়ে আত্মীয়ের ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাইতো নবকুমার সৌদামিনীকে অসুস্থ মামা নবকুমারের পিতার সেবা করতে না আসার জন্য ভাতকাপড়ের খোটা দিতেও দ্বিধা বোধ করে নি। নবকুমার অগ্নিশর্মা হয়ে বলেছে — "তারও কিছু কম কর্তব্য নয়, যে মামা এতকাল ভাত-কাপড় দিয়ে পুষল—"[৩৫]

আশাপূর্ণার সময়ে ছেলেদের শিক্ষার প্রচলন ছিল তবে মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন হয় নি তখনও। ছেলেদের শিক্ষার মধ্যেও টোলে গিয়ে সংস্কৃত পড়ার প্রচলনই ছিল বেশি। ধারণা ছিল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে অকালে বিধবা হয়, তাছাড়াও লেখাপড়া শিখে মেয়েরা উপার্জন করে স্বাবলম্বী যাতে হতে না পারে সেদিকে লক্ষ রেখে কুটিল পুরুষশাসিত সমাজে মেয়েদের অন্দরমহলে ঠেলে দিয়েছিল। উনিশ শতকে ইংরাজি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ফলে সংস্কারকামী মনীষীদের দ্বারা কলকাতায় যে নবজাগরণের আলো দেখা দেয় তার ফলে স্ত্রী শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে নারীর সামগ্রিক উন্নতির কথা চিন্তা করে। ফলে কলকাতা শহরে মেয়েদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই উদ্দেশ্যেই ১৮৪৯ সনে কলকাতায় বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার পর কলকাতায় স্ত্রী শিক্ষার বিকাশ গতি লাভ করে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে আমরা লক্ষ করে থাকি যে কলকাতায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হলেও গ্রামবাংলায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয় নি।

গ্রামবাংলার ছেলেদের শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও ইংরাজি শিক্ষাকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ইংরাজি ভাষাকে তখন ম্লেচ্ছ ভাষা মনে করা হয়েছে। গ্রাম গঞ্জে তখনও স্ত্রী শিক্ষাকে পাপ মনে করা হয়েছে। তাই তো সত্যর তালপাতায় লেখা নিয়ে হৈ চৈ লেগে যায়। পুণ্যি সত্যকে তালপাতায় লেখা নিয়ে চিন্তিত হয়ে বলেছে — "খেয়াল করে তো করছিস, দেখে আহ্লাদও হচ্ছে, কিন্তু হাজার হোক মেয়েমানুষ, ওতে তোর পাপ হবে না?"[৩৬] সত্যর মা ভুবনেশ্বরীও মেয়ের তালপাতায় লেখা নিয়ে চিন্তামগ্ন হয়েছে। তবে তখন পর্যন্ত কলকাতায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয়ে গেছে। তার প্রমাণ মিলে সত্যর একটি লেখা কাগজ নিয়ে ভুবনেশ্বরীর তাঁর ছোট ভাইয়ের বউ কলকাতার মেয়ে সুকুমারীর কাছে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। সুকুমারী কলকাতার মেয়ে তাই সে লেখাপড়া একটু জানে। কলকাতায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের কথা বলতে গিয়ে সত্য বলেছে যে ছোটমামীর কাছে শুনেছে কলকাতায় স্ত্রী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গ্রাম বাংলায় স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন না হলেও সত্য বাল্যকালেই শিক্ষার মূল্য বুঝতে পেরেছে। তাই সে মামীর বিদ্যাশিক্ষা পূর্ণ না হবার জন্য দুঃখ করেছে "একটু একটু জানেন। বেশি করে কবে আর শিখতে পেল বেচারা? শুধু বলছিল, একজন মেম নাকি দিশী ইস্কুল খুলেছে, আর একজন সায়েব বিলিতী স্কুল দিয়েছে, কলকাতার মেয়েরা আর মুখ্যু থাকবে না।"[৩৭] কলকাতায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনে কলকাতার মেয়েদের অন্দর থেকে আলোর যাত্রা আরম্ভ হলেও সেই আলোর মূল্য সত্যর কাছে ধরা দিলেও অন্দরমহলে বন্দী থাকার জন্য গ্রামবাংলার অন্যান্য নারীরা যে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও কু-সংস্কারাচ্ছন্নই রয়ে গেছে তার প্রমাণ মেলে নিভাননীর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে — "বল কি ঠাকুরঝি, সত্যও কি তার ছোট মামীর মতন লেখাপড়া করছে? কালে কালে হল কি? বলি মেয়ে কি তোমার শামলা এঁটে কাছারি যাবে? সবাই তো তোমার ভাইদের মতন ভালমানুষ নয় যে, যা ইচ্ছে তাই চলে যাবে, শ্বশুররা এ খবর টের পেলে?"[৩৮] এমনকি সত্যর তালপাতায় লেখা নিয়ে সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাকে পাপ হবার ভয় দেখালে সে বলেছে, "কেন মেয়েমানুষ তালপাতায় হাত দিলে কি হয়? কলকাতায় তো কত মেয়েমানুষ লেখা পড়া করে।"[৩৯] পাপ হবার কথা শুনে সত্য রেগে যায় এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে — "কেন, পাপ হবে কেন? মেয়েমানুষেরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ শাপমন্যি করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না?"[৪০] তৎকালীন সমাজে সত্যর মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার প্রতি থাকা আগ্রহের মধ্য দিয়ে নবজাগরণের বাতাস ছড়ানোর রাস্তা প্রস্তুত করেছেন লেখিকা। রামমোহন রায় বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীদের সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় কলকাতায় যে প্রগতির আলো দেখা দিয়েছিল তা গ্রামবাংলায় সত্যর মতো মেয়েদের মনে যে আলোড়ন তুলেছিল তার ইঙ্গিত লেখিকা তুলে ধরেছেন 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে। সত্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। বিচক্ষণ রামকালীও মেয়ের লেখাপড়ার আগ্রহকে প্রশ্রয় দিয়েছে এবং মেয়ের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে তৎকালীন রক্ষণশীল পুরুষশাসিত সমাজে উদারমনা পুরুষদের ছবি ভেসে উঠেছে।

পরিবর্তনের সংবাদ 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে এসেছে সুহাসের শিক্ষয়িত্রী হয়ে ওঠার প্রসঙ্গে। কলকাতার মেয়েরা বিদ্যাশিক্ষা করে উপার্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রামকালীও তাই সত্যর সুহাসকে পড়ানোর উৎসাহ দিয়েছে। রামকালীর মধ্য দিয়ে মেয়েদের স্বাবলম্বী হওয়ার দিকটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখিকা — "রামকালী বলতে চাইছিলেন, বিয়ের চেষ্টার প্রয়োজন কি? বেশ তো লেখাপড়া শিখছে ভাল কথা। নিজের জীবিকা নিজে অর্জন করতে পারে, সেটা মঙ্গল। কলকাতায় তো আজকাল এরকম হচ্ছে। বিদুষী মেয়েরা গৃহশিক্ষয়িত্রী হয়ে অথবা মেয়ে স্কুলে পড়িয়ে উপার্জন করছে।"[৪১] এ থেকে মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে উনিশ শতকের শেষের দিকে মেয়েরা ক্রমশ বিকাশের দিকে এগিয়ে গেছে স্বাবলম্বী হয়েছে তারই আভাস মেলে। শিক্ষার মূল্য বুঝে সত্য সংসার ত্যাগ করার পরও কাশীতে গিয়ে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুলে হাজার হাজার সুবর্ণকে আলোর মুখ দেখানোর প্রয়াস চালিয়েছে সংসার ছাড়ার মুহূর্তেও ত্রিবেণীতে পিতার প্রদত্ত ভূমিতে ছেলেকে ভূবনেশ্বরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলে গেছে।

গ্রাম-শহর নির্বিশেষে উনিশ শতকের সমাজে বিধবাদের উপর ছিল নানা প্রকার কঠোর বাধানিষেধ। তবে সব বিধবাই যে সমাজের কঠোরতার দ্বারা নির্যাতিত হত তা নয়। বয়স্ক বিধবা ও গৃহিণী বিধবাদের কিন্তু বেশ প্রতাপ ছিল সমাজে ও অন্দরমহলে। অল্পবয়সী ও সহায়হীন বিধবাদের উপরই পড়ত সমাজের কোপ। তাইতো সত্য অন্যান্য বিধবাদের সঙ্গে কাটোয়ার বউ শঙ্করীর অবস্থানগত পার্থক্যকে সহজেই ধরতে পেরেছে। গৃহিণী বিধবাদের সম্পর্কে সত্যর উক্তি — "পিস্ঠাকুরমাও তো বিধবা। বিধবা আরও কতজনেই, তাদের ভয়েই তো সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। ওদের দেখে মনে হয়, ওরাই যেন পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।"[৪২] 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সময় বাংলার গ্রাম্য জীবনে বিধবা নারীর ক্ষেত্রে সমাজে অত্যন্ত কঠোর অনুশাসন ছিল। তাদের নিরামিষ হেঁসেল থাকত। বিধবা হওয়া যেন নারীর জন্য অভিশাপই ছিল তখন। সারদার চিন্তাসূত্র তার সাক্ষ্য দেবে— "বিধবা! বুকটা থর্থর করে ওঠে সারদার। বরং একশটা সতীন নিয়ে ঘর করবে সারদা। বিধবা হওয়ার মত অভিশাপ আর কি আছে?"[৪৩] বিধবাদের শুভ কাজ থেকে বিরত রাখা হত। আমিষ আহার গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল তাদের। একাদশীব্রত পালন তথা নিয়ন্ত্রিত আহার গ্রহণ করতে হত বিধবাদের। বিধবা নারীদের বাইরে বিচরণ নিষিদ্ধ ছিল তবে বয়স্ক বিধবাদের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। উনিশ শতকে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আইনত বৈধ বলে ঘোষিত হলেও রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ মনে প্রাণে তা মেনে নিতে পারেনি। তাই বিধবাদের বুকে চাপা থাকত বিয়ে করার সাধ। বিধবাদের এরূপ কঠোর নীতি নিয়মের মাঝখানে শঙ্করীর নগেনকে ভালোবাসা ও তার সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে তারই আভাস মেলে। সুহাসের বিয়ের জন্য ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে সত্যর আলাপচারিতায় তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মধর্মের লোকদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল তার আভাস পাওয়া যায়। সত্য সদ্য ব্রাহ্ম হওয়া ভবতোষ মাস্টারকে বলেছে — "সে আপনি স্নেহ করে বলেছেন। দিন তবে নাতনীর একটা ব্যবস্থা করে। আপনাদের সমাজে শুনেছি অনেক উদারমনা ছেলে আছে যারা বিধবা বিয়ে করতে রাজী।"[৪৪]

উনিশ শতকের সামাজিক আলোড়নের ফলস্বরূপ নারীর অবস্থানগত যে পরিবর্তন আরম্ভ হয় বিশ শতকে আরো বেশি দ্রুত গতি নেয় কিন্তু এই পরিবর্তনের কালেও রক্ষণশীল মানসিকতা নবজাগরণের ফলে হওয়া পরিবর্তনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিংশ শতাব্দীতে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজে নারীর ক্ষেত্রে থাকা অনুশাসন বহু পরিমাণে শিথিল হলেও মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারে নারীর ক্ষেত্রে কোনো স্বাধীনতা দেখা যায় নি। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের মুক্তকেশীর পরিবারটি প্রগতির বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয়েছে ইতিমধ্যে, কিন্তু মুক্তকেশীর রক্ষণশীল পরিবারে নারীর অবস্থান একই ছিল। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতীর মধ্যে খাঁচা ভাঙার যে দুঃসাহস দেখা গেছে সুবর্ণলতার মধ্যে সেই খাঁচাবন্দি নারীর অব্যক্ত যন্ত্রণাকে লক্ষ করা যায় তারই সঙ্গে রয়েছে খাঁচা ভাঙার প্রয়াস ও ব্যর্থতার যন্ত্রণা। সুবর্ণলতার জীবনকে লক্ষ করলেই সেই সময়ে নারীর অবস্থান আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। ন বছরের সুবর্ণ কান্না করলে স্বামীগৃহে শাশুড়ি মুক্তকেশী তাকে ছেচরিয়ে নিয়ে যায়। বাবা ভাই দেখা করতে এলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সুবর্ণকে ঘরের ভিতরে রেখে বাইর থেকে শিকল লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। না চাইলেও সুবর্ণলতাকে একের পর এক সন্তান জন্ম দিতে হয়েছে। সুবর্ণর ননদ ও জায়েরা নতুন কালের মানুষ হয়েও হাবে-ভাবে ভাবনায় পুরনোকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছে। তারা রান্না ঘরকেই মেয়েদের অবস্থান মনে করেছে। সুবর্ণর জায়েরা অন্যান্যদের কাছে ভাল হয়ে থাকার প্রয়াস চালিয়েছে আত্মমর্যাদাকে বিকিয়ে দিয়ে। সুবর্ণলতা গতানুগতিক রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে না ধরে থেকে আত্মমর্যাদাবোধের প্রেরণায় স্রোতের বিপরীত মুখে যাত্রা করতে গেলে সংঘর্ষ বেঁধেছে শাশুড়ি মুক্তকেশীর সঙ্গে, স্বামী এবং দেবরদের সঙ্গে।

এ শুধু মুক্তকেশীর সংসারের কথাই নয় এ হল রক্ষণশীল পরিবারের সাধারণ দৃশ্য — "শুধু মুক্তকেশীর ছেলেরাই এরকম, একথা বললে অন্যায় বলা হবে। অধিকাংশই এরকম। তারতম্য যা সে কেবল ব্যবহার-বিধিতে।"[৪৫] এ সমস্ত পরিবারের ছেলে মেয়েদের সভ্যতা সংস্কৃতির কোন ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায় নি। ছেলেদের আমোদ প্রমোদের নামে ছিল তাস খেলা আর মেয়েদের মানসিকতায় ছিল রান্নাবাড়া আর বড় হলে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া। তাই লেখিকা বলেছেন — "মানুষকে খেতে হয় ঘুমুতে হয় বংশবৃদ্ধি করতে হয় এবং সেই কাজগুলো নিশ্চিন্তে সমাধা করার উপায় হিসাবে টাকা রোজগার করতে হয়, আবার খেটে খুটে ক্লান্ত হলে তাস-পাশা খেলতে হয়, মাছ ধরতে হয়, রসে বসে রাজনীতি করতে হয়, ছেলে শাসন করতে হয়, মেয়ের বিয়ে দিতে হয়, আর বুড়ো হলে তীর্থ-ধর্ম ও গুরুগোবিন্দ করতে হয়।"[৪৬] 'সুবর্ণলতা'র সমাজে মেয়েদের প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন — "মেয়েমানুষ পরচর্চা করবে, কোঁদল করবে, ছেলে ঠেঙাবে, ভাত রাঁধবে, আর হাঁটু মুড়ে বসে এককাঁসি চচ্চড়ি দিয়ে এক গামলা ভাত খাবে, এই তো জানা কথা।"[৪৭]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র মত 'সুবর্ণলতা'র সময়েও মেয়েদের স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, সুবর্ণও এর থেকে রেহাই পায় নি। প্রবোধের কাছ থেকে সুবর্ণ মৌখিক তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে

দৈহিক লাঞ্ছনাও ভোগ করেছে। সুবর্ণ লাঞ্ছিত হয়েছে দক্ষিণের বারান্দার জন্য, কেদারবাবুর সঙ্গে কথা বলার জন্য, অম্বিকার সঙ্গে কথা বলার জন্য। এত অত্যাচার ও লাঞ্ছনার মধ্যেও সুবর্ণর মুক্তিকামী মন দমে যায় নি। সুবর্ণর মুক্তিকামী মন মুক্তির জন্য, বহির্জগতের আলোর জন্য ছটফট করেছে তাই সুবর্ণ প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে। গতানুগতিক ধারায় সে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারে নি। সুবর্ণ মুক্তকেশীর সংস্কারবিহীন বাড়িতে ভব্যতা ও সভ্যতার প্রবাহ আনতে চেয়েছে। সুবর্ণলতার চাওয়ার দিকে তাকিয়ে লেখিকা বলেছেন — "কিন্তু সুবর্ণলতা কেন বহির্জগতে বহমান বাতাসের স্পর্শ চায়? এ বাড়ির বৌ হয়েও তার সমস্ত সত্তা কেন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করে? তার পরিবেশ কেন অহরহ তাকে পীড়া দেয়, আঘাত হানে?"[৪৮] লেখিকা চিত্রগুপ্ত ও বিধাতাপুরুষের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সুবর্ণলতার সময়ে ও রক্ষণশীল পরিবেশে সুবর্ণর মতো আপন সত্তা সন্ধানী নারীর বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিত্রগুপ্ত বলেছেন বিধাতাপুরুষকে — "আজ্ঞে হুজুর বামুনদেব। যে মেয়েটা সেই পনেরো বছর বয়স থেকে মরণকামনা করতে করতে এই পঞ্চাশ বছরে সত্যি মলো।"[৪৯] বিধাতাপুরুষ বলেছেন — "তাই নাকি? তা জীবনভর মরণকামনা কেন? খুব দুঃখী ছিল বুঝি?"[৫০] চিত্রগুপ্ত ও বিধাতাপুরুষ সুবর্ণর ষোলো আনা সুখের সংসারে দুঃখের কারণ খুঁজতে অসমর্থ হন। সুবর্ণলতার অন্তরদাহকে আবিষ্কার করার অবকাশ নেই সমাজের। তবুও তো সুবর্ণলতার মত বহু নারী তিলে তিলে অন্তরের দহন নিয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। সমাজ সংসারের কেউ তাদের সুখের সংসারে বিসংগতি খুঁজে পায় না কিন্তু সে বিসংগতি ধরা পড়েছে আশাপূর্ণা দেবীর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে।

যে সমাজে কন্যাসন্তানের জন্ম হলে শাঁখ বাজানো পর্যন্ত নিষিদ্ধ, সেই সমাজ মেয়েদের 'পরপুরুষে'র সঙ্গে কথা বলার অধিকারও দেয় না। বড় ননদাই কেদারবাবুর সঙ্গে সুবর্ণ সমুদ্র দেখার কথা বললে মুক্তকেশী ক্রুদ্ধ হয়েছেন। মুক্তকেশী মেয়েদের অন্দরমহলে থাকাকে সমর্থন করেছে যাতে পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলতে না পারে তাই। একইভাবে মল্লিকবাবুর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপার নিয়ে মুক্তকেশী সুবর্ণকে 'নষ্ট মেয়েমানুষ' বলেছেন। মেয়েদের জীবনের পরিধি স্বামী পুত্র ও সংসারের মধ্যেই সীমায়িত। মুক্ত পৃথিবীতে শ্বাস নেবার তাদের অধিকার নেই। এই বাঁধন কেউ কেউ অমান্য করতে চায়। তাদের মধ্যে সুবর্ণলতা একজন। তাইতো লেখিকা বলেছেন — "সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।"[৫১]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র মতো 'সুবর্ণলতা'য়ও দেখা গেছে বউ ঝিদের অবমাননার দিক, আশ্রয়হীনতার ভয় অপরদিকে দেখা গেছে গৃহিণীদের দাপটের বাহার। গৃহিণীরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষতন্ত্রের বাহক হিসেবে অন্তঃপুরেও পুরুষতন্ত্রকে বহাল রেখেছে। তাইতো লেখিকা বলেছেন — "গৃহিণী মেয়েরা যদি এতটুকু সহানুভূতিশীল হতো, হতো এতটুকু মমতাময়ী, হয়তো সমাজের চেহারা এমন হতো না। তা হয় না, তারা ওই অত্যাচারী পুরুষসমাজের সাহায্যই করে। সে পুরুষেরা 'সমাজ সৌধ' গঠনের কালে মেয়ে জাতটাকে ইট পাটকেল চুনসুরকি ছাড়া কিছু ভাবে না।"[৫২] মেয়েদের অপমানজনক অবস্থানের দিকে লক্ষ্য করে সুবর্ণ দেশকে উদ্ধার করার আগে,

স্বাধীন করার আগে মেয়েদেরকে অপমানের দলদল থেকে তুলে আনার কথা বলেছে। সে বলেছে — "মিথ্যা তোমরা দেশকে উদ্ধার করার স্বপ্ন দেখছো অম্বিকা ঠাকুরপো। দেশকে আগে পাপমুক্ত করার চেষ্টা করো। .... এই মেয়েমানুষ জাতটাকে যতদিন না এই অপমানের নরককুণ্ডু থেকে উদ্ধার করতে পারবে, ততদিন সব চেষ্টাই ভস্মে ঘি ঢালা হবে।"[৫৩]

বিংশ শতাব্দীতে মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল পরিবারে মেয়েদের স্বাধীনতা না থাকলেও উচ্চবিত্ত এবং ব্রাহ্মসমাজে মেয়েদের ক্ষেত্রে বহু স্বাধীনতা লক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া জীবিকার প্রয়োজনে নিম্নস্তরের নারীর ক্ষেত্রে সমাজের অনুশাসন বহু ক্ষেত্রে শিথিল ছিল। জীবিকার প্রয়োজনে নিম্নস্তরের নারীরা বহির্জগতে অনায়াসে বাইরে বিচরণ করেছে; রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে।

উনিশ শতকের অফিসবাবুর দল বিশ শতকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। বিশ শতকের দুরন্ত কর্মগতির মধ্যেও আড্ডা দিয়ে, মেয়ে জাতটাকে ব্যঙ্গ ও অবজ্ঞা করে গৌরব বোধ করেছে তারা, আধুনিক সমাজকে উঁকি মেরে দেখেছে। মুক্তকেশীর পরিবারে প্রগতির বাতাস না বইলেও মুক্তকেশীর সংসারে যুগ-প্রলয় ঘটিয়ে মুক্তকেশীর কলমের উপরে কলম চালিয়ে মুক্তকেশীর সংসারে মাইনে করা রাঁধুনি রেখে সুবর্ণ মেয়েদের 'রান্না আর খাওয়া' এই অবস্থানগত প্রবাদের ভিত হিলিয়ে দিয়েছে। যেভাবে পালকির হ্রাস পাওয়া, রাঁধুনি বামুনের চাহিদা বাড়া সমাজের ক্রমশ পরিবর্তন ও বিকাশের আভাস দিয়েছে। ঠিক তেমনি ধীরে ধীরে বিবর্তিত হয়ে চলেছে মেয়েদের অবস্থানেরও যা ঘটেছে 'সুবর্ণলতা'র শেষের দিকে। লেখিকা বলেছেন — "মেয়েরা ক্রমশই 'বাবু' হয়ে উঠেছে, রান্নার ভারটা চাপাচ্ছে উড়িয়া কুলতিলকের হাতে।"[৫৪] একদিকে লেখিকা সমাজে প্রগতির দিক দেখিয়ে উচ্চবিত্ত ও ব্রাহ্মঘরের মেয়েদের স্বাধীনতার কথা বলেছেন — "যারা বেম্ম, যারা খ্রীষ্টান, যারা সনাতন ধর্মত্যাগী ইঙ্গবঙ্গ, যারা বাঙালী হয়েও 'সাহেব' তাদের ঘরের মেয়েরাই যা নয় তাই করছে। তাদের মেয়েরাই ডাক্তার হচ্ছে, মাস্টার হচ্ছে, দেশসেবিকা হচ্ছে, সমাজ-সংস্কারিকা হচ্ছে, হট হট করে রাস্তায় বেরোচ্ছে, 'পিরিলি' করে শাড়ী পরছে, জুতো মোজা পরছে। ছেলেদের মতন খেলাঘরের ছাতা হাতে নিয়ে বেড়াচ্ছে।"[৫৫] তারই বিপরীত রক্ষণশীল পরিবার সমূহের নারীর অপরিবর্তনীয় অবস্থান ও অন্তঃপুরের নারীর বন্দিত্বকে দেখিয়েছেন লেখিকা — "এই যে প্রবোধের ওপাড়ার বন্ধু শশীশেখরদের বাড়ি? সুবর্ণ জানে না তাদের কথা? ... এখনো তাদের বাড়ির মেয়েরা চন্দ্রসূর্য কেমন তা জানে না, ভাদ্রবৌরা কখনো ভাসুরের সামনে বেরোয় না। শশীশেখরের দাদা যখন বৈঠকখানার দিক থেকে অন্দরের দিকে আসেন বা তিনতলা থেকে একতলায় নামেন, ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে পদক্ষেপ করেন না? ছোট একটা পেতলের ঘণ্টা থাকে না তাঁর হাতে?"[৫৬]

তবে সুবর্ণলতার সমাজে যে প্রগতি এসেছে তা কেবল এসেছে আলোকপ্রাপ্তদের ঘরে, ধনীর ঘরে। আর রক্ষণশীল সমাজ প্রগতির পরিভাষাকে অন্য রূপে নিয়েছে। তারা প্রগতি বলতে বুঝেছে পরিমলবাবুর ভগ্নির কালোয়াতি গান শেখাকে, ভানুর মামাত শালার ভায়রা বউএর বিলেত যাওয়াকে, কানুর পিসতুতো শালির পিরিলি করে শাড়ি পরা, কাঁধে ব্রোচ এঁটে, আর পায়ে জুতো-মোজা চড়িয়ে একা রাস্তায় যাওয়া-আসাকে। বউদের ঘোমটা খোলা, মোটরগাড়িতে মুখ খুলে

বেড়ানো তাদের কাছে পয়সা থাকার চিহ্ন বলে মনে হয়েছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে গ্রাম গঞ্জে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন না থাকলেও নাগরিক জীবনে স্ত্রী শিক্ষা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণলতা স্কুলে গেছে। সুবর্ণলতাতেও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের আভাস রয়েছে। সুহাসিনী শিক্ষয়িত্রী হয়েছে। তবে স্ত্রী শিক্ষা সে সময় প্রধানত উচ্চবিত্ত ও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সুবর্ণলতার সময়ে স্ত্রী শিক্ষা সমাজে সর্বস্তরের প্রসার লাভ করলেও রক্ষণশীল পরিবারসমূহে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ছিল না। মুক্তকেশীর রক্ষণশীল পরিবারেও ছেলেদের শিক্ষার প্রচলন থাকলেও মেয়েদের শিক্ষার প্রচলন ছিল না। সুবর্ণ আসার পর মুক্তকেশীর রক্ষণশীল পরিবারে খবরের কাগজ এসেছে, ছেলে মেয়েদের একসঙ্গে পড়াতে বসিয়েছে সুবর্ণ। তবে মুক্তকেশীর সংসারে থাকাকালীন বড় মেয়ে চাঁপা এবং চন্ননকে স্কুলে ভর্তি করতে পারেনি। তবে নিজের সংসারে এসে মেয়ে পারুল ও বকুলকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছে। তবে রক্ষণশীল প্রবোধচন্দ্র ও তাদের পুত্ররা পারুল ও বকুলকে স্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে রক্ষণশীল মনোভাবই পোষণ করেছে। মার সঙ্গে বাবা ও দাদার সংঘর্ষতে পারুল অপমানবোধ করেছে এবং স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। তবে সুবর্ণলতার রক্ষণশীল ছেলেরা শেষের দিকে স্ত্রী শিক্ষার কিছু সমর্থন করলেও নিজের বোনদের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মনোভাবই প্রকাশ করেছে। ভানু তার বড়লোক বন্ধুর ভাইঝির এন্ট্রান্স পাশকে ও বৃত্তি পাওয়ার কথা নিয়ে বন্ধুর ভাইঝির গুণগান করলেও বোন বকুলের পড়ার ইচ্ছাকে অবহেলা করে বলেছে — "মাস্টার? তোমার জন্যে যদি চারশো টাকা খরচ করেও মাস্টার পোষা হয়, কিচ্ছু হবে না, বুঝলে? ওসব আলাদা ব্রেন। তোমার জন্যে মাস্টার রাখলে তুমি আর একটু ঔদ্ধত্য শিখবে, আর একটু অসভ্যতা। হু।"[৫৭] কানুর পিসশ্বশুরের দিকের শালি মাস্টারনি হয়েছে। তবে পারুল বকুলকে পড়ানোর ব্যাপারে মাকে সমর্থন করেছে। পরবর্তীতে মধ্যবিত্ত ঘরেও একটু একটু করে প্রগতির আলো ঢুকছিল 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের শেষের দিকে এর আভাস মিলে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সময় স্ত্রী শিক্ষা গ্রামে গঞ্জে প্রবেশ না করলেও সুবর্ণলতায় স্ত্রী শিক্ষার প্রচার গ্রামে গঞ্জেও হয়েছে। ধীরে ধীরে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে শিক্ষার প্রসারে। সুবালার দেবর অম্বিকা সুবালাদের গ্রামে পাঠশালা খুলেছে। সুবালা বলেছে — "হুঁ। আমার দ্যাওর যে গাঁয়ের লোকের পায়ে ধরে ধরে গাঁয়ে একটা মেয়ে-পাঠশালা বসিয়েছে গো। তা নিজেদের ঘরের মেয়েদের তো আগে পাঠাতে হবে! নচেৎ ফাঁসি।"[৫৮] অম্বিকা মেয়েদের স্কুলই খুলে নি স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের যোগদানকেও সমর্থন করেছে। 'সুবর্ণলতা'র শেষের দিকে পথে ঘাটে মেয়েদের দেখা গেছে, মেয়েস্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, মেয়ে শিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব দিকের উল্লেখ করে লেখিকা উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি হয়েছে তারই আভাস দিয়েছেন।

'বকুলকথা' উপন্যাসে বকুল তথা লেখিকা অনামিকা দেবী নিজের জীবন, মা সুবর্ণলতা

এবং দিদিমা সত্যবতীর জীবনের সঙ্গে বর্তমান যুগের নারীর তুলনা করেছেন। সেকালের নারীদের সংগ্রাম, যন্ত্রণা, অবদমন এবং মুক্তির আকাঙক্ষার সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের নারীদের জীবন ও সামাজিক অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের নারীর প্রকৃত অবস্থানের স্বরূপ খোঁজার চেষ্টা করেছেন। 'সুবর্ণলতা'য় যে নারীমুক্তি ও প্রগতিশীলতা শুধু উচ্চবিত্ত ও ব্রাহ্মসমাজের নারীরাই ভোগ করতে পেরেছে সেই নারীমুক্তির স্বাদ 'বকুলকথা'য় এসে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরাও পেয়েছে। যে নারী মুক্তির জন্য বকুলের মা দিদিমা'রা সংগ্রাম করে পথ তৈরি করেছে সেই পথ দিয়ে বকুল অনায়াসে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে মুক্তির স্বাদ নিতে পেরেছেন। যেখানে সত্যবতীর যুগে তালপাতার পুঁথিতে হাত দেওয়াকে পাপ বলে গণ্য করা হত, তারই উত্তরসুরী নাতনি বকুল একালের প্রেক্ষাপটে এসে পুরুষের সমকক্ষ হয়ে স্বনামধন্য লেখিকার স্থান পেয়েছেন। সুবর্ণলতার বকুল 'বকুলকথা'য় এসে লেখিকা অনামিকা দেবী নামে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে সত্য ও সুবর্ণর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। লেখিকা অনামিকা দেবী 'বকুলকথা'য় এসে দর্শকের নির্লিপ্ত নয়নে মা, দিদিমাদের সময়ের নারীর স্থান এবং শম্পাদের সময়ের মেয়েদের অবস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজেছে। শুধু তাই নয় বকুলের দিদি পারুল 'বকুলকথা'য় তাদের মা দিদিমাদের বন্ধন যুক্ত কাল সেকাল ও ভাইঝি শম্পার নারী স্বাধীনতার কাল একালের মধ্যে তাদের কালকে খুঁজেছে। 'বকুলকথা'য় বকুল ওরফে অনামিকা দেবী মা দিদিমাদের সংগ্রাম কতটা সফলতা পেয়েছে, না শেকল ছেঁড়ার আনন্দে প্রগতির নামে স্বেচ্ছাচার করে চলছে আধুনিক নারীরা, তারই উত্তর খুঁজেছেন। পারুল একালের মেয়েদের স্বাধীনতা দেখে নিজেদের ও মা দিদিমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ব্যর্থতার জীবনকে, গ্লানির জীবনকে মনে করেছে। পারুল একালের মেয়েদের স্বাধীনতা দেখে বলেছে — "আমি আমার মাকে দেখেছি — দেখেছি জেঠিমা কাকিমা পিসিমাদের, দেখেছি আমার শাশুড়ি খুড়শাশুড়িদের। ওপরওয়ালার জাঁতার তলায় নিষ্পিষ্ট সেই জীবনগুলি শুধু অপচয়ের হিসেব রেখে চলে গেছে ...... আমরাও আমাদের বধূজীবনে সেই অপচয়ের জের টেনেই চলে এসেছি আর ভেবেছি আমাদের 'কাল' আসতে বুঝি বাকি আছে এখনো। সেই আসার পদধ্বনির আশায় কান পেতে বসে থাকতে থাকতে দেখছি আমরা কখন যেন বাতিলের ঘরে আশ্রয় পেয়ে গেছি।"[৫৯]

'বকুলকথা'য় এসে নারীর এক পরিবর্তিত রূপ দেখা যায়। নারী আর মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছে না। নারী পুরুষের সমান অধিকারই পেয়েছে। নারীর বন্দিত্ব কেটে গেছে নারী পুরুষের সমানে সমানে বাইরে বেরিয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারছে। 'বকুলকথা'য় নারীর অবস্থার বিবর্তন ঘটেছে। যেখানে বকুল বড় হবার পর বাপ ভাইয়ের ভয়ে নির্মলের বাড়িতে যেতে সাহস করেনি তারই ভাইঝি শম্পা একালে এসে হাসিমুখে ছেলেদের সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছে। একের পর একের সঙ্গে প্রেম সম্পর্ক স্থাপন করেছে, শুধু তাই নয় নিজের প্রেমের গল্প পিসি অনামিকা দেবীর কাছে দ্বিধাহীনভাবে করেছে। এমনকি মা বাবার বিরুদ্ধাচরণ করে আশ্রয়হীনতার ভয় না করে অজানিতের পথে পা ফেলেছে সত্যবানের হাত ধরে। শম্পা মা বাবার অনুশাসন, সামাজিক অনুশাসন মেনে

চলে নি। শম্পা জাতপাতের ভেদাভেদের মতো পরম্পরাগত ধ্যানধারণাকেও অস্বীকার করেছে।

যে বাড়িতে সুবর্ণ বহির্জগতের স্পর্শের জন্য ব্যাকুল ছিল সেই বাড়িতে আবার তারই নাতিনী শম্পা বহির্জগতের ছাড়পত্র পেয়ে গেছে। সুবর্ণলতার পরিবারের অন্য এক মেয়ে সত্যভামাও বাইরের স্বাদ পেয়েছে, পেয়েছে মুক্তির বাতাস। নির্মলদের বাড়িতে না যাবার জন্য যে বড়দাদা বকুলের উপর পাহারা বসিয়েছে তারই ছেলে অপূর্বর মেয়ে বয় ফ্রেণ্ড এর সঙ্গে ঘুরতে যাবার ছাড় পেয়েছে। অলকা মেয়ে সত্যভামাকে নিজের মতো করে গড়তে চেয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী সত্যভামার জীবনকে দিয়ে আধুনিক ভোগবাদী উগ্র স্বাধীনতার দিকটি তুলে ধরেছেন। সত্যভামার জীবন আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদে বিসর্জিত হয়েছে। অতিশয় আধুনিক হতে গিয়ে সে ফাঁদে পড়েছে ভোগবাদী সমাজ সংস্কৃতির তাই তার জীবনযাত্রায় ধরা পড়েছে উচ্ছৃঙ্খলতা, উগ্র নারীত্ব। সত্যভামার প্রসঙ্গে উগ্রতাকে এভাবে দেখানো হয়েছে — "ব্লাউজের গলার এবং পিঠের কাট এতো নামিয়ে ব্লাউজটা গায়ের সঙ্গে আটকে রেখেছে কি করে সত্যভামা? নাভির এতো নীচে শাড়িটাকে পরেছে কি করে? ওই নখগুলো এতো লম্বা লম্বা হলো কী করে? ও কি নিজেই বুঝে ফেলেছে ওর ওই দেহখানা ছাড়া আর কোনো সম্বল নেই, নেই কোন সম্পদ? তাই ওই দেহটাকেই — কী অশ্লীল! কী অরুচিকর!"[৬০]

'বকুলকথা'য় এসে দেখা গেছে বিধবাদের রীতি নীতি শিথিল হয়ে এসেছে। সামাজিক বাধ্যবাধকতা লোপ পেয়েছে। যদিও বহু বিধবা পুরনো রীতিনীতি মেনে চলেছে। সুবর্ণ আমরণ যে সত্তা পাবার জন্য চেষ্টা করেছে তারই মেয়ে পারুল একালে এসে দুই ক্লাস ওয়ান অফিসারের মা হয়ে বিধবা হবার পরও নিজস্ব সত্তা নিয়ে বেঁচেছে। সে সমাজ প্রচলিত বিধবাদের সমস্ত নীতি নিয়মকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়ে বিধবাদের উপর সমাজের কঠোরতার দিকটি শিথিল হবার আভাস দিয়েছে।

এ যুগের মেয়েরা নিজের জীবন বাজি রাখতে দ্বিধা করে না। এ যুগের নারীর গতি সম্পর্কে অনামিকা দেবী বলেছেন — "জল মানে না, আগুন মানে না, কাঁটাবন মানে না, গড়গড়িয়ে এগিয়ে যায়।"[৬১] পারুলও আধুনিক নারী সম্পর্কে নিজের মতামত তুলে ধরেছে। সে বলেছে — "যারা জাত শব্দটাই মানে না, তাদের আর জাত যাবার ভয় কি? এরা দেখছে সুবিধাবাদীরা ধুনি জ্বেলে জ্বেলে ধোঁয়ার পাহাড় বানিয়ে বলছে, 'এ হচ্ছে অলঙ্ঘ্য হিমালয়।' ব্যস, অলঙ্ঘ্য 'যেই না যুগ তাকে ধাক্কা দিয়ে দেখতে গেল, দেখলো পাথর নয়, ধোঁয়া,— পার হয়ে গেল অবলীলায়।"[৬২] এই অলঙ্ঘ্যকে অতিক্রম করার নেশায় নমিতা লক্ষ্মী বউয়ের ভূমিকা থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হয়েছে। সে অগাধ স্বাধীনতা লাভ করেছে। সেকালের মতো শুধু ভাতের জন্য, নিরাপত্তার জন্য, সামাজিক পরিচয়ের ভয়ে লক্ষ্মীবউ-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ থাকে নি নমিতা। আজকের মেয়েরা জীবনকে নানাভাবে গড়ে তুলতেই ব্যস্ত। নমিতা লক্ষ্মীবউ-এর দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য অভিনেত্রী রূপছন্দার আবরণ ধারণ করেছে। সত্যভামা উগ্র আধুনিকতার জামা পরেছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্য অস্তিত্বের লড়াই করতে গিয়ে শাশুড়ি স্বামী সমাজের বিরূপতা করেছে, কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ককে অস্বীকার করে নি। সুবর্ণ স্বামীকে ভাল না বাসলেও স্বামীকে ত্যাগ করে নি। কিন্তু 'বকুলকথা'য় এসে মতের অমিলে শোভনের স্ত্রী রেখা স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা ভেবেছে। মোহন ও তার স্ত্রীর মধ্যেও মতের অমিল দেখা গেছে। মহিলা সমিতির কাজের অজুহাতে স্বামীর মতের বিরুদ্ধে রাত এগারোটায় ঘরে এসেও স্বামীর সঙ্গে থাকা জীবনকে বন্দিত্ব মনে করেছে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইন হওয়ার পর থেকে নারীকে আর অবমাননার সঙ্গে স্বামীর ঘর করতে হয় নি। নিজের ইচ্ছায় স্বামীকে অনায়াসে ত্যাগ করে স্বাধীন জীবনযাপনে সক্ষম হয়েছে তারা। তাই পারুলের মায়ের দুঃখময় জীবনের কথা মনে পড়েছে। মায়ের সময় বিবাহ বিচ্ছেদ আইন না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে। তবে বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে হওয়া সমস্যার ইঙ্গিতও লেখিকা দিয়েছেন উপন্যাসে। বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের ফলে আধুনিক, আত্মাভিমানী, স্বতন্ত্রতায় বিশ্বাসী পুত্রবধূ রেখা পুত্র, কন্যা ও স্বামীর সঙ্গে বাহ্যিকভাবে সুখী জীবনের মোহভঙ্গ করে বিবাহ বিচ্ছেদ করেছে। শোভন ও রেখা নিজেদের হৃদয়ের দ্বন্দ্বকেই বড় করে দেখেছে ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ থেকে। এই বিচ্ছেদের ফলে রেখার ছেলে বুড়োর মনে গভীর আঘাত হেনেছে। বুড়ো সম্পর্কের উপর বিশ্বাস হারিয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদের কুফলকে লেখিকা এভাবে বলেছেন — "এ যুগ কি ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার বিনিময়ে এদেশেও সেই একটা হতভাগ্য জাতি সৃষ্টি করলো, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতিরা যা নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে! যে হতভাগ্যেরা শিশুকালে বাল্যকালে তাদের জীবনের পরম আশ্রয় হারিয়ে বসে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতায় কঠিন হয়ে উঠবে, উচ্ছৃঙ্খল হবে, স্বেচ্ছাচারী হবে, সমাজদ্রোহী হবে অথবা একটা হীনমন্যতায় ভুগে ভুগে জীবনের আনন্দ হারাবে, উৎসাহ হারাবে, বিশ্বাস হারাবে।"[৬৩]

আধুনিক সমাজে নারীমুক্তির কুফলকে দেখে আশাপূর্ণা দেবী তিনটি যুগের মধ্যে সামঞ্জস্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তাইতো লেখিকা অনামিকা দেবীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন — "রেখা, আমরা সেই যুগকে দেখেছি, যে যুগে মেয়েরা পড়ে মার খেতো। আমরা তোমাদের যুগকেও দেখছি। তফাতটা খুব বুঝতে পারছি না। যুগের হাওয়া যুগের বিদ্যে বুদ্ধি বিচক্ষণতা কোনো কিছুই তো লাগছে না।"[৬৪] বর্তমান যুগে নারীরা বহির্জগতে বিচরণের সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের স্বাধীনতাও পেয়েছে এবং তারই সঙ্গে পুরনো মূল্যবোধকে হারিয়েছে। মূল্যবোধের অবনতি লেখিকার চোখে ধরা পড়েছে, তিনি বলেছেন — "এত সহজে চিরকালীন মূল্যবোধগুলো এমন করে ঝরে পড়ছে কী করে? একদা যারা বংশমর্যাদা, কুলমর্যাদা, পারিবারিক নিয়ম ইত্যাদি শব্দগুলোর পায়ে জীবনের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার আরাম-আয়েস বিসর্জন দিয়েছে। তারাই কেমন করে সেগুলো ভেঙে তার ভাঙা টুকরোগুলোকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছে?"[৬৫] অপূর্ব মেয়ে সত্যভামার হোটেলে নাচাকেও গর্বের সঙ্গে বলে বেড়িয়েছে।

এত অগ্রগতির মধ্যেও কোথাও যেন ফাঁক রয়েছে যা আশাপূর্ণার চোখে ধরা পড়েছে, যার ফলে পুরাতন সনাতনী চিন্তাভাবনা কখনো কখনো উঁকি মারছে। বকুলের ছোড়দা অনামিকা দেবী

সম্পর্কে মন্তব্য করে বলে — "মেয়ে বলেই তাই লেখা ছেপে দিয়েছে। ...... শুনতে পাস না ইউনিভার্সিটিতে পর্যন্ত গোবরমাথা মেয়েগুলোকে পাস করিয়ে দিচ্ছে? এই লেখা একটা বেটাছেলের নাম দিয়ে পাঠালে, দেখতে স্রেফ ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে চলে গেছে!"[৬৬] এভাবে মেয়েদের ক্ষমতায়নকে বর্তমান যুগেও অস্বীকার করতে দেখা গেছে। এমনকি 'নবীন ভারত' পত্রিকায়ও মেয়েদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে — "নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, প্রভাবতী দেবী এসব তো জানি, এই নতুন দেবীটি আবার কে? এ নির্ঘাত কোন মহিলার ছদ্মনামে কোন পুরুষ '. . . . লেখার ধরন যে রকম বলিষ্ঠ। . . . . অর্থাৎ 'বলিষ্ঠ' হওয়াটা একমাত্র পুরুষেরই একচেটে।"[৬৭] বিংশ শতাব্দীতে এসেও মেয়েদের অন্দরমহলের বন্দিত্ব ঘোচার পরও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে সমাজ পুরো বাদ দিতে পারে নি তাই তো মেয়েদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস করতে পারছে না সমাজ মানসিকতা। এভাবেই নারী অবস্থানের প্রেক্ষিতে, সামাজিক চলিষ্ণুতা আশাপূর্ণার লেখনবিশ্বের কেন্দ্রীয় আধেয় হয়ে উঠেছে। বিবর্তনের ধারাবাহিকতা ত্রয়ী উপন্যাসের মতো এমন তন্নিষ্ঠতায়, বাংলা সাহিত্যে খুব বেশি দেখা যায় নি।

বিভিন্ন প্রথার আড়ালে ত্রয়ী উপন্যাস :

সমস্ত মধ্যযুগ জুড়েই বাল্যবিবাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন থাকতে দেখা গেছে। প্রায় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই সমস্ত প্রথা দেখা গেছে। ধর্মীয় শাসন মেনে নিয়ে গৌরীদানের পুণ্য লাভের আশায় অভিভাবককুল মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিয়ে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছে। ফলে সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে বাল্য বিবাহের বহুল প্রচলন দেখা গেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে ঋতুমতী হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দিতে না পারলে অভিভাবকদের সমাজচ্যুত হতে দেখা গেছে উনিশ শতকেও। সমাজে তিরস্কৃত হওয়ার ভয়ে কুলীন ব্রাহ্মণেরা যে কোনো প্রকারে নিজের মেয়েকে কুলীন ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বিয়ের ক্ষেত্রে তাদের একমাত্র বিচার্য ছিল কুলীন ব্রাহ্মণ— ফলে বহু অল্পবয়সী মেয়েদেরও অসুস্থ বৃদ্ধ স্বামীর ঘর করতে হয়েছে। বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার ফলে মেয়েদের বিবাহিত, অসুস্থ, বয়স্ক ও দরিদ্র স্বামীর হস্তান্তর করেছেন কন্যাদায়গ্রস্ত অভিভাবকরা। বাল্য বিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণরা বহু পত্নী গ্রহণের সুযোগ পেয়েছে। কুলীন মেয়েদের অবমাননার সঙ্গে ঘর করতে হয়েছে বহুপত্নীক স্বামীর। ছোট ছোট মেয়েদের বধূরূপে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে এক দুর্বিষহ যন্ত্রণার সঙ্গে থাকতে হয়েছে। আবার যদি কোনো কারণে এ সমস্ত মেয়েদের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে তবে তাদের দুঃখ হয়েছে সীমাহীন। সেই অল্পবয়সী বিধবা মেয়েদের আবাসস্থল হত বাপের বাড়ি বা কোনো আত্মীয়ের ঘরে। সেখানে তারা গলগ্রহ রূপেই কাটাত নিজের বাকি জীবন। আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসেও এই সমস্ত কুপ্রথার বলি হতে দেখা গেছে বহু নারীকে।

সত্যবতীর জন্ম হয়েছে সেকালে যখন গৌরীদানের পুণ্য অর্জনে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত

৭-৮ বছর বয়সে। সত্যবতীর জীবনেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। রামকালীর মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও মেয়েকে আট বছরে বিয়ে দেওয়ার মত ভুল করে বসেছে। সত্যর বিয়ে হয়ে গেছে আট বছর বয়সে। সত্যবতীর মা ভুবনেশ্বরীরও কম বয়সেই বিয়ে হয়ে গেছিল রামকালীর সঙ্গে। উপন্যাসে লেখিকা দেখিয়েছেন রামকালীর ত্রিশ বছর বয়সে নয় বছরের ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। লেখিকা বলেছেন — "ফেলু বাঁড়ুয্যের ন' বছরের মেয়ে 'ভুবি' বা ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে রামকালীর বিয়ে হয়ে গেল রামকালীর।"[৬৮] আবার সত্যবতীর বাল্যবিবাহকে লেখিকা তুলে ধরেছেন — "নাকে নোলক, কানে 'সার' মাকড়ি, পায়ে ঝাঁজর মল, বৃন্দাবনী-ছাপের আটহাতি শাড়িপরা আট বছরের সত্যবতী। বিয়ে হয়ে গেছে বছর খানেক আগে— এখনও ঘরবসত হয় নি।"[৬৯] বিয়ের পর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মেয়েদের বাপের বাড়িতে থাকতে হত, তারপর শ্বশুরবাড়িতে ঘরবসত করতে পাঠানো হত। সত্যর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সময়ের আগেই ঘরবসতের জন্য সত্যকে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে এসেছে এবং রামকালী দিতে না চাইলে এলোকেশী ছেলে নবকুমারের দ্বিতীয় বিয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছে। মোক্ষদাকেও আমরা উপন্যাসে বালবিধবা রূপেই পাই যার স্বামীর সঙ্গে সংসার করার আগেই স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে। শঙ্করীরও স্বামীগৃহে আসার আগেই স্বামীর মৃত্যু ঘটেছে। সত্যবতীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বামী নবকুমার ও শাশুড়ি এলোকেশী ষড়যন্ত্র করে সত্যকে না জানিয়ে সুবর্ণলতাকে ন' বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। আবার ভাবিনীর বোন পুঁটিরও কম বয়সে বিয়ে হয়েছে বরের দ্বিতীয় পক্ষ হিসেবে। বয়স্ক স্বামীর শারীরিক চাহিদা পূরণ করতে না পারায় প্রথমে শাশুড়ি ও স্বামী মিলে পুঁটিকে অত্যাচার করেছে এবং পরে তাকে হত্যা করেছে। এভাবেই এক একজন নারী তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহের শিকার হয়ে স্বামী ও শাশুড়ির হাতে কম বয়সেই প্রাণ হারিয়েছে। ভাবিনীর কান্নার মধ্য দিয়ে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের কুফল আমাদের সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে — "সকল খুনের শাস্তি আছে, পোড়া দেশে বৌ খুনের তো আর শাস্তি নেই! ওই ছেলের আবার এক্ষুনি ড্যাংডেঙিয়ে বিয়ে দেবে মাগী। যেতে আমাদেরই গেল। কচি বাচ্চা, ন বছর পেরিয়ে সবে দশে পা দিয়েছে ভাই, কিছু জানে না কিছু বোঝে না। আর কী ভাল মানুষ। শ্বশুরবাড়ি যাবার নামে সাত দিন ধরে খায় নি দায় নি, শুধু কেঁদেছে। গেল আর একটা মাসও না যেতেই এই। মায়ের আমার অবস্থাটা ভাবো।"[৭০] পুঁটির একমাত্র দোষ ছিল সে স্বামীর ঘরে ঢুকতে চায় নি। পুঁটির হত্যা করেও তারা ভয় পায় নি। বরং পুঁটির শাশুড়ি ছেলেকে আবার বিয়ে করানোর কথা ভেবেছে। এতকিছু হবার পরও এসমস্ত অত্যাচারী স্বামী ও শাশুড়ির ঘরে মেয়ে বিয়ে দিতে প্রস্তুত থাকে অনেক মায়েরা। সমাজে বহু বিবাহের প্রচলনের ফলেও এসমস্ত অন্যায় দেখতে পাওয়া গেছে। ভাবিনীর এক পিসি পুঁটির মৃত্যুর কারণ হিসেবে পুঁটিকেই দায়ী করেছে। তৎকালীন সমাজে কন্যাদায়গ্রস্ত মায়েদের মানসিকতাও প্রকট হয়ে উঠেছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র মধ্যে। ভাবিনীর এক জ্ঞাতি পিসি মাকে বলেছে — "যেমন ন্যাকা করে মেয়ে তৈরী করা, হবে না শাস্তি? বিয়ে হয়েছে, বরের ঘরে যাবে না? আহ্লাদ! দোজপক্ষের বর, শুধু তোকে পুতুল খেলনা কিনে দিতে বে করেছে!"[৭১] তার এরূপ বলার মধ্যে নিজের স্বার্থ রয়েছে সেটির

উল্লেখও করেছেন লেখিকা ভাবিনীর মুখ দিয়ে — "কি বলবো দিদি, নির্ঘাত পিসির মতলব খারাপ! নিজের একটা বারো তেরো বছরের ধেড়ে ধিঙ্গী মেয়ে আছে।"[৭২] ১৮৯১ বাল্যবিবাহ রোধ আইন কার্যকর হওয়ার ফলে বাল্যবিবাহ পুরোপুরি বন্ধ না হলেও কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। প্রসঙ্গটি লেখিকা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ভাবিনীর কথার মধ্য দিয়ে — "অত্যাচার তো আছেই ভাই জগৎ জুড়ে। মেয়েমানুষ তো পড়ে মার খেতেই জন্মেছে। তবে দুধের বাছাটা গেল, সেটাই বড় কষ্টের। এখনকার যে একটু বয়স হয়ে বে হচ্ছে সেটা ভাল। তোমার সুবন্নকে যে ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছ ভাল করেছ। তবু একটু বল-বুদ্ধি হোক।"[৭৩]

কুলীন মেয়েদের কুলীন পাত্র ছাড়া বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। গৌরীদান প্রথার ফলে সমাজে পতিত হবার ভয়ে উপযুক্ত কুলীন ছেলের অভাবে কমবয়সী মেয়েদেরও বয়স্ক অসুস্থ কুলীনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হত। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে তাইতো রাখহরি ঘোষাল লক্ষ্মীকান্তের লগ্নভ্রষ্টা নাতনি পটলীকে লাঞ্ছনার হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য তিন পত্নী থাকা হাঁপানী রোগগ্রস্ত দয়াল মুখুয্যের সঙ্গে বিয়ে দেবার কথা বলেছেন। যিনি লক্ষ্মীকান্ত থেকে বয়সে কয়েক বছর বড়। লক্ষ্মীকান্ত আপত্তি করলে রাখহরি বলেছেন — "হাঁপানিটা যমরোগ নয় লক্ষ্মীকান্ত, আয়ুর্বেদ মতে ওটা হচ্ছে জীওজ ব্যাধি। তাছাড়া বয়সের কথা যা বলছ ওটা কোনো কথাই নয়, পুরুষের আবার বয়েস। বরং মুখুয্যের আর দুটি পত্নীর ভাগ্য প্রভাবে তোমার এই অলক্ষণা পৌত্রীটির বৈধব্য-যোগ খণ্ডন হয়েও যেতে পারে।"[৭৪] নেহাৎ কুলীনদের কুলীন ব্রাহ্মণ ছাড়া বিয়ে হয় না তাই, না হলে রাখহরি ঘোষালই পটলীকে বিয়ে করতেন বলে রসিকতা করেছেন। কৌলীন্য প্রথার ফলে পটলীকে নির্দিষ্ট সময়ে বিয়ে দিতে না পারলে লক্ষ্মীকান্তের জাতটাই চলে যাবার আশঙ্কাও ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসে। ঘোষাল মহাশয় লক্ষ্মীকান্তকে তাঁদের কৌলীন্যর কথা মনে করিয়ে দেবার মধ্য দিয়ে সেকালের সমাজবাস্তবকেই উদ্ঘাটিত করেছেন — "...... নিজেকে সমাজের শিরোমণি ভেবে যতই তুমি নির্ভয়ে থাক, এর পর অর্থাৎ তোমার ওই পৌত্রীকে নির্দিষ্ট লগ্নে পাত্রস্থ করতে না পারলে সদ্ব্রাহ্মণরা তোমার গৃহে জল গ্রহণ করবেন কি না সন্দেহ। এই দুঃসময়ে অপোগণ্ড একটা ছুড়ির বুড়োবর দুজোবরের ভাবনা তুমি ভাবতে বসছ, কুলমর্যাদা, ধর্মসংস্কার, জাতি মান এসব বিস্মৃত হচ্ছ, এ একটা তাজ্জব বটে।"[৭৫] এভাবেই দেখা গেছে কৌলীন্য প্রথা প্রচলনের ফলে কমবয়সী মেয়েরাও কখনও কখনও বৃদ্ধ স্বামীর ঘর করেছে। আবার বাল্যবিবাহে বলি হওয়া বালিকা কন্যার বধূরূপকে লেখিকা রামকালীর দৃষ্টিদর্পণে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। যখন রামকালী মেয়ে সত্যবতীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন, তখন— "দেখলেন একটা অন্ধকার-অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা চৌকির ধারে একগলা ঘোমটা ঢাকা একটি বালিকা-মূর্তি। পরনের শাড়িখানা জমকালো; বোধ করি পিতৃ সন্নিধানে আসার উপলক্ষে তাকে খানিকটা সাজিয়ে ফেলা হয়েছে।"[৭৬]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সময়ে বঙ্গদেশে বহুবিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। নারীরা সতীন জ্বালা থেকে মুক্তি লাভের জন্য 'সেঁজুতি বত্ত' ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সতীনের অমঙ্গল কামনা করেছে।

রামকালীর মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও রাসুর দ্বিতীয় বিয়ে দিয়ে সারদার জীবনে সতীন জ্বালা এনে দিয়েছেন। ঠিক একইভাবে পটলীকেও স্বামীর দ্বিতীয় পক্ষ হয়ে স্বামীর ঘর করতে আসতে হয়েছিল। ভয়, কুণ্ঠা সঙ্গে নিয়ে নিজেকে অপরাধী মনে করে। সারদার অতিরিক্ত কুটুম্বের মত ব্যবহারে পটলী একদিন ধৈর্য্যের ভার হারিয়ে ফেলে সারদাকে বলেছে — "তামাশা করছ?"[৭৭] নবকুমারের পিসতুতো বোন সৌদামিনীকেও দেখা গেছে স্বামী দ্বিতীয় পক্ষ আনলে তাকে স্বামীগৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে মামী এলোকেশীর দ্বারস্থ হতে। আবার অসুস্থ সতীনের দেখাশোনা করার জন্য স্বামী নিতে এলে সৌদামিনী চলেও গেছে। সতীনের মৃত্যুর পর সতীনের ছেলে মেয়েদের নিজের ছেলে মেয়ে মনে করে সেখানেই থেকেছে। উনিশ শতকের পারিবারিক জীবনের সম্পর্কের টানাপোড়েনে কৌলীন্য ও বহুবিবাহ বিচিত্র জট ও জটিলতা, আবার মানবিক উন্মোচন নিয়ে এসেছে, আশাপূর্ণার প্রতিবেদনে রয়েছে তার প্রতিবিম্ব।

বিংশ শতাব্দীতেও সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথার প্রচলন থাকায় এই সমস্ত প্রথার প্রভাব 'সুবর্ণলতা'তেও লক্ষিত হয়েছে। বাল্যবিবাহের শিকার হয়েই সত্যবতীর নয় বছরের কন্যা সুবর্ণলতা শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। যেখানে তার সহ্য করতে হয়েছে শাশুড়ি থেকে শুরু করে অন্যান্যদের নানা প্রকার অন্যায় ও অত্যাচারকে। নয় বছর বয়সে "সেই ছোট্ট বেলায় বেগুণী বেনারসী মোড়া সুবর্ণ যখন কাঁদতে কাঁদতে এদের বাড়িতে এসে দুধে-আলতার পাথরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ডুকরে উঠে বলেছিল, 'আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও গো, তোমাদের পায়ে পড়ি,' তখন চারদিক থেকে ছি-ছিক্কারের অগ্নিবাণে সুবর্ণ তো প্রায় ভস্ম হতে বসেছিল, মুক্তকেশী তো এই মারে কি সেই মারে,"[৭৮] শুধু বড় ননদ তাকে দুধের শিশু বলে সহানুভূতি দেখিয়েছিল। চাঁপার এগার বছর হয়েছে তাই পাড়ার সবাই ঠাকুরমাকে চাঁপা ও মল্লিকার জন্য নাতজামাই খোঁজার কথা বলেছে। সুবর্ণলতা যৌথ পরিবারের অন্নবস্ত্র ছিন্ন করে নতুন সংসার পেতেছে। চাঁপার বিয়ের পর চন্ননের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। কম বয়সেই উনিশ বছরের মল্লিকা বিধবা হয়ে এসে ঠাকুমার হেঁসেলে ভর্তি হয়েছে।

সুবর্ণলতার কালে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের প্রচলন থাকার প্রমাণ মেলে সুবালা অমূল্য ও অম্বিকার হাস্য পরিহাসের মধ্যে। তখন গ্রামের কোনো কোনো ঘরে কয়েকটা বুড়ো গিন্নি থাকার পরও আবার বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছে। দত্ত জ্যাঠামশাইও ভাগ্নীর ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেই বিয়ে করে বসেছেন। সুবালা হেসে বলেছে — "সম্পর্কটা অবিশ্যি খারাপ হল না। নাতবৌ হতো, বৌ হলো। তেরো আর তেষট্টি!"[৭৯] তবে সময়ের সাথে সাথে বাল্যবিবাহের প্রতি বিরূপ মনোভাবও দেখা গেছে অম্বিকা ও অমূল্যর কথোপকথনে। অম্বিকা কুলীন প্রথার বিরুদ্ধে এবং কুলীন ছেলেদের দুই তিনটি পত্নী রাখার কথাকে সমর্থন না করে তাদের সায়েস্তা করার কথা বলেছে। অমূল্য কিন্তু বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের জন্য মেয়েদের পিতৃকুলকেই দায়ী করেছে। এ প্রসঙ্গে সুবালা বলেছে — "দেয় ভাল ঘরে-বরে দিয়ে উঠতে পারে না বলে, নচেৎ টাকাকড়ির লোভে। এই তো তোমাদের দত্ত জ্যাঠামশাইয়ের ব্যাপারই তাই। মেয়ের বয়েস বেশি হয়ে গেছে,

জাত যাবার ভয়ে কাতর বাপ হাতের সামনে একটা বড়লোক বুড়ো পেয়ে —"[৮০] অম্বিকা বলেছে — "জাত! জাত যাবার ভয়! আশ্চর্য, এত অনাচারে জাত যাচ্ছে না, জাত যাবে শুধু মেয়েকে সাত সকালে বিয়ে না দিলে?"[৮১] তবে আশাপূর্ণা দেবী সমাজের বিবর্তনে এই সমস্ত প্রথার অবসান হচ্ছে এবং হবে তারও আভাস দিয়েছেন 'সুবর্ণলতা'র শেষের দিকে— "একদা বাল্যবিবাহের প্রয়োজন ছিল, তাই মেয়ের বাপের কাছে প্রলোভন বিছানো ছিল, কন্যাদান করে নাকি তারা পৃথিবীদানের ফল পাবে, পাবে গৌরীদানের। - - বিপরীত চোদ্দপুরুষ নরকস্থ। .... অর্থসমস্যা আর অন্নসমস্যার চাপে কন্যাদানের পুণ্যলাভের স্পৃহা মুছে আসছে সমাজের। অতএব এখন আর চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হচ্ছে না, হয়তো এমন দিন আসবে যেদিন এই সমাজই বলবে, 'বাল্যবিবাহ কদাচার, বাল্যবিবাহ মহাপাপ।"[৮২]

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে স্ত্রী শিক্ষার ফলে সমাজে আসা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে পুরনো সংস্কার ও প্রথাগুলি ক্রমশ ক্ষয়িত হচ্ছিল, ধ্বংস হচ্ছিল। তাই তো উনিশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে যেমন ছিল নানা কুসংস্কার, অন্যায় প্রথা, অবিচার ও অনাচার তেমনি সত্যবতীর চোখের সামনে ছিল এগুলোর সংস্কার সাধনে ব্রতী মহাপুরুষগণ। তাই প্রথা ও সংস্কারের মধ্যে জন্মেও সে এগুলির বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সমালোচক মন্তব্য করেছেন— "একটা ক্ষয়ে যাওয়া সমাজে — যেখানে সত্যবতীর লড়াই কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে নয়, তার লড়াই একটা শক্তির সঙ্গে। এই শক্তি শাস্ত্রের শক্তি, প্রথার শক্তি। সে শক্তি মানুষকে করেছে দুর্বল, জিজ্ঞাসাহীন, ভীরু।"[৮৩] উনিশ শতকের সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রভাব বিশ শতকেও সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণর মধ্যে লক্ষিত হয়েছে। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে যেমন দেখা গেছে প্রথা জর্জরিত সমাজ মানসিকতা তেমনি ফুটে উঠেছে প্রথার থেকে বেরিয়ে আসার বিবর্তিত মানসিকতাও। 'বকুলকথা'য় এসে সমাজ এ সমস্ত প্রথা থেকে মুক্তি পেয়েছে। আধুনিককালের প্রেক্ষাপটে রচিত 'বকুলকথা'র সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথার দৃষ্টান্ত নেই।

'বকুলকথা'য় এসে দেখা গেছে বকুল অবিবাহিত থেকে গেছে, বাবা প্রবোধচন্দ্রের মেয়েকে বিয়ে দেবার কোন প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায় না। পারুল বাবাকে বলেছিল "বকুলের তো বিয়ের বয়স হয়েছে, আমাদের হিসাবে সে বয়স পেরিয়েই গেছে, বিয়ে দিচ্ছেন না কেন?"[৮৪] এর থেকে এটি সহজেই প্রমাণিত হয় বকুলদের সময় বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। তবে বাল্যবিবাহের প্রচলন না থাকলেও বয়স্ক কুমারী মেয়েদের ভাল চোখে দেখা হত না। কুমারী মেয়ে বয়স্থ হলে সেটি লজ্জার ব্যাপার ছিল। লেখিকার ভাষায় — "তা বকুলদের আমলে বাস্তবিকই ওতে লজ্জা ছিল। বয়স্থা কুমারী মেয়েকে চোরের অধিক লুকিয়ে থাকতে হত।"[৮৫]

বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথা ছাড়া বঙ্গসমাজে প্রচলিত ছিল জাতিভেদ প্রথা, পণপ্রথা ইত্যাদি। প্রাচীনকালে মানুষের কর্মভিত্তিক শ্রেণিবিভাজন করা হয়েছিল। কর্মভিত্তিক শ্রেণিবিভাজন পরবর্তীতে বর্ণভিত্তিক শ্রেণিবিভাজনে পরিণত হয়ে সংকীর্ণ জাতিভেদ প্রথার রূপ

ধারণ করে। এই জাতিভেদ প্রথা সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্গদেশের সমাজে এই জাতিভেদ প্রথা খুব শক্তিশালী রূপে প্রকটিত হয়। বিংশ শতাব্দী জুড়ে এর প্রভাব লক্ষিত হয় যদিও শতাব্দীর শেষের দিকে জাতিভেদ প্রথার প্রকোপ কিছুটা লোপ পেতে থাকে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে এই জাতিভেদ প্রথা কঠিন রূপে ধরা পড়েছে। উপন্যাসের প্রথম দিকে দেখা গেছে রামকালী বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে গোবিন্দ গুপ্তের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। পিতা জয়কালী পুত্র রামকালী বেঁচে থাকার কথা শুনে খুশি হলেও জাতপাতের রক্ষণশীল মনোভাব তাঁকে ছেলে বেঁচে থাকার আনন্দ উপভোগ করতে দেয় নি। তাই তো তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি আনন্দ করবেন না শোক করবেন — "ছেলে বদ্যিবাড়ির ভাত খাচ্ছে, বদ্যিবাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এ তো মৃত্যু সংবাদেরই সামিল।"[৮৬]

গোবিন্দ গুপ্ত জাতে ব্রাহ্মণ নয় বৈদ্য তাই রামকালী গ্রামে ফিরে এলে তাকে কিছুদিন জাতে তোলা হয় নি। লেখিকা বলেছেন — "তবু কিছুদিন একটু জাতে-ঠেলা জাতে-ঠেলা হয়ে থাকতে হয়েছিল বৈকি রামকালীকে। বারবাড়িতে শুত, খেত, বাড়ির ছোট ছেলেপুলে দৈবাৎ কেউ রামকালীকে ছুঁয়ে ফেললে তাকে কাপড় ছাড়ানো হত। কিন্তু রামকালীই একদিন গ্রামকর্তাদের ডেকে নালিশ মানেন।"[৮৭] জাতপাতের আড়ালে থাকা সমাজের ভণ্ডামি লেখিকার চোখে ধরা পড়েছে। একদিন যে রামকালীকে জাতে ঠেলাঠেলি করা হয়েছিল সেই রামকালী আবার জাতের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল। রামকালীর ঐশ্বর্য দেখে গ্রামের লোক শীঘ্রই রামকালীকে জাতে তুলে নিয়েছিল সামান্য একটু প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে। এমনকি গ্রামের শিরোমণি ফেলু বাঁড়ুয্যে নিজের ন' বছরের মেয়েকে রামকালীর সঙ্গে বিয়ে দেন। জাতপাত ভেদের আরেকটি দৃষ্টান্ত : সত্য খেঁদিদের বাড়িতে মাছ ধরার জন্য পান্তাভাত আনতে যাওয়ার কথা বললে দীনতারিণী বলেছেন — "কি বললি? খেঁদিদের বাড়ি থেকে ভাত? কায়েত-বাড়ির ভাত নিয়ে ঘাঁটবি তুই?"[৮৮] এমনকি গরুর গোবর ছিটানোর পর শিবজায়াকে মোক্ষদা প্রশ্ন করেছেন শুদ্ধতার, গোরুর গোবর নিজের ঘরের না অন্যের ঘরের সে কথা জানতে চেয়েছেন।

জাতিভেদ প্রথার ফলে উচ্চবর্ণের লোকেরা তাদের থেকে একটু নিচু বর্ণের লোক বয়সে বড় হলেও পায়ের ধূলা নিতেন না। বয়স নয়, বংশকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তৎকালীন সমাজে। যার ফলে পটলীর বিয়ের পূর্বে বরের আসন্ন মৃত্যুর খবর পেয়ে রাখহরি ঘোষাল লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের ঘরে এলেও লক্ষ্মীকান্ত রাখহরি ঘোষালের পায়ে ধরে প্রণাম করতে পারেন নি — "লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে বয়সের সম্মান রাখতে জানলেও ঘোষাল ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো তো আর নেবেন না,"[৮৯] জাতিভেদ প্রথার প্রকোপ সত্যর শ্বশুরবাড়িতেও লক্ষিত হয়। নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে নবকুমারের ভবতোষ মাস্টারের বাড়িতে গিয়ে ইংরাজি শিক্ষার প্রসঙ্গে বলেছেন — "বামুনের ঘরের ছেলেগুলো যাচ্ছে শুদ্দুরের কাছে বিদ্যে নিতে। কলি পূর্ণ হতে আর কতই বা বাকি।"[৯০] শুধু তাই নয় ইংরাজি ভাষাকে তখন ম্লেচ্ছ ভাষা বলে মনে করা হত তাই নবকুমার ভবতোষ মাস্টারের কাছ থেকে পড়ে আসার পর জামাকাপড় ছেড়ে, গঙ্গাজল স্পর্শ করার পরই অন্য কিছু স্পর্শ করতে

পারত। আবার নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের সারা রাত উল্লাসী বাগদীর ঘরে কাটানো এবং কাশির দোষ থাকায় স্নান না করেই পূজা দেওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লেখিকা তৎকালীন সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত ভণ্ডামিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। 'সুবর্ণলতা'য় জগু অনাথ নিতাইকে বাড়িতে নিয়ে এলেও মুক্তকেশী নিতাইয়ের জাতটা কি তা জানার চেষ্টা করেছেন। জগু জাতপাতের ব্যাপারটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে মুক্তকেশী বলেছেন — "এই তোকে আর আমার মেজবৌমাকে এক বিধাতায় গড়েছে দেখছি। কথা কয়েছ কি অগ্নিমূর্তি। ঘরে দোরে ঘুরে বেড়াবে, জাত দেখবি না?"[৯১] 'সুবর্ণলতা'য় এসেও দেখা গেছে সমাজে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন রয়েছে। মুক্তকেশী নিত্য তাসের আড্ডায় যান, আবার সেখানে এক স্যাকরা-গিন্নীর সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায় বলে বাড়িতে এসে স্নান করেন। 'সুবর্ণলতা'র প্রথমদিকে মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে জাতপাতের বিচার দেখা গেলেও ক্রমশ জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠেছে সমাজ; তাইতো সুরাজের ছোট ছেলে মেম বিয়ে করলে সুরাজ সমাদরে বউকে ঘরে তুলেছে। সুবালা ও অমূল্য মেয়েকে বারেন্দ্র বামুনের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। তবে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা তখনো জাতপাতের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছিল না তার প্রমাণ বহন করে প্রবোধের উক্তি। প্রবোধ সুবালাকে বলেছে — "মেয়েগুলোকে অঘরে-কুঘরে বিয়ে দিচ্ছিস শুনলাম"[৯২] — তারই সঙ্গে সুবালার উত্তরে তৎকালীন সমাজেও কিছু পিতা মাতার জাতপাতকে পিছনে ফেলে মেয়েদের সুখটাকে প্রাধান্য দেবার মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে। সুবালা শিউরে ওঠে বলেছে — "দুগ্‌গা দুগ্‌গা! কি যে বল মেজদা! আমার কুলীনগিরিটা ওদের প্রাণের থেকে বড় হলো? ভাল ঘরে পড়েছে, খেয়ে পরে সুখে আছে, এই সুখ। তাতে লোকে আমায় 'একঘরে' করে করুক।"[৯৩]

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু জাতিভেদ প্রথা 'বকুলকথা'য় এসে অবলুপ্ত হয়েছে, তবে প্রাপ্তবয়স্কদের এবং রক্ষণশীলদের মানসিকতায় জাতিভেদ প্রথার ছাপ রয়েই গেছে। বকুলের বিয়ের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নির্মলের জেঠিমা বলেন — "বকুল হল নভেলপড়া একেলে মেয়ে, ও হয়তো একখানা 'লভ'-টভ করে বসে বাপকে বলে বসবে, 'বাবা, হাড়ি ডোম বামুন কায়েত যাই হোক, 'অমুক' লোকটার সঙ্গেই বিয়ে করতে চাই।"[৯৪] পারুল জাতপাতের ঊর্ধ্বে বকুলকে নির্মলের সঙ্গে বিয়ে দেবার সিদ্ধান্তে আধুনিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। তবে বকুলের পিতার কথার মধ্যেও একটু রক্ষণশীল মনোভাব দেখা গেছে। সে বলেছে 'ওদের সঙ্গে আমাদের কাজ হয়?"[৯৫] আবার পারুল নির্মলের জন্য বকুলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে জেঠাইমার থেকে অসম্মতির আভাস পেয়ে জাতপাত বর্তমানে ওঠে যাবার কথা বলেছে — "আপনাদের ওই রাঢ়ী-বারেন্দ্র গাঁইগোত্র? ওসব আর আজকাল ততো মানে না।"[৯৬] রক্ষণশীল মনোভাবাপন্নদের মধ্যে বকুলদের সময় জাতপাত একটু থাকলেও সমাজে জাতপাতের কড়াকড়ি ততটা না থাকার প্রমাণ মিলে পারুলের কথার মধ্য দিয়ে। তবে জেঠিমা "আমরা আজকালের নই পারু"[৯৭] এই কথার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজেও রক্ষণশীলতা বহাল রাখার চেষ্টা করেছেন বয়স্করা তার প্রমাণ বহন করে এনেছে। এভাবেই লেখিকা সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার উপস্থাপনা করেছেন আমাদের সামনে

এবং তারই সঙ্গে ক্রমশ তার অবলুপ্তির দিকটিও তুলে ধরেছেন। রয়েছে ঘুনে ধরা সমাজের রক্ষণশীলতাকে আঁকড়ে ধরার মানসিকতার উপস্থাপন।

আশাপূর্ণার কথাবিশ্বে পণ প্রথা ও যৌতুক প্রথার প্রসঙ্গ রয়েছে। কন্যার পিতা প্রতিশ্রুতি মতো ধন সম্পদ ও পণ্যসামগ্রী দিতে না পারলে বিয়ের আসর থেকে বরকে ঘুরিয়েও নিয়ে যেতে দেখা যেত। এমনকি বিয়ের পরও পণ্যসামগ্রীর জন্য কন্যাপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা হত। কন্যাপক্ষের লোক চেষ্টা করত বরপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার। পণপ্রথার জন্য তৎকালীন সমাজে মেয়ের জন্ম হলে বাড়ির লোকদের আনন্দ করতে দেখা যায় নি। বিবাহিত কন্যার পিতা যদি বরপক্ষের দাবি পূরণে অসমর্থ হত তাহলে মেয়ের উপর চলত নানা প্রকার নির্যাতন। বহু মেয়েকে সমাজে চলা যৌতুক প্রথার শিকার হয়ে প্রাণও হারাতে দেখা গেছে। সমস্ত উনিশ ও বিংশ শতাব্দী জুড়েই যৌতুক প্রথার বলি হতে দেখা গেছে নারীদের ও তার পরিবারের লোকদের। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই প্রথা কিছুটা কমে এলেও, বর্তমান যুগেও বহু নারীকে যৌতুক প্রথার বলি হতে দেখা যায়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তেও লেখিকা যৌতুক প্রথার ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। এলোকেশীকেও দেখা গেছে সত্যবতীকেও বিতাড়িত করে ছেলেকে আবার দ্বিতীয় বিয়ে করানোর পরিকল্পনা করতে। সত্যকে এলোকেশী নিজের ইচ্ছামত চালাতে না পারায় এলোকেশী নবকুমারের দ্বিতীয় বিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেছেন। তবে শুধু সত্যকে বশ করতে না পারার জ্বালাই একমাত্র কারণ নয়, তার পেছনে এলোকেশীর পণসামগ্রী ঘরে তোলার আশাও প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসে। তাই তো এলোকেশী রামকালী সত্যকে নিতে এলে খুশি হয়েছিলেন — "হাতে চাঁদ পেয়েছিলেন এলোকেশী। এবং নিশ্চিত ঠিক করে ফেলেছিলেন, এই সূত্রে বৌকে জন্মের শোধে বিদায় দেবেন। কারণ ইত্যবসরে আর একটি মেয়ে এলোকেশীর দেখা হয়ে গেছে, বয়স সাত-আট, ধরন-ধারন খুব নিরীহ, সর্বোপরি তার বাপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীনে-সোনার গহনায় মেয়ের সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবে।"[৯৮] 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সময়ে সর্বত্র পণপ্রথার প্রচলন ছিল তার আর একটি মর্মস্পর্শী দৃষ্টান্ত হল জটার বউ মার খেয়ে যমের দোরে চলে গেছে ভেবে জটার মার নাটুকে চিৎকারে পাড়ার লোকের প্রতিক্রিয়া — "দেখেছি। দেখতে আর বাকি কিছুই নেই। বুক যদি ফেটেছে, তো বৌ জীইয়ে ওঠায়। বড় আশায় ছাই পড়ল। ভাবছিল তো বেটা তার 'ভাগ্যিমান' হল। আবার এখুনি তার বে দিয়ে, দানসামগ্রী গয়নাপত্তর ঘরে তুলবে।"[৯৯] পণ বিয়ের আগে দিতে না পারলে বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে ঝগড়াঝাটিও হতে দেখা গেছে তৎকালীন সমাজে। এমনকি সত্যবতীর ছেলেদের বিয়ের প্রসঙ্গেও যৌতুক দেওয়া নেওয়ার আভাস পাওয়া যায়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র কাহিনি ও ঘটনায় এভাবেই তৎকালীন সমাজের অন্ধকার দিকগুলি পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন লেখিকা।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র মতো 'সুবর্ণলতা'র কালেও পণপ্রথার হদিশ মেলে। মুক্তকেশীও ছেলেদের বিয়েতে অনেক পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করেছেন তার আভাস দিয়েছেন লেখিকা — "ছেলেদের বিয়ে তিনি দিলেন। নগদ নিলেন, তত্ত্ব ঘরে তুললেন, এক কুটুমের নিন্দেয় শতমুখ এবং আর এক কুটুমের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন।"[১০০] এমনকি মুক্তকেশীর মেয়ে বিরাজেরও বিয়েতে পণসামগ্রী

দেওয়া হয়েছিল। পণসামগ্রীর জন্য বিরাজের বিয়ে প্রায় ভেঙে যাবার জো হয়ে গিয়েছিল। পাত্রের সন্ধান অবশ্য মুক্তকেশীর মেয়ে সুশীলাই নিয়ে এসেছিল। বিরাজের বিয়েতে বরের দানসামগ্রী প্রসঙ্গে সুশীলা বলেছে — "ফুলশয্যার তত্ত্ব, দানসামগ্রী, বরাভরণ, নমস্কারী, ননদঝাঁপি, কনের গা-সাজানো গহনা ইত্যাদি সর্বাধিক সৌষ্ঠবের ওপর আবার তিনশো টাকা নগদ।"[১০১] পণপ্রথার জন্য কন্যাপক্ষকে বহুসময় ঋণগ্রস্ত হতেও দেখা গেছে। তারও প্রমাণ মেলে সুবালার উক্তিতে — "ধার-দেনা আবার কোন্ গেরস্তটাকে করতে না হয়? কন্যেদায় উদ্ধার করতে ধার-দেনা করা তো চিরাচরিত বিধি।"[১০২] সুবর্ণলতার ছেলেমেয়েদের বিয়ের সময়ও যৌতুক প্রথার প্রচলন ছিল, সেই মধ্যবিত্ত রক্ষণশীল সমাজ মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে সুবর্ণর ছেলেমেয়েদের উপর। সুবর্ণর ছেলে মানুর জন্য সুবর্ণ এক গরীব পাত্রীর সন্ধান করলে সুবর্ণর মেয়ে সে বিয়েতে বাধা দেবার জন্য গাড়ি ভাড়া করে চলে এসেছিল মায়ের কাছে। চাঁপা মাকে বলেছে — "রূপ নিয়ে কি ধুয়ে জল খাবে মা? মেয়ে তো শুনছি ডোমের চুপড়ি-ধোয়া! মানুর মতন দামী ছেলেকে তুমি কানাকড়িতে বিকিয়ে দেবে? অথচ আমার পিসশ্বশুর অত সাধ্যসাধনা করলেন, তখন গা করলে না তুমি। উনি মেয়েকে মেয়ের ওজনে সোনা দিতেন, তার ওপর খাট-বিছানা, আর্শি, আলনা, ছেলের সোনার ঘড়ি, ঘড়ির চেন, হীরের আংটি, সোনার বোতাম —"[১০৩] এমনকি সুবর্ণর শিক্ষিত ছেলে মানুও চিঠির মধ্য দিয়ে যৌতুক প্রথারই সমর্থন করেছে। রূপের চেয়ে টাকা পয়সার উপরই তাকে বেশি গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে।

'বকুলকথা'য় এসে পণ প্রথার তেমন উল্লেখ করেননি লেখিকা। মেয়ের পিতা মাতাকে পণের জন্য তেমন ব্যতিব্যস্ত হবার কথা উল্লেখ নেই 'বকুলকথা'য়। মেয়েরা যথারীতি রোজগেরে হয়েছে, নিজের পছন্দে বিয়ে করেছে ঘর সংসার করেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে বিম্বিত সংস্কার ও রীতি নীতি :

ত্রয়ী উপন্যাসের 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে বিম্বিত সমাজ ছিল। নানা প্রকার সংস্কার ও রীতি নীতির অবগুণ্ঠনে আবৃত। তার তুলনায় 'বকুলকথা' অনেক বেশি সংস্কারমুক্ত। উনিশ ও বিশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি জুড়ে সমস্ত বাংলাদেশের সমাজ নানা প্রকার কুসংস্কার ও রীতি নীতির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। সমাজে প্রচলিত সংস্কার অনায়াসেই মানুষকে প্রতাড়িত করে ফেলে যার দরুন মানুষ হারিয়ে ফেলে নিজের বোধ ও বুদ্ধিকে। সমাজের সংস্কারগুলো মানুষের মজ্জাগত হয়ে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম অনায়াসেই বাহিত হয়ে গিয়ে যুগের পর যুগ টিঁকে থাকে মানুষের মানস প্রকৃতিতে এবং সমাজে নিজের ভিত গেড়ে নেয়। এই সমস্ত সংস্কারগুলির কবলে পড়ে মানুষ হারিয়ে ফেলে নিজের চিন্তাশক্তিকে, ভালমন্দ বিচারের ক্ষমতাকে। মানুষের হৃদয়, ইচ্ছা ও বিবেককে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে চলে আসা এই সমস্ত সংস্কার ও রীতি নীতিগুলি। আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসেও আমরা বিভিন্ন সংস্কার ও রীতি নীতির পরিচয় পাই। ঘুণে ধরা সমাজেও রীতিনীতি ও সংস্কারগুলোকে আশ্রয় করেই বেচে থাকতে চায় রক্ষণশীল সমাজের

মানুষ।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে আমরা বাঙালি সমাজের বিচিত্র সংস্কারের সঙ্গে পরিচিত হই। বিধবাদের হেঁসেলে বিধবা ছাড়া অন্য কারো প্রবেশের অধিকার নেই। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে বিধবাদের নানা প্রকার রীতি নীতি মেনে চলতে দেখা গেছে। রামকালীর যৌথ পরিবারেও রয়েছে একটি হেঁসেল যেখানে স্থান পেয়েছে দীনতারিণী, দীনতারিণীর সেজ জা শিবজায়া, দীনতারিণীর দুই ননদ কাশীশ্বরী আর মোক্ষদা তাছাড়া কাটোয়ার বউও স্থান পেয়েছিল নিরামিষ হেঁসেলে। তবে শঙ্করীকে তাঁরা শুদ্ধাচারী বলে ভাবতেন না তাই তার আনা জলও তাঁরা গ্রহণ করেন নি কখনও। বিধবাদের রাতে ভাত খাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। তাই তো বিধবার হাঁড়িতে পান্তাভাত থাকার কথাই নেই। সেজন্য সত্য পান্তাভাত চাইতে এলে মোক্ষদা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন — "আমাদের হেঁসেলে পান্তা চাইছে, আর তুমি সেই শুনে গা পাতলা করে হাসছ নতুন মেজবৌ? আর কত আহ্লাদ দেবে নাতনীকে? পরকাল যে ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে! বলি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যদি বিধবার হেঁসেল থেকে দুটো পান্তা চেয়ে বসে, তারা বলবে কি? একথা ভাববে না যে আমরা বুঝি গপগপ করে বাসি হাঁড়ির ভাতগুলো গিলি!"[১০৪] পূর্ণিমা-অমাবস্যা সহ নানা তিথিতে অন্নগ্রহণের নিয়ম ছিল না। ফলমূল খেয়ে থাকতে হত বিধবাদের। তৎকালীন সমাজে ভাগনে বউকে মামাশ্বশুর স্পর্শ করলে পাতক হয় বলে মনে করা হত এবং প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। জটার মৃতপ্রায় বউকে মামাশ্বশুর নাড়ি টিপে দেখার পর জটার বউ জীবিত হয়ে গেলে গ্রাম শুদ্ধ ছি ছি পড়ে যায়। মামাশ্বশুরের ছোঁয়া তার উপর মরে বেঁচে ওঠা বউকে তুলসীতলা থেকে ঘরে ঢোকানোর আগে দুটো প্রায়শ্চিত্ত জটার বউকে করানোর কথা বলেছেন গ্রামের লোক। জ্ঞাতি খুড়শাশুড়ি বললেন — "একে তো তুলসীতলায় বার করা, তা'পর আবার কত বড় অনাচার ভাবো, মামাশ্বশুরের ছোঁয়াচ খাওয়া! কবরেজ মশাই যখন নির্ভরসায় নাড়ি টিপে ধরলেন তখনই তো আমি 'হ্যাঁ'। অবিশ্যি উনি ভেবেছিলেন মরেই গেছে। আর মরে গেলে সৎকারের আগে দেহশুদ্ধু তো একটা করতেই হত। কিন্তু এ যে একেবারে জলজ্যান্ত জীইয়ে উঠল! প্রাচিত্তির না করলে কি করে চলবে?"[১০৫] তাছাড়াও খুড়শাশুড়ি বলেছেন তাঁদের বাপের বাড়ি দেশ হলে তুলসীতলার থেকে আর বউকে ঘরে ঢোকানো হত না বরং তার স্থান হত ঢেঁকশালে বা গোয়াল ঘরে। তাঁর কথা থেকে বোঝা যায় যে তৎকালীন সমস্ত বাংলা জুড়েই তুলসীতলায় একবার নেওয়ার পর বেঁচে উঠলেও ঘরে না ঢোকানোর সংস্কারই প্রচলিত ছিল। কোনো কারণে ঠিক করা লগ্নতে বিয়ে না হলে মেয়েকে 'লগ্নভ্রষ্টা' বলা হত। লগ্নভ্রষ্টা মেয়েকে সমাজ অপয়া মনে করত। যাতে মেয়ে লগ্নভ্রষ্টা না হয় তার জন্য একই লগ্নে অন্য কোন পাত্র যোগাড় করে বিয়ে দেওয়া হত। মেয়ে লগ্নভ্রষ্ট হলে বাড়ির লোকেদের জাত থেকে বের করে দেওয়া হত। তাই তো পটলীকে 'লগ্নভ্রষ্টা' হবার থেকে রক্ষা করার জন্য স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও রাসুর সঙ্গে পটলীর বিয়ে করিয়ে দেন রামকালী।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে বিয়ে সম্পর্কিত বাঙালি সমাজে প্রচলিত রীতি নীতিগুলোকেও লেখিকা দেখিয়েছেন। জন্মমাসে বিয়ে না হওয়ার বিধান রয়েছে সেখানে। কলাতলায় খেউরি করিয়ে স্নান

করানো, স্নান করিয়ে সোজা সম্প্রদানের পিঁড়িতে নিয়ে গিয়ে ধান দুর্বো আর আংটি দিয়ে 'পাকা দেখা' অনুষ্ঠানের প্রথা, সাত এয়োতে মিলে মাথায় করে শ্রী, কুলো, বরণডালা, আইহাঁড়ি, চিতের কাঠি, ধুতরো ফলের প্রদীপ সাজানো ইত্যাদি নিয়ে বরকনেকে প্রদক্ষিণ করা হত। তারপর কেউ একজন— "কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম, হাতে দিলাম মাকু, একবার 'ভ্যা' কর তো বাপু।"[১০৬] বলার পর বরকনেকে অর্থাৎ রাসু আর পটলীকে 'লক্ষ্মীর ঘরে' প্রণাম করিয়ে পায়ের গোড়ায় ঘটি ঘটি জল ঢালতে ঢালতে বাসরে নিয়ে যাওয়া হয়।

রামকালীর বাড়িতে পটলীর বিয়ের পরদিন নানা প্রকার রীতি নীতি ও আচার আচরণ পালন করা হয়েছিল নতুন বউকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য। অখণ্ড পোয়াতি রামকালীর জেঠতুতো খুড়ি নন্দরাণী আতপ চালের 'বৌছত্তর' আঁকেন। বউ এসে সদ্য উথলে-পড়া দুধ দেখলে সংসারে ধনে ধানে বৃদ্ধি হওয়ার ধারণা থাকায় দুধ উথলানোর ব্যবস্থা করা হয় রাসুর দ্বিতীয় পত্নী পটলীকে স্বাগত জানাতে। তাছাড়া পাথরের থালায় করে দুধে আলতা মিশিয়ে রাখা হয়েছিল। নতুন কনে গৃহপ্রবেশ মাত্রই শাঁখ আর উলুধ্বনিতে সমস্ত বাড়ি মেতে ওঠে। বিধবাদের অন্যান্য শুভ কাজে নিষেধ থাকলেও শাঁখ আর উলুধ্বনি দিতে তাদের কোনো বাধা ছিল না। যে কোনো শুভ কর্মে যে সমস্ত এয়ো রাখা হতো তাদের সধবা এবং অখণ্ড পোয়াতি হতে হত। ছেলের বিয়ের পর বউ বাড়িতে এলে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে যজ্ঞ হয়েছিল সারদার বিয়ের পর এবং রাসুর দ্বিতীয়বার পটলীর সঙ্গে বিয়ের পর। তবে সারদার বিয়েতে ঘটাটা একটু বেশি হয়েছিল। রাসুর প্রথম বিয়েতে মিষ্টির কারিগর এসেছিল নাটোর থেকে, কেষ্টনগর থেকে, মুড়োগাছা থেকে, বারো তেরো রকমের মিষ্টির আয়োজন হয়েছিল। মাছের ব্যবস্থাও হয়েছিল প্রচুর তবে রাসুর দ্বিতীয় বিয়েতে প্রথম বিয়ের মত ঘটা না করলেও দু রকমের মিষ্টি এবং ষোলো কুড়ির মত রান্নার পদও হয়েছিল। রামকালীই প্রথম গ্রামে হালুইকর ঠাকুর এনে রাঁধানোর প্রথা প্রবর্তন করেছেন। এর আগে কাজকর্মে গ্রামের ব্রাহ্মণ-কন্যারাই রেঁধে থাকতেন।

তৎকালীন সমাজে মেয়েদের নানারকম ব্রত পার্বণ করিয়ে শিশুকাল থেকেই পরকাল কুসুমাস্তীর্ণ করার ব্যবস্থা করা হত। তার মধ্যে রয়েছে সেঁজুতি ব্রত। এই ব্রতের মন্ত্রগুলিতে সতীনকে কাঁটা মনে করে তার অমঙ্গল কামনা করা হয়েছে। মেয়েদের যেমন নারায়ণ পূজার অধিকার ছিল না তেমনি তালপাতায় হাত দিলেও পাপ বলে মনে করা হত।

রামকালী সামাজিক প্রথা রীতিনীতি সংস্কারে তেমন বেশি বিশ্বাসী না হলেও মা দীনতারিণীর মৃত্যুর পর কালাশৌচের বছরটি বিধিনিষেধ মেনে চলেছিলেন। আচমনের পর তিনি কথা বলেন নি। সত্য সন্তানসম্ভবা হলে তাকেও অনেক বিধিনিষেধের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়তে হয়েছিল। সেই সব বিধিনিষেধগুলি হল পায়ের আঙুলে রুপোর আঙটি পরা, চুলের ডগা আর শাড়ির আঁচলে সর্বদা গিঁট বেঁধে রাখা, শত্রুপক্ষ জাতীয় কোন মহিলাকে দেখলে সরে থাকা এবং কোন মহিলার নজর পড়েছে বোধ হলে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া, দরজায় না বসা, দুজনের মাঝখান দিয়ে না

যাওয়া, সাঁঝ-সন্ধ্যেবেলায় উঠোনে না নামা, শনি-মঙ্গল বারে পথে না বেরোনো, ঘাটে পুকুরে একা না যাওয়া ইত্যাদি। সন্তান জন্মের পর আঁতুড়ঘরে কাঁদতে নেই ছেলের অকল্যাণ হয়, নাড়ির দোষ হবার ভয় থাকে এই ধারণা প্রচলিত ছিল সমাজে। তাই সত্যর মা মারা যাবার পর সত্য মায়ের মৃত্যুর খবর আঁতুড় ঘরে বসেই শুনেছিল। কিন্তু ছেলের অমঙ্গল হবার ভয়ে মা মরার খবরে কাঁদতেও পারেনি সে। কোথাও যাবার আগে পঞ্জিকা দেখে দিন ধার্য করার রীতি ছিল। সত্য শ্বশুরবাড়ি থেকে ছেলে মেয়ে নিয়ে কলকাতায় যাবার সময়ও পঞ্জিকা দেখে দিন ঠিক করা হয়েছিল।

সত্য কলকাতায় বাসা বাড়িতে চলে গেলে যে বাড়িতে সত্যদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটিতে কল বসানো ছিল কিন্তু তখন পর্যন্ত গ্রামে কলের জল খেলে জাত যায় বলেই ধারণা ছিল। ভবতোষ মাস্টার বললেন — "খুব খাসা বাড়ি। তিন-চারখানা ঘর, মস্ত দরদালান। রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, উঠোন, কুয়োতলা। জলের কলও নাকি আছে। বাড়ির ভেতর নয়, দরজার কাছে। থাক তার জল খেয়ে জাতজন্ম না খোয়ানোই ভাল। কুয়োর জল যখন আছে!"[১০৭]

আশাপূর্ণা দেবী 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে যে সময়কার পটভূমি তৈরি করেছেন তখনকার সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও সংস্কারমূলক কার্যগুলিকে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে রচিত 'সুবর্ণলতা'য়ও আমরা দেখতে পাই উনিশ শতকীয় সংস্কারগুলিকে মানুষ পুরোপুরিভাবে বাদ দিতে পারে নি যদিও সমাজে বহু পরিবর্তনই ঘটেছিল দীর্ঘকালের ব্যবধানে। কিন্তু মজ্জাগতভাবে স্থান পাওয়া সংস্কারগুলিকেও বাদ দিতে পারছিল না মানুষ। পুরনো ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের ক্ষয়ে কিছু লোক নিজস্ব অবস্থানকে সংকটময় মনে করে পুরনোকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরার প্রয়াস করছে। সেরকমই একটি চরিত্র মুক্তকেশী। উনিশ শতকের ধ্যান-ধারণা আবাল্য মেনে আসা সংস্কার মুক্তকেশী বিশ শতকে এসে ক্ষয়ে যেতে দেখে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সেই ধ্যান-ধারণাকে আরোও বেশি আঁকড়ে ধরে থাকতে চেয়েছেন তিনি। মুক্তকেশীর দর্জিপাড়ার নতুন বাড়িটা তৈরি হতে থাকলে সুবর্ণ একদিন যেতে চাইলে মুক্তকেশী বলেন — "শোনো কথা এখন যাবে কি? অদিনে অক্ষণে গেলেই হল? ভিটে বলে কথা। ঠাকুরমশাই শুভদিন দেখে দেবেন, বাস্তুপুজো করে তবে তো গৃহ প্রবেশ।"[১০৮] এই কথার মধ্য দিয়ে নতুন বাড়িতে প্রবেশের আগে শুভদিনে বাস্তুপূজা করার রীতিরই আভাস পাই।

'বকুলকথা'য় দেখা গেছে সমাজে নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটেছে। তারই সঙ্গে বহু রীতি নীতি শিথিল হয়ে উঠতে দেখা গেছে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'র সমাজে বিধবাদের যে সমস্ত কঠোর রীতি নীতি ছিল 'বকুলকথা'য় এসে বয়স্কদের মানসিকতায় সেগুলির প্রচলন থাকলেও সামাজিকভাবে নীতি নিয়মের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তাইতো পারুল বিধবা হয়েও বিধবাদের অনেক রীতিনীতিই মানে নি। তবে পারুলদের সময়েও বিধবাদের হরির শয়ন পড়ার পর পটল আর কলমি শাক খেতে মানা ছিল। অম্বুবাচীতে বিধবার আগুন স্পর্শ করাও নিষিদ্ধ ছিল কিন্তু পারুল একালে এসে এসমস্ত বিধি নিষেধকে অনায়াসেই পরিহার করে চলতে পেরেছে যেটি সেকালে কখনই সম্ভব হয়ে উঠত না। এ থেকে বোঝা যায় 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'র মত

'বকুলকথা'য় রীতি নীতির উপর তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা ও কঠোরতা ছিল না। একালেও কোথাও কোথাও সেকেলে সংস্কার অজান্তে মেনে ফেলা হত। তাইতো শম্পার মত প্রগতিশীল মেয়ে ঠাকুর দেবতাকে বিশ্বাস না করেও সত্যবানের জ্বর সারলে পূজা দেবে মানত করে ফেলে। এভাবেই সংস্কারগুলো স্থায়িত্ব পায়, অজান্তে প্রকাশিত হতে থাকে রক্তস্রোতে চলে আসে সেকাল থেকে একালে। কখনো জেনে কখনো বা অজান্তে নিজেদের জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়ে এসমস্ত সংস্কারগুলি। শম্পা হেসে বলে, "দেখেছো পিসি, কুসংস্কারের কী শক্তি? যেই না বিপদে পড়া, অমনি স্রেফ ছেলেমানুষের মতো ভাবতে শুরু করা — মৃত্যুর দূত আকাশ থেকে নেমে আসে, মরে গেলে মানুষরা সব আকাশের নক্ষত্র হয়ে যায়।"[১০৯] রীতিনীতির পরিবর্তনকে লেখিকা বকুলের মুখ দিয়ে এভাবে প্রকাশ করিয়েছেন মেজদিকে বলার সময় — "হচ্ছে বৈকি। আর সেটা তো হতেই হবে। কালবদল হবে না? যুগবদল হবে না? সমাজের রীতিনীতি আচার-আচরণ সব অনড় হয়ে থাকবে? মানুষ চিরকাল এক ছাঁচেই থেকে যাবে?"[১১০]

ত্রয়ী উপন্যাসে বিম্বিত অর্থনীতি ও রাজনৈতিক জীবন

ত্রয়ী উপন্যাসে রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছায়া, স্বদেশী প্রসঙ্গ, বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গ, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ মহামারীর প্রসঙ্গ, স্বাধীনতা আন্দোলন, স্বাধীনতার পরের নানা সমস্যার ছবি— একটা দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্রনোটপ। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পরাধীন ভারতবর্ষে সে অর্থে গভীর জাতীয় চেতনা জেগে ওঠে নি। মুষ্টিমেয় অংশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছে ইংরেজ রাজের বিরুদ্ধে। তবে তখন পর্যন্ত পরাধীনতার জ্বালাকে সমাজ পুরোপুরি অনুভব করতে পারে নি। তবে সংবেদনশীল সত্য কিন্তু পরাধীনতাকে অনুভব করেছিল এবং ছেলেদের থেকে আশা করেছিল পড়াশোনা করে দেশ স্বাধীন করার কাজে লাগবে তারা।

রামকালী যখন গোবিন্দ গুপ্তের ওখানে ছিলেন তখনও নবাবের নবাবিই ছিল কিন্তু ধীরে ধীরে নবাবির অবসান হতে থাকে তার প্রমাণ মিলে রাজবদ্যি মুকশুদাবাদের গোবিন্দ গুপ্তের কথায়। তিনি রামকালীকে বলেছেন — "তোমার আর রাজবদ্যি হয়ে কাজ নেই বাপু, রাজ্যে এখন ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরতে বসেছে, নবাবের নবাবি তো শিকেয় উঠেছে। আমার এই দীর্ঘকালের সঞ্চিত অর্থরাশি নিয়ে দেশে পালিয়ে গিয়ে নিজে নবাবি করো গে। আমরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে কাশীবাসে মনঃস্থির করেছি।"[১১১] আবার রামকালী নিজের গ্রামে বাংলায় ফিরে আসার পর সেখানে জমিদারি প্রথার আভাস পাই। রামকালী শুধু নিত্যানন্দপুরেই কবিরাজি বিদ্যার খ্যাতি অর্জন করেন নি প্রায় দশখানা গাঁ অবধি তাঁর নাম ডাক রয়েছে। এমনকি জীরেটের জমিদারবাড়িতেও তিনি রোগী দেখতে যান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতা হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। কলকাতায় নাগরিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশীয় ও বিদেশি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে সেখানে। ইংরাজি শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের ফলে সৃষ্টি হওয়া নবজাগরণ কলকাতা নগরীতে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। উনিশ শতকের প্রথমদিকে এই জাগরণ সমগ্র গ্রামবাংলাকে আলোড়িত করতে না পারলেও

উনিশ শতকের শেষের দিকে গ্রাম বাংলায়ও এর প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রথম প্রতিশ্রুতিতে সমাজের এই পরিবর্তিত রূপকে লক্ষ করা যায়। রামকালী বাল্যকালে যখন বাড়ি ছেড়ে যান তখন নবাবি রাজত্ব থাকার কথা রয়েছে এবং পরবর্তীতে যখন তার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি তখন নবাবের নবাবির ক্ষয়িষ্ণুতার আভাস মিলে। পাঠক জানেন, ১৮৫৭ র সিপাহি বিদ্রোহের পর নবাবি চিরতরে ঘুচে যায়। নগরায়ন এবং ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের সূত্রে শহর কলকাতায় নতুন নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছিল। গ্রামের মানুষের মধ্যেও নগরকেন্দ্রিক চাকচিক্যের প্রতি প্রলোভন দেখা দিয়েছে। পাড়াগাঁয়ের জমিদারের 'কাছারি বাড়ি'র চাকরি থেকেও কলকাতার শহরের অফিসের চাকরিকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়। নবকুমারও কলকাতায় গিয়েছে চাকরি করতে। লেখিকা বলেছেন — "পাড়াগাঁয়ের 'কাছারী বাড়ি'র চাকরি নয়, এ একেবারে কলকাতা শহরের অফিসের চাকরি।"[১১২] নবকুমার কলকাতার সাহেবদের অফিসে চাকরি করেছে।

পরাধীনতার অনুভব সবার মধ্যে না এলেও সত্যবতীর মধ্যে এসেছিল। সত্য ছেলেদেরও সে অনুভব করানোর চেষ্টা করেছে। সরল সদুকে বলেছে — "মা আবার একলা একলা কি স্বাধীন হল? আমাদের দেশের কেউই তো স্বাধীন নয়, ভারতবর্ষটাই তো পরাধীন!"[১১৩] সরলের কথা শুনে সদু বিস্মিত হয়ে বলেছে, — "ওমা! শোন কথা, ওদের রাজ্য ওরা রাজা হবে না?"[১১৪] পরাধীনতাকে সাধারণ লোক অনুভবই করতে পারছিল না তারই প্রমাণ বহন করে সদুর বক্তব্য; সাধারণের কাছে সাহেব ছিল অন্নদাতা। একদিকে ইংরাজের রাজত্ব চলছে অপরদিকে তারই সঙ্গে চলছে সমাজে নারীর উপর অত্যাচার। ভবানির বোন পুঁটিকে স্বামী হত্যা করলে ইংরাজ পুলিশের কাছে গেছে সত্য। সাহেব পুলিশ এলে বলেছে — "বলো তবে কী জন্যে আদালত খুলে বসে আছো তোমরা? সতীদাহ করে মেয়েগুলোকে পুড়িয়ে মারত আমাদের দেশ, তোমরাই সে পাপ থেকে উদ্ধার করেছো আমাদের। তবু এখনো কিছুই হয় নি। এখনো অনেক অনেক পাপ জমানো আছে। চারযুগ ধরে জমেছে এই পাপের বোঝা। এই পাপ দূর করতে পারো, তবেই বলি শাসনকর্তা সেজে বসে থাকা শোভা পাচ্ছে। .... নচেৎ পরের দেশে এসে রাজাগিরি কিসের? জাহাজ বোঝাই হয়ে ফিরে যাও না!"[১১৫] আইনের শাসনের দাবি সত্যবতীর কণ্ঠে উঠে এসেছে। রবীন্দ্রনাথ 'কালান্তর' প্রবন্ধে বলেছেন, ইংরেজ চরিত্রের প্রতি আস্থাবশতই আমাদের মধ্যে আইনের শাসনের দাবির বোধ জন্ম নিয়েছিল। ইংরেজের আইনের শাসনের প্রতি সত্যবতীর আস্থাই দেখা যাচ্ছে এখানে। কিন্তু আইন করেও ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ পাপ মুক্ত করা যায় নি। দেশকে সম্পূর্ণ পাপ মুক্ত করতে হলে বিদেশের লোকের দ্বারা কখনই সম্ভব নয় এই রাজনৈতিক চেতনা ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। তার জন্য দেশের লোকেরই এগিয়ে আসতে হবে। তাইতো ভবতোষ মাস্টার সত্যকে বলেছেন — "ভিন্ দেশের লোক এসে আইন করে এদেশের সমাজের গ্লানি দূর করবে, এ আশা করো না বৌমা। দেশকেই করতে হবে।"[১১৬] পরাধীন ভারতবর্ষের ছবিই ফুটে উঠেছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে এবং সত্য পরাধীনতার গ্লানিকে অনুভব করেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্য যে স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখেছে সেই স্বাধীনতা ভারতবর্ষ পেয়েছে

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে এসে। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে শুনলাম 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। দেশপ্রেমিক ছেলেরা স্বরাজের মহৎ কাজ হাতে নিয়েছে। দেশকে তারা উদ্ধার করেই ছাড়বে। এমনকি বাসনমাজা ঝি হরিদাসীর মনও সাড়া দিয়েছিল স্বদেশি আন্দোলনে। সে মুক্তকেশীর বাড়ি থেকে দেওয়া কাপড় ফিরিয়ে দিয়েছে — "নাটুমার্কা কাপড় চলবে নি ঠাকুমা, ও বিলিতি কাপড় আমাদের বাড়িতে বারণ হয়ে গেছে।"[১১৭] মুক্তকেশী রাগ করলে সে আরও বলেছে — "অন্যায় রাগ করলে নাচার ঠাকুমা! তোমার একখানা কাপড় পরে তো বাসায় আমি জাতে ঠেলা হয়ে থাকতে পারি না। দেখ গে যাও না, রাস্তায় কী কাণ্ডটাই হচ্ছে। পুলিশের হাতে মার খেয়ে মরছে, তবু মানুষ 'বন্দে মাতাং!' বলছে! এতটুকুন-টুকুন ছেলেগুলো পর্যন্ত মার খাচ্ছে, গান গাইছে। দোকান থেকে কাপড় লুঠ করে বাবুরা সব বিলিতি কাপড়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বস্তর-যজ্ঞি করছে, এরপর সব নাকি স্বদেশী হবে! নেকচারবাবুরা সেই সেই নেকচারই দিয়ে বেড়াচ্ছে। - - - - - - আমাদের বস্তিতে পর্যন্ত তোলপাড় কাণ্ড চলেছে। খালি এ বাড়ির বাবুদেরই চোখে কানে ঠুলি আঁটা।"[১১৮] কিন্তু সম্পূর্ণ দেশ জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলন তোলপাড় করলেও দেশের কথা দেশের হাওয়া মুক্তকেশীর রক্ষণশীল পরিবারের ছেলেদের কানে যাচ্ছিল না। কিন্তু সুবর্ণলতাকে সে হাওয়া স্পর্শ করেছে। সে কারো সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' পাতাতে চেয়েছে। স্বদেশিদের জন্য তার মনে রয়েছে অগাধ ভক্তি। সুবর্ণ বাড়ির অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে দেখতে গেছে স্বদেশি মেলা। সেখানে মেয়েরাও অংশ নিয়েছে, দোকান দিয়েছে, সেখান থেকে স্বদেশি দেশলাই, স্বদেশি চিরুনি ও স্বদেশি সাবান কিনে এনেছে। আসছে বার নিজেও মেলাতে দোকান খোলার কথা ভেবেছে। এমনকি দুর্গাপূজায় ছেলেমেয়েদের জন্য আনা বিদেশি কাপড়গুলো জ্বালিয়ে দিতে ছাতে নিয়ে গিয়েছে। সবাইকে সুবর্ণ পুজোয় বাংলাদেশের ঢাকাই কাপড় কেনার কথা বলেছে। তাছাড়াও সুবর্ণলতা মুক্তকেশীর বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে স্বদেশিদের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্নও দেখেছে। "তারপর সুবর্ণলতা পথে পথে ঘুরছে, ঘুরছে তীর্থে তীর্থে, ঘুরছে ওই সব মহাপুরুষদের দরজায় দরজায়, যাঁরা 'স্বদেশী' করেন।"[১১৯] সুবালার দেবর অম্বিকা স্বদেশি হয়ে দেশ উদ্ধারের কাজে লেগেছে। ইদানিং মেয়েরাও দেশ উদ্ধারে অংশগ্রহণ করছে সে কথাও বলেছে অম্বিকা সুবর্ণকে। সুবর্ণরও এই স্বদেশিদলের উপর রয়েছে প্রাণভরা ভক্তি। অনেক ভারতবাসীও ইংরেজদের হয়ে এই সব 'স্বদেশি'র উপর অত্যাচার করেছে। অনেক ভারতীয় পুলিশ লাঠি চালিয়েছে। ইংরাজের অধীনে কাজ করে তারা খুশি করতে চেয়েছে ইংরাজকে তাইতো শরৎশশী নিজের স্বামীর কথা বলতে গিয়ে বলেছে — "থাক মাসী ওসব কথা। দেশের সর্বনাশ যে আসন্ন তো বোঝাই যাচ্ছে। গোরারা একবার খেপলে কি আর রক্ষা থাকবে। তবু যারা কর্তব্যনিষ্ঠ, যারা ব্রিটিশের নেমক খাচ্ছে, তারা মরবে তবু নেমকহারামী করবে না, এই হচ্ছে সার কথা। তাতে প্রাণ যায় যাক।"[১২০] পুলিশরাও প্রাণ হারাচ্ছে স্বদেশিদের হাতে। এভাবেই স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিকে লেখিকা তুলে ধরেছেন 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে।

'বকুলকথা'য় আমরা এক ভিন্ন রাজনৈতিক পরিবেশের সাক্ষাৎ পাই। 'বকুলকথা'য় রয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের আখ্যান। দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে তাই দেশের লোকের সামনে কোনো

মহৎ উদ্দেশ্য নেই। মানুষের ভাবধারা, চিন্তা এবং সমাজের মাপকাঠি হয়ে উঠেছে নিম্ন মানের। বহু লোকের রক্তের দানে পাওয়া স্বাধীনতার কোনো মূল্য দিচ্ছে না একালের ছেলেরা। এখন সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ভাষণবাজিতে। দেশের দুর্নীতিকে লেখিকা দেখছেন এবং এই দুর্নীতিকে কেন্দ্র করে করা রাজনীতিও লেখিকার চোখ এড়াতে পারে নি। তাই তো অনামিকা দেবীর কাছে আনা দুর্নীতির বিরুদ্ধে আবেদন পত্রের উপর অনামিকা দেবী ও অন্যান্য মান্যগণ্য বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের স্বাক্ষর নিতে আসা ভদ্রলোকদের কথা প্রসঙ্গ অনামিকা দেবীর ভাবনায় লেখিকা এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন — "এই দুর্নীতিসাগরে নিমজ্জিত দেশের অন্ধকার ভবিষ্যৎ দেখে বিচলিত বিপর্যস্ত এঁরা সে সাগরে বাঁধ দিতে নেমেছেন। ওজস্বিনী ভাষায় এবং বিক্ষুব্ধ গলায় বলেন তাঁরা, 'ভাবতে পারেন কোথায় আজ নেমে গেছে দেশ? খাদ্যে ভেজাল দিচ্ছে, ওষুধে ভেজাল দিচ্ছে, শিক্ষা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে' — এমন ভাবে বলেন, যেন এইমাত্র টের পেয়েছেন তাঁরা দেশে এইসব ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটছে!"[১২১] 'সুবর্ণলতা'য় দেখা গেছে দেশের স্বাধীনতার জন্য দেশপ্রেমিক স্বদেশিরা নিজের সব স্বাধীনতা ত্যাগ করেছে। আর বর্তমানে দেশ স্বাধীন হবার পর মানুষ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু তাই নয় নিজের স্বার্থের জন্য দেশের সমস্যাকেও বাজি রাখছে তারা, তাই তো "দেশ পাপপঙ্কে নিমজ্জিত, মানুষের মধ্যে আর আদর্শ নেই, বিশ্বাস নেই, শ্রদ্ধা নেই, প্রেম নেই, পরার্থপরতা নেই, মানবিকতা বোধ নেই, সর্বস্ব হারিয়ে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে। কিন্তু চলেছে বলেই কি চলতে দিতে হবে? বাধা দিতে হবে না?"[১২২] এই সব ভাষণবাজিতে অনামিকা দেবী 'বিশ্বাস' আনতে পারছেন না। এই সব মহৎ চিন্তার মধ্যেও যে তাদের কোনো মতলবই লুকিয়ে রয়েছে অনামিকা দেবীর তা মনে হয়েছে। তিনি তাঁদের বিশ্বাস করতে পারছেন। তাদের কথায় অনামিকা দেবীর মনে হয়েছে তাঁরা নিজেদের কোনো মতলবকেই সুচারু মলাট দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমান যুগটাকে লেখিকা 'অনুসন্ধানী যুগ'ও বলেছেন। নতুনের পেছনে ছোটার যুগ। এ যুগের ছেলেরা ব্যস্ত রয়েছে পলিটিক্স নয়, ফাংশানে। কোনো উচ্চ চিন্তা নেই, উচ্চ আদর্শ নেই, সুস্থ একটা কর্মপ্রচেষ্টা নেই। 'সুবর্ণলতা'য় ছেলেরা মেতে উঠেছিল স্বদেশি হুজুগে তাদের সামনে ছিল দেশ স্বাধীন করার মহৎ আদর্শ কিন্তু বর্তমানে ছেলেরা মেতে উঠেছে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান নিয়ে। তবে এইসব সম্বর্ধনা সভা সমিতিতে যে নেহাৎ কোনো নেশার বশেই করে চলেছে তারা তা নয় এর পেছনে থাকা স্বার্থটা ধরা পড়েছে লেখিকার চোখে — "মুখে বলবেন ওইটুকু, মনে মনে বলবেন, শুধু তো নেশাই নয়, ওই ফাংশানের পিছনে যে অনেক মধুও থাকে। নেশাটা সেই মধুরই। দেশের লোকের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা, সরকারের ঘর থেকে এড্ বার করা, নিদেনপক্ষে নিজেকে পাদপ্রদীপের সামনে তুলে ধরা, সব কিছুর মাধ্যমেই তো ওই ফাংশান। যখন যে উপলক্ষটা পাওয়া যায়।"[১২৩]

লেখিকা আজকালের ছেলেমেয়েদের রুচিহীনতাকে দেখেছেন তারই সঙ্গে দেখেছেন তাদের সামনে আসা সমস্যাকে। তাদের সামনে রয়েছে বেকার সমস্যা, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে দিন দিন। শিক্ষাবিস্তারের সমানুপাতে চাকরির ক্ষেত্র গড়ে উঠছে না। আজকের ছেলেরা

সামনে শ্রদ্ধা করার মতো লোক পাচ্ছে না তাদের সামনে কোনো মহৎ ব্যক্তির আদর্শ নেই, তাদের ধৈর্য নেই পরিস্থিতিকে বুঝে নেবার। তারা ছুটে যায় আপাত প্রাপ্তির দিকে যা তাদের ক্রমশ নিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসের পথে। তারা বিপ্লব করছে, বোমা বানাচ্ছে। ধ্বংস করছে তারই সঙ্গে নিজেরাও যে ধ্বংস হয়ে চলেছে সেটা বুঝে উঠতে পারছে না, তাই তারা থামছে না। তাইতো নির্মলের বংশধর বুবুন বোমা বানাতে গিয়ে পা হারিয়ে ফেলেও ঠাকুরমাকে বলেছে — "কী দেখতে এলে? যেমন কর্ম তেমনি ফল? ভাবো, তবু জেনে রাখো যে হাতটা আস্ত আছে, সেই হাতটা দিয়েই আবার ওই কাজই করবো দেখো।"[১২৪]

নির্মলের বংশধর বুবুন বিপ্লব করতে গিয়ে হাত পা হারিয়েছে। বর্তমান যুগটা এইভাবেই হাজার হাজার বুবুনকে করাল গ্রাসে টেনে নিচ্ছে। মাধুরী বউ বলেছে — "শুধু আমার বুবুনই নয় বকুল, দেশ জুড়ে হাজার হাজার বুবুন এইভাবে প্রতিনিয়ত গ্রাসিত হচ্ছে। কিন্তু এর মূলে হয়তো আরো গভীর কারণ আছে। আজকের ছেলেমেয়েদের সব চেয়ে বড়ো যন্ত্রণা তারা শ্রদ্ধা করবার মত লোক পাচ্ছে না। ওদের মনের নাগাল পায়, এমন মা-বাপ পাচ্ছে না। ওদেরকে ভালবাসার বন্ধনে বাঁধতে পারে, এমন ভালবাসার দেখা পাচ্ছে না। আমরা আমাদের নিজের মনের মত করে ভালবাসতে জানি, ওদের মনের মত করে নয়। ..... হয়তো আগের যুগে ওতেই সন্তুষ্ট থাকতো, এ যুগের মন-মেজাজ দৃষ্টিভঙ্গী আলাদা, কারণ যে কারণেই হোক এদের চোখ কান বড় অল্প বয়সেই খুলে গেছে। এরা তাই 'লোভ'কে লোভ বলে বুঝতে শিখেছে, দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলে চিনতে শিখেছে। তাই এদের সবচেয়ে নিকটজনদের ওপরই সবচেয়ে ঘৃণা।"[১২৫] উদ্বাস্তু সমস্যা, খাদ্য আন্দোলন থেকে নকশাল আন্দোলনের উত্তাল পর্বের রাজনীতি, তার সংকটচিত্র 'বকুলকথা'য় অস্পষ্টভাবে হলেও ছুঁয়ে আছে আখ্যানকে।

নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাসে বিম্বিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবন

বিংশ শতাব্দীর লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞি আধুনিক অসমের বিশিষ্ট কথাকার। তাঁর রচনার মধ্যে দেশকালের বাস্তব সমাজ রাজনীতির বিচিত্র অনুপুঙ্খ সহ উপস্থাপিত। তিনি সমাজকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকোণ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন সমাজ প্রচলিত বিধি ব্যবস্থাকে এবং সেই বিধিব্যবস্থার সঙ্গে মানবজীবনের আনুগত্য ও প্রত্যাখ্যানের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ককে। সাহিত্যে সেটিকে তুলে ধরে পাঠক সমাজকেও সেই বিধি ব্যবস্থা নিয়ে ভাবিয়েছেন। নিরুপমা বরগোহাঞি সচেতনভাবেই তাঁর সময়ের অসমের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকে তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাস বিশ্বে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সমগ্র ভারতব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের আলোড়নকে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের অসমে ঘটা আঞ্চলিকতাবাদী রাজনীতির তিনি হয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী। নিরুপমা বরগোহাঞি পিতা-মাতার কাছ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার দরুন অনায়াসেই শিক্ষা ও কর্মসূত্রে সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন, তাই তাঁর উপন্যাসে তিনি সমাজের বাহ্যিক দিকটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি নারীর

জীবনের পারিবারিক দিকটি এবং পারিবারিক জীবনের নানা সমস্যার দিকটি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন সমস্যাকেও উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। বেশিরভাগ উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে কৃষক জীবন, তাদের সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, সমস্যা-সংগ্রাম, দৈন্য-সমৃদ্ধি, স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের বাস্তব আখ্যান।

নিরুপমা বরগোহাঞির জন্ম ও লালন পালন নাগরিক পরিবেশে হলেও অসমের গ্রাম্যজীবনের প্রতি তিনি অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তাঁর রচনায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্রাম্যজীবনের ছবি ফুটে উঠেছে। তিনি নাগরিক সমাজে বড় হওয়ার দরুন গ্রাম্যসমাজের প্রত্যক্ষতা নিজের জীবনযাত্রার মধ্যে অনুভব করেন নি, কর্মসূত্রেই তাঁর গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে যোগ। গ্রাম্য সমাজের যে বর্ণনা তিনি করেছেন তা নগরজীবন থেকে উঁকি মেরে দেখা। দেখার ভঙ্গিটি তন্নিষ্ঠ বা objective বলেই দূর থেকে দেখা গ্রাম্যজীবনও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদের বিকাশের ফলে নাগরিক জীবনে আসা অস্থিরতা, গ্রাম নির্ভর অসমীয়া সমাজের ক্রমশ নাগরিক সভ্যতার দিকে অগ্রগতি, সমাজ পরিবেশে নারী জীবনে আসা বিভিন্ন সমস্যা, পুরুষপ্রধান সমাজে নারীর অবস্থান ও অধিকারের দিকটি দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নারী প্রগতির দিকটির নির্দেশ করেছেন তিনি। নিরুপমা বরগোহাঞির 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', 'অন্যজীবন' ও 'অভিযাত্রী' উপন্যাস তিনটির আলোচনার মাধ্যমে লেখিকার সমাজ ভাবনাকে বোঝার চেষ্টা করব আমরা।

নির্বাচিত উপন্যাস তিনটির মধ্যে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন দিক ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক পরিবেশের আভাসও মেলে। রাজনৈতিক মন্তব্য বেশি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'অভিযাত্রী' উপন্যাসেই। নিরুপমা বরগোহাঞির আত্মজীবনী 'বিশ্বাস আরু সংশয়র মাজেদি'এ নিজেকে কমিউনিস্ট মতাদর্শী হিসাবে পরিচয় দিয়েছেন। ছাত্রবয়সে পার্টির কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার কথাও স্বীকার করেছেন তিনি। তাঁর মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের আবেগের সঙ্গে স্বাধীনোত্তর ভারতের তথা অসমের রাজনৈতিক পরিবেশের গভীর প্রভাব পড়েছে। এই উপন্যাস তিনটিতে না আছে সময়ের দীর্ঘ বিস্তৃতি না আছে কাহিনিগত ঐক্য, তবে বিষয়বোধের দিক থেকে উপন্যাস তিনটির ধারাবাহিকতা আমাদের চোখে পড়ে। তিনটি উপন্যাসই রচিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে। ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখিকা সমাজ বাস্তবতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন উপন্যাস তিনটিতে। উপন্যাস তিনটিতে ব্রিটিশ যুগের থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত অসমের সমাজ পরিবর্তনের ধারাবাহিক ছবি ফুটে উঠেছে। উপন্যাস তিনটির মধ্যে কালগত ব্যবধান না থাকায় যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তা মোটামুটি একই ধরনের। রচনাকালের হিসেবে উপন্যাস তিনটির ধারাবাহিকতা এ ধরনের — 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' (১৯৭৯), 'অন্যজীবন' (১৯৮৭) ও 'অভিযাত্রী' (১৯৯৩)। তবে উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের দিক থেকে দেখা গেছে 'অভিযাত্রী' উপন্যাসে রয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমকালীন অসমের সমাজ, ব্রিটিশ শাসন, রাজনৈতিক আন্দোলন ও সভাসমিতির নানা প্রসঙ্গ। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা তার

পরবর্তী সময়ের ছবি ফুটে উঠেছে। 'অন্যজীবন' উপন্যাসে ফুটে উঠেছে অসমের গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের পাশাপাশি সাম্প্রতিক কালের সমাজ জীবনের বিস্তৃত রূপ। লেখিকার সামাজিক বক্তব্য, গড্ডলিকায় গা না ভাসিয়ে যুক্তির আলোয়, জাতীয় পরম্পরায় গৌরবের চেতনায়, বলিষ্ঠ জাতিগঠনের আহ্বান জানায়। তাইতো তিনি চন্দ্রপ্রভার কানে আচার্য পি. সি. রায়ের ভাষণের মধ্যে থাকা গাম্ভীর্য, চিন্তা ও মননশীলতার সুর বাজিয়েছেন বার বার — "যদিও অসম বুরঞ্জী আপোনালোকর গৌরবর বিষয় কিন্তু বর্তমান অবস্থাৰে চাই আপোনালোকে করিবলগীয়া আরু ভাবিবলগীয়া বহুতো আছে। আপোনালোকে কলেজত যি অর্থনীতি চর্চা করিছে সেই অর্থনীতি কেবল ইউরোপর অবস্থাতে খাটে। আপোনালোকর দেশর কথা সেই অর্থনীতিত নাই ......। .... আপোনালোকর শিক্ষার লগত বাস্তব জীবনর সম্বন্ধ থাকিব লাগে — অর্থাৎ আপোনালোকর সমুখত ভবিষ্যৎ জীবনর এটা আৰ্হি থাকিব লাগে। ...... মতবিলাক সমাজত প্রচলিত আছে বুলিয়েই গ্রহণ নকরিব। একোকে এনেয়ে বিশ্বাস নকরিব। নিজে ভাবিবলৈ শিকিব, ... এই সংসারত অকল নিষ্ক্রিয় সাধুতা হ'লেই নচলে। আপোনালোকে নিষ্ঠুর আরু অন্যায়পরায়ণ নোহোয়াটোয়েই যথেষ্ট বুলি নাভাবিব। আপোনালোকে ঘটনার সোঁতত গা এরা নিদিব, নিমাত জন্তুর দরে খেদি দিয়া ফালেই নগৈ নিজর বীরত্ব দেখুয়াই সংসারর হকাবধার লগত যুঁজিব। আমার দেশর শিক্ষার এজন প্রধান গুরিয়াল ডাক্তার ডেভিদ টমসন চাহাবে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিছনলৈ পঠোয়া মন্তব্যর ভিতরত জাতিবিচার আরু পুরুষানুক্রমিক নীতি কিছুমানে অসমর উন্নতির বাটত আগভেটা দিছে বুলি জোরেরে কৈছে। ...... আপোনালোকর বর গৌরবর বিষয় যে মহাপুরুষ শংকর মাধবে বঙ্গর চৈতন্যর আগতেই অসমর বৈষ্ণব ধর্মপ্রচার করে আরু কৃত্তিবাস, কাশীদাসর আগতেই গদ্যপদ্যত পুথি লেখে - যিসময়ত ইংলণ্ডর হুকার আরু লোটিমারর রচনার বাহিরে জগতর আন কোনো সাহিত্যই উন্নতি লাভ করিব পরা নাছিল, সেই সময়ত ষোল শতিকাত অসমীয়া গদ্য সাহিত্যে উন্নত অবস্থাত ভরি দিয়ে। এই শতিকাত অসমীয়া সাহিত্যই যি অবস্থা পাইছিল, সেই অবস্থা বঙ্গই বঙ্কিমচন্দ্র আরু ঈশ্বরচন্দ্রর দিনতহে পাইছিল।......."[১২৬] নিরুপমা বরগোহাঞি অসমীয়া সমাজকে তুলে ধরেছেন আচার্য পি. সি. রায়ের বক্তৃতাকে তুলে ধরে 'অভিযাত্রী' উপন্যাসে। তারই সঙ্গে তুলে ধরেছেন অসমীয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির গৌরবকেও। উপন্যাসের পটভূমির সময়কাল বিচারে দেখতে গেলে 'অভিযাত্রী'কেই আগে আলোচনা করতে হয়। কারণ এখানে ব্রিটিশ রাজত্বকাল এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা রয়েছে। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা থাকলেও মূলত স্বাধীনোত্তর কালের সমাজ বাস্তবতাই গ্রন্থটিতে বিধৃত হয়েছে এবং 'অন্যজীবন' উপন্যাসেও স্বাধীনোত্তর কালের সমাজ বাস্তবতার প্রতিবিম্ব রয়েছে।

পারিবারিক জীবন

বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে রচিত তিনটি উপন্যাসের কোনোটিতেই বিশাল যৌথ পরিবারের ছবি ফুটে ওঠে নি। ব্রিটিশ রাজত্বকাল তথা স্বাধীনতার পরবর্তী কালের সমাজজীবনের চিত্র ফুটে

উঠেছে নির্বাচিত উপন্যাসগুলিতে। একদিকে গ্রামীণ জীবনের অবক্ষয়, অপরদিকে শহরে তৈরি কলকারখানায় তথা অন্যান্য কাজের সন্ধানে নগরের দিকে প্রব্রজনের প্রবণতা দেখা গেছে। শহরে গিয়ে মাটির মানুষ মাটির থেকে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে শহরের কুলি মজুরে পরিণত হয়েছে। কৃষি ও কুটির শিল্পের ধ্বংসের ফলে মানুষের জীবনযাপন সংকটপূর্ণ হয়েছে। আর্থিক এই দুর্দিনে যৌথ পরিবারের ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায় নি। কারণ যৌথ পরিবার কৃষিনির্ভর সমাজ জীবনেরই ফসল।

'অভিযাত্রী' উপন্যাসে আমরা দেখি দৈশিঙরি গ্রামের প্রতাপ ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন গাঁওবুড়া রাতিরাম মজুমদারের পরিবার। যেখানে রয়েছে তাঁর ছেলে, মেয়ে ও বউ এবং মৃত মেয়ে ভাতোপুরিয়ার মেয়ে রুক্মিণী। রাতিরাম কলিতার এগারোজন ছেলে মেয়ে থাকলেও মাত্র চারজন জীবিত ছিল। তারা হল যোগমায়া, চন্দ্রপ্রভা, রজনীপ্রভা এবং ছেলে ধর্মেশ্বর। রাতিরাম কলিতা মাটি বাড়ি থাকা গ্রামীণ লোক। তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ছবি তুলে ধরেছেন লেখিকা। চন্দ্রপ্রভা ভালোবেসেছে তার ভাইবোনদের এবং মা হারা রুক্মিণীকে। তাছাড়া মৃত দিদি ভাতোপুরিয়ার কথা মনে পড়ে চন্দ্রপ্রভার মন মাঝে মাঝে ভারাক্রান্ত হয়েছে। গঙ্গাপ্রিয়ারও রয়েছে ছেলেমেয়েদের প্রতি ভালোবাসা এবং চিন্তা, রুক্মিণীকেও তিনি ভালোবেসেছেন এবং চিন্তা করেছেন, আর স্বামীকে করেছেন ভক্তি। ঠিক একইভাবে রাতিরাম মজুমদারের মধ্যেও ছেলেমেয়েদের জন্য চিন্তা ও ভালোবাসা ফুটে উঠেছে। মেয়ে যোগমায়াকে দূরে বিয়ে না দিয়ে জামাইকে জমি ও বাড়ি দিয়ে ঘরের কাছেই রেখেছেন। তৎকালীন সমাজে এই সমস্ত গ্রাম্য পরিবারে কৃষিই ছিল জীবিকার প্রধান উপজীব্য। রাতিরাম মজুমদারের সম্পূর্ণ পরিবারটি কৃষির উপরই নির্ভরশীল। এক সময়ের মাটি বাড়ি প্রতিপত্তি থাকা রাতিরামের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এবং যুদ্ধের চাপে দরিদ্র হয়ে পড়েছে। পরিবারের বোঝা একা বহন করতে অসুবিধা হচ্ছে তার। ধর্মেশ্বর ছেলে হলেও কোনো সাহায্য করে নি সংসারটিতে। সে একেবারে বেপরোয়া মেজাজের তাই রজনীপ্রভা পড়া অবস্থায় পাওয়া বৃত্তি থেকে কিছু টাকা পাঠিয়ে পরিবারে সাহায্য করেছে। চন্দ্রপ্রভাও নিজের অল্পবিস্তর উপার্জন ও দণ্ডীনাথের পাঠানো টাকা থেকে তেল, মাছ, ডিম, মশলা ইত্যাদি বাবার হাতে তুলে দিয়ে পরিবারটিকে সাহায্য করেছে। তৎকালীন সমাজে একমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করা বহু পরিবারের উপার্জন করা ব্যক্তি বৃদ্ধ হলে এবং সরকারি খাজনার দায়ে অভাব অনটনের সম্মুখীন হতে দেখা গেছে। পরিবারের ভাঙনের ইঙ্গিত রয়েছে ধর্মেশ্বরের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণে। তবে রাতিরাম ও স্ত্রী গঙ্গাপ্রিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আভাস রয়েছে। তবে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৎকালীন সমাজে গ্রাম্য পরিবারগুলির স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকা সম্পর্কের আংশিক ধারণাই বহন করে। সব পরিবারে এ ধরনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয় না তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান দেখে। নারীকে গৃহকাজে লিপ্ত থাকতে এবং পরের অধীনেই দেখা গেছে বিশ শতকের প্রথমার্ধের অসমীয়া সমাজে।

'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে যৌথ পরিবার সেভাবে পাওয়া যায় না। ঔপনিবেশিক অসমে চাকরির জন্য বা ক্ষয়িত কৃষি ও কুটির শিল্পের ভাঙনে ও শহরে বর্ধিত সুখ-সুবিধার আশায়

গ্রামের বহু পরিবারের সদস্য সংখ্যা কমে গেছে। এই উপন্যাসে পরিবার সমূহের মধ্যে গ্রামের ছেলে পরেশ কলিতা চাকরির সুবাদে শহরবাসী হয়েছে। এ পরিবারটিতে রয়েছে স্ত্রী, দুই পুত্র ও তিন কন্যা। পরেশ কলিতার বড় ছেলের বিয়ে হয়েছে, তার দুটি মেয়েও রয়েছে। তারা শহরে ভাড়াবাড়িতে একইসঙ্গে আছে। ইতিমধ্যে পরেশ কলিতার দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। পটেশ্বরীর বাপের বাড়িতে রয়েছে বৃদ্ধা মা ও ছোট ভাইয়ের বউ। বড় দাদা কালীকান্ত তেজপুরে গিয়ে ব্যবসা খুলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং সঙ্গে নিজের স্ত্রীকেও নিয়ে গেছে। ভাই রবি পাঠশালার দুটো শ্রেণি পাশ করে গ্রামের উমা বামনের হাকিম ছেলে হরিনারায়ণের পিয়ন হয়ে তাঁর সঙ্গে চলে গেছে। ঢলকুছি গ্রামের সব থেকে বেশি অর্থবান পরিবার হল নীলকণ্ঠ লহকরের পরিবার। নীলকণ্ঠ লহকরের স্ত্রী চার মেয়ে ও দুই ছেলের জন্মের পর মারা গেছেন। চার মেয়ের তিনজনের বিয়ে হয়েছে একজন বিধবা হয়ে বাড়ি চলে এসেছে, তার একটি মেয়েও আছে। ছেলে-ছেলের বউ, নাতি-নাতনি ভরা প্রকাণ্ড ঘর, জমি-বাড়ি, সম্পত্তিতে ভরপুর নীলকণ্ঠ ঢলকুছি বাথানঘাটের সবার থেকে অর্থবান ও শক্তিশালী গৃহস্থ। উপেন কলিতা পরেশ কলিতার ভাই যাকে উপেন ব্যাপারী বলা হয়। উপেন কলিতা গ্রামের বাড়িতে থাকে তবে সে মাঝে মাঝে পরেশ কলিতার কাছ থেকে এটা ওটা সাহায্য নিতে আসে। উপেন কলিতার পরিবারে রয়েছে স্ত্রী, পাঁচ ছেলে এবং দুই মেয়ে। সে একটু কৃপণ ও স্বার্থপর। আর্থিক টালমাটাল স্থিতি এবং নাগরিক সভ্যতার প্রভাবে গ্রাম গঞ্জের মানুষের মনকেও সংকুচিত করে তুলেছে। তারই সঙ্গে করে তুলেছে স্বার্থপর। উপেন কলিতা সমাজের সেই স্বার্থপর শ্রেণির প্রতিনিধি।

'অন্যজীবন' উপন্যাসে রয়েছে গ্রামের ছেলে কলেজ শিক্ষক মনোজের পরিবার। উজান অসমের ডিব্রুগড়ের উত্তর পারের একটি ভিতরের গ্রামে মনোজের বাড়ি। মনোজদের পরিবারে তাঁর পিতা হেরম্ব দত্ত, মনোজের মা, ভাই এবং তিন বোন। মনোজ বড় ছেলে এবং পংকজ ছোট। পিতা হেরম্ব দত্ত গ্রামের একটি এম.ভি. স্কুলের শিক্ষক এবং কৃষির জমি আধি দিয়ে কোনো রকমে পরিবারটি চালায়। তাঁদের আশা ছিল মনোজ লেখাপড়া শিখে বাড়ির সামনে চাকরি বাকরি করে বাড়িতে একটু সাহায্য করবে। কিন্তু মনোজ বাড়ি থেকে বহু দূরে ধুবড়ির একটি কলেজে চাকরি করছে এবং শহরের মেয়ে অণিমাকে বিয়ে করে কর্মস্থলে নিজের সংসার তৈরি করে নিয়েছে। তবে মনোজ বাড়ির সঙ্গে একেবারে যোগাযোগ বন্ধ করেনি।

এইভাবে দেখা গেছে গ্রামের বেশিরভাগ পরিবারই কৃষিজীবী এবং কিছু কিছু পরিবারের থেকে বর্তমানে কিছু চাকরিজীবীও বেরোচ্ছে। তবে গ্রামের বহু ছেলেকে চাকরি কিংবা শহরের সুখ-সুবিধার দিকে আকৃষ্ট হয়ে এবং গ্রামের কাজের অভাবে শহরে যেতে দেখা গেছে এবং শহরবাসী হয়েছে। নিরুপমা বরগোহাঞির ভাষায় — "গাঁওর লরা যেতিয়া চহরলৈ চাকরি-বাকরি করি অবশেষত পেন্সন পাই জীবনর প্রান্তসীমাত উপস্থিত হয়, তেতিয়া সাধারণতে সেই গাঁওত্যাগীয়ে গাঁওলৈ আরু উভতি নাহে, চহরতে ঘর-বারী বান্ধি মরণর দিনলৈকে বসবাস করে। কারণ তেঁওর গাঁওলৈ উভতি আহার কোন ধরণর কারণেই অবশিষ্ট না থাকে, ছোয়ালির বিয়া হৈ যায় চহরতে

ল'ৰায়ো সম্পূৰ্ণ চহৰীয়া চাকৰিয়ালৰ ভূমিকা লয়। দেউতাকৰ গাঁওৰ লগত থকা নিজৰ ক্ষীণ সম্পৰ্কও ল'ৰাৰ দিনত বাকী নাথাকেগৈ। নিজৰ বুঢ়া বাপেক-মাকেই জীয়াই আছে নে ল'ৰালিৰ নিজৰ ঘৰেই একে হৈ আছে যে সেই মানুহ আকৌ গাঁওলৈ উভতি যাব?"[১২৭] এভাবেই দেখা গেছে গ্রামের বহু পরিবারের ছেলে চাকরি বা কাজের জন্য শহরে যায় এবং শহরের মেয়ে বিয়ে করে শহরের বাসিন্দা হয়ে যায়। বৃদ্ধ মা বাবা অনেক কষ্ট করে ছেলে মেয়েকে পড়ানোর পর ছেলের প্রতি আশা করে থাকে কিন্তু ছেলেদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মা বাবার দিকে পিঠ দিতে দেখা গেছে। মূলত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নিরুপমার উপন্যাসের কুশীলব, সেইসব পরিবারের ক্রমশ অনিকেত হওয়া, গ্রামের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হওয়ার বাস্তবই উপন্যাসগুলিতে উঠে এসেছে। বাঙালি সমাজের মতো অসমীয়া সমাজে যৌথ পরিবারের সংস্কৃতি নেই — এই বাস্তবও উপন্যাস পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নিরুপমার উপন্যাস তিনটিতে বিম্বিত নারীর অবস্থান

উনিশ এবং বিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অসমীয়া সমাজে নারীর স্থান খুব বেশি উন্নত ছিল না। শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে অসমীয়া নারীকে মূলত গৃহকার্যেই লিপ্ত থাকতে দেখা গেছে। সমাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ব্যবধান লক্ষিত হয়েছে। স্ত্রীকে পুরুষের বশ হয়েই থাকতে হয়েছে। তবে পরবর্তীতে ব্রিটিশ আমলে ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে এবং বঙ্গীয় নবজাগরণের প্রভাবে সমাজে নানারকম সংস্কার আন্দোলনের ফলে বঙ্গীয় সমাজের মত অসমীয়া সমাজেও নারীর অবস্থানের বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে। অসমীয়া সমাজে নারীর অবস্থানগত অবমাননা থাকলেও অন্তঃপুর বন্দিত্ব তেমন লক্ষিত হয় নি। অবশ্য নারী শিক্ষার প্রতি উদাস মনোভাব দেখা গেছে অসমীয়া সমাজেও। অসমীয়া সমাজে উনিশ ও বিশ শতাব্দীতে বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহের মত কুসংস্কারের প্রভাবও লক্ষিত হয়েছে বিভিন্ন জাতির প্রব্রজনের ফলে। তবে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত উদারমনা কিছু পুরুষের বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজের দ্বারা অসমীয়া নারী সমাজের উন্নতি সাধিত হয়েছে। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন ও গুণাভিরাম বরুয়ার মত ব্যক্তিরা স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহের আইন প্রণয়ন হলে গুণাভিরাম বরুয়া শুধু বিধবা বিবাহকে সমর্থনই করেন নি তিনি নিজেও বিধবা একজনকে বিয়ে করেছেন। এভাবে অসমীয়া সমাজেও নারীর অবস্থানগত পরিবর্তন দেখা গেছে যার ফলে নারীর দুঃখ-কষ্টের অবসান ঘটেছে। নারী কল্যাণের জন্য বিভিন্ন সভা সমিতি গঠন করে পরবর্তীতে নারীর সামগ্রিক বিকাশের চেষ্টা করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ শাসনকালে তথা স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে নারীশিক্ষার প্রচলন হওয়ার পরও গ্রামে গঞ্জে বহু নারীকে অশিক্ষিত তথা পুরুষের দ্বারা অবমাননার জীবন যাপন করতে দেখা গেছে। তারই সঙ্গে পুরুষশাসিত সমাজের পুরুষের নারীর প্রতি থাকা উদাসীনতার দিকটিও লক্ষিত হয়েছে। নিরুপমা বরগোহাঞিঃর উপন্যাস 'অভিযাত্রী', 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' এবং 'অন্যজীবন' উপন্যাস তিনটিতে সমাজের এ সমস্ত দিক ফুটে উঠেছে। তাঁর উপন্যাসে নারীর

স্থান প্রসঙ্গে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেছেন — "নারীও মানব, গতিকে মানবতাবাদী বুলিলে নারীবাদীকে সামরি লোয়া হয়। তথাপি মোর লেখাত 'পুরুষবাদ'তকৈ 'নারীবাদ'র স্থান আগে — পুরুষসকলে শুনি বেয়া পাব, কিন্তু মোর লেখার সন্দৰ্ভত এই কথা একেবারে সত্য। আমার সমাজত তুলনামূলকভাবে আজিও নারী অধিক নির্যাতিতা, অবহেলিতা আরু নিপীড়িতা — অন্ততঃ পুরুষর তুলনাত এই কথা কোনেও অস্বীকার করিব নোয়ারে। মোর 'অন্যজীবন' উপন্যাসত নারীক হালত জুটি দিয়া দেখুয়াইছোঁ — এয়া কল্পনা নহয়, মোর শহুরর গাঁও ঢকুয়াখানার সঁচা কাহিনী এইটো। চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী অসমর নারী মুক্তির পথ প্রদর্শনকারী এওঁক লৈ মই 'অভিযাত্রী' উপন্যাস লিখিছোঁ।"[১২৮]

'অভিযাত্রী' উপন্যাসে নারী পুরুষের মধ্যে থাকা ব্যবধান লক্ষিত হলেও নারীর বন্দিত্ব ও দাসীরূপের ছবি ফুটে উঠেনি। চন্দ্রপ্রভার পিতা মাতার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই লক্ষিত হয়েছে। তা বলে তৎকালীন সমাজে নারী পুরুষের বা স্বামী স্ত্রীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কই ছিল এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা, পরবর্তীতে 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' বা 'অন্যজীবন' উপন্যাসে স্বামী স্ত্রীর এরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক লক্ষিত হয়নি। তবে 'অন্যজীবন' উপন্যাসের মনোজ ও অণিমার মধ্যে কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আভাস মিলে। চন্দ্রপ্রভার বাল্য সময়ে সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে ব্যবধান লক্ষিত হলেও পরবর্তীতে শিক্ষার প্রসারে এই অবস্থানগত ব্যবধানের কিছু পরিবর্তনের আভাস মেলে। নারী পুরুষের ব্যবধান ফুটে উঠেছে কম্পাউণ্ডার জেঠার কথায় চন্দ্রপ্রভার বাল্যকালে। তিনি রজনীপ্রভা সম্পর্কে রাতিরাম মজুমদারকে বলেছেন — "তোমার এই আপীটো মতাচ'লি হ'লে মই তোমাক মোর দরে ডাক্তারী পঢ়োয়ার পরামর্শ দিলোহেঁতেন।"[১২৯] চন্দ্রপ্রভাদের পরিবারে ছেলে মেয়ের মধ্যে খুব ব্যবধান না থাকলেও কষ্ট করে স্কুলে যাওয়া নিয়ে নিজেকে ধর্মেশ্বরের সঙ্গে তুলনা করলে পিতা চন্দ্রপ্রভাকে যা বলেছেন, তাতে সমাজে নারী পুরুষের ব্যবধান সম্পর্কিত ধারণাই প্রকাশ পেয়েছে — "অই, সিঁহত ল'রা মানুহ, সিঁহতর কথাই বেলেগ। সিঁহতর কথাই বেলেগ। সিঁহতর গার বলো বেছি, আরু সিঁহতে মেখেলাও নিপিন্ধে। গতিকে সিঁহতে বনর জন্তুর লগতো যুঁজ করিব পারিব আরু ধুতি কোঁচাই খাল-বিল লৈ জান জুরিও পার হ'ব পারিব, লাগিলে সাঁতুরি নৈ পার হৈয়ো স্কুললৈ যাব পারিব —"[১৩০] তৎকালীন সমাজে মেয়েরা সব সুবিধা ভোগ করতে পারত না চন্দ্রর উক্তির মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে — "সেয়ে ধর্মেশ্বর মজুমদার হৈ জন্ম লোয়ার ভাগ্য নহৈ তাইর চন্দ্রপ্রভা মজুমদার হৈ জন্ম লোয়ার দুর্ভাগ্য হ'ল যেতিয়া ভায়েকর দরে সকলোবোর সুযোগ সুবিধাতো সমানে ভোগ করিব নোয়ারে।"[১৩১] তৎকালীন সমাজে মেয়েরা গৃহে কর্মের মধ্যেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে এবং খুশিও থেকেছে — "গাঁওর আন ছোয়ালীবোর ঘরর কাম-কাজ লৈয়ে সন্তুষ্ট, কারো গরজ নাই এনেকৈ বোকাপানী গছকি বাটকুরি কই ল'রার এম.ভি. স্কুল এখনত পঢ়ি 'পণ্ডিতনী' হ'বলৈ আহার।"[১৩২] তবে পরবর্তীতে চন্দ্রপ্রভা নিজের উদ্যমে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি পেয়েছে। মেয়ের পড়ার ইচ্ছা দেখে পিতা রাতিরাম কলিতাকেও মেয়ে চন্দ্রপ্রভাকে সাহায্য করতেই দেখা গেছে।

১৯ বছর বয়সেই চন্দ্রপ্রভা গ্রামের বাইরে গিয়ে থেকেছে, চাকরি করেছে এবং পরবর্তীতে পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। তবে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজে নারীকেই সবকিছুর জন্য দোষ দেওয়া হত তা 'অভিযাত্রী'তে ফুটে উঠেছে। চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথকে ভালোবেসে অবৈধ সন্তানের জননী হলে সমাজের চোখে চন্দ্রপ্রভা কলঙ্কিনী হয়ে উঠেছে এবং তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে। পরবর্তীতে সামাজিক কাজের দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলে সমাজ তাকে গ্রহণ করেছে। চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথকে ভালোবেসেছেন এবং তাঁর অবৈধ সন্তানের মা হয়েছেন বলে সমাজ চন্দ্রকেই দোষ দিয়েছে কিন্তু দণ্ডীনাথের উপর কোনো দোষ যায় নি। সমাজে সতীত্ব রক্ষার দায় একমাত্র নারীরই। লেখিকার ভাষায় — "তদুপরী সমাজে আরোপ করা সতীত্ব আদি নৈতিক বিধি ব্যবস্থার ওপরত তাইতো আস্থা হেরুয়াইছে, ইয়াত তো তাই তাহানিরে পরা সমাজর ভণ্ডামি আরু পক্ষপাতদুষ্ট মনোভঙ্গীর পরিচয় পাই আহিছে। এই সমাজে সতীত্ব বুলিলে কেবল তিরোতার সতীত্বকে বুজে, আনহতে পুরুষে যিমানেই ব্যভিচার নকরক, সমাজে কিন্তু তেঁওর গাত তিরোতার দরে অসতীর মার্কাটো নামারোঁ।"[১৩৩] নগাঁও মহিলা সমিতির অধিবেশনে অতুল ও চন্দ্রকে নিয়ে অধিবেশনে আসা অন্যান্য মহিলাদের সমালোচনার মধ্য দিয়ে লেখিকা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে সমাজে মেয়েদের অপবাদজনিত অবস্থানের জন্য, সমাজে নারীর বৈষম্যমূলক অবস্থানের জন্য, মেয়েরা নিজেরাও কিছু অংশে দায়ী। নগাঁও মহিলা সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত মহিলারা চন্দ্রপ্রভার নিন্দা করলে একজন বিধবা মহিলা বিরোধিতা করে বলেছেন — "আমি তিরোতাবোরেই তিরোতার প্রধান শত্রু। আপোনালোকে চন্দ্রপ্রভার নিন্দা করিছে, কিন্তু এটা কথা ভাবি চাইছে নে যে কলঙ্কর ভাগীতো তেঁও অকলে নহয়? অথচ আজি অকলে তেঁওই তার বোজা কঢ়িয়াই মরিছে, তেঁওরতো আরু কোনোদিন কারো লগত বিয়া নহ'ব, অথচ শুনিলেই নহয় তেঁওর এই অবস্থার বাবে দায়ী মতা মানুজনেতো ঠিতেই বিয়াবারু করাই সুখেরে ঘর সংসার করি আছে, লরা ছোয়ালীর জন্ম দিছে। এইটো মাইকী মানুহর প্রতি আমার সমাজর ঘোর অবিচার নিদর্শন নহয় নে? আরু তার পিছতো আমি নিজেই আমার মাইকী মানুহকে দোষী করি নিন্দা করিছোঁ।"[১৩৪] আবার চন্দ্রপ্রভার দিদি যোগমায়া বিধবা হবার পর ঘণবাবার সঙ্গে পুনর্বিবাহ করলে সমাজের চোখে কলঙ্কিনী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে বিধবা বিবাহ হলেও সেটিতে সমাজের ততটা সমর্থন ছিল না তার আভাস দিয়েছেন লেখিকা। বিধবাদের সমাজে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকারও ছিল না। নগাঁও অধিবেশনে উপস্থিত জনৈকা মহিলার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে সমাজে বিধবার অবস্থান প্রকাশ পেয়েছে — "তেঁও বাল্য বিবাহ হৈ যোয়ার পিছতে কপাল আরু শিরর সিন্দূর মুচিবলগীয়া হোয়া এজনী বাল্যবিধবা, এতিয়া তেঁও এগরাকী পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী যুবতী, একমাত্র নিজর মনর দৃঢ়তার বাবেই অলপ লেখাপড়া শিকি দুই এখন কিতাপ পঢ়ি আজির এই সাহিত্য সভার প্রতিনিধি হৈ আহার যোগ্যতা অর্জিছে। কিন্তু সমাজত এজনী সাধারণ তিরোতারো যিখিনি মর্যাদা, তেঁও তার পরাও বঞ্চিত। অলপতে ককায়েকর জীয়েকর বিয়া হৈ গ'ল, মাজনী তেঁওর বুকুর ধন সরুরে পরা তেঁওই গু-মুত ধুয়াই নিচুকনি গীত গাই শুয়াই ডাঙর করিছে বুলিব

পারি কিন্তু তাইর বিয়ার কোনো শুভ আচার-অনুষ্ঠানর ত্রিসীমালৈকে তেঁও অমঙ্গলীয়া মানুহজনীক যাব দিয়া নহ'ল।"[১৩৫] কৌলীন্য প্রথা না থাকলেও অসমীয়া সমাজেও যে বাল্যবিবাহ ছিল, বাল্যবিধবাদের যে দুঃসহ দুঃখের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হত, কোনোরূপ মঙ্গলানুষ্ঠানে এমনকি উপস্থিত থাকারও যে তাদের অধিকার ছিল না, ছোট্ট একটি সংলাপে এসব তথ্য উঠে এসেছে।

অসমীয়া সমাজে নারীর স্বাধীনভাবে দয়িত নির্বাচনের অধিকারও যে ছিল, তার আভাস রয়েছে 'অভিযাত্রী' উপন্যাসে। চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথকে ভালোবেসেছে। রজনীপ্রভা বাঙালি ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করেছে। ঠিক একই সময় শহরে অনেক উচ্চ শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা বিকাশের সুযোগ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের কাজে অংশগ্রহণ করার সুবিধাও পেয়েছে। পরমানন্দ আগরওয়ালার পত্নী কিরণময়ী আগরওয়ালা ড. ভুবনেশ্বর বরুয়ার পত্নী ইন্দুপ্রভা, গোয়ালপারার লক্ষীপুরের জমিদার সুসাহিত্যিক নগেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর পত্নী প্রফুল্লবালা চৌধুরী, বেণুধর রাজখোয়ার পত্নী রত্নকুমারী রাজখোয়া প্রমুখ ছাড়াও অনেক অভিজাত পরিবারের নারীরা শিক্ষা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলন তথা অন্যান্য সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ আসার পূর্বে অসমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন ছিল না। এর পূর্বে সংস্কৃত টোলসমূহে শিক্ষাদান করা হত, আর সেখানে শুধু ছেলেদেরই পড়ার অধিকার ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ আসার পর ছেলেদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হলেও মেয়েদের শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা করা হয় নি। খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টায় স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলেও কম সংখ্যার জন্য নারীরা শিক্ষার তেমন সুযোগ পায় নি। চন্দ্রপ্রভার বাল্যকালে দেখা গেছে গ্রামে গঞ্জে মেয়েদের স্কুলের ব্যবস্থা নেই। পড়াশোনার জন্য চন্দ্রপ্রভা ও চন্দ্রর বোন রজনীকে দূরের ছেলেদের এম.ভি. স্কুলে যেতে হয়েছে। এমনকি স্ত্রী শিক্ষাকে সমাজে তেমন উৎসাহও দেওয়া হয় নি তাই তো চন্দ্র ও রজনীর কষ্ট করে বিদ্যালয়ে যাওয়া নিয়ে স্কুলের একজন পণ্ডিত চন্দ্রপ্রভার বাবাকে মেয়েদের পড়ানো কী দরকার প্রশ্ন তোলে কার্যত নিষেধ করেছেন — "পণ্ডিত হ'লেও তেওঁ কৈছে যে ছোৱালীমানুহর পঢ়ার ইমান কি দৰ্কার যে এনেহেন বৈতরণী পার হৈ সদায় সদায় স্কুললৈ যাব লাগে—"[১৩৬] তবে চন্দ্রপ্রভা নিজের সাহস ও ইচ্ছাশক্তিতে এবং পিতার সাহায্যে পড়াশোনা করে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছেন, বোন রজনীপ্রভাও ডাক্তারি পড়তে কলকাতায় গেছে এবং ডাক্তার হয়েছে। তবে তাদের গ্রামবাসীর অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্ত্রী শিক্ষার প্রতি গ্রামবাসীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও গ্রামের কিছু কিছু মেয়ে নর্মাল স্কুল পাশ করে শিক্ষয়িত্রী হয়েছে। চন্দ্রপ্রভার মাসী এম.ভি. পাশ করে বিয়ের পর ভালুকীগ্রামের এল.পি. স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। চন্দ্রপ্রভার মা গ্রাম্য নারী হলেও শিক্ষার মূল্য বুঝতে পেরেছেন এবং মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি বোন সম্পর্কে বলেছেন — "তেঁওর পরম ভাগ্য যে তেঁওর ভনীয়েকজনী তেঁওর দরে জধা-মুর্খ হৈ নাথাকি এম.ভি. পাছ করি বিয়ার পিছোতো ভালুকীগাঁওর এল.পি. স্কুলর মাস্টরনী হ'ব পারিছে।"[১৩৭] আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ সচেতন একদল মানুষের প্রচেষ্টায় অসমের গ্রামে গঞ্জেও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন হয় উনিশ শতকের শেষের দিকেই। স্ত্রীশিক্ষার জন্য তারা

প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন এবং গ্রামে গঞ্জে শিক্ষার জন্য স্কুল খুলেছেন যার আভাস মেলে 'অভিযাত্রী' উপন্যাসে। এই প্রচেষ্টায় চন্দ্রপ্রভার বহু অবদান লক্ষিত হয়েছে উপন্যাসে। চন্দ্রপ্রভার খোলা বালিকার পাঠশালা, তেজপুরের মেয়েদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কালজিপারা গ্রামের বালিকা স্কুল, শিক্ষার প্রসারতাকেই তুলে ধরেছে। এছাড়াও চন্দ্রপ্রভা মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেছেন, নারীর সামগ্রিক উন্নতির কথা চিন্তা করে। এসবের মধ্য দিয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধের অসমীয়া সমাজে ধীরে ধীরে নারীর অবস্থান পরিবর্তন হওয়ার কথাই প্রকাশ করা হয়েছে উপন্যাসে।

'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসেও পুরুষশাসিত সমাজে নির্যাতিত অত্যাচারিত ও অপমানিত নারীর অবস্থানই আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। অশিক্ষা এবং অর্থনৈতিকভাবে পরনির্ভরশীল মেয়েদের সমাজে বহু দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নলবাড়ীর ঢলকুছি গ্রামের পটেশ্বরী পূজনকে ভালোবেসে পালিয়ে গেলে পূজন তাকে ভোগ করে গুয়াহাটীর একটি হোটেলে রেখে চলে যায়। ইচ্ছা না থাকলেও পটেশ্বরীকে হোটেলের কাজ করা রূপহীন চবিনকে বিয়ে করে হোটেলের মালিকের বাড়ির দাসীতে স্বরূপ পরিণত হতে হয়েছে। শয্যাত্যাগ থেকে রাত্রিতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত তাকে মালিকের সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। পটেশ্বরীর আর চবিনের সঙ্গে নিজের ঘরের স্বপ্নও পুরণ হয় না তার। এমনকি মালিকের বাসনারও শিকার হতে হয়েছে তাকে। চবিন মালিকের হাত থেকে স্ত্রীকে বাঁচাতে না পেরে নিজের হাতেই স্ত্রীকে তুলে দিয়েছে মালিকের হাতে। কিন্তু পরে সন্দেহবশত স্ত্রীকেই মারধর করেছে, গালাগালি দিয়েছে — "চবিনে এচুকত শিলর মূর্তির দরে বহুতপর থির হৈ আছিল, তার পাছত সি হঠাৎ পগলার দরে হৈ গৈছিল আরু পটেশ্বরীক গার জোরেরে লুটিয়াই লৈ উধাই-মুধাই বুকুয়ে পেটে গোর শোধাই দাঁত করচি অর্ধস্ফুট মাতেরে কৈছিল "চালী বেশ্যা, রাণ্ডী করবার — মোর ঘর জ্বালাবাক্ গেলি আইহ্‌ছিলি রাক্ষসিনী —"[১৩৮] চবিনের মৃত্যুর পর গ্রামে ফিরে এলেও পটেশ্বরীকে আবার পুরুষের লালায়িত নজরের শিকার হতে হয়েছে। পটেশ্বরী ভেবেছে — "পটেশ্বরীয়ে আগতে বহুতবার অনুভব করার দরে আকৌ অনুভব করিছিল যে দরিদ্র মানুহর কারণে রূপ বস্তুটো অভিশাপহে, এই রূপেই তাইক সমস্ত জীবন লটিঘটি করি মারিলে। এতিয়া ললিতে কয় যে তাইর দরে বেশ্যা প্রকৃতির তিরোতা এজনীর আকৌ কিহর সতীত্বর অভিনয়।"[১৩৯] এভাবে দেখা গেছে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে একের পর এক পুরুষের দ্বারা পটেশ্বরী নির্যাতিত হয়েছে। শুধু পটেশ্বরীই নয় এমনকি জালুকবাড়ির মহিলা আশ্রয়গৃহে থাকা অনেক মেয়েই পুরুষের অত্যাচারের শিকার হয়ে গৃহ হারিয়ে আশ্রয়গৃহে স্থান পেয়েছে। আশ্রয়গৃহে থাকা পদুমী নামের মেয়েটি মাসীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাঙালি একটি ছেলের সঙ্গে পালিয়েছে মুক্তি পাবার আশায়। কিন্তু সেখানেও ছেলেটি থেকে সে প্রতারিত হয়েছে। ছেলেটি তাকে ছেড়ে পালিয়ে গেলে তার স্থান হয়েছে আশ্রয়গৃহে। এমনকি শহরের শিক্ষিত মেয়ে রেখাকেও স্বামীর বন্ধুর দ্বারা ধর্ষিত হয়ে স্বামীর অবহেলার শিকার হতে হয়েছে। এভাবেই লেখিকা পুরুষশাসিত সমাজে নারীর যন্ত্রণার গাথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন লেখিকা। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার জন্য বাণোর মাকেও আঠারো বছর বয়সে বিধবা হবার পর থেকেই খাওয়া

পরার জন্য ভাসুর দেবরের বাড়িতে ক্রীতদাসীর মতো থাকতে হয়েছে। যেমন পটেশ্বরীর মা শাশুড়ি হয়েও তার ভাই বউকে ভয় করেই থেকেছে।

অসমীয়া সমাজে বিধবাদের উপর তেমন নীতি নিয়মের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয় নি। তাই তো নীলকণ্ঠ লহকরের মেয়ে সুমলা বিধবা হয়ে বাড়িতে চলে এলে তাকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে মেয়েটি দাদাদের সংসারের গলগ্রহ হয়ে না থেকে। শিক্ষয়িত্রী হয়ে যাতে নিজের ও মেয়ের ভরণপোষণ করতে পারে। তবে মেয়েটি মেট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়ে একটি অবস্থাসম্পন্ন ঘরের ছেলের সঙ্গে প্রেম বিবাহ করে নিয়েছে। প্রথম প্রথম বলীর বাড়িতে এই বিয়েকে স্বীকৃতি না দিলেও পরবর্তীতে ছেলের বাড়ি থেকে এই বিয়েকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বলীর বাড়ির লোক ছেলে ও বউকে গ্রহণ করলেও নীলকণ্ঠ এই বিয়েকে স্বীকৃতি দেন নি। “ইমানখিনি বিদ্রোহ মাপ-বাপেকে কোনোপধ্যেই সহ্য করিব নোয়ারিলে। গতিকে সুমলার এই দুই নম্বর গিরীয়েক বলী পাটোয়ারীয়ে সুমলাক আরু তাইর কন্যা মীনাক লৈ ধুবরীত থকা বিরাট ব্যবসায়ী তার মোমায়েকর ওসরলৈ গৈ আশ্রয় ভিক্ষা করিলে। মোমায়েকে আশ্রয় দিলে, তেঁওর বিরাট ব্যবসায়ত তেঁওক সহায় করিবলৈ এজন আপন বিশ্বাসী মানুহ লগা হৈছিল, অথচ তেঁওর নিজর লরা একেবারে সরু হৈ আছে। বলী পাটোয়ারী মোমায়েকর কামত সোমাল আরু নিষ্ঠা আরু সততারে কাম করি মোমায়েকর কামত নিগাজি হ'ল। তার বহুত দিন পাছত বলীর ঘরর মানুহে পুতেক বোয়ারীয়েকক গ্রহণ করিছিল। কিন্তু আচরিত কথা যে নীলকণ্ঠয়ে সেই জীয়েকর আরু মুখ চোয়া নাই, তেঁওর দরে সাত্ত্বিক মানুহর ছোয়ালী যেতিয়া এনে শাস্ত্রবিরুদ্ধ, ঘোর অনাচারর কাম করিলে সেই ছোয়ালীক তেঁও মরণর দিনলৈকে ক্ষমা করিব নোয়ারে।”[১৪০] এথেকে বোঝা যায় ‘ইপারর ঘর সিপারর ঘর’ এর সময়ে অসমীয়া সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন থাকলেও তা সমাজে সর্বজনস্বীকৃত ছিল না।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে মেয়ে শ্রমিকের থেকে পুরুষ শ্রমিকের শ্রমকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। তাইতো সাবিত্রী ছেলে না হয়ে মেয়ে হবার জন্য পটেশ্বরীর দুঃখ হয়েছে, কারণ সে পুরুষের থেকে বেশি নোংরা কাজ করেও কম মূল্য পাচ্ছে। লেখিকা ছেলে ও মেয়ের শ্রম বিভাজনকে পটেশ্বরীর উক্তির মধ্য দিয়ে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন — “সাবিত্রী যদি ছোয়ালী নহৈ ল'রা হ'লহেঁতেন, অতি কমেওতো সি কুরি-পঁচিশ টকা আর্জিলেহেঁতেন — কিয় যে ল'রা চাকরতকৈ ছোয়ালী চাকরণীয়ে কম দরমহা পায় অথচ ছোয়ালী এজনীয়ে কেঁচুয়ার গু-মূত উকটা, গৃহস্থালীর মেখেলা ধোয়ারে পরা আদি করি পাকঘরর রন্ধা-বঢ়ালৈকে সকলো কামেই করে। কিন্তু কোনো ল'রাইতো সেই লেতেরা কামবোর নকরে অথচ সিহঁতে টকা পায় বেছি।”[১৪১] এগুলি ছাড়াও গ্রাম্য নারীকে শহরের নারীর তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয় ঢেঁকি দেওয়া, মাঠে ধান বোনা, নদীতে বিলে মাছ ধরতে যাওয়া, নদী থেকে কলসে করে জল আনা, তাঁত বুনা ইত্যাদি। গ্রামে গঞ্জে স্কুল কলেজ হলে কোথাও কোথাও গ্রামের মেয়েদের শিক্ষিত হয়ে শিক্ষয়িত্রীর ভূমিকা পালন করতেও দেখা গেছে।

‘অন্যজীবন’ উপন্যাসেও লেখিকা গ্রাম্য নারীর দুঃখকষ্টময় জীবনকেই তুলে ধরেছেন। এখানে

লেখিকা দেখিয়েছেন শহরের নারীর তুলনায় গ্রামের নারীদের অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। অণিমার শাশুড়ি অণিমাকে বলেছেন — "চহৰত তোমালোকৰ ইমান সোনকালে উঠাৰ অভ্যাস নাই নহয়, দৰকাৰো নাই। আমাৰ দৰেতো ঢেঁকীত ধান খুন্দি চাউল উলিয়াই ভাত খাব নালাগে। গতিকে আমাৰ সোনকালে নুঠিলে কেনেকৈ হ'ব আই? ঘৰখনৰ অইন কত কাম বন থাকে, গতিকে গাঁওত জীয়ৰী বোৱাৰীকে ধৰি সকলো মাইকী মানুহেই ৰ'দ ওলোৱাৰ আগতে বাহি বন কৰি ঢেঁকীত ধান বানিব লাগে আৰু যাৰ ঘৰত কুঁৱা নাই সিঁহতে আন ঠাইৰ পৰা পানীও কাঢ়িয়াই আনিব লাগে।"[১৪২] কঠিন পরিশ্রম করতে দেখা যায় বিশেষ করে উজান অসমের নারীদের। এত কষ্ট করার পরও স্বামীর কাছ থেকে অপমানিত হতে হয় তাদের। যেভাবে রজনী তার স্ত্রীকে অণিমার সামনেই অপমান করে স্ত্রী সম্পর্কে বলেছে — "নাই, আমাৰ এই গাঁওৰ অশিক্ষিতা তিৰোতাবোৰ একোকে নাজানে .... হেৰৌ,"[১৪৩] নারীকে স্বামীর দেওয়া অপমানই শুধু সহ্য করতে হয় না স্বামীর রক্ষিতা রাখার ব্যাপারকেও মেনে নিতে হয়। রজনীর নারায়ণপুরে রক্ষিতা রাখার ব্যাপার নিয়ে স্ত্রী বিহুপুরীয়ানি প্রথম প্রথম একটু কান্নাকাটি করলেও "তথাপিও ভাগ্য ভাল যে মই লক্ষীমপুৰীয়ানীৰ দৰে সতিনী খাটিব লগা হোৱা নাই"[১৪৪] বলে রক্ষিতা রাখার ব্যাপারটি মেনেও নিয়েছে। আবার পুরুষশাসিত সমাজে নারীর উপর হওয়া অত্যাচারের জ্বলন্ত উদাহরণ রূপে ভেসে উঠেছে পুতুলীর মা রম্ভার উপর পুতুলীর বাবার করা অত্যাচার। পুতুলীর মায়ের উপর হওয়া অত্যাচারের মধ্য দিয়ে সমাজে নারীর উপর হওয়া অত্যাচারকে লেখিকা দেখিয়েছেন। আইকণ অণিমাকে বলেছে — "খুৰীদেউক তেঁও জয়মতীক দিয়া শাস্তিতকৈও বেশি শাস্তি দিছিল। এবাৰ হোনো খুৰীদেউক মৈত বান্ধি পথাৰৰ পকা চপৰাৰ ওপৰেদি চোঁচৰাই নিছিল—।"[১৪৫] অণিমার মুখে লেখিকার ভাষ্য — "আচলতে আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত তিৰোতাৰ স্থানেই এনেকুৱা যে মতা মানুহবোৰৰ অবচেতন মনত তিৰোতাৰ প্ৰতি কৰা অত্যাচাৰ এটা স্বাভাৱিক ঘটনা হিচাপেই পোত খাই থাকে। আজিয়োতো ৰজনী দদাইদেউ ঘৈণীয়েকক মোৰ আগতে অনাহকত ইমান ককৰ্থনা কৰা শুনি আহিলো।"[১৪৬] আবার মনোজের বোন মাজনির স্বামীও মদ খেয়ে মাজনির উপর অত্যাচার করেছে ছেলের জন্ম দিতে না পারার জন্য। লেখিকা শুধু পুরুষের মেয়েদের উপর অত্যাচারকেই দেখাননি নারীর প্রতি তাদের অবহেলাকেও দেখিয়েছেন। অণিমা মনোজের মায়ের থালায় শ্বশুরের তুলনায় কম খাদ্য বস্তু দেখে দুঃখিত হয়েছে এবং মনোজকে তার মা কি খায় না খায় তা নিয়ে প্রশ্ন করলে মনোজ বলেছে — "এইটো কি আচৰিত কথা সুধিছো? বৌটিয়ে কি খায় মন কৰিবলগীয়া কিটো আছে? তেঁওৰতো কোনো বেমাৰ-আজাৰ হোৱা নাই যে কিবা স্পেচিয়াল খাব লাগিব বা আমি তেঁওৰ বাবে স্পেচিয়াল খাদ্যৰ বন্দোবস্ত কৰিব লাগিব? তেঁও নিশ্চয় আমি যি খাঁও তাকেই খাব আৰু খায়ো।"[১৪৭] কথার মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি পুরুষের চিরাচরিত উদাসীনতা ফুটে উঠেছে।

তবে অবস্থার ধীরে ধীরে পরিবর্তন হয়েছে। শিক্ষার প্রসারের ফলে গ্রামের মেয়েরাও বুঝতে পেরেছে শিক্ষার মূল্য, তাইতো আইকণ বিয়ে করতে চায়নি। সে লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হতে চেয়েছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ার জন্যই নারীর এরূপ অবস্থা বলে আইকনের মত

মূর্খ মেয়েটিও বলেছে — "মই বিয়া-চিয়া নকরাওঁ, মোর কারণে কোনেও চিন্তা করিব নালাগে। মেট্রিক পাছ করি মই ঘোরামরা কলেজত পঢ়িম, আমার ঘরর পরা পাঁচ মাইলহে দূরৈত, সেই খিনি মই খোজকাঢ়ি আহা-যোয়া করিব পারিম। বি.এ. পাছ করি চাকরি করিম। নিজর ভরিত থিয় দিম। তেতিয়া আরু কালৈকো পরোয়া করিব নালাগিব। বাইদেওয়ে পড়াশুনা করা হ'লে আজিতো এনেকৈ ভুগিব নেলাগিলহেঁতেন কেতিয়াবাই ভিনদেউক এরি থৈ আহি স্বাধীনভাবে চাকরি-বাকরি করি শান্তিত জীবন কটাব পারিলেহেঁতেন। মাইকী মানুহবোরেহে খোয়া-পিন্ধার বাবে মতা মানুহর ওপরত নির্ভর করিব লগা হয়, সেইবাবেইতো মরে।"[১৪৮] অণিমাও আইকণের কথা সমর্থন করে বলেছে — "আইকণে ঠিকেই কয়, মাজনীয়ে পঢ়ি-শুনি শিক্ষা-দীক্ষা পোয়া হ'লে তেনে অত্যাচারী গরিয়েকক এরি থৈ আহি অন্ততঃ নিজর ভরিত নিজে থিয় দি পারিলেহেঁতেন। স্ত্রীশিক্ষার অন্ততঃ সেইখিনি সুফল আছে।"[১৪৯] মনোজ ও অণিমা আইকণের পড়ার ইচ্ছাকে সমর্থন করেছে। এবং বাবাকেও আইকণকে পড়ানোর জন্য রাজী করিয়েছে। তাছাড়াও লেখিকা বিবাহবিচ্ছেদ আইনের কথার মধ্য দিয়েও নারীর অবস্থানের উন্নতির আভাস দিয়েছেন। এই আইনের ফলে মেয়েদের আর স্বামীর অত্যাচার সহ্য করে স্বামীর ঘর করতে হচ্ছে না। তাছাড়াও ঘরকন্নার আধুনিক উপকরণ সহজলভ্য হওয়ায় মেয়েদের গৃহকর্মের কষ্ট অনেক কমে গেছে। আইকণ বলেছে — "অবশ্যে আজিকালি দিনকাল বহুত হলনি হৈ আহিল। আজিকালির গাঁওর জীয়রী বোয়ারীয়ে আরু আমার বৌটি-আইতাঁহতর দরে কষ্ট নকরে। শুনিলাই নহয় হলার মেচিন হোয়াবাবে ঢেঁকীর ব্যবহার কম করি আহিছে, পলু পুহি এরি চাদর বোয়া কারবারটো এতিয়া কেবল অতি দুখীয়া মানুহবোরর ঘরে ঘরেহে বর্তি আছে — মুগার কাপোর আমার বৌটিহঁতেই ববলৈ এরি দিলে, মুগার বাবে চোমনি লাগে — সেই হাবিবোরো এতিয়া ধ্বংস হৈ আহিছে।"[১৫০]

পুতলীও মার মৃত্যুর জন্য একসময় সমস্ত পুরুষজাতিরই বিদ্বেষী হয়ে উঠলেও পরবর্তীতে মার্ক্সবাদী যুবক নরেনের সান্নিধ্যে এসে পুরুষকে সঙ্গে নিয়েই নারীকল্যাণে এগিয়ে আসতে চেয়েছে, পুরুষকে বাদ দিয়ে নয়। এভাবেই লেখিকা ক্রমশ নারীর অবমাননাকর অবস্থানের ধীরলয়ের পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন 'অন্যজীবন' উপন্যাসে। নারীর হীন অবস্থার জন্য পুরুষসমাজ দায়ী হলেও বর্তমানে বহু শিক্ষিত উদারমনা পুরুষের হাত ধরেই নারীমুক্তি আন্দোলন অগ্রসর হয়ে চলেছে তার আভাসও দিয়েছেন লেখিকা। পুতলীর উক্তি — "আইকণ নতুন শিকারু, গতিকে তাইর উগ্রতা বেছি হৈ আছে। তাইক কিন্তু মই সদায় কওঁ কার মন কিমান সংস্কারমুক্ত হ'ব পারিছে, কিমান প্রগতিশীল হ'ব পারিছে — সেই লৈহে কথা। আমার এই সমাজত পুরুষসকলেই বেছি শিক্ষা-দীক্ষা পোয়ার সুবিধা পাইছে, গতিকে তেঁওলোকেই আমাতকৈ বেছিকৈ জীর্ণ আরু অবক্ষয়রে ভরা এই সমাজর বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে। ভারতর নারীমুক্তি আন্দোলনর তেঁওলোকেই হোতা নহয় জানো?"[১৫১] এভাবেই নিরুপমার রচনা তাঁর মতাদর্শগত অবস্থানেরও স্মারক হয়ে ওঠে।

প্রথার আড়ালে 'অভিযাত্রী', 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' এবং 'অন্যজীবন'

মধ্যযুগে তথা আহোম যুগে জনজাতীয় প্রভাবে বাল্যবিবাহ প্রথার প্রচলন না থাকলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শের ফলে অসমেও বাল্যবিবাহ হতে দেখা গেছে। বিংশ শতাব্দীতেই বাল্যবিবাহ প্রথার প্রচলন দেখা গেছে। মেয়ে পুষ্পিতা হবার আগে বিয়ে দেওয়া এবং কুমারীকাল এলে পরে স্বামীগৃহে প্রেরণ করার প্রথার প্রচলন ছিল। তাছাড়াও তৎকালীন সমাজে বহুবিবাহ, জাতিভেদ প্রথা সহ অনেক কুপ্রথার প্রচলন ছিল। 'অভিযাত্রী' উপন্যাসেও এসব কুপ্রথার প্রচলন দেখা গেছে। উপন্যাসে চন্দ্রপ্রভা এবং তার ভাগনি রুক্মিণীর বাল্যবিবাহের কথা রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য চরিত্রের সংলাপে সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহের আভাস মেলে। স্কুল পরিদর্শক নীলকান্ত বরুয়া চন্দ্রর কথা নিয়ে ভাবতে গিয়ে বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গ ছুঁয়েছেন — "এই ছোৱালীজনীয়ে কি সংসার জ্বালরে বন্দী হওয়ার কথা কৈছে। এইর বিয়া হৈছিল নেকি বারু? একো আচরিত কথা নহয়, কামরূপর গাঁও-বোরত ছোৱালীবোরর অতি সোনকালে বিয়া হয়েই - তাতে যি পরিয়ালত আঠ-নজনী ছোৱালীর জন্ম হয়, তাততো ছোৱালীক উলিয়াই দিবলৈ তট নোহোয়া হ'বই। নিশ্চয় এই তেজী ছোৱালীজনীরো বিয়া হৈছিল আরু পিছত বোয়ারী জীবনর কঠোর বাধা নিষেধর শৃংখল ছিঙি ওলাই আহিছে।"[১৫২] রুক্মিণীকে ছোটবেলা বিয়ে দেওয়ার কথা শুনে চন্দ্র রেগে যান। চন্দ্রপ্রভার ক্রোধ এভাবে প্রকাশ করেছেন লেখিকা— "চন্দ্রই সিদিনা অসহায় বন্দিনী সিংহিনী এজনীর দরেই অকলে অকলে নিজর মনতে গর্জি মরিছিল। রুক্মিণীক ইমান কোমল বয়সত বিয়া দিয়া হ'ল। ভাগ্যর যে কি করুণ পরিহাস! তাই নিজে ইয়াত বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দি ফুরে আরু সিফালে তাইর নিজর ঘরতে নিজরেই প্রাণর প্রিয়া লাডুজনীক সেই বাল্যবিবাহর বলি করা হৈছে।"[১৫৩]

'অভিযাত্রী' উপন্যাসে বাল্যবিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহের কথাও রয়েছে। 'অভিযাত্রী'র সময়ে একটি পুরুষের একাধিক বিবাহের কথা জানা যায়। চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথকে ভালোবেসে তাঁর অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। দণ্ডীনাথ চন্দ্রপ্রভাকে বিয়ে করতে না পারলেও অতুলের ভরণপোষণের জন্য কিছু টাকা পাঠিয়েছেন। দণ্ডীনাথ অন্য একজনকে বিয়ে করলেও চন্দ্র ও দণ্ডীনাথের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলেছে। চন্দ্রপ্রভা কালজিপারার স্কুলে চাকরি করার সময় গোপীনাথ মেধীর ঘরে থাকাকালীন চন্দ্র ও দণ্ডীনাথের চিঠিপত্রের আদান প্রদানের কথা গোপীনাথ সমস্ত গ্রামে ছড়িয়ে দিলে রাতিরাম বলেছেন — "এদিন চন্দ্রক আরু অতুলক বোলে দণ্ডীনাথে স্ত্রী-পুত্র বুলি গ্রহণ করি ঘরত ঠাই দিব। তেঁও আকৌ বিয়া করাইছে? করিলে করক, কিনো ইমান জগরর কথাটো হ'ল, কালজিরাপারা দৈশিঙরিকে ধরি যত মানে গাঁও আছে সকলোতে কত মানুহর দুই তিনিজনীকৈ 'তিরী' আছে।"[১৫৪] রাতিরামের কথায় অসমীয়া সমাজে বহুবিবাহের বাস্তব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমগ্র ভারতব্যাপী জাতিভেদ প্রথার যে প্রচলন ছিল তা অসমেও লক্ষিত হয় তবে সময়ের অগ্রগতিতে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশ হ্রাস হয়ে চলেছে। তবে 'অভিযাত্রী' উপন্যাসে জাতিভেদ প্রথার স্পষ্ট প্রকাশ আছে। নায়িকা চন্দ্রপ্রভাও এই জাতিভেদ প্রথার শিকার হয়েছেন। চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথকে ভালোবেসে অবৈধ সন্তানের জননী হওয়ার পরও সুতকুলে জন্মানোর জন্য তাঁকে দণ্ডীনাথ কলিতা স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারেন নি। লেখিকার ভাষায় — "আচলতে চন্দ্রর তেজপুরর ভৈরব মন্দিরত দণ্ডীনাথ কলিতার লগত গোপনে গান্ধর্বমতেই বিয়া হৈছিল। পিছে দণ্ডীনাথর জাতি কলিতা, চন্দ্রর সুত, গতিকে সমাজর ভয়ত আরু দণ্ডীনাথর মাক-বাপেকে, জ্ঞাতি-কুটুম্বই ত্যাগ করার ভয়ত এতিয়া চন্দ্রক গ্রহণ করিব পরা নাই।"[১৫৫] এমনকি চন্দ্রপ্রভা নিজেও সুতকুলে জন্ম নেওয়ার জন্য হীনমন্যতায়ও ভুগেছেন। তাই তেজপুরে চাকরি করাকালীন আগরওয়ালা পরিবারটি তাঁকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছেন। তিনি বলেছেন — "পকীর সেই বিখ্যাত আগরওয়ালা পরিয়ালটো যে কি মহানুভব, কি দয়ালু! তাইর দরে সাধারণ গাঁওর ঘর এখনর নীহকুলীয়া ছোয়ালী এজনীক তেঁওলোকে অকণো হীনভাবেরে নেচাই নিজর পরিয়ালর এজনর দরেই তেওঁলোকর মাজত আশ্রয় দিলে।"[১৫৬] পরবর্তীতে চন্দ্রপ্রভা এই জাতপাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। যে শংকরদেব জাতপাত ভেদাভেদ বিচার না করে সর্বমানবের সমতার ধর্মপ্রচার করেছেন তাঁরই কীর্তন ঘরে জাতপাতের ভেদাভেদ দেখে চন্দ্রপ্রভা প্রতিবাদ করেছেন। কালজিপারার সত্রের সামনে থাকা কুয়োতে নীচুজাতির মেয়েদের জল ভরা নিষিদ্ধ ছিল — "তাই নীচ জাতির ছোয়ালীতো, সেই বাবে কুঁয়ার পানী স্পর্শ করিব নোয়ারে। অলপ পিছতে গাঁওর কোনোবা ভাল জাতির ছোয়ালী পানী তুলিবলৈ আহিলে তাইরো কলহ ভর্তি করি দিব।"[১৫৭] এই কথায় চন্দ্রপ্রভা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে গান্ধীজীর জাতিভেদ নিবারণের আন্দোলনের কথা শুনালে সত্রাধিপতি লজ্জিত হয়ে কুয়ো থেকে সবার জল তোলার অধিকার দিলে চন্দ্র কয়েকটি নীচকুলের মেয়েকে দিয়ে জল তুলিয়ে নেন।

'অভিযাত্রী' উপন্যাসে আমরা ঘরজামাই রাখার প্রথারও আভাস পাই। ভারতীয় সমাজে কোথাও কোথাও ঘরজামাই রাখার প্রথা আছে। 'অভিযাত্রী'তেও জমি বাড়ি দিয়ে মেয়ের জামাইকে ঘর জামাই রাখার উদাহরণ মেলে। কখনো কখনো অবস্থাসম্পন্ন পিতামাতা মেয়েকে সম্পত্তি দিয়ে জামাইকে ঘরেই রেখে দেন, মেয়েকে দূরে পাঠান না। আবার কখনও কখনও বুড়ো বয়সের কথা ভেবেও ঘরজামাই রেখে দেন। 'অভিযাত্রী' উপন্যাসে চন্দ্রপ্রভার বাবা রাতিরাম মজুমদারও মেজ মেয়ে যোগমায়াকে ইচ্ছা করলেই যাতে দেখতে পারেন সে আশাতেই জামাই সুপাত্র হওয়ার পরও ভূ-সম্পত্তি দিয়ে নিজের কাছেই জামাইকে রেখেছিলেন ঘরজামাই করে। দণ্ডীনাথ পিয়াদাও মেয়ে রুক্মিণীকে বুড়ো বয়সের সাহায্য হবার জন্য মাটি বাড়ি নিয়ে দিয়ে সামনেই রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসেও দেখা গেছে বহুবিবাহজনিত লাঞ্ছনা। আশ্রয়গৃহে থাকা গুদু নামের বউটির স্বামীর ঘর ছেড়ে আশ্রয়গৃহে আসার পিছনেও রয়েছে সতীনজ্বালা — "গুদু বোলা মানুহজনী অলপো গাভরু নহয়। চল্লিছর ওপর হোয়া এই মানুহজনী দুবারকৈ আশ্রয়গৃহলৈ

আহিছে। গুদু কামৰূপৰ কোনাবা এখন ভিতৰুয়া গাঁওৰ তিৰোতা। তাই অবিবাহিত মাতৃ নহয়, এটা ল'ৰা হোয়ার পাছতে গিরিয়েকে এজনী 'ধেম্‌নী' আনিলে, তার পাছত দুই সতিনীয়েকর এনেকুয়া দুর্বাদল কাজিয়া লাগিল যে গিরিয়েকে দ্বিতীয় পক্ষর লাগী তিরোতাজনীক রাখি প্রথম পক্ষর এলাগী তিরোতা গুদুক ল'রাটোরে সৈতে খেদি দিলে।"[১৫৮]

'অন্যজীবন' উপন্যাসেও বহুবিবাহের আভাস মেলে বিহপুরীয়ানীর উক্তিতে — "তথাপিও ভাগ্য ভাল যে মই লক্ষীমপুরীয়ানীর দরে সতিনী খাটিব লগা হোয়া নাই"[১৫৯] এবং এই বহুবিবাহ ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই সমাজও মেনে নিয়েছে। তাইতো অণিমা মনোজকে রজনীর নারীঘটিত দোষ এবং রমা বরার লক্ষীমপুরীয়ানী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ের কথা নিয়ে প্রশ্ন করলে মনোজ ব্যাপারটিকে একেবারে সাধারণ করেই বলেছে — "তুমি চহরর ছোয়ালী, গতিকে তার মাপকাঠীরে গাঁওক বিচার করিবলৈ নাযাবাচোন, গাঁওত আগতে দুজনী-তিনজনী বিয়া করাটো সাধারণ ঘটনা আছিল।"[১৬০] 'অন্যজীবন' উপন্যাসেও জাতিভেদ প্রথার আভাস রয়েছে। ব্রাহ্মণ কলিতার বিরুদ্ধাচরণ করেছে জাতি উপজাতির লোকেরা। মনোজ নরেন সম্পর্কে 'আহোম লরা' বললে আইকণ রেগে গিয়ে বলেছে — "পুতলীয়ে একেবারে ঠিক কথাকে কৈছে। তাই এনেকৈ অপ্রিয় সত্য কথাবোর কয় বাবেই সকলোয়ে তাইর বিরুদ্ধে কয়। আরু বৌটি, আমার ছারর এটা নাম আছে নহয়, তই কিয় আহোম মাষ্টর বুলি ক'ব লাগে? তঁহতর এনে ধরণর কথার বাবেইতো আজি অসমর সকলো পিছ-পরা জাতি উপজাতির মানুহ এই বামুণ-কলিতাবোরর বিরুদ্ধে মূর দাঙি উঠিছে।"[১৬১] এভাবেই নিরুপমার উপন্যাসগুলিতে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ এবং জাতিভেদ প্রথার মত নানা কু-প্রথায় জর্জরিত অসমীয়া সমাজের খণ্ডচিত্রমালা উঠে এসেছে। চন্দ্রপ্রভা অসমের গ্রামে-গঞ্জে, নগর-শহরে ঘুরে ঘুরে মহিলা সমিতির অধিবেশন আহ্বান করে সেগুলিতে দেওয়া ভাষণের মধ্যে সমাজের কুসংস্কার এবং নানা কু-প্রথা দূর করা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধ করা, অস্পৃশ্যতা বর্জন করার কথা বলেছেন। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন অসমীয়া সমাজে এই সমস্ত প্রথার প্রচলন থাকার আভাসই দিয়েছেন লেখিকা।

উপন্যাস তিনটিতে বিম্বিত সংস্কার ও রীতিনীতি

উপন্যাসের বয়নে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের টুকরো টুকরো ছবিতে ধরা পড়ে সামাজিক জীবনের নানা বিধি নিষেধ, সংস্কার ও প্রথার রূপ। নিরুপমার উপন্যাসও ব্যতিক্রম নয়। অসমীয়া সমাজে বাড়িতে অতিথি এলে চা ও তামোল দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। রাতিরাম কলিতার বাড়িতে আসা লোকদের চা-তামোল দিয়ে আপ্যায়নের ছবি আছে 'অভিযাত্রী'তে। পুরুষের সামনে এলে মেয়ে বউদের ভালো করে গা ঢাকা দিয়ে আসতে হয়। বউদের মাথায় কাপড়ও দিতে দেখা যায়। তাই রাতিরাম মজুমদারের স্ত্রী মেয়ে জামাই দণ্ডী পিয়াদা এলে তাঁতশাল থেকে জামাইয়ের সামনে আসার সময় মেখলার উপর তাড়াতাড়ি করে গামছা একটা নিয়ে শরীর ঢেকেছেন এবং

সেটি দিয়ে ওড়নিও নিয়েছেন — “তিনি-চারিবার তেঁও ‘চন্দ্র-চন্দ্র’ বুলি চিঞঁরার পিছতহে গঙ্গাপ্রিয়ার কাণত শব্দটো সোমালে। লগে লগেই তেঁও তাঁত শাল এরি বাহিরলৈ ওলাই আহিল আরু ঘাইঘরর কাঁথির চরিত ওলমি থকা গামোচা এখন টান মারি লৈ মেথলি মরা গাটোর ওপরর উদং অংশটো ঢাকি ল’লে, কিবাকৈ সেই গামোচারে ওরণিও ল’লে।”[১৬২] বিবাহিত মেয়েদের কপালে সিঁদুরের ফোটা নেওয়ার রীতি রয়েছে তা চন্দ্রপ্রভার কপালে দেওয়া সিঁদুরের ফোটা থেকে বোঝা যায়। চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথের বিবাহিতা স্ত্রীর মত কপালে সিঁদুরের ফোটা দিয়েছেন এবং দণ্ডীনাথের মৃত্যুর পর সেটিকে মুছে ফেলেছেন।

অসমীয়া সমাজে যে সমস্ত লোক ভক্ত হয়ে যান তাঁরা গুরুর শরণ নিয়ে মহন্ত হয়ে যাওয়ার পর স্বপাক আহারই গ্রহণ করেন। ‘ইপারর ঘর সিপারর ঘর’ উপন্যাসে নীলকণ্ঠ লহকর ভগবানের শরণে গিয়ে মহন্ত হলে স্বপাক অন্ন গ্রহণ করেছেন। আগে নীলকণ্ঠ অঞ্জলিদের বাড়িতে আসলে অঞ্জলির মার হাতে রান্নাও খেয়েছেন কিন্তু শরণ নেওয়ার পর আলাদা করে নিজেই রান্নাবাড়া করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন অঞ্জলির মা। তবে তাঁরা আবার দোকানে অন্যের বানানো জিনিস খান। তাই একবার অঞ্জলির দাদা নীলকণ্ঠর চা খাওয়া ও বিস্কুট খাওয়া নিয়ে মন্তব্য করেছে — “দোকানর ম্লেচ্ছে করি দিয়া বস্তু খালে এই ভকতসকলর জাত নেযায়, কিন্তু আমার মায়ে রান্ধি দিয়া ভাতকেইটা খালে হ’ল রৌ রৌ নরকত পচি মরিব।”[১৬৩] এই উক্তির মধ্য দিয়ে ভক্তদের ভণ্ডামি আমাদের সামনে চলে আসে। বিবাহ এবং শ্রাদ্ধ এ দুটি অনুষ্ঠানে গ্রামের মানুষকে ভোজ দেওয়ার রীতিও প্রচলিত তার প্রমাণ মিলে ‘ইপারর ঘর সিপারর ঘর’ উপন্যাসে। অতি দরিদ্র মানুষ হলেও ভোজের ব্যবস্থা করতেই হয়।

‘অন্যজীবন’ উপন্যাসের লেখিকা অসমীয়া সমাজে প্রচলিত কিছু বিশ্বাস ও রীতি নীতির উল্লেখ করেছেন। তাই অণিমার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাদের পথের খাবার জন্য যে আহার পাঠিয়েছিল তাতে একটি লঙ্কাও দিয়ে দিয়েছিল ভূত-প্রেতকে দূরে রাখার জন্য। তাই অণিমা বলেছে — “জলকীয়া ? অ’ ভূত-প্রেতক দূরত রাখিব খোয়া-বস্তুর টোপোলার লগত সরিয়হ, জলকীয়া আদি বান্ধি দিয়ার নিয়ম তেন্তে ইয়াতো আছে? কিন্তু না থাকিবই বা কিয়, অসমরে এখন গাঁওর কথা।”[১৬৪] অসমীয়া সমাজে বউকে ‘রান্ধনী’ হিসেবে দীক্ষিত না করা পর্যন্ত গুরুস্থানীয়রা বউএর ছোঁয়া জিনিস খায় না। আর এই রাধুনি হিসেবে দীক্ষিত করার জন্য বাড়িতে দস্তুরমতো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে লোকজন নেমন্তন্ন করে ভগবানের পূজার্চনা করা হয়। তাই তো মনোজের মা বলেছেন — ‘ভাতর চরু গতাব খোজা নাই, কিন্তু নিয়মটো করি থ’ব খুজিছো। আপদে-বিপদে যাতে দরকার হ’লে চরু চুব পারে, তার ব্যবস্থা এটাতো করি থ’ব লাগিব। নহ’লে কিবা সকামে-চকানে বোয়ারীর চোয়া বস্তু গুরুয়ে কিয় মুখত তুলিব।”[১৬৫] অসমীয়া গ্রাম্য সমাজে মেয়ে বউদের বাসি কাপড়ে স্নান না করে চা করা এবং অন্যান্য কাজে নিষেধ রয়েছে। মাকন অণিমাকে বলেছে — “তুমি বাহি গারে আছা নহয় নবৌ, দেউতাহঁতেতো তোমার হাতোর চাহ নেখাব।”[১৬৬]

নিরুপমার উপন্যাসে বিম্বিত রাজনৈতিক পরিবেশ

নিরুপমা বরগোহাঞিঁর উপন্যাসগুলিতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক মতাদর্শের স্বর বেশ স্পষ্ট। 'অভিযাত্রী' উপন্যাসে প্রাক স্বাধীনতা পর্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির ছবি আছে। সরাসরি এসেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ। ব্রিটিশের ভূমি খাজনা নীতির ফলে সাধারণ কৃষকের জীবনে নেমে আসা সংকটের উল্লেখ রয়েছে উপন্যাসে একাধিকবার। করের বোঝা কৃষকের মেরুদণ্ড বাঁকা করে দিয়েছে —"ইমান জমির মালিক হৈ লাভতো নাই, ব্রিটিছ চরকারক দিব ল'গা বিপুল পরিমাণর খাজনাই একেবারে কঁকাল বেঁকা করি দিয়ে ...."[১৬৭] খাজনা দিতে না পারলে ছিল পেয়াদার অত্যাচার, ক্রোক করা হত জমি সম্পত্তি — "হরিহঁতর জানে ভিনিহি, বর দুখ, অতি দুখীয়া সিহঁত, দুইবেলা খাবলৈকে নাপায়। খাজনা দিব নোয়ারা বাবে সিহঁতর মাটিবারী, সা-সম্পত্তি সকলো পিয়াদাই ক্রোক করি লৈ গৈছে — অ' আপুনিওতো তেনে পিয়াদাই, মই কথাটো ভবাই নাছিলো! পিয়াদাবোরতো বর বেয়া মানুহ, আমার দুখীয়া খেতি করা মানুহবোররতো আপনালোকে খাজনার বাবে সকলো বস্তুকে ধাহি-মুহি কাঢ়ি লৈ যায়—"[১৬৮] উপন্যাসটিতে মিশনারিদের প্রচেষ্টায় ধর্মান্তরীকরণের প্রয়াসের বিবরণ আছে, চন্দ্রপ্রভার মতো প্রগতিশীল মানুষ এদের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

সমগ্র ভারতব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রামের আগুন জ্বলে উঠলে অসমেও এর প্রভাব লক্ষিত হয়। গান্ধীজীর অসম আগমন তথা 'স্বরাজ আমার জন্মস্বত্ব'র ঘোষণা চন্দ্রপ্রভার মত দেশপ্রেমীদের উৎসাহ বৃদ্ধি করে। মহাত্মা গান্ধী মহিলাদের 'জাত সিপাহি' বলেছিলেন, উপন্যাসে রয়েছে এই তথ্য। অসমে চরকা কাটার বিস্তৃতি, ব্যাপক হারে মানুষের গান্ধী আন্দোলনে যোগদান ইত্যাদি বিবরণ রয়েছে লেখায়। উপন্যাসের একটি চরিত্র চন্দ্রপ্রভাকে বলেছে — "আমার রাইজ গান্ধীজীর আহ্বানত কেনেকৈ সঁহারি দি ওলাই আহিছে ভাবিলে বিস্ময় মানিব লাগে। এতিয়া প্রায় ঘরে ঘরে যতঁরর প্রচলন হৈছে, এতিয়া গাঁওর ডেকাই পিন্ধনর বস্ত্রর অভাবতো হেনো কেবল গামোচাকে পিন্ধি স্বেচ্ছাসেবক হ'বলৈ দলে দলে ওলাই আহিছে। আমার গাঁওবোর কিমান দুর্দশাগ্রস্ত, কিমান পিছপরা, বাট-পথ খলা বমারে ভরা, গাড়ী-ঘোঁরার ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আমার ডেকা-বুঢ়া সকলোয়ে মূরর ওপরর র'দ বাটর বোকাপানী, দীর্ঘ পথর দূরত্ব, জংগলর জন্তু, চোর ডকাইত একোকে গ্রাহ্য নকরি পিকেটিং করি আদালত বর্জন করিবলৈ বাধ্য করিছে, কানি মদ বিক্রী বন্ধ করি দিছে, বিদেশী বস্ত্র বর্জন আরু দাহ করিছে ... সঁচাই চন্দ্র বাইদেউ, দিনে দিনে এই খবরবোর পাঁও আরু আমার দেশবাসীর এই নিঃস্বার্থ আরু আত্মত্যাগর কাহিনীবোরত মোর বুকু গর্বত ফুলি উঠে...."[১৬৯] স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় তেজপুর, সতিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবের অগ্নি ছড়িয়ে পড়ে। চন্দ্রনাথ শর্মা, অমিয়কুমার দাসের মত ব্যক্তিরা চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেশপ্রেমমূলক বক্তৃতা দিয়েছেন। জ্যোতিপ্রসাদ আগরওয়ালা, দয়ালচন্দ্র ভূএগ্ৰা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ছাত্ররা স্কুল ত্যাগ করে ভলান্টিয়ার

হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে অসমের আকাশ, বাতাস মেতে উঠেছে। গান্ধীজীর পরামর্শে চন্দ্রপ্রভার মতো নেত্রীরা মহিলা সমিতি গঠন করে মহিলাদের নানারূপ প্রশিক্ষণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের দেশসেবায় ব্রতী হবার মতো মানসিকতাও গড়ে দিয়েছেন। মহিলা স্বেচ্ছাসেবী দলের গঠন করেছেন। চন্দ্রপ্রভা ও জ্যোতিপ্রসাদ মিলে নানারূপে স্বাধীনতা সংগ্রামকে গতি দিয়েছেন। "রায়ত সভার মহিলা সমাবেশর শোভাযাত্রাত প্রায় বিশগরাকীমান ছোয়ালীকে তাই আরু জ্যোতিয়ে অশ্বারোহী করি যোগ দিবলৈ উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিব পারিছিল। চারিদুয়ারর আকাশ বতাহ সেই ঘোঁরার ক্ষুরার ধূলিরে যেন ধূয়ঁলি কুয়ঁলি হৈ উঠিছিল, সেই কুরিজনী ছোয়ালী যেন সাধারণ একোজনী অসমীয়া ছোয়ালী নহয়— সিহঁতর প্রত্যেকেই যেন একো একোজনী ঝাঁন্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ .. আরু চন্দ্রপ্রভা ! তাই তেতিয়া তিনি হেজার মহিলা সমাবেশর সভানেত্রীর পদ অলংকৃত করি উদাত্ত কণ্ঠেরে আই বাই ভনী সকলোকে গান্ধীজীর প্রতিটো আঁচনিরে সফল রূপায়ণর যোগেদি অসহযোগ আন্দোলনত অরিহণা দিবলৈ আহ্বান জনাইছে, তাইর প্রতিটো কথা অগ্নিস্ফুলিংগ হৈ প্রতিজন শ্রোতার অন্তরত বহুবার লগা গভীর দাগ বহুয়াই শেষত আকাশমুখে ধাবিত হৈছে, লগে লগে তাইকে যেন কোনোবা এখন স্বৰ্গলৈ উরুয়াই লৈ গৈছে, অন্ততঃ প্রতিজন শ্রোতার মনত তেতিয়া তেজোদ্দীপ্ত চেহেরার অকুতোভয় প্রাণর, অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা দিব পরা এই ছোয়ালীজনী আরু এজনী সাধারণ ছোয়ালী নহয়, স্বৰ্গর কোনবা দেবী, কোনোবা শক্তিরূপিণী দুর্গা, চামুণ্ডা।"[১৭০]

চন্দ্রপ্রভা অসমের নগরে-শহরে, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে সভা-সমিতি গঠন করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার এবং নানা কু-প্রথা দূর করার কথা, বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহ রোধ করা, অস্পৃশ্যতা বর্জন করা, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জন্য কাজ করা, বিদেশি দ্রব্য এবং বিলাসিতা বর্জন, খাদি উৎপাদন এবং প্রচলন করা, স্ত্রী শিক্ষা প্রচার করা, নিরক্ষরতা দূর করা, কানি মদ ভাং ইত্যাদি বর্জন, সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চার উৎসাহ দিয়ে অধিবেশনসমূহ পরিচালনার মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য করার জন্য বের হওয়া শোভাযাত্রাতে অসমীয়া হিন্দু মেয়ে ছাড়াও পর্দায় থাকা মুসলমান মেয়ে, বাঙালি মেয়েরাও যোগ দিয়েছিল।

'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ সামান্য ছুঁয়ে গেলেও এখানে মূলত স্বাধীনতা পরবর্তী সময়কেই দেখানো হয়েছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে তবে দরিদ্র দেশবাসীর অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি বরং নীলকণ্ঠের মতো স্বার্থপর ভণ্ড মানুষদের জন্য গ্রামের দরিদ্র প্রজার দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার ভূমিহীন মানুষের মধ্যে ভূমি বন্টনের জন্য বেশি ভূমিসম্পত্তি থাকা মানুষ থেকে কিছু মাটি আদায় করার ব্যবস্থা করে 'সিলিং আইন' প্রণয়ন করে। ফলে নীলকণ্ঠের মত ভক্তটির চোখ থেকে ঘুম চলে যায় তাই তিনি নিজের মাটি জমি রক্ষার জন্য তৎপর হয়ে বেনামে পাট্টা বের করতে থাকেন। এভাবেই লেখিকা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের সিলিং আইন, প্রব্রজন সমস্যা ইত্যাদি রাজনৈতিক পরিবেশ তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে। ব্যাপক সংখ্যক বাঙালি উদ্বাস্তুর প্রব্রজন এবং প্রব্রজনের ফলে অসমের সমাজে সৃষ্ট সংকটকেও তুলে ধরেছেন লেখিকা। তবে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃজন উপন্যাসটির লক্ষ নয়। বরং মানুষের স্বার্থপরতা,

নীচতাই বেশি করে ফুটে উঠেছে 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে। বেকার সমস্যা ও দুর্নীতিতে ভরে উঠেছে রাজ্যের পরিবেশ। ফলে সৃষ্টি হয়েছে অরাজকতা ও অস্থিরতা। দেখিয়েছেন পুঁজিবাদের ফলে সৃষ্টি হওয়া শোষক শ্রেণির শোষণের দিকটিকে। কিন্তু পুলিশের হাতে কখনো এই শোষক শ্রেণিরা ধরা পড়ে না। কারণ তারা সমাজের গণ্যমান্য শ্রেণির লোক। বরং পুলিশেরা শাস্তি দেন সাধারণ শ্রেণিকেই। তাই অঞ্জলি দাদাকে বলেছে — "অ' দাদা মোর এটা কথা খুব জানিবর মন যায় — মাজে মাজে যে হঠাৎ কেতিয়াবা ক'রবাত দুই এজন ভেজালকারী, ভেটিখোর, ক'লা বেপারী আদি সমাজর গণ্যমান্য অপরাধী ধরা পড়ে, তেতিয়া আমার এই ধর্মহঁতকৈ ভালগুণে বদমাইছ সেই মানুহবোরকো পুলিচে এইদরে বুটতে গুরিয়াব নেকি, হান্টাররে কোবাই সিহঁতর চোলার তলর আলসুয়া ছালবোর ফটাই দিয়ে নেকি?"[১৭১] দরিদ্র শ্রেণির দরিদ্রতা বৃদ্ধি ও তাদের দুঃখময় জীবনের জন্য পুঁজিবাদ ও ধনিক শ্রেণিকেই দোষ দিয়ে অঞ্জলি দাদাকে বলেছে — "যোয়াবার গাঁওলৈ যাওঁতে আমার উপেন খুরাহঁতর ওচরত থকা আকলু নামর মানুহ এটার ঘৈণীয়েকে মা আরু মোর আগত খুব কান্দিলে। আকলুয়ে চহরত পিয়ন কাম করিছিল, কোনোবা মানুহর পরা দহ টকা ভেটি লোয়া অপরাধত ধরা পরাত লগে লগে চাকরি গ'ল। মাটিহীন আকলুর এতিয়া পানীত হাঁহ নচনা অবস্থা। দাদা আমার ওচরত নরেশ শইকীয়াহঁতর থকা-খোয়ার ষ্টেণ্ডার্ড আগতকৈ কমিছেনে? তেওঁ কিয় ধরা পরা নাই? তেওঁ কিয় রক্ষা পরি আছে? তেনেকুয়া আরু হাজার হাজার নরেশ শইকীয়ার দপ্দপনি কিয় কমা নাই? আকলুর ঘটনাটো শুনি মোর আগত নরেশ শইকীয়া আরু তেওঁর দরে বহুত মানুহর ছবি ভাহি উঠিছিল। দুর্নীতির অভিযোগত বহুত পিয়ন-চকীদারর চাকরি গৈছে, বহুতো ডাঙর চাকরি করা মানুহরো অবশ্যে চাকরি গৈছে কিন্তু সকলোরে চকুর আগত দেখ দেখকৈ দুর্নীতি করি দপদপাই থকা মানুহবোরর কিয় কোনো শাস্তি হোয়া নাই, কিয় তেওঁলোক এতিয়াও সমাজর গণ্যমান্য মানুহ হৈ বহি আছে? আকলুর ল'রা এটা আছিল, পঢ়াত সি বর চোকা আছিল, কিন্তু এতিয়া তাক পঢ়ার পরা এরুয়াই আন ঘরত চাকর রখা হৈছে। আমার দেশর বেকার সমস্যার সমাধান অতি সুন্দরভাবে করি আছে এই এটা চাকরিয়ে। লোকর ঘরর ল'রা-ছোয়ালী আহি লোকর ঘরর গালি-শপনি কিল চর লাথি খাই দিনটো কাম করি থাকিব। রাতিপোয়ার পরা রাতিলৈ সিঁহতর বেছিরভাগরে দিনটো আজরি নাই। বহুতে ভালকৈ খাবলৈও নাপায়, বহুতে মার খাই মরে। আমার দেশর এই ভৃত্য সম্প্রদায়র দরে শোষিত শ্রেণী আরু নাই দাদা।"[১৭২] এভাবেই লেখিকা মর্মস্পর্শী কিন্তু অতি বাস্তব সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে।

'অন্যজীবন' উপন্যাসের অন্তর্বয়নে রাজনীতির স্বর বেশ স্পষ্ট। নারী পুরুষের সম্পর্কের সমস্যাকে লেখিকা নিজে যেমন মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন, তেমনি নরেন-পুতলীর কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়ে তাকে প্রকাশ করেছেন।

আৰ্থসামাজিক দিক

উপন্যাসগুলিতে অসমের অর্থনৈতিক জীবনেরও কিছু পরিচয় আছে। যুদ্ধের অভিঘাতে, এবং নতুন প্রজন্মের নগর-অভিমুখী মানসিকতার দরুন জমি পড়ে থাকছে অনাবাদ। কৃষির ক্রমাবনতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফলগুলিকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রয়োগ করার জন্য কোনোদিনই প্রণালীবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করে নি শিলং-দিসপুর। উপন্যাসগুলিকে ছুঁয়ে আছে এসব পর্যবেক্ষণ। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে প্রথমত কৃষিনির্ভর গ্রাম্য জীবনই তুলে ধরেছেন লেখিকা। তবে উপযুক্ত বিকাশ পরিকল্পনার অভাবে এবং প্রব্রজনের ফলে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে যাওয়া গ্রাম্য জীবনের অভাব অনটনের এবং দুঃখ-কষ্টের দিক ফুটে উঠেছে উপন্যাসে।

কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সভ্যতার ক্রমশ অবলুপ্তির আভাস মেলে অন্যান্য জীবিকা গ্রহণের মধ্য দিয়ে। পরেশ কলিতা কৃষকের ছেলে হয়েও পড়াশোনা করে চাকরিজীবী হয়ে গুয়াহাটীতে থেকেছেন। পরেশ কলিতার বড় ছেলে গুয়াহাটী কলেজের অধ্যাপক হয়েছে। বাণোও জীবিকার সন্ধানে শহরে গিয়ে প্রেসের কাজে ঢুকেছে। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বাকলুও গ্রামে হওয়া প্রব্রজনের বলি হয়েছে। ঢলকুছি গ্রামের দোকানি বাকলুর দোকান থেকেই গ্রামের লোক তেল, লবণ, ডাল নিত কিন্তু নদীর ওপারে প্রব্রজিত মারোয়াড়ি একটি বড় দোকান খুললে বাকলু প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে না পেরে গ্রাম ছেড়ে গুয়াহাটী গেছে। হাতে একটি দা নিয়ে যাত্রা করেছে জীবন সংগ্রামে যোগ দিয়েছে সে পরিণত হয়েছে দিনমজুরে। এভাবেই ভূমিহীন কিন্তু স্বনির্ভর বাকলুর মত বহু মানুষ শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। লেখিকার ভাষায় — "গতিকে এদিন সি ঈশ্বরকে ভরসা করি হাতত দা এখন লৈ গুয়াহাটীলৈ বুলি যাত্রা করিলে। প্রথমতে গৈ সি হরি কাম্‌লার বাহাত উঠিব আরু তার পাছত সিয়ো তাত কাম্‌লা করি জীবিকা অর্জনর চেষ্টা করিব।"[১৭৩] একইভাবে বহু ছেলে প্রব্রজিত হয়ে প্রেসের কাজে লেগেছে, কেউ হোটেল বয়ের কাজ করেছে আবার কেউ শহরে সম্ভ্রান্ত ঘরে চাকর খেটেছে। আবার পটেশ্বরীর ভূমিহীন দাদা কালীকান্ত তেজপুরে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয়েছে। এভাবেই দেখা গেছে গ্রাম থেকে দলে দলে জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী যাত্রা করেছে এবং গ্রামে গঞ্জেও প্রব্রজন ঘটেছে ব্যবসায়ী মারোয়াড়ি ও বাঙালির। নিম্ন অসমের কৃষকদের অত্যন্ত বেশি দুরবস্থা কারণ সেখানে বসতি ঘন, ভূমির ওপর প্রবল চাপ। তবে উজান অসমের মানুষকে বেশি কষ্ট করতে হয় যা ধরা পড়েছে লেখিকার চোখে — "উজনির মানুহে চাপরি ভাঙি খেতি করে, হাবি কাটি খেতি করে, কিন্তু নামনিত মাটি অতি দুষ্প্রাপ্য।"[১৭৪]

অর্থনৈতিকভাবে অস্বাবলম্বী নারীর দুঃখ ও দুর্দশা ফুটে উঠেছে পটেশ্বরীর জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে। অভাবে পটেশ্বরী মেয়ে সাবিত্রীকে কাজে দিয়েছে। "এইদরেই সাবিত্রী এঘার বছর বয়সতে চাকরিত সোমাল, ভারতর অগণন শিশু শ্রমিকর লগতে আরু এটা নুতন শিশু শ্রমিকর যোগ হ'ল।"[১৭৫] এই উপন্যাসেও মেয়েদের তাঁত বোনার উল্লেখ রয়েছে। "পটেশ্বরীর মাক আরু বৌয়েকে চোতালত তাঁত-বাতি কাঢ়ি আছিল।"[১৭৬]

নিরুপমা গ্রাম্য জীবনকেই বেশি প্রাধান্য দিলেও অর্থসম্পন্ন ধনি শহুরবাসীর মানসিকতাও ফুটিয়ে তুলেছেন এই উপন্যাসটিতে বাণেশ্বর অর্থাৎ বাণোর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। বাণো শহরে যে প্রেসে কাজ করত সেই প্রেসের মালিকের স্ত্রীর কৃপণতা দেখে বাণোর মনে সৃষ্টি হওয়া ভাবনার মধ্য দিয়ে লেখিকা এই সমস্ত ধনিক শ্রেণির নীচ মানসিকতা ও হৃদয়হীনতার দিকটি ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের অনেক থাকা সত্ত্বেও বাণোর মত দরিদ্র শ্রেণিকে পেট ভরে খেতে দিতে দেখা যায় না তাদের। কিন্তু কাজ করানোর সময় যথেষ্ট পরিমাণে তাদের থেকে কাজ আদায় করিয়ে নেয়। ভাত খেতে বসে বাণো দেখতে পায় মালিকনীর কৃপণতাকে। থাকা সত্ত্বেও তাকে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী না দেওয়ার ব্যাপারটিতে বাণো আহত হয়। কারণ বাণো মালিকনীকে নিজের মায়ের মতই মনে করেছিল — "বাণোয়ে লক্ষ্য করিলে যে চরুত লাগে বস্তু রই যাব, তথাপি তেওঁ সিহতঁক যথেষ্ট পরিমাণর মাছ তরি-তরকারী দিব নোয়ারে। মাছ তো যি দিয়ে তাক আঁতচী কাচেরে মনিব পরা বিধরহে। বাণো আহত আরু অবাক দুয়োটাই হৈছিল — ইমান থকা মানুহর ইমান ঠেক মনোবৃত্তি কিয়? ভগবানে যাক দুহাত ভরি দিছে তেওঁ তেনেকৈ বা রু দুহাত ভরি দিব নেলাগে, অলপ-অচপরতো দিয়ে!"[১৭৭] বাণোর এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে লেখিকা এক গভীর উপলব্ধির দিকে আমাদের নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করেছেন। শুধু তাই নয় বাণোর খাওয়া একটু বেশি দেখে মালিকনী সুন্দরভাবে খাওয়া কমানোর কথা বলে নীচ মনোভাবের পরিচয়ও দিয়েছেন— "বাণো, ভাত কিন্তু ইমান খোয়া ভাল নহয়। ভাতে মানুহরতো একো উপকার নকরে, গাত কেবল মেদ বঢ়ায় আরু মানুহক সোরোপা করি তোলে। গাঁওর মানুহে পথারত কাম করে অলপ বেছিকৈ খায় কিন্তু অফিস কাছারীত কাম করা মানুহর ইমান খোয়ার দরকার নাই।"[১৭৮] এভাবেই লেখিকা অর্থসমস্যার জন্য গ্রাম থেকে আসা শ্রমিকের নানাভাবে হওয়া নির্যাতনের দিকটি উন্মোচন করে তৎকালীন অসমের নানা সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে এক বাস্তব সমাজচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

'অন্যজীবন' উপন্যাসেও কৃষিনির্ভর গ্রাম্যজীবন ফুটে উঠেছে। তবে মনোজের পিতা হেরম্ব দত্ত গ্রামের এম.ভি. স্কুলের শিক্ষক এবং নিজের মাটি আধিতে দিয়ে সংসার চালাচ্ছে এবং মনোজও কৃষিবৃত্তি নয় শিক্ষা লাভ করে কলেজ অধ্যাপকের জীবিকা গ্রহণ করেছে। ফলে দেখা গেছে কৃষিনির্ভর গ্রাম্য অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে অন্যান্য জীবিকার প্রবেশ ঘটেছে। মনোজের মাকেও তাঁত বুনতে দেখা গেছে।

নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাস তিনটির সব কয়টিতেই দরিদ্র গ্রাম্য জীবনেরই প্রতিফলন ঘটেছে। স্বচ্ছল পারিবারিক জীবন তেমন ফুটে ওঠে নি। দরিদ্র শ্রেণি থেকে কেউ কেউ শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করে চাকরিজীবী হয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে যেমন 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে পরেশ কলিতা, 'অন্যজীবন' উপন্যাসে মনোজ ও তাদের পরিবার। তবে উপন্যাস তিনটিতেই মেয়েদের তাঁত বোনার কথা উল্লেখের মধ্য দিয়ে অসমীয়া সমাজে প্রচলিত তাঁতশিল্পের বহমান পরম্পরাকেই পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন লেখিকা।

আশাপূর্ণা ও নিরুপমার উপন্যাসে বিম্বিত সামাজিক ও পারিবারিক জীবন : তুলনার দর্পণে

আশাপূর্ণা দেবী এবং নিরুপমা বরগোহাঞিং — দুজন ঔপন্যাসিকের রচনাতেই নারীজীবনের প্রেক্ষিতে দেশকালীন বাস্তবের বিচিত্র বিভঙ্গ উঠে এসেছে। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনি মুখ্যত পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ফলে বাঙালির পারিবারিক জীবনের নানা আচার-সংস্কার বড় জীবন্তভাবে উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। নিরুপমা নারীর জীবনযন্ত্রণার আলেখ্য রচনায় পারিবারিক পরিসীমাতেই আবদ্ধ থাকেন নি। অন্দর ও সদরের দ্বিরালাপে তাঁর উপন্যাসগুলিতে অন্তঃপুরের সমান্তরালে বাইরের জগৎটিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বৃহৎ পরিবারের অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতির মাত্রা নিরুপমার উপন্যাসকে আশাপূর্ণার তুলনায় খানিকটা বেশি ব্যাপ্তি দিয়েছে।

দুজন লেখিকার উপন্যাসবিশ্বেই সমাজে নারীর অবস্থানকে দেখানো হয়েছে। আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসের মতো নিরুপমার 'অভিযাত্রী', 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' এবং 'অন্যজীবন' উপন্যাসেও নারীর উপর হওয়া অত্যাচার অবমাননা ও সমাজে প্রচলিত নারী পুরুষের মধ্যে থাকা ব্যবধানসূচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ মেলে। এ থেকে বোঝা যায় বঙ্গীয় সমাজের মতো অসমীয়া সমাজেও নারীর অবস্থান খুব বেশি উন্নত ছিল না। তবে আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'য় নারীর যে অন্তঃপুর বন্দী অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে নিরুপমার উপন্যাসে সমাজে নারীর সেই বন্দিত্ব প্রতিফলিত হয় নি। কারণ হিসেবে বলা যায় জনজাতীয় প্রভাবে অসমীয়া নারীকেও পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে কৃষিকাজও করতে দেখা গেছে। নিরুপমার উপন্যাসে গ্রাম্য নারীদের ঘরোয়া কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফসলের সময় কৃষিকাজও পুরুষের সঙ্গে করতে হয়। 'অন্যজীবন' উপন্যাসে গ্রাম্য নারীর এই কঠোর পরিশ্রমের ফলে অণিমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামের মৌজাদারণীর মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন ঘরের মেয়ে বউদেরও একইভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। আইকণের ভাষায় মৌজাদারণীর অকল্পনীয় কষ্টকে লেখিকা তুলে ধরেছেন — "কমনো ঘরর সোপাই বনবারী করী ঢেঁকী দি পথারলৈ গৈ আকো তাঁত-সূততো বহিব লাগে, ইফালে এরি চাদরর মেহনত কমনে — পলু পোহা, কেছেরু আরু এরা গছর পাত বিচরা, পলুবোরর লেটা হোয়ার পিছত সেইবোর সিজোয়া, সূতাবোর কাটি উলিওয়া — ভাবিব নোয়ারা কাম। সেয়ে রাতি নুপুয়াওতেই ঢেঁকী দিব লগা হয় — রাতি পাটীত পরার আগলৈকে আরু এখন্তেকর বাবেও জিরনি নাই। অ' তার পিছত মৌজাদারণীর কি শুনা — শহুরেকর শ্রাদ্ধর দিনা পরমান্ন সিজাই থাকতে মৌজাদারণী ঢলি পরিল আরু তাতেই মৃত্যু হ'ল।"[১৭৯] এভাবেই লেখিকা অসমের গ্রাম্য নারীর করা অমানবিক পরিশ্রমকে এবং তার ফলে হওয়া তাদের দুঃখের দিককে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যেভাবে আশাপূর্ণা দেবী তুলে ধরেছেন বঙ্গীয় নারীর বন্দিত্বের জ্বালাকে, দুঃখকে তাঁর উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'তে। তবে আশাপূর্ণা দেবী 'বকুলকথা' উপন্যাসে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর

বন্দিত্ব মোচন হয়ে মুক্তির স্বাদ পাওয়ার দিকটির আভাসও দিয়েছেন। 'বকুলকথা'য় আর নারী অন্তঃপুরে বন্দী নেই। পুরুষের মতো নারীও বাইরে বিচরণ করতে পেরেছে। নমিতা লক্ষ্মী বউএর ভূমিকা বাদ দিয়ে নায়িকা রূপছন্দা হয়েছে। একই ভাবে নিরুপমা বরগোহাঞিঁর 'অন্যজীবন' উপন্যাসে গ্রাম্য নারীর কঠোর পরিশ্রমের দিককে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের আভাসও দিয়েছেন। আইকণ বলেছে — "অবশ্যে আজিকালি দিনকাল বহুত সলনি হৈ আহিছে, আজিকালি গাঁওর জীয়রী-বোয়ারীয়ে আরু আমার বৌটি-আইতাহঁতর দরে কষ্ট নকরে। শুনিলাই নহয় হলার মেচিন হোয়াবাবে ঢেঁকীর ব্যবহার কম করি আহিছে। পলু পুহি এরি চাদর বোয়া কারবারটো এতিয়া কেবল অতি দুখীয়া মানুহবোরর ঘরেহে বর্তি আছে — মুগার কাপর বৌটিহঁতেই ববলৈ এরি দিলে, মুগার বাবে চোমনি লাগে — সেই হাবিবোরো এতিয়া ধ্বংস হৈ আহিছে।"[১৮০]

বঙ্গীয় সমাজের মতো অসমীয়া সমাজেও বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মতো কুসংস্কার লক্ষিত হয়েছে। আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'র মতো নিরুপমার 'অভিযাত্রী'তে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কথা রয়েছে। তাছাড়া 'অন্যজীবন' উপন্যাসে বহুবিবাহ ও রক্ষিতা রাখার আভাস মিলে। রক্ষিতা রাখার কথা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র মধ্যেও রয়েছে। আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের রক্ষিতা রাখার ব্যাপারটি যেমন এলোকেশী মেনে নিয়েছিলেন তেমনি 'অন্যজীবন' উপন্যাসেও রজনীর রক্ষিতা রাখার ব্যাপারটি তার স্ত্রী বিহপুরিয়ানী প্রথম প্রথম মন খারাপ করলেও পরবর্তীতে মেনে নিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় দুটি সমাজেই রক্ষিতা রাখার ব্যাপারটিকে একটা সময় পর্যন্ত সাধারণ ব্যাপার বলে মেনে নিয়েছিল।

পরাধীনতার গ্লানি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্য ও 'সুবর্ণলতা'র সুবর্ণ অনুভব করতে পেরেছিল। বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে রচিত 'সুবর্ণলতা'য় স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা রয়েছে, রয়েছে স্বদেশিদের কথা। দেশ জুড়ে বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত হওয়ার কথা রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে রচিত নিরুপমার 'অভিযাত্রী'তেও স্বাধীনতার কথা রয়েছে। বিপ্লবীদের কথা রয়েছে, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি অসমের আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ার কথা রয়েছে। তবে 'অভিযাত্রী'তে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে ততটা বিস্তৃত বর্ণনা নেই। এমনকি 'অভিযাত্রী'তে স্বাধীনতা সংগ্রামে মেয়েদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার কথা যেভাবে উঠে এসেছে 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের প্রথম দিকে সেভাবে মেয়েদের অংশ নিতে দেখা যায় না। সুবর্ণলতায় যে রক্ষণশীল সমাজকে নিয়ে আসা হয়েছে সেই রক্ষণশীল সমাজে পরিবারের মেয়েদের দেশ স্বাধীনতার জন্য রাজপথে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না। তবে সুবর্ণলতার শেষের দিকে অম্বিকার মুখে দেশ স্বাধীনতায় মেয়েদের অংশগ্রহণের খবরও পাওয়া গেছে। সুবর্ণর মত রক্ষণশীল ঘরের বউরা পরাধীনতার জ্বালা অনুভব করে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হয়েছে। সুবর্ণলতা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয় নি কিন্তু চন্দ্রপ্রভা (অভিযাত্রী) স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ যোগ দিয়েছেন।

বিধবাদের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। দুই লেখকের উপন্যাসেই তা লক্ষিত হয়েছে। তবে আশাপূর্ণার উপন্যাসে বঙ্গীয় সমাজে বিধবাদের উপর যে নীতি নিয়মের বোঝা

চাপিয়ে দিতে দেখা গেছে নিরুপমার উপন্যাসে সেটি দেখা যায় না। আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' 'সুবর্ণলতা'য়ও প্রেমবিবাহকে তেমনভাবে দেখানো হয় নি। বকুল নির্মলকে ভালোবাসলেও সমাজ ও দাদাদের ভয়ে প্রেমের প্রকাশ করতে পারে নি। তবে 'বকুলকথা'য় শম্পার প্রেমবিবাহের মধ্য দিয়ে সময়ের পরিবর্তনের আভাস দিয়েছেন লেখিকা। অপরদিকে নিরুপমার উপন্যাসে অনেকগুলি প্রেমবিবাহের মধ্য দিয়ে অসমীয়া সমাজে প্রেমবিবাহের ব্যাপক প্রচলনের বাস্তব ফুটে উঠেছে। চন্দ্রপ্রভার দণ্ডীনাথকে ভালোবাসা, চন্দ্রপ্রভার বোন রজনীপ্রভার বাঙালি ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করা, যোগমায়ার ঘনাবাবাকে ভালোবেসে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা, নীলকণ্ঠের মেয়ে বিধবা হবার পর আবার ভালোবেসে বিয়ে করা, পটেশ্বরীর পূজনকে ভালোবেসে পালিয়ে যাওয়া, অণিমা ও মনোজের প্রেমবিবাহ ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে দেখা গেছে কলোনি শাসন বিস্তারের পর্বে শহুরে মধ্যবর্গের উত্থান এবং নতুন নতুন জীবিকার সৃষ্টিকথা। নবকুমার ইংরাজি শিখে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে চাকরিজীবী হয়েছে। 'সুবর্ণলতা'য় সুবোধ ও প্রবোধকেও চাকরিজীবী রূপেই আমরা পাই। নগরায়নের ফলে কৃষিজীবী গ্রামীণ সভ্যতার পালে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে — এই ইতিহাসকে আশাপূর্ণা উপন্যাসে ধারণ করেছেন। অপরদিকে নিরুপমার উপন্যাসেও দেখা গেছে কৃষি ও কুটির শিল্পভিত্তিক অসমীয়া অর্থনীতি ক্রমশ ধ্বংস হয়ে চলেছে। গ্রামেও প্রব্রজন ঘটেছে গুজরাতি ও মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর ফলে গ্রামে দেখা দিয়েছে জীবিকার সমস্যা। জীবিকার উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে গেছে সেখানে গিয়েও তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। কেউ প্রেসের কাজে ঢুকেছে, কেউ হোটেল বয় হয়েছে কেউবা মজুর হয়েছে। শহরে যেভাবে গ্রামের লোকের প্রব্রজন হয়েছে তেমনি ব্যবসায়ীর প্রব্রজন ঘটেছে গ্রামে যার ফলে গ্রামীণ সরলতা ধ্বংস হয়ে কুটিলতা, দুর্নীতিগ্রস্ততা প্রবেশ করেছে গ্রামে। ফলে গ্রামের লোকের দরিদ্রতা ও দুর্দশা আরও বেশি করে বেড়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণার সমাজভাবনায় অন্যান্য দিকের থেকে মেয়েদের দিকটিই বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে অপরদিকে নিরুপমার লেখায় মেয়েদের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য দিককেও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। আশাপূর্ণার বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা পরবর্তী পটভূমিতে রচিত 'বকুলকথা'য় নারীর সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজের নানা সমস্যা বিশেষত আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি, রাজনৈতিক ভণ্ডামী ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান স্থিতি, এবং এর ফলে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মধ্যে জন্ম হওয়া আক্রোশ প্রতিনিয়ত বুবুনদের মতো হাজার হাজার ছেলেকে গ্রাস করছে। এ যুগের ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে 'বকুলকথা'য় আশাপূর্ণা দেবী বলেছেন — "এ যুগের মন-মেজাজ দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা, কারণ যে কারণেই হোক এদের চোখ কান বড় অল্প বয়সেই খুলে গেছে এরা তাই লোভকে লোভ বলে বুঝতে শিখেছে, দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলে চিনতে শিখেছে। তাই এদের সবচেয়ে নিকটজনদের ওপরেই সবচে ঘৃণা।"[১৮১] নিরুপমা বরগোহাঞিও তাঁর উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর সমাজের চঞ্চল পরিস্থিতিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের ফলে সৃষ্টি হওয়া বেকার সমস্যা, শ্রমিক শ্রেণির আত্মমর্যাদাহীনতা এবং দুঃখময় জীবনের আভাস

রয়েছে উপন্যাসে। তারই সঙ্গে ধনিক শ্রেণির শোষণকে দেখিয়েছেন লেখিকা। কালোবাজারি করে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পুলিশের কাছ থেকেও বেঁচে যায়। আর দরিদ্র শ্রেণি কম অপরাধেও কঠোর শাস্তি পায়। এই দিকগুলিকে লেখিকা সুন্দরভাবে তুলে ধরে শ্রেণিরাষ্ট্রে ধনি দরিদ্রের মধ্যে থাকা বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে। তাইতো লেখিকা অঞ্জলির কথার মধ্য দিয়ে দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন — "আমার দেশর বেকার সমস্যার সমাধান অতি সুন্দরভাবে করি আছে এটা চাকরিয়ে, চাকরর চাকরিয়ে। লোকর ঘরর ল'রা ছোয়ালী আহি লোকর ঘরর গালি-শপনি কিল চর লাথি খাই দিনটো কাম করি থাকিব।"[১৮২] আশাপূর্ণা দেবী 'বকুলকথা'য় যেমন মানুষের মূল্যবোধের ক্রমশ অবনতির কথা বলেছেন তেমনি 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে গ্রামের সরলতা ধ্বংস হয়ে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও শোষণ-শাসনের আভাস দিয়েছেন নিরুপমা বরগোহাঞি।

আশাপূর্ণা দেবীর 'বকুলকথা'য় বিবাহ বিচ্ছেদের আভাস দিয়ে বঙ্গীয় নারীর স্বাধীনতা স্পৃহা এবং পুরুষের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ ও মুক্তির আভাস দিয়েছেন লেখিকা। তেমনি নিরুপমা বরগোহাঞি 'অন্যজীবন' উপন্যাসেও বিবাহ বিচ্ছেদের আভাস দিয়ে অসমীয়া সমাজেও নারীর স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার দিকটি দেখিয়েছেন।

১৬.৩.২০১৩ তারিখের তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় বর্তমান প্রতিবেদকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বঙ্গীয় সমাজ এবং অসমীয়া সমাজে নারীর অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য কোথায় প্রশ্নের উত্তরে নিরুপমা বরগোহাঞি বলেছেন যে অসমের তুলনায় বঙ্গীয় সমাজে নারী ছিল একটু পিছিয়ে এবং একটু বেশি নির্যাতিতা। অসমে বিভিন্ন জনজাতীয় জনগোষ্ঠীর প্রভাবে নারী ছিল তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ও কম নির্যাতিতা। বঙ্গদেশের মতো যৌতুকপ্রথা, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি অসমীয়া সমাজে ছিল না। তিনি আরও বলেছেন বঙ্গীয় নারীর মতো অসমীয়া নারীদের অন্তঃপুরের বন্দিত্ব ছিল না। তবে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রভাবে এসব ব্যাধি অসমীয়া সমাজেও যে প্রবেশ করেছে, উপন্যাসগুলিতে সে আভাস রয়েছে।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সমাজভাবনা সম্পর্কে 'আর এক আশাপূর্ণা'তে এভাবে বলেছেন — "ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রশ্নমুখর মন তখনকার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার অসঙ্গতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে প্রখর হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে মানুষে মানুষে ব্যবস্থার এমন পার্থক্য কেন? বেশি পীড়িত করেছে মেয়েদের অবস্থা। কেন তাদের সকল বিষয়ে এই অধিকারহীনতা? কেন তাদের জীবন কাটে অবরোধের অন্ধকারে? এই সব প্রশ্ন আমায় স্থির হতে দেয়নি, হয়তো এই প্রশ্নের ফলশ্রুতিই আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'।"[১৮৩]

আশাপূর্ণার সমাজভাবনায় মেয়েদের দিকটিই বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বুঝেছেন সমাজে মেয়েদের স্থান অবমাননার তাই তিনি বলেছেন — "আমি রাজনীতি নিয়ে লিখিনি, সমাজসেবিকাদের নিয়েও তেমন নয়। লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়ে।"[১৮৪]

নিরুপমা বরগোহাঞিঃ তাঁর রচিত এই উপন্যাসে পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে প্রশ্নে বলেছেন — "হয় পারিপার্শ্বিক সমাজ আরু পরিবেশর যথেষ্ট প্রভাব মোর এই তিনিটা রচনাত পরিছে। সমাজত থকা নারীর সমস্যা, বর্ণভেদ প্রথা, আদি মোর এই উপন্যাসবোরত আহিছে।"[১৮৫]

নিরুপমার সমাজভাবনা সম্পর্কে ড. হীরেন গোঁহাই বলেছেন — "…. শ্রীযুক্তা নিরুপমা বরগোহাঞিঃ আমার আধুনিক যুগর বিশিষ্টা লেখিকা, আরু তেখেতর রচনাবলীরো এক সুকীয়া তাৎপর্য আছে। মোর ধারণা তেখেতর সৃষ্টির মূল প্রেরণা হৈছে এক মহৎ সমাজসচেতনতা। তেখেতে আমার সমাজর মূল কেরোণবোর অন্তর্ভেদী সেইবোর দাঙি ধরিছে যে প্রতিজন পাঠকর সমুখতেই এরাব নোওারা প্রত্যাহ্বানর দরে উপস্থিত হয় সমাজ পরিবর্তনর প্রশ্নোটো। যিবোর ঘটনা, বিধি আরু ব্যবস্থাই মানুহর জীবনর নিঃশেষ করে, বিকাশর সম্ভাবনা পংগু করে, হৃদয় মরুময় করি তোলে, সেইবোরর নির্মোহ অথচ সহানুভূতিশীল চিত্রণেরে শ্রীযুতা বরগোহাঞিয়ে পাঠকক বিচলিত, আলোড়িত, অভিভূত করে।"[১৮৬]

রাজেন কলিতা 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' সম্পর্কে যা বলেছেন তা থেকে লেখিকার উপন্যাসে ফুটে ওঠা সমাজ বাস্তববোধেরই প্রকাশ ঘটে আমাদের কাছে। "ইপারর ঘর সিপারর ঘর পাগ্‌লাদিয়ার কাহিনী নহয়, তার পারর মানুহর কাহিনী। পহিলা উপন্যাসখনত দেখা পোয়া প্রতিশ্রুতিসমূহে আহি এই উপন্যাসত অধিক পূর্ণতা লাভ করিছে। পাগ্‌লাদিয়ার পারর গাঁওত শিপা থকা বহুকেইটা চরিত্ররে আশা-আকাংখা, দুখ-বেদনা, আনন্দ-আহ্লাদ আরু স্বপ্নভংগর নিদারুণ যাতনার কাহিনীয়ে এশ বাহান্ন পৃষ্ঠার নাতিদীর্ঘ উপন্যাসখনর পাতে পাতে খলকনি তোলে। গাঁওলীয়া জীবনর (ক্রমশঃ বলীয়মান) সরলতা আরু পোনপটীয়া নিষ্ঠার বিপরীতে চহরীয়া জীবনর অর্থ-গধূরতা, জটিলতা আরু স্বার্থই বান্ধি রখা মানব সম্পর্কর একোখন ছবিও লেখিকাই নিপুণভাবে আঁকিব পারিছে।"[১৮৭]

গ্রাম শহরের সংস্কৃতির বৈপরীত্য, শ্রেণি শোষণ, আধিপত্যবাদের প্রবল চাপ — এই বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে নিরুপমা স্থাপন করেছেন তাঁর (আলোচিত) উপন্যাসগুলিতে নারীর জীবনযন্ত্রণার কাহিনি। আশাপূর্ণার উপন্যাসে প্রেক্ষিতের নানা প্রসঙ্গ এলেও, ফ্রেমটি নিরুপমার মতো বৃহৎ নয়। তবু, আন্তরিক পর্যবেক্ষণের শক্তিতে, বয়নের তন্বিষ্ট (objective) বিন্যাসরীতিতে আশাপূর্ণা ও নিরুপমার রচনা দাঁড়ায় একই সমতলে। একে অন্যের পরিপূরক হয়ে। মতাদর্শগত ভিন্নতা সত্ত্বেও সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি এবং পরিবার-প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক উন্মোচনে দুজন লেখিকাই পাঠকচিত্তে জাগিয়ে দেন প্রশ্নমালা। এই লক্ষভেদিতায় সফল হয়ে ওঠেন দুই ভিন্ন ভাষার দুই কথাকার।

তথ্যসূত্র :—

১. চক্রবর্তী, রামী : 'আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারী', দেবাশিস ভট্টাচার্য, রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৭, উদ্ধৃত, পৃ. ২২

২. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭১, পৃ. ভূমিকা

৩. তদেব : ব্লার্ব এ গ্রন্থ পরিচায়িকা সূচক মন্তব্য

৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৩, পৃ. ১০০

৫. তদেব : পৃ. ভূমিকা

৬. দেবী, আশাপূর্ণা : 'আর এক আশাপূর্ণা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১, পৃ. ১১

৭. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা

৮. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৮০, পৃ. ১০৭

৯. দেবী, আশাপূর্ণা : 'আর এক আশাপূর্ণা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১০. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, ব্লার্ব এ গ্রন্থ পরিচায়িকা সূচক মন্তব্য

১১. দেবী, আশাপূর্ণা : 'আর এক আশাপূর্ণা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১২. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

১৩. তদেব : পৃ. ১১৮

১৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১৫. তদেব : পৃ. ৪৬

১৬. তদেব : পৃ. ৩

১৭. তদেব : পৃ. ৩

১৮. তদেব : পৃ. ৫

১৯. তদেব : পৃ. ৬৫

২০. তদেব : পৃ. ৫১

২১. তদেব : পৃ. ২১৪

২২. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

২৩. তদেব : পৃ. ১৪৫

২৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'আর এক আশাপূর্ণা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

২৫. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

২৬. তদেব : পৃ. ৭৮

২৭. তদেব : পৃ. ৪৫৪

২৮. তদেব : পৃ. ৪৪

২৯. তদেব : পৃ. ৩২

৩০. তদেব : পৃ. ৪৯

৩১. তদেব : পৃ. ৫০

৩২. তদেব : পৃ. ২১৫

৩৩. তদেব : পৃ. ৪৮

৩৪. তদেব : পৃ. ৬৯

৩৫. তদেব : পৃ. ৪৪২

৩৬. তদেব : পৃ. ১২২

৩৭. তদেব : পৃ. ১২৬

৩৮. তদেব : পৃ. ১০২

৩৯. তদেব : পৃ. ১২০

৪০. তদেব : পৃ. ১২২

৪১. তদেব : পৃ. ৩৮০

৪২. তদেব : পৃ. ৮৯

৪৩. তদেব : পৃ. ৯৮

৪৪. তদেব : পৃ. ৪০৬

৪৫. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৪৬. তদেব : পৃ. ১৪

৪৭. তদেব : পৃ. ১১২

৪৮. তদেব : পৃ. ৩১

৪৯. তদেব : পৃ. ৩১

৫০. তদেব : পৃ. ৩১

৫১. তদেব : পৃ. ভূমিকা

৫২. তদেব : পৃ. ২৮৪

৫৩. তদেব : পৃ. ১৮০

৫৪. তদেব : পৃ. ২২৯

৫৫. তদেব : পৃ. ২৩৭

৫৬. তদেব : পৃ. ২৩৭

৫৭. তদেব : পৃ. ৩৩৯

৫৮. তদেব : পৃ. ১২৯

৫৯. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

৬০. তদেব : পৃ. ২৪৪

৬১. তদেব : পৃ. ২০৮

৬২. তদেব : পৃ. ২০৯

৬৩. তদেব : পৃ. ২৪০-৪১

৬৪. তদেব : পৃ. ২৯১

৬৫. তদেব : পৃ. ২৮১

৬৬. তদেব : পৃ. ৮৩

৬৭. তদেব : পৃ. ৮৩

৬৮. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৬৯. তদেব : পৃ. ৪

৭০. তদেব : পৃ. ৪৫১

৭১. তদেব : পৃ. ৪৫৪

৭২. তদেব : পৃ. ৪৫৪

৭৩. তদেব : পৃ. ৪৫২

৭৪. তদেব : পৃ. ৫৩

৭৫. তদেব : পৃ. ৫৩

৭৬. তদেব : পৃ. ১৯৫

৭৭. তদেব : পৃ. ২৬২

৭৮. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৭৯. তদেব : পৃ. ২৫৮

৮০. তদেব : পৃ. ২৫৯

৮১. তদেব : পৃ. ২৫৯

৮২. তদেব : পৃ. ২৮৪

৮৩. দাশ, শিশির কুমার : 'প্রথম প্রতিশ্রুতির চতুরঙ্গ', ৫৬ সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৪০৩, পৃ. ৬৮

৮৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

৮৫. তদেব : পৃ. ৭০

৮৬. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৮৭. তদেব : পৃ. ৯

৮৮. তদেব : পৃ. ১৪

৮৯. তদেব : পৃ. ৫২

৯০. তদেব : পৃ. ১৪৭

৯১. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬

৯২. তদেব : পৃ. ৩৬৮

৯৩. তদেব : পৃ. ৩৬৮

৯৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৯৫. তদেব : পৃ. ৫০

৯৬. তদেব : পৃ. ৬৭

৯৭. তদেব : পৃ. ৬৭

৯৮. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০২

৯৯. তদেব : পৃ. ২১

১০০. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১০১. তদেব : পৃ. ৩৮

১০২. তদেব : পৃ. ৩৮

১০৩. তদেব : পৃ. ৩৫৫

১০৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১০৫. তদেব : পৃ. ২২

১০৬. তদেব : পৃ. ৫৭

১০৭. তদেব : পৃ. ২৮৩

১০৮. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

১০৯. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

১১০. তদেব : পৃ. ১৪৪

১১১. দেবী, আশাপূর্ণা : ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

১১২. তদেব : পৃ. ২৯৫

১১৩. তদেব : পৃ. ৩৬৭

১১৪. তদেব : পৃ. ৩৬৭

১১৫. তদেব : পৃ. ৪৫৯

১১৬. তদেব : পৃ. ৪৫৯

১১৭. দেবী, আশাপূর্ণা : ‘সুবর্ণলতা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

১১৮. তদেব : পৃ. ১০৪-০৫

১১৯. তদেব : পৃ. ১০৬

১২০. তদেব : পৃ. ১৬৮

১২১. দেবী, আশাপূর্ণা : ‘বকুলকথা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

১২২. তদেব : পৃ. ১৫

১২৩. তদেব : পৃ. ৯১

১২৪. তদেব : পৃ. ২২৬

১২৫. তদেব : পৃ. ২২৫

১২৬. বরগোহাঞিং, নিরুপমা : ‘অভিযাত্রী’, নিরুপমা বরগোহাঞিৰ উপন্যাস সম্ভার (১), জ্যোতি প্রকাশন, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর, পৃ. ৬৩৭

১২৭. বরগোহাঞিং, নিরুপমা : ‘ইপারর ঘর সিপারর ঘর’, নিরুপমা বরগোহাঞিৰ উপন্যাস সম্ভার (২), জ্যোতি প্রকাশন, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১, পৃ. ৪

১২৮. চন্দ্রপ্রসাদ, শইকীয়া (সম্পা.) : গরিয়সী, ড. জিতেন দাস ‘নিরুপমা বরগোহাঞিৰ সান্নিধ্য আরু আলাপন’, সাহিত্য প্রকাশ, ট্রিবিউন ভবন, গুয়াহাটী, পৃ. ৪৭

১২৯. বরগোহাঞিং, নিরুপমা : ‘অভিযাত্রী’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১

১৩০. তদেব : পৃ. ৫৮৪

১৩১. তদেব : পৃ. ৫৮৭

১৩২. তদেব : পৃ. ৫৮১

১৩৩. তদেব : পৃ. ৭১৩

১৩৪. তদেব : পৃ. ৬৭৬

১৩৫. তদেব : পৃ. ৬৭৭

১৩৬. তদেব : পৃ. ৫৮২

১৩৭. তদেব : পৃ. ৫৮৩

১৩৮. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

১৩৯. তদেব : পৃ. ৪৬

১৪০. তদেব : পৃ. ১৭-১৮

১৪১. তদেব : পৃ. ৮০

১৪২. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৫

১৪৩. তদেব : পৃ. ৭১৭

১৪৪. তদেব : পৃ. ৭১৭

১৪৫. তদেব : পৃ. ৭১৭

১৪৬. তদেব : পৃ. ৭২১

১৪৭. তদেব : পৃ. ৭০৩-০৪

১৪৮. তদেব : পৃ. ৭০৭

১৪৯. তদেব : পৃ. ৭৩৫

১৫০. তদেব : পৃ. ৭২৬

১৫১. তদেব : পৃ. ৭৩৪

১৫২. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৪

১৫৩. তদেব : পৃ. ৬৫৩

১৫৪. তদেব : পৃ. ৬৭০-৭১

১৫৫. তদেব : পৃ. ৬৭০

১৫৬. তদেব : পৃ. ৬৩১

১৫৭. তদেব : পৃ. ৬৬৯

১৫৮. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৫৯. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭

১৬০. তদেব : পৃ. ৭২১

১৬১. তদেব : পৃ. ৭৩৭

১৬২. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৫

১৬৩. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৬৪. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯৭

১৬৫. তদেব : পৃ. ৭২৪

১৬৬. তদেব : পৃ. ৭০৫

১৬৭. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯০-৯১

১৬৮. তদেব : পৃ. ৫৯৬

১৬৯. তদেব : পৃ. ৬৫০

১৭০. তদেব : পৃ. ৬৫১

১৭১. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১৭২. তদেব : পৃ. ৬৬

১৭৩. তদেব : পৃ. ৩২

১৭৪. তদেব : পৃ. ৩১

১৭৫. তদেব : পৃ. ৬২

১৭৬. তদেব : পৃ. ৭

১৭৭. তদেব : পৃ. ১৬

১৭৮. তদেব : পৃ. ১৬

১৭৯. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২৬

১৮০. তদেব : পৃ. ৭২৬

১৮১. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫

১৮২. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

১৮৩. দেবী, আশাপূর্ণা : 'আর এক আশাপূর্ণা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১৮৪. মণ্ডল, নাজিমুল ইসলাম (সম্পা.) : 'শতবর্ষের আলোকে আশাপূর্ণা দেবী', এম গিরি প্রিন্ট সার্ভিস, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ২৯৭

১৮৫. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় অতিথিশালা, ১৬.৩.২০১৩

১৮৬. বরগোহাঞি, নিরুপমা : ব্লার্ব এ গ্রন্থ পরিচায়িকা সূচক মন্তব্য

১৮৭. তদেব : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', পৃ. ২

পঞ্চম অধ্যায়

আশাপূর্ণা ও নিরুপমার রচনায় নারী : একালের নারীচিন্তার আলোকে

পঞ্চম অধ্যায়

আশাপূর্ণা ও নিরুপমার রচনায় নারী : একালের নারীচিন্তার আলোকে

।।১।।

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি — এই দুই লেখিকার সিংহভাগ উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে নারী। যে নারী অর্জন করতে চায় আত্মপরিচয়, চায় নিজস্ব পরিসর। আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের সত্যবতী, সুবর্ণ, বকুল কিংবা নিরুপমার উপন্যাসের অণিমা, চন্দ্রপ্রভা, পুতলী — এরা কেউই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার পরিসরে নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রচলিত ধ্যানধারণা, সমাজে নারীর অন্তেবাসী নিরুপায় অস্তিত্ব ও পুরুষের নিপীড়ক ভূমিকাকে মনে প্রাণে মেনে নেয় নি। পুরুষের ছায়া হয়ে, 'অর্ধেক মানবী' আর 'অর্ধেক কল্পনা'র উপাদানে গড়া অস্তিত্ব হিসাবে তারা কেবল বাঁচবার জন্যই বেঁচে থাকতে চায়নি। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজের স্বতন্ত্র পরিসর সন্ধান করেছে তারা। উভয় লেখিকা নিজস্ব ভাষিক সমাজে নারী পুরুষের সম্পর্কের প্রচলিত বিধি ব্যবস্থাকে কীভাবে দেখেন, কীভাবে সমালোচনা করেন, তাঁদের চিন্তায় নারীর স্বাতন্ত্র্যসন্ধান ও সমানাধিকার এর স্বরূপ কী এসব জিজ্ঞাসারই উত্তর খুঁজতে চাই আমরা বক্ষ্যমান অধ্যায়ে। আধুনিক বিশ্বে নারীচিন্তার বিবর্তনের ইতিহাসের আলোকে অর্থাৎ মানবীচেতনাবাদী তত্ত্বচিন্তার প্রেক্ষিতেই আমরা বঙ্গীয় ও অসমীয়া সাহিত্যের প্রধান দুই কথাকার আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির প্রধান উপন্যাসসমূহ পুনঃপাঠ করব।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্বে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে নারীমুক্তির আন্দোলনও প্রবল হয়ে উঠেছে। সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। নারী পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক চলছে। বিভিন্ন সমাজিক সমস্যার মতো নারীর সমস্যার প্রশ্নেও বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন নারীর সমস্যা বলে স্বতন্ত্র কোনো সমস্যা নেই, তারা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার সঙ্গে নারীর সমস্যাকে এক করে দেখেছেন। আর একদল স্ত্রীদের গৃহের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকে মা কিংবা স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ থাকাকেই প্রকৃতির নিয়ম বলেছেন, বৈবাহিক বন্ধনকেই তারা গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীর পরাধীনতা, দাসত্ব, দুঃখ কষ্টের প্রতি তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন।[১] সময়ঘড়ি যত এগিয়ে চলেছে নারী পুরুষ সমানাধিকারের প্রশ্ন, চিন্তা তত বিচিত্র, জটিল, এমনকী পরস্পরবিরোধী তাত্ত্বিক অবস্থান নিয়েছে। নারী চেতনাবাদীরা নারীচিন্তার পটবদলকে কয়েকটি পর্যায়ে বা তরঙ্গে পৃথক করেছেন। নারী মুক্তির আন্দোলনে নারী পুরুষ উভয়েই ভাগ নিয়েছে। নারীর অবস্থার উন্নতির পেছনে বহু উদার, সমাজ সচেতন পুরুষেরও

অবদান রয়েছে, উনিশ শতকের বাঙালির সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার পরিচয় মিলবে।

নারীবাদের সৃষ্টির মূলে রয়েছে যুগ যুগ থেকে নারীর উপর চলে আসা নির্যাতন ও নিষ্পেষণের স্বরূপ উন্মোচন। সামন্ত সমাজে এটা ছিল স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু আধুনিক কালে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার প্রসারের যুগে নারীর সমানাধিকার তত্ত্বগতভাবে, বলা ভালো, কাগজেপত্রে স্বীকৃত হলেও অন্তরে অপরিবর্তিত রয়ে গেছে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কার। নতুন কালের মূল্যমান থেকে সামন্ততান্ত্রিক পরিসরে নারী পুরুষ সম্পর্কের পুনর্বিবেচনার দাবি এবং সেই সূত্রে নির্দিষ্ট অধিকার চেয়ে আন্দোলন, ভোটদানে নারীর অধিকার — এই সমস্ত বিষয়ে মহিলাদের রাজনৈতিক বৌদ্ধিক আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৮৯০ সালে। এর পর নানা ইতি নেতির দোলা, কখনো কালাপাহাড়ি উগ্রতা, কখনো বিভিন্ন তত্ত্বপ্রস্থানের সঙ্গে সংলাপ - এর মধ্য দিয়ে নারীচেতনাবাদ অনেক গুলি পর্ব বা তরঙ্গের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। নারীবাদ শব্দটি ইংরাজি ‘ফেমিনিজম’ শব্দের প্রতিশব্দ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। জন সার্ভে তাঁর ‘ফেমিনিজম’ গ্রন্থে বলেছেন, যে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতার ধারণা বা ভাবই হ’ল নারীবাদ।[২]

মেরি উলস্টোনক্র্যাফট, জন লক এবং টমাস হবস এর প্রভাবে ইউরোপে নারীবাদী চিন্তার প্রথম স্ফুরণটিকে লিবারেল বা উদারপন্থী নারীবাদ রূপে আখ্যায়িত করা হয়। উদারপন্থীদের দাবি ছিল নারী-পুরুষের সমান অধিকার। জন স্টুয়ার্ট মিল ও হ্যারিয়েট টেল ‘নারীত্ব’র ধারণাকে কারাগার ও দাসত্ব বলেছেন। শুধু তাই নয় নারী-পুরুষের ভেদাভেদের কারণ হিসাবে লিঙ্গ পার্থক্যকে দেখিয়েছেন তারা। উলস্টোনক্র্যাফট নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথাই বলেছেন, কারণ নারীরও বিচারবুদ্ধি রয়েছে। উদারপন্থীরা আরো বলেছেন যে স্ত্রী যাতে মাতা এবং নৈতিক অভিভাবক রূপে তার সামাজিক এবং পারিবারিক কার্য সম্পূর্ণ করতে পারে সে জন্য নারীর সমানাধিকারের প্রয়োজন। নারীশিক্ষার মাধ্যমে নারী ও পুরুষের অবস্থানগত পার্থক্যের পরিবর্তন সাধন করার কথা বলেছেন তারা। উলস্টোনক্র্যাফট পুরুষের ব্যভিচারী যৌনতাকে খর্ব করার জন্য নারীকে নৈতিক ও নাগরিক শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭৫ সনে তাঁর ‘সাম্য/স্ত্রীজাতি’ প্রবন্ধে স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রারম্ভ হিসাবে স্ত্রী শিক্ষার মাধ্যমে নারীকে ক্ষমতা প্রদান করার কথা এবং পৈত্রিক সম্পত্তিতে নারী ও পুরুষের সমানাধিকারের কথা বলেছেন।[৩]

নারীর সমস্যাকে দেখতে হলে আমাদের ইতিহাসের পথ চেয়ে নারীর সামাজিক অবস্থানকে বিচার করে দেখতে হবে। অতীত যুগের মানুষ যখন যাযাবর ছিল তখন শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে স্ত্রী পুরুষের কোনো ব্যবধান ছিল না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীকে পুরুষ থেকে অধিক শক্তিশালী হতেও দেখা গেছে। তখন নর নারীর যৌন সম্পর্ক ছিল বন্ধনহীন, অবাধ। আমেরিকার কোনো কোনো উপজাতিদের মধ্যে নারীর কর্তৃত্বও ছিল। বেঁচে থাকার জন্য তখন পুরুষদের মত নারীদেরও সমানে সংঘর্ষ করতে হত।

জার্মান তাত্ত্বিক আউগস্ট বেবেল তার অসামান্য আলোচনায় নারীর অবদমনে শ্রমের ভূমিকা

কীরূপ তার চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। গর্ভবতী অবস্থায়, সন্তান জন্মের অল্পদিন আগে ও পরে সন্তানের জন্মদান ও পরিচর্যার জন্য অন্তত কিছু দিন কৃষিকাজ বা অন্য নির্দিষ্ট উপজীবিকা থেকে হাত গুটিয়ে ঘরে থাকতে হয়েছে নারীকে। স্বাভাবিকভাবেই উৎপাদনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ নাথাকায় সাময়িকভাবে পুরুষের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছে নারী। কৃষি যুগের আগে পর্যন্ত খাদ্যের জন্য যাবাবর গোষ্ঠী ও উপজাতীয় দলগুলির মধ্যে অস্তিত্বের সংগ্রাম চলেছে অহরহ। বিজয়ী গোষ্ঠীগুলি প্রায়শই নারীহত্যা করেছে পরাজিত গোষ্ঠীর। বংশবৃদ্ধির জন্য হৃষ্টপুষ্ট কয়েকটি শিশু কন্যাকে বাদ দিয়ে বাকিদেরকে হত্যা করা হত। তখন থেকেই শুরু হয় শিশু কন্যা হত্যার ইতিহাস। তাছাড়া যুদ্ধে বহু পুরুষের মৃত্যু হত, এই অবস্থায় সমাজে নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার জন্যও শিশু কন্যার হত্যা করা হত। সে সময়ে স্বামী স্ত্রীর কোনো সামাজিক বন্ধন ছিল না, ছিল না পরিবারের ধারণা, শুধু ছিল অবাধ যৌন সম্পর্ক। নারীরা ছিল গোষ্ঠী বা দলের অধীন। অবাধ যৌন সম্পর্কের জন্য সন্তানের পিতার পরিচয় জানা সম্ভব না হওয়ায় তখন সন্তানের পরিচিতি হত মাতৃ পরিচয়ে। অন্যগোষ্ঠীর মেয়েদের বা পরাজিত গোষ্ঠীর মেয়েদের জবরদস্তি ধরে আনার প্রচলনও ছিল তখন। জবরদস্তি করে ধরে আনা মেয়েদের নিজের বংশের মেয়েদের মত সমান মর্যাদা দেওয়া হত না। আবার যেখানে নারীর সংখ্যা কম সেখানে নারীই ছিল সর্বেসর্বা। সেখানে নারীর বহু স্বামী গ্রহণের প্রথাও প্রচলিত ছিল। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষকেই ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতে দেখা গেছে। নারী পুরুষের স্থায়ী সম্বন্ধের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের প্রভাবই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে।[৪]

কৃষির বিবর্তনের যুগে নারী পুরুষের দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক স্থাপিত হয়, গড়ে ওঠে পরিবারের ধারণা। একজন পুরুষ একজন নারীকেই স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে তার সন্তানকে পিতৃ পরিচয় দিতে শুরু করে। শুধু তাই নয় তাদের পালন পোষণের দায়িত্বও এসে পড়ে পুরুষের উপর। নারী কেবল স্বামী বা পুরুষের আশ্রয়েই নিরাপদ — শাস্ত্রে-বয়ানে-সমাজবিধিতে দেশে দেশে পুরুষতন্ত্রের তৈরি করা এই বয়ান প্রতিষ্ঠিত হল। এভাবেই সৃষ্টি হল ব্যক্তিগত সম্পত্তি, পরিবার, জাতি ও রাষ্ট্রের। সন্তানের পরিচয় হল পিতৃ পরিচয়ে আর পিতার পরবর্তীতে বংশের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারী হল পুরুষ সন্তান। শুরু হল স্থায়ী গৃহ নির্মাণ এবং দিনের শেষে পুরুষের গৃহে ফেরার রীতি। শুরু হল পুরুষ ও মহিলার মধ্যে শ্রম বিভাজন। শিকার করা, মাছ ধরা, লড়াই করা যাবতীয় বাইরের কাজ করত পুরুষেরা আর ঘর সামলানো, সন্তান ও পতির সেবা করাই ছিল মেয়েদের কাজ। এভাবেই ধীরে ধীরে নারীকে গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা হয়। পরিবার বৃদ্ধির ফলে খাদ্যভাব দেখা দিলে পশুপালন প্রথা এবং ক্রমে কৃষিপ্রথার সূত্রপাত হয়।[৫]

সমাজ বিকাশের যে স্তরে কৃষির বিকাশ এবং পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সেই স্তরে নারী ছিল পুরুষের প্রধান ভৃত্য। যার কাজ ছিল সন্তান পালন, পরিধেয় প্রস্তুত, বাসযোগ্য কুটির তৈরি ইত্যাদি। লাঙল আবিষ্কারের পর্বে লাঙল টানা ও ফসল সংগ্রহ করত মেয়েরা। অতিরিক্ত শ্রম ও দাসত্বের দ্বিগুণ বোঝার ভারে নারীর মানসিক দিকটার উন্নতি হল কম। যাযাবরদের

মতো নারী আর শুধু পুরুষের নর্মসঙ্গিনী না থেকে হয়ে উঠল জননী, কন্যা, বধূ — দায়িত্ব তার বেড়ে গেল। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল সংসার। এই ভূমিকারই স্বীকৃতি পাই 'গৃহিনী গৃহমুচ্যতে' ইত্যাদি প্রবাদে। অথচ এই নারীরাই ছিল পুরুষের কাছে হস্তান্তরযোগ্য, বিনিময়যোগ্য। মালিক কিংবা পিতার কাছ থেকে মূল্যবান বস্তুর বিনিময়ে কিনে আনা হত নারীকে, আর নারী হত পুরুষের হাতের পুতুল। তাই তারা নারীকে ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ ও বর্জন করতে পারত। এইভাবেই নারীর পণ্য হওয়ার সুত্রপাত হয়েছে আজকের বিশ্বায়নের যুগের বহু পূর্বেই।

নারী সারাজীবনই পরাধীন। প্রথমাবস্থায় পিতার অধীন তার পর স্বামীর এবং শেষে পুত্রের অধীন। নারীর নিজস্ব পরিসর বলতে কিছু নেই। কেবল ভোগ্যবস্তু তারা, পুরুষ তাকে নিয়ে নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে পারে। কেবল সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, যৌন সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও নারীকে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। নারীকে প্রাচ্য-পশ্চিমের প্রতিবেদনে, প্লেটো-ডিমিস্থিনিস কিংবা মনু-আপস্তম্ভ-বৌধায়ন — সর্বত্র নারী হল অকল্যাণের আকর, আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। যৌন জীবন সম্পর্কে ডিমসথিনিস বলেন "আমরা বিবাহ করি বৈধ সন্তানের জন্য এবং বিশ্বস্ত গৃহরক্ষকের জন্য। রক্ষিতাদের রাখি আমাদের প্রতিদিনের সেবার জন্য, পতিতাদের কাছে যাই প্রণয়ের স্ফূর্তির জন্য।"[৬] প্লেটো দলগত বা গোষ্ঠীগতভাবে স্ত্রী রাখা ও নির্বাচনের মাধ্যমে বংশ বা প্রজন্মের নির্ধারণের কথা বলেছেন।[৭] আরিস্টটল নারীদের পুরুষের থেকে নীচে বললেও তাদের স্বাধীনতা ও সৎপরামর্শ দেবার অধিকারকে স্বীকার করেছেন।[৮]

থাকিউাইডস (Thukydides) বলেছেন — "সেই স্ত্রীই সবচয়ে বেশি প্রশংসার যোগ্য যার সম্বন্ধে বাড়ির বাইরে ভালো মন্দো কিছুই শোনা যাবে না।"[৯]

সক্রেটিস "সমলিঙ্গ যৌন সংসর্গকে উচ্চ সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ মনে করতেন।"[১০] থাকিডাইডস বলেছেন— "নারী ব্যত্যাহত চেয়ে, অগ্নির উত্তাপের চেয়ে, উন্মত্ত জল প্রপাতের চেয়ে অশুভ যদি কোনো দেবতা নারীকে সৃষ্টি করে থাকেন তবে তিনি যেখানেই থাকুন, তিনি জেনে রাখুন যে তিনি হলেন সবচেয়ে অশুভ শক্তির অসুখী সৃষ্টিকর্তা।"[১১] সময়ের পরিবর্তনে রোম রাষ্ট্রে নারীদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পেলে কেটো (Cato) অভিযোগের সুরে বলেন — "যদি পরিবারের প্রত্যেকটি পিতা তার পূর্বপুরুষদের উদাহরণ মেনে চলত এবং তাদের স্ত্রীদের দাসী করে রেখে দিতে পারত, তবে আর নারীরা সাধারণ লোকের মধ্যে এত উৎপাত করে বেড়াতে পারত না।"[১২]

বাইবেলে সৃষ্টির শুরু থেকেই নারীকে পুরুষের বশবর্তী হয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। বাইবেলের Old Testament এর দশম বিধানে নারীকে দাসদাসী ও গৃহপালিত পশুদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। খ্রিস্টধর্মের মতে, "নারী হল অপবিত্র, যে পুরুষকে প্রলুব্ধ করে এবং এ দুনিয়ায় পাপ নিয়ে এসেছে এবং পুরুষদের পতন ঘটিয়েছে।"[১৩] টারটুলিয়ান (Turtullian) ঘোষণা করেছেন — "হে নারী, তোমার উচিত সর্বদা ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে অনুশোচনায় কাঁদতে

কাঁদতে শোক প্রকাশ করে চলা, যাতে মানুষ ভুলতে পারে যে তুমিই সমগ্র মানব জাতির ধ্বংসের কারণ। নারী! তুমি নরকের দ্বার।"[১৪] পিটার (Petar) নারীদের বলেছেন — "তোমারা তোমাদের স্বামীদের বাধ্য হয়ে চল।"[১৫] ইফিউসিয়ার (Ephesians) বলেছেন — "খৃষ্ট যেমন গীর্জার মাথা, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর মাথা।"[১৬] করিনথিয়ানদের মতে "প্রত্যেকটি পুরুষের প্রভু খৃষ্ট আর প্রত্যেকটি নারীর প্রভু হলো পুরুষ।"[১৭] এমনকি জন পল নারীদের শিক্ষা ও কৃষ্টির বিরুদ্ধাচরণ করে বলেছেন - "নারীরা পরাধীন থেকে নীরবে শিক্ষালাভ করুক কিন্তু তারা যে শেখাবে অথবা পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করবে আমি তা সহ্য করব না, তারা চুপচাপ থাকুক।"[১৮]

শুধু যে খ্রিস্টধর্মেই নারীকে অবমাননা করা হয়েছে তা নয়। অন্যান্য ধর্মের কেন্দ্র থেকেও নারীকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে ছলে বলে কৌশলে। কখনও তাকে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা করে তার মানবীরূপকে অবহেলা করা হয়েছে। পুরুষতন্ত্রের প্রতিভূ ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, রাজা ও ক্ষত্রিয়রা আপন সুবিধার্থে নারীকে অবলা বলে অবহেলা করেছে। নিজেদের প্রভুত্বকে বজায় রাখার জন্য মেয়েদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে নীতি নিয়মের বোঝা। ভারতীয় ধর্ম শাস্ত্র সমূহেও নারীকে খুব একটা উচ্চ আসন দেওয়া হয় নি। ঋগ্বেদের যুগে নারী পুরুষের সমানাধিকার ও সমগুরুত্ব ছিল। অথর্ব বেদের যুগ থেকে নারীর অধিকার একের পর এক খর্বিত হতে থাকে এবং মনুসংহিতার কাল থেকে নারী একেবারেই গৃহকারাগার বন্দিনী হয়ে পুরুষের ভোগের সামগ্রী ও সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র হয়ে পড়ে। ঘর সামলানো ও রান্নাবান্না করা ছাড়া তাদের আর কোনো সামাজিক ভূমিকাই থাকল না। নারী হয়ে পড়ল অবলা অল্পমতি। বিশেষ করে মনুসংহিতায় নারীকে নরকের দ্বার বলা হয়েছে। নারীর স্বাধীনতা সম্পর্কে মনু বলেছেন — " পিতা রক্ষতি কৌমারে / ভর্তা রক্ষতি যৌবনে। / রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রাঃ/ ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্য মর্হতি।"[১৯] অর্থাৎ কুমারী অবস্থায় পিতা, যৌবনে স্বামী ও বৃদ্ধাবস্থায় পুত্র রক্ষণাবেক্ষণ করবে। নারীর কোনো স্বাধীনতা ছিল না। নারীর স্থান এরূপ ছিল "পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্য্যা"[২০] অর্থাৎ নারীকে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র মনে করা হত। স্ত্রী কর্তব্য সম্পর্কে মনু বলেছেন — "স্ত্রী সর্বদা আনন্দমনে দক্ষতার সঙ্গে গৃহকর্ম করবে। জিনিস পত্র পরিস্কার করে রাখবে এবং মিতব্যয়ী হয়ে থাকবে। বাবা অথবা ভাইয়েরা যাকে সম্প্রদান করেছে আমরণ সেই পতির সেবা করা উচিত এবং পতির মৃত্যুর পরেও তাঁকে উল্লংঘন করা অনুচিত।"[২১] বিবাহের ক্ষেত্রেও তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু মনুসংহিতার আগের যুগে নারীরা তুলনামুলক ভাবে একটু স্বাধীনই ছিল। বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে পারত। কৃষিপ্রধান আর্যজাতির মেয়েদের প্রধান কাজ ছিল গো দোহন। বাল্য বিবাহের মতো কুসংস্কার তখন ছিল না। ছেলে মেয়ের অবাধ বিচরণ তথা মেয়েদের স্বামী নির্বাচনের অধিকারও ছিল। বিধবা বিবাহর প্রচলন ছিল এবং সতীদাহ প্রথা ছিল না।

ধীরে ধীরে পুরুষ নারীকে নিজের সুবিধামতো ভোগ করার জন্য আশ্রয় নিল ধর্মীয় শাস্ত্রের। মেয়েদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হল শাস্ত্রের বিধি নিষেধ। ধর্মের আড়ালে চলল নারী নির্যাতন। পুরুষ আপন সুবিধার্থে নারীকে 'অর্ধেক মানবী ও অর্ধেক কল্পনা' রূপে রচনা করল।

ভাষার জগতে পুরুষের একাধিপত্য নারীকে চিহ্নায়িত করেছে অবজ্ঞাসূচক মনোভঙ্গি থেকে। নারী শব্দের অর্থ ও প্রতিশব্দের মধ্যেই রয়েছে পরাধীনতার সংকেত। নারী হল সে, যে পুষ্টিদান করে, স্ত্রী যে বেষ্টন করে, রমণী মানে রমণযোগ্য। নারীকে ভোগ্যপণ্য মনে করে শুধু ভোগই করা হয়েছে। তার অন্তরকে বোঝার চেষ্টা করা হয়নি। যেখানে নারীকে 'অপর' বলে দূরে সরিয়ে অবহেলা ও নির্যাতন চলেছে, সেখান থেকেই সৃষ্টি হয়েছে প্রতিবাদের তাগিদ, ক্রমশ বিকশিত হয়েছে নারীবাদী চেতনা। চলেছে নারী পুরুষের সমানাধিকারের লড়াই। অবশ্য নারীর ভাগ্যের জন্য শুধু যে পুরুষই দায়ী তা নয় বহুক্ষেত্রে নারীরাও নারীর ভাগ্যের জন্য দায়ী। নারীরাও নারীর স্বাধিকারের প্রতিবন্ধক রূপে নানা প্রকার বাধা বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংলণ্ডের কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবির যে সংগ্রাম তার ব্যর্থতা। বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ নারীরাই ব্রিটেনে কৃষ্ণাঙ্গ নারীর বিরোধিতা করেছিল।

নারীর ভাষা, শরীর, চেতনা সম্পূর্ণরূপে পুরুষের ছত্রছায়ায় আবদ্ধ থাকায় বহুদিন নারী পরাধীনতার শেকলকে অনুভবই করতে পারে নি। কিন্তু পীড়ন যখন নিজের সীমাকে লঙ্ঘন করেছে তখনই প্রতিবাদ অন্ধকারকে ভেদ করে আলোকের দিকে ছুটে এসেছে। বহুদিন যে মুক্তির আশা মনের মধ্যে দানা বাঁধছিল তাই নারীবাদী চেতনারূপে বাইরে প্রকাশ পেল। নারী আর পুরুষের ছত্রছায়ায় থাকতে চায়নি, সে আপন পরিসরের সন্ধানে ব্রতী হল। তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালাল আপন মানবীসত্তার। নিজের সত্তাকে দেবী রূপে বন্দনা ও পরিচারিকা রূপে অবহেলা কোনোটিই তার আর কাম্য থাকল না। নারী নিজের ভাগ্যকে নিজেই জয় করে নেওয়ার চেষ্টা চালাল। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর নারীচেতনাবাদ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নান্দনিক পরিসর পেয়ে দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। বর্তমানে নারীচেতনাবাদ বহুস্বরিকতার মাত্রা পেয়েছে। নারীচেতনাবাদ নিজের পরিসর তৈরি করে নিয়েছে সাহিত্যেও।

।। ২ ।।

উনিশ শতকে ফরাসী সমাজবাদী চার্লস ফুরিয়ার ফেমিনিজম বা নারীবাদ শব্দটির উদ্ভাবন করেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন কিছু মানবীর যারা নিজের অন্দরে বদল ঘটিয়ে সহযোগিতা এবং পারস্পরিকতার সাহায্যে সমাজেও বদল ঘটাবেন। নারীবাদী চিন্তার কোনো নির্দিষ্ট পরিভাষা দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি। চিন্তার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, লিবার্যাল, র্যাডিক্যাল, মার্ক্সবাদী সমাজবাদী ফেমিনিস্ট বলে বিভিন্ন পর্বের নারীচেতনাবাদী ভাবনাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। লিবার্যাল নারীবাদীরা পক্ষপাতমূলক ব্যবহারের বিরোধিতা করে চাকরি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সমান অধিকারের দাবি করেছেন। র্যাডিকালে নারীবাদীরা তাদের চিন্তাচর্চার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন পুরুষের কাছে নারীর অধীনতার বিষয়কে এবং সমাজ পরিবর্তনের সূত্রে এই জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করেছেন। মার্ক্সবাদীরা নারীর সমস্যাকে ধনতন্ত্রপ্রসূত বলে মনে করেছেন। সমাজবাদী ফেমিনিস্টদের মতে নারী কেবল পুরুষের দ্বারাই নিপীড়িত নয়, শ্রেণি, ত্বক, জাতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে বৈষম্যের

জন্যও তারা অবদমিত হয়ে থাকে। আবার জাক লাঁকা, মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা প্রমুখের ভাবনার থেকেই নিজেদের চিন্তার দিক বেছে নিয়েছেন পোস্টমর্ডান বা আধুনান্তিক নারীবাদীরা। এছাড়াও ভাল্প্লামুভ এর নবতর সবুজ নারীবাদী ভাবনাও নারীবাদের ক্ষেত্রকে বিস্তৃতি দান করেছে।

নারীর যে ইতিহাসকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজচিন্তায় কেন্দ্র থেকে সরিয়ে গার্হস্থ্য জীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেই বদ্ধ নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন নারীচেতনাবাদীরা। নারীচেতনাবাদ একটি রাজনৈতিক তর্ক হওয়ায় নারীচেতনাবাদীদের প্রথম দায় নারীর নিপীড়ন, দমন, নিগ্রহ ও অসাম্যের উৎস সন্ধান করা। নারীচেতনাবাদের প্রস্তুতি পর্ব বহু আগে থেকে শুরু হলেও উনিশ শতকের শেষের দিকে নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞান সন্ধান স্পষ্ট প্রত্যয় লাভ করেছে। নারী-পুরুষের নর্মসঙ্গিনী, যৌন পুত্তলিকা হয়ে থাকাকে অস্বীকার করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজমানসতায় কুঠারাঘাত করেছে। সে চেয়েছে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি। এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় ভার্জিনিয়া উলফের বিখ্যাত বইয়ের কথা যেখানে নারীর কাম্য, 'a room of her own'। নারীর পরিসর সন্ধান দীর্ঘ লড়াইয়ের পর সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও নান্দনিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে এবং নারীচেতনা ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাঁচটি দশকে নারীচেতনাবাদ প্রতীচ্যের তাত্ত্বিকদের প্রভাবে গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করে হয়ে উঠেছে বহুস্বরিক। এই বহুস্বরিকতা প্রতিনিয়ত পরিশীলিত হয়ে চলেছে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহে। নারীচেতনাবাদীরা সাহিত্যের মূল স্রোত হিসবে পুরুষস্রোতকে চিহ্নিত করেছেন। এই স্রোতের থেকে নিজেকে সরিয়ে আপন পরিচয় ব্যক্ত করতে প্রয়াসী হলেন তারা। অন্তর্ঘাতের কৃৎকৌশলে নারীচেতনাবাদীরা প্রান্তিকায়িত নারীসত্তার অর্তি, যন্ত্রণা, স্বপ্নভঙ্গ, পরাজয় ও দহনকে আবিষ্কারের চেষ্টা চালালেন এবং সাহায্য নিলেন পুনঃপাঠের। তারা দেখিয়ে দিলেন যে সমাজে নারীকে অপাঙক্তেয় করে রাখা হয়েছে সেখানে সাহিত্যের প্রতিবেদনেও নারীর উচ্চারণকে উপেক্ষা করা হয়েছে। দেরিদা এবং লাঁকা পিতৃতান্ত্রিক অভ্যাসের আধিপত্য মনস্কতা এবং একমাত্রিকতাকে বিরোধিতা করে বিনির্মাণবাদ ও আকরণবাদের সাহায্যে মুক্ত উপসংহারের কথা বলেছেন।

প্রথম তরঙ্গের পাশ্চাত্য নারীচেতনাবাদী ভাবুক মনে করেন — "পুরুষের জগতের বাইরে নারীকে আটক রাখার জন্যেই নারীর গার্হস্থ্য জীবন।"[২২] দ্বিতীয় তরঙ্গে সমাজ জীবনকে বিশ্লেষণ করে তাতে যৌনতা ও পারিবারিক সম্পর্ককে যুক্ত করা হয়েছে। পুরুষের আদলে নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে না। তাই ষাটের দশকে পাশ্চাত্য নারীবাদীরা 'যা ব্যক্তিগত তা রাজনৈতিক' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্য সমস্যাকে রাজনীতির অর্ন্তভুক্ত করেন। জুলিয়েট মিচেল জাক লাঁকার অনুসরণে বলেছেন - "মানবসভ্যতার অনুপ্রবেশের জন্য আগে থাকতে পরিভাষিত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নারীকে ঢুকতে হয়। তার মাধ্যমে গড়ে ওঠে আমাদের সমাজ বাস্তবতা, ব্যবস্থাটি আছে পরিবারে, আছে ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া রাষ্ট্রে, আছে বিশ্বসংস্থায়। নারীর দুর্দশা

করেছে পুরুষ অথচ তাকে ঘোচাবার নামকরণ হ'ল 'নারী জাগরণ'; যেন সে এতকাল ঘুমোচ্ছিল অথচ আসলে ব্যাপরটা পুরুষ জাগরণ।"[২৩] অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের মত নারীচেতনাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনেও নিজস্ব সংঘর্ষ দেখা দেয়। দরিদ্র, কৃষ্ণাঙ্গিনী, লিসবিয়ান, অ-ইউরোপীয়রা প্রথমদিকের ধারাতে নেই বলে তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে কারণ মূলস্রোতে শ্বেতাঙ্গিণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকারে ছিল।

লিবার‍্যাল বা উদারপন্থী বলা হয়েছে প্রথম নারীচিন্তার স্ফূরণটিকে। লিবার‍্যালিজম শুধু রাজনৈতিক অবস্থাকেই চিহ্নিত করে না, এর সঙ্গে মেটাফিসিক্স বা অধিবিদ্যা এবং জাস্টিসের ধারণাও যুক্ত থাকে। লিবার‍্যাল নারীবাদীরা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরত্ব দিয়েছেন। স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ভূমিকা এবং ব্যক্তিগত জীবনে নিষ্ক্রিয় থাকার কথা বলেছেন তারা। সমাজ নিয়ন্ত্রক বিধি ব্যবস্থাকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ হওয়ার দাবি উত্থাপন করেছেন। উদারনৈতিকরা লিঙ্গ মোচন করতে না পারলেও লিঙ্গ উত্তরণের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। এরা আরও বলেছেন — "ব্যক্তি জীবনে সুবিচার পেতে গেলে ন্যায়নীতির দ্বারস্থ হতেই হবে। ন্যায়নীতির কোন লিঙ্গপরিচয় নেই, প্রিনসিপল অব জাস্টিস বা ন্যায়বিধির পক্ষপাত থাকতে পারে না। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার সকলেরই প্রাপ্য এবং সকলের ক্ষেত্রে একই বিধি সমানভাবে প্রযোজ্য। এমন নিরপেক্ষ বিধি পেতে গেলে বিধিকে যুক্তিনিষ্ঠ হতে হবে।"[২৪] সে সময় অধিকাংশ ভাবুকই মেরি ওলস্টোনক্রাফ্ট, জন লক এবং টমাস হবস এর মতো তাত্ত্বিকদের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। উদারপন্থীরা নারী পুরুষের সমান অধিকারের দাবি করলেন। স্ত্রী মাতা এবং নৈতিক অভিভাবক রূপে সামাজিক কাজ করার জন্যও নারীর অধিকারের প্রয়োজন রয়েছে। জন স্টুয়ার্ট মিল ও হ্যারিয়েট টেলর বলেছেন — "সামাজিক বর্গীকরণে নারীপুরুষের ভেদাভেদ লিঙ্গ পার্থক্যের কারণে। নারীত্ব একটি কারাগার, তা দাসত্ব। পুরুষ ও নারীর প্রকৃতি ভিন্ন। পুরুষ হল মনের মালিক। তাই সে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন। নারীর আছে দেহ।"[২৫] ওলস্টোনক্রাফ্ট বলেন — "নারীরও আছে বিচারবুদ্ধি, অতএব তাকেও সমান অধিকার দেওয়া হোক। নারীকে তার দেহের জন্য অযথা শাসিত মনে করা হয়, মনে করা হয় যে তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সে মানসিকভাবে অক্ষম। নারীর দাসত্ব, তার স্বভাবগুণে নয় তা পুরুষের ষড়যন্ত্রের ধূর্ততার কারণে।"[২৬] শিক্ষার দ্বারা সমাজে নারীপুরুষের অবস্থানগত পার্থক্যের আবসান ঘটানো সম্ভব। ওলস্টোনক্রাফ্টের মতে, নারীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে পুরুষের ব্যাভিচারী যৌনতাকে খর্ব করা সম্ভব। ওলস্টোনক্রাফ্ট বলেন — "নারীকে যদি ঠিকমতন নৈতিক ও নাগরিক শিক্ষা দেয়া হয়, তাহলে সে পুরুষের ব্যভিচারী যৌনতাকেও খর্ব করতে পারবে।"[২৭]

বিখ্যাত ফরাসি চিন্তাবিদ সিমোন দ্য বোভোয়া বলেন — "কেউ নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজই তাকে নারী করে তোলে।"[২৮] লিঙ্গ পরিচয়েই যৌন পরিচয় প্রোথিত করে বলে তিনি মনে করেন না। লিবার‍্যাল নারীবাদী দেকার্ত mind এবং matter (যারা মধ্যে দেহ অন্তর্ভুক্ত) এর কথা স্বীকার করে বলেছেন— "আমাদের দৈহিক পরিচয় দেহের দ্বারা নিরূপিত হয় - যেখানে

ক্রোমজমের পরিচয় দেহের দ্বারা নিরূপিত হয় - সেখানে ক্রোমজমের বা হরমোনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষের মন তো চলে যুক্তির নিয়মে। যুক্তির বলে মানুষ রচনা করে আইন, দর্শন, বিধিব্যবস্থা, এক কথায় বলা যায় 'কালচার' (সংস্কৃতি)।"[২৯] প্লেটোর, রিপাব্লিক বইটিতে রয়েছে — "মানুষ যুক্তিচালিত জীবন যাপন করলে সে আদর্শ জীবন যাপন করতে পারবে।"[৩০] লিবার‍্যালরা একটি প্রিন্সিপল তথা যুক্তিপূর্ণ জীবন নিয়ন্ত্রণের কথা বলে। যুক্তিই মানুষের লিঙ্গ পরিচয়কে অতিক্রম করতে পারে। লিবার‍্যাল নারীবাদীদের মতে — "আমরা তিনটি পরিচয় বহন করি যৌন পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয় এবং অপরটি হ'ল আমরা মানুষ।"[৩১] মানুষ পরিচয়ই সবার ঊর্ধ্বে। লিবার‍্যাল নারীবাদীরা মেথড অব ইনক্লুশন (Method of inclusion) বা অন্তর্ভুক্তি প্রকল্পের দ্বারা নারীবাদী তত্ত্ব বিশ্লেষণে মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা অথবা ফ্রয়েডের তত্ত্বকাঠামোর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে বলেও উল্লেখ করেছেন। লিবার‍্যাল নারীবাদীরা অন্তর্ভুক্তি প্রক্রিয়ার দ্বারা মেয়েদের মূল সামাজিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করার তথা পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন। তারা তিন ধরনের অন্তর্ভুক্তির উল্লেখ করেছেন। প্রতিষ্ঠিত চিন্তাতন্ত্রে নারীর অভিজ্ঞতা পর্যালোচনার অন্তর্ভুক্তি, দ্বিতীয়ত সবরকম সামাজিক চর্যায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অন্তর্ভুক্তি এবং সবশেষে আইনের অঙ্গনে একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্তি। লিবার‍্যাল নারীবাদীরা বাহ্যজগতের মূল স্রোতে নারীর অন্তর্ভুক্তি চাইলেও সমাজের মূল স্রোতের ছাঁদ বদলানোর কোনোরূপ প্রয়াস করেন নি। তারা নারীর সংসার, মাতৃত্ব ও সন্তান মানুষ করার দায়িত্বকে অস্বীকার না করলেও নারীর বাইরের কাজ করাকেও সমর্থন করেছেন।

যাটের দশকে ইউরোপ আমেরিকার নাগরিক অধিকার ও বামপন্থী আন্দোলন থেকে সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় তরঙ্গ ঃ র‍্যাডিকাল নারীবাদ বা সংস্কারপন্থী নারীবাদ। তারা পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন। উদারপন্থী ও সমাজবাদীরা পুরুষ দার্শনিকের গড়া কাঠামো মানলেও র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা তা মেনে নেন নি। তারা নারীর ব্যক্তিগত জীবন, দৈহিক ও মানসিক সুখের প্রসঙ্গকে তর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। উদারপন্থীরা সমাজকাঠামো বহাল রেখেই নারী পুরুষের অসাম্যকে দূর করার চেষ্টা করলেও র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা ব্যক্তিগত সমস্যার উপর বেশি গুরুত্ব দিলেন। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা কমিউন বানানো, নারী উৎসব পালন করা, ব্যবসার উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। কোনো কোনো র‍্যাডিকাল নারীবাদী সরাসরি পুরুষকে বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। লেসবিয়ান হওয়া বা কুমারী থাকার কথা বলেছেন।[৩২] র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা পিতৃতন্ত্রকে সমাজে নারীর বৈষম্যতার কারণ মনে করে পিতৃতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নারীর প্রতি হওয়া বৈষম্যমূলক আচরণকে রোধ করার কথা বলেছেন। NOW (National Organisation for Women) এর রক্ষণশীলতাকে মেনে না নিয়ে ১৯৬৭ তে একদল মহিলা যে বিকল্প গোষ্ঠীর রচনা করেন সেটিই র‍্যাডিকাল নারীবাদের জন্মসূত্র। র‍্যাডিকাল নারীবাদীদের কেউ কেউ বামপন্থী চিন্তা আবার কাউকে উত্তর আধুনিকদের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে দেখা গেছে। দেকার্ত শরীর ও মনের সম্পর্ককে খারিজ করে দিয়ে বলেছেন — "আমাদের যৌন পরিচয় যেমন আমাদের লিঙ্গ

পরিচয়কে প্রভাবিত করে তেমনি আবার আমাদের লিঙ্গ পরিচয় আমাদের যৌন পরিচয়ে বির্বতন ঘটায়। অর্থাৎ আমাদের জন্মগত স্বরূপ বা নেচার এবং আমাদের রচিত স্বরূপ বা জেণ্ডারের মধ্যে একটা উভয়মুখী সম্বন্ধ রয়েছে। এই দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটা একরৈখিক নয়।"[৩৩] র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা ক্ষমতা ও স্বার্থপরতার আস্ফালনকে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণ বলেছেন। তাদের মতে — "সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যের বীজ লুকিয়ে আছে নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের মধ্যে। যেখানে একটা অসম ক্ষমতার বন্টন, অবদমন ও বৈষম্য বাসা বেঁধে আছে পরবর্তীকালে সেখান থেকেই লিঙ্গ বৈষম্যকারী আচরণ সমাজের সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে।"[৩৪] ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন, আশা আকাঙ্খার মধ্যে কাজ করে চলেছে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতার কাঠামো যা র‍্যাডিকালরা অনুভব করেছেন। তারা লিবার‍্যালদের মতো ব্যক্তিকে ভিন্ন সত্তারূপে না দেখে দুটি ভিন্ন সত্তার পরস্পর গভীর সম্পর্কের কথাই বলেছেন এবং কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেছেন। র‍্যাডিকালে নারীবাদীরা আন্দোলনের অংশ হিসেবে কনশাসনেস রেজিং প্রোগ্রাম (Conscious Raising Programe) বা সচেতন হয়ে ওঠার প্রকল্পের কথা বলেছেন।

লেলিন ও স্তালিনের রূপায়িত ধ্রুপদী মার্ক্সবাদে নারীকে একটি পৃথক শ্রেণি রূপে স্বীকৃতি না দিয়ে, নারীপুরুষের স্থিতিকে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। ধ্রুপদী মার্ক্সবাদ মনে করে নারী শ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিক অস্তিত্বের বস্তু স্থিতিকে বিপ্লবের দ্বারা একযোগে মুক্তি লাভ করতে পারে। অ-মার্ক্সীয়রা শ্রেণি বিশেষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক সন্দেহ জনক বলেছেন। তাঁরা পুঁজিবাদের বাজারে গার্হস্থ্য শ্রমকে কী ভাবে নেওয়া হচ্ছে তা দেখিয়ে, শ্রমের বাজারে লিঙ্গ ও জাতিভিত্তিক অসাম্যকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।[৩৫] ফলে প্রয়োজন দেখা দিল মার্ক্সবাদী চিন্তা কাঠামোর পরিবর্তনের। রমা কুণ্ডু বলেছেন, "পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা কাঠামোতে পরিবর্তন না আনলে পুরুষের প্রভুত্বকামিতা জনিত শোষণ-শাসন বদলাবে না।"[৩৬]

মার্ক্সবাদের অনুশীলনকারী নারীবাদীরা নারীর চেতনা প্রক্রিয়ার পরিবর্তনে মার্ক্স-এঙ্গেলসের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলেন। মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী নারীবাদীরা সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারীর সাংসরিক সমস্যার অবসান ঘটানোর কথা বললেন। ধ্রুপদী মার্ক্সবাদ পরবর্তীকালে বিকৃত হয়ে ভালগার মার্ক্সবাদে রূপান্তরিত হয়ে, শ্রমের বাজারে নারী কর্মীদের অদৃষ্ট নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে এবং তাদের অনুভাবনের বিষয় হয়ে ওঠে স্বাভাবিক শুশ্রূষাকর্মী এবং ঘরকন্নার শ্রমিক রূপের মূল্যায়ণ। মার্ক্সবাদী নারীবাদীরা ব্যক্তিগত এলাকাটিকে রাজনীতিকরণ করতে প্রয়াসী হলেন।

মার্ক্সীয় নারীবাদের ভিত গড়ে উঠেছে এঙ্গেলসের পরিবারের সূত্রপাত, ব্যক্তিমালিকানা, সম্পত্তি এবং রাষ্ট্র শীর্ষক রচনা থেকে। এঙ্গেলস পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থনৈতিক নির্ধারকটিই নারীর ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করেছেন এবং বলেছেন — নারী এর দ্বারা নিজে থেকেই শ্রেণি বিশেষটির অংশ হয়ে যায় এবং প্রলেতারিয়েতের অবস্থান নারী পেয়ে যায়। এর ফলে মার্ক্সবাদে দুটি সমস্যা

দেখা দেয় পারিবারিক কাঠামোর অপরিবর্তনীয় যৌন বৈষম্যের পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং কর্মক্ষেত্রে শ্রমের লিঙ্গবাদী বিভাজন।

পরবর্তী মার্ক্সীয় নারীবাদী আলিসন জ্যাগার একটি ভিন্ন কাঠামো রচনা করার চেষ্টা করেছেন যা — "শ্রমের বাজারের বাইরে থেকে যাওয়া নারীর অভিজ্ঞতাকে, পারিবারিক সম্পর্ক ও মতাদর্শের টানাপোড়েনকে, আত্তীকরণ করবে এবং সেই সঙ্গে প্রতিরোধ করবে তথাকথিত ঐতিহাসিক প্রবণতাকে। এর জন্য সংসারে নারীর শ্রমকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি অংশ মনে করতে হবে, যা পুঁজি সৃষ্টির সহায়ক। জাতীয় আয়ের অঙ্ক করার সময় এই শ্রমকে মজুরিতে ছকতে হবে এবং তার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, মনে রাখতে হবে যে নারীর সাংসারিক আত্মপরিচয় শ্রমের বাজারে এতটাই প্রভাবিত হয় যে উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রসঙ্গে তার শ্রম পুরুষের শ্রম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়।"[৩৭]

বর্তমান যুগে নারীবাদের আলোচনায় নারীবাদীদের কয়েকজন আলথুজারের আইডিয়লজি বা মতাদর্শের ভাবনাটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন, নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে। আলথুজার মার্ক্সের প্রথম দিকের মতবাদকে 'ভালগার' বলে নস্যাৎ করলেও মার্ক্সের পরবর্তীকালের ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ তত্ত্বটি গ্রহণ করে বলেছেন - "এই সামাজিক প্রক্রিয়াটি একটি কাঠামোগত, পরিস্রবনের মাধ্যমে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মতাদর্শগত তাত্ত্বিক ভাবনাচিন্তা এবং অভ্যাসের মিলনের ফলে নির্ণায়ক গড়ে তোলে।"[৩৮] মানুষ মতাদর্শের সাহায্যে পৃথিবীকে ও পৃথিবীতে নিজের জায়গা বুঝতে পারে। আলথুজারপন্থী নারীবাদীরা এই মতাদর্শ ও 'সমাজ-বাস্তবতার' সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে একটি জটিল তত্ত্বের অবতারণা করেছেন যার দ্বারা শ্রেণি ও লিঙ্গ বৈষম্যের নিপীড়ন ব্যাপারটির ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়ে উঠছে। আলথুজার বলেন — "মতাদর্শ ব্যক্তির প্রাতিস্বিকতার কাছে কৈফিয়ত দাবি করে। অর্থাৎ আমাদের অহং ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে সামাজিক প্রাণী হিসেবে। মতাদর্শ ব্যাপারটি কেবল ভাবকল্পের স্তরে কাজ করে না। আমাদের কাজকর্মের দ্বারা ভাবকল্পগুলো অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। নারীবাদের উচিত হবে প্রচলিত কর্তৃত্বকারী মহাদর্শকে লাগাতার আক্রমণ, তাদের স্বাভাবিক মনে করার ভুল ভেঙে দেওয়া এবং সেই সঙ্গে জাগতিক ক্ষমতা কাঠামোটিতে সমানাধিকার। এভাবে থামানো যাবে পিতৃতন্ত্রের দ্বারা নারীকে সর্বজনীন করার তর্ক।"[৩৯]

।।৩।।

নারীচেতনাবাদের প্রথম তরঙ্গটি ছিল সব থেকে দীর্ঘায়ত। এই পর্যায়ে নিপীড়ক পুরুষতন্ত্রের সঙ্গে নিপীড়িত নারী আপন পার্থক্যকে বুঝে উঠতে সক্ষম হয়েছে তার সঙ্গে তারা এটিও বুঝে নিয়েছে লিঙ্গবোধ আসলে সমাজনির্মিতি মাত্র। দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রধান তাত্ত্বিক হলেন ভার্জিনিয়া উল্‌ফ এবং সিমোন দ্য বোভোয়া। বোভোয়ার 'Second Sex' (১৯৪৯) বই দিয়ে দ্বিতীয় তরঙ্গের সমাপ্তি ঘটেছে। সৃষ্টিশীল লেখিকা ভার্জিনিয়া উলফের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বই 'A room of

one's own (১৯২৯) এবং 'Three Guineas' (১৯৩৮)। তাছাড়া এ পর্যায়ের অন্যান্য নারীচেতনাবাদীদের মধ্যে রয়েছেন অলিভ শ্রাইনের, এলিজাবেথ রবিনস, ডরোথি রিচার্ডসন, ক্যাথারিন ম্যানস্‌ফিল্ড, রেবেকা ওয়েস্ট, রে স্টাচে, ভেরা ব্রিটেইন, উইনি ফ্রেড, হোল্টবি ইত্যাদি। উলফ্ দাবি জানিয়েছেন নারীর ন্যায্য অধিকারের। বোভোয়া যৌনতা ও লিঙ্গ পরিচয়ের পার্থক্য নির্দেশ করতে চেয়েছেন তিনি মন্তব্য করেছেন— "One is not born, but rather becomes a woman. It is civilization as a whole that produces this creature intermediate between male and eunuch which is described as femine. One the intervention of some one else can establish an individual as an other."[৪০] বোভোয়ারের অসামান্য অবদানের উল্লেখ রয়েছে বেটি ফ্রীডান ও শুলামিথ ফায়ারস্টোনের 'The faminine mystique (১৯৬৩) ও 'The dialectic of sex' (১৯৭০) বই দুটিতে। এ বই দুটিকে তৃতীয় তরঙ্গের সূত্রধার মনে করা হয়। ১৯৮০ সনে রচিত ডোল্ স্পেণ্ডারের 'Man Made Language'-এ দেখানো হয়েছে পুরুষতন্ত্রের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে নারীর ভাষা কীভাবে নিজস্বতা হারিয়ে ফেলে।

অর্থসামাজিক পরিস্থিতির দ্রুত বদলে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বেও পরিবর্তন ঘটেছে এবং নারীচেতনাবাদ তৃতীয় তরঙ্গের থেকেও এগিয়ে গেছে অরও অনেক জটিল প্রবণতা ও অভিঘাতের দিকে। তাই জুলিয়েট মিচেল, কেইট মিলেট, আদ্রিয়েনা রীচ, এলেন রীচ, এলেন শোয়াল্টের, হেলেন সিক্সো, লুসি ইরিগেরে, জুলিয়া ক্রিষ্টেভা, তোরিল মোই, টেরি ঈগলটন প্রমুখের চিন্তাস্রোতে অজস্র আবর্ত সত্ত্বেও তারা সহযাত্রী নন, তাদের প্রতিবেদনে রয়েছে বিচিত্র ভিন্নতা।

আকরণোত্তরবাদ, উপনিবেশোত্তর চেতনা, আধুনিকোত্তরবাদ এবং বিনির্মাণবাদ নারীচৈতন্যকে সূক্ষ্মতা ও কৌণিকতা দান করেছে। কেট মিলেটের 'Sexual Politics' (১৯৬৯) বইটি নারীর ভাবমূর্তি রচনার পেছনে সামাজিক প্রতাপের কৃৎকৌশলকে উলঙ্গ করে দিয়েছে। মার্ক্সীয় নারীচেতনাবাদের প্রাথমিক ফসল হিসাবে ধরা যায় শীলা রোবোথাসের 'Hidden from History' ও 'Women's Consciousness, Man's World' বই দুটি এবং জুলিয়েট মিচেলের 'Women, The largest Revolution' নামক নিবন্ধটিতে। পরবর্তীতে মিশেল বারেট 'Women's Oppression Today : Problems in Marxsist Feminist Analysis (১৯৮০) বইটিতে এই ধারা আরো সমৃদ্ধি লাভ করেছে।

বারেট ভার্জিনিয়া উলফের বস্তুতান্ত্রিক বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। জুডিথ নিউটন, ডেবোরা, রোজেনফেল্ট, সান্ড্রা গিলবার্ট, সুসান গুবার, কোরা কাপলান প্রমুখ সমালোচকের হাতে পরবর্তীতে বস্তুবাদী নারীচেতনাবাদ আরও বলিষ্ঠতা লাভ করেছে। সুসান কাণিলিয়ান, এলেন মোয়েৰ্সে, মেরী জেকোরাস প্রমুখ লেখিকার রচনায় নারী পুরুষের চিরাচরিত রুদ্ধতাকে অস্বীকার ও নিজস্ব উচ্চারণকে জোরাল করার কথা রয়েছে। তবে শোয়াল্টের রচিত 'A Literature of their own' বইটি এ

প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফরাসী ধারার লেখিকাদের মধ্যে রয়েছেন ক্রিস্টেভা, হেলেন সিক্সো ও লুসি ইরিগের। নারীর শারীরিক অভিজ্ঞতা বাচন ও প্রতীকের সঙ্গে পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে তার অবচেতনে ভাষার উপর প্রভাব ফেলার দৃষ্টান্ত রয়েছে হেলেন সিক্সের "The language of Medusa' (১৯৭৬) যেখানে বলা হয়েছে – Woman is the silence of which precedes discourse, She is the other, which stands outside and threatens to, disrupt the conscious order of speech"[৪১] হেলেন এখানে নারীকে তাদের শারীরিক অভিজ্ঞতাকে রচনার মাধ্যমে প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছেন।

মূল নারীবাদী আন্দোলনের প্রবক্তারা মধ্যবিত্ত শ্বেতাঙ্গ পরিবার থেকে আসার দরুন মূল নারীবাদী তর্কে কৃষ্ণাঙ্গিনীদের সমস্যা অনুপস্থিত। তাই কৃষ্ণাঙ্গিনীরা পৃথক মঞ্চ তৈরি করে নিলেন। অ্যালিস ওয়াকার বলেছেন - “কালো মেয়ের সমস্যা মূল নারীবাদীরা বুঝবে না। শ্বেতাঙ্গ নারীবাদী হিগেমনিকে বানচাল করে দিতে হবে।”[৪২] বেল হুক্স বললেন, “ইউরোপ আমেরিকার নারীবাদের দৃষ্টিতে এশিয়া আফ্রিকার কালো মেয়েরা ‘অপর’। কালো মেয়েদের আগে নারী বলে মনে করা হোক।”[৪৩] আমেরিকা ইউরোপের কৃষ্ণাঙ্গ নারীবাদীদের বাইরের শত্রুভাবাপন্ন সমাজ বাস্তবতা থেকে আত্মরক্ষার জন্য পরিবারের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিতে দেখা গেছে। রমা কুণ্ডুর মতে — “ব্যক্তিমানুষ বাইরের সমাজে যত বিপন্ন হয় ততই সে আরো বেশি করে পরিবারের আশ্রয় ও মমতার প্রলেপ চায়।”[৪৪]

গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক বিনির্মাণের মাধ্যমে প্রান্তিককে ক্ষমতার কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। পরনোগ্রাফি নামধেয় পাঠকৃতিতে নারীর দেহকে মাত্র একটি উপনিবেশ মনে করা হয়েছে। ক্রিস উইডন ভাষা ও সংস্কৃতির উত্তরকাঠামোবাদী তত্ত্বকে নারীবাদে আত্মসাৎ করার কথা বলেছেন তাঁর ‘ফেমিনিস্ট প্র্যাকটিস অ্যাণ্ড পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট থিয়রি’ গ্রন্থে। ‘উত্তরকাঠামোবাদী আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ফরাসি নারীবাদীরা লাঁকা, দেরিদা, ফুকোর ভাবনা থেকে তত্ত্ব আহরণ করেছেন। রোজলিণ্ড কাওয়ার্ড, বোলবি, স্টিফেন হিথ হলেন ব্রিটিশ চিন্তাধারার বাহক। তাঁরা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে আলাদা করে সমীক্ষা করেন না। অন্যান্য এলাকার মতো ইতিহাস থেকেই প্রাতিস্বিকতার ও যৌনতার নানান রীতি রেওয়াজ পেয়ে যায় নারী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। নারীর চাওয়া পাওয়া ও পিতৃতন্ত্রে নারীর চাহিদা বলে চালিয়ে দেওয়ার ফাঁকটিকে তারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। লুসে ইরিগার ও হেলিন সিকসুর ভাষায় — “ভাষার ব্যবহার ও অপব্যবহার নারী ও পুরুষ একই রকম ভাবে করে না। ভাষা নিজেও লিঙ্গনিরপেক্ষ নয়।”[৪৫] উত্তরকাঠামোবাদ নারীদের পক্ষে মুক্তির সোপান বহন করে এনেছে।

বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের নারীচেতনা চতুর্থ তরঙ্গের প্রকাশ ঘটিয়ে চলেছে। নতুন নন্দন ও সমাজতত্ত্ব যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গদের দিক থেকে, তেমনি প্রতিবেদনেও স্থান করে নিয়েছে ব্যতিক্রমী যৌন আচরণ। নতুন নতুন বিতর্কের বাতাস ছড়িয়ে পড়েছে দেশে বিদেশে। ভারতবর্ষেও এই বাতাস পিতৃতান্ত্রিক আখ্যানকে চূর্ণ করে নারীচেতনাবাদী মনোভাবের বিকাশ

ঘটাচ্ছে।

নারীচেতনাবাদের সূত্রপাত হয়েছে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ইংলণ্ডে কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাদের ভোটাধিকারের দাবি থেকে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ মহিলাদের বিরোধের ফলে তাদের সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। দার্শনিক জন লক (John Locke) এবং কঁডসের রচনায় নারীবাদের ধারণার সূত্রপাত দেখা যায়। তারপর থেকেই নারীর গাথা সাহিত্যে আপন স্থান অধিকার করে নেয়। ধীরে ধীরে ভারতীয় সাহিত্যেও এর প্রভাব লক্ষিত হয়। ব্রিটিশ রাজত্বকালে ভারতে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারের সুবাদে নারীর সামাজিক অবস্থান ও অধিকারের বিষয়টির পুনর্বিবেচনা শুরু হয়। ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারের ফলে পাশ্চাত্যের উদারবাদী ও বৈজ্ঞানিক ভাবধারার সঞ্চার হয় ভারতে। পাশ্চাত্যের উদার আদর্শে রঞ্জিত কিছু ভারতীয় সমাজ সংস্কারক যেমন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি মনীষীরা রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে নারী প্রগতির সোপান রচনা করেছিলেন।

পুরুষই আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য নারীকে অবহেলা করেছে, আবার নারীমুক্তির ভাবনাচিন্তার প্রথম সূত্রপাতও হয়েছে কিছু উদারমনা পুরুষেরই দ্বারা। এর আগে নারীরা নিজের ভাগ্যের সঙ্গে এক প্রকার আপস করেই নিয়েছিল। অন্দরমহলকেই নিজের ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছিল। রাজা রামমোহনই প্রথম নারীর অন্তরের সুপ্ত মুক্তির বাসনাকে জাগিয়ে তোলেন। তিনি কলকাতায় 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮১৪ সালে। সেই সভাতেই বাল্যবিবাহ প্রথা, বহু বিবাহ প্রথা এবং সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা করা হয়। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ ১৮২৮ সালে বহু বিবাহ প্রথার বিরোধিতা করে।

ইউরোপীয় নারীর তুলনায় মধ্যযুগ এমনকি আধুনিক পর্বেও ভারতীয় নারীর জীবন বেশি কঠোর শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধে বন্দী ছিল। বিবাহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া কোনো প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীর যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। অসমের সত্রানুষ্ঠানসমূহে এখনও স্ত্রীর প্রবেশাধিকার নেই। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সমাজ সংস্কারক গণ বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ রোধ, বহু বিবাহ প্রথা রোধ ও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন করলে ভারতীয় সমাজ ও সাহিত্যে আমূল পরিবর্তন ঘটে। সাহিত্যে ফুটে ওঠে নারীর বিবর্তিত সত্তা। অন্দর মহল থেকে নারীকে নিয়ে আসা হল নিখিল বিশ্বে। সমাজ সংস্কারের মতো সাহিত্যেও পুরুষের কলম থেকেই প্রথম বেরিয়ে এল নারী অধিকারের দাবি নিয়ে নানা লেখালেখি। ক্রমশ লেখিকারাও নিজের বেদনাকে নিজের মতো করে লিখতে শুরু করলেন, এবং তখনই বেদনা হয়ে উঠল অনেক বেশি মর্মস্পর্শী ও জীবন্ত। বেদনার বেদগান মাত্র নয়, নারীর কলমে উঠে আসতে লাগল পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন।

।।৪।।

বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে নারীর স্থান

নারী পুরুষের ছত্রছায়ার থাকত বলে তাদের জীবনদৃষ্টিও হয়ে উঠেছিল পুরুষের উপনিবেশ।

এমনকি চণ্ডীদাসের রাধাও প্রেম নিবেদন করছে কৃষ্ণের চরণে। অর্থাৎ প্রেমও পরাণে পরাণে নয়, পুরুষের চরণের সাথেই নারীর পরাণের প্রণয়! আবার কোথাও স্বামীকে পরম গুরু মনে করা হয়েছে। প্রবাদে বলা হয়েছে 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' আধুনিক যুগের সাহিত্যে পুরুষের আধিপত্যবাদী অবস্থানের সমালোচনা করে তাদের দোষ ক্রুটিকেও অঙুলি নির্দেশ করা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ হওয়া উচিত কি না এতদ্বিবিষয়ক প্রস্তাব' এর মধ্য দিয়ে আমরা নারী কল্যাণের নবীন চিন্তার আভাসই পেয়ে থাকি।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' তে ভাগ্য নয়, পুরুষের স্বেচ্ছাচারই নিয়ন্ত্রণ করেছে দুই নারী সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর ভাগ্যলিপি। বিবাহিতা স্ত্রী সূর্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রনাথের মেকি প্রেম ধরা পড়েছে কুন্দনন্দিনীর প্রতি নগেন্দ্রর আকর্ষণের মধ্য দিয়ে। আবার সূর্যমুখীর গৃহ ত্যাগের পর কুন্দনন্দিনীর প্রতি অবহেলা চূড়ান্ত পর্যায় লাভ করেছে। আবার এই দুই নারীই প্রতিবাদ জানিয়েছে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে, একজন স্বামীগৃহ ত্যাগ করেছে আর একজন আত্মহত্যা করে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

'চন্দ্রশেখর' এর শৈবলিনীও অবহেলার স্বীকার হয়ে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরপুরুষের প্রতি আপন ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে আধুনিক মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। 'রজনী' উপন্যাসে নায়িকা লবঙ্গলতার বেশি বয়সের স্বামী রামসদয় মিত্রের সঙ্গে সুখের সংসার থাকলেও অমরনাথকে স্বামী রূপে পাওয়ার আকাঙ্খা লবঙ্গকে ব্যতিক্রমী চরিত্ররূপে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এ বিধবা নারীর পরপুরুষকে ভালোবাসা গর্হিত কাজ হলেও রোহিণী গোবিন্দলালকে ভালোবেসে দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়েছে। দায়িত্ববিহীন গোবিন্দলালকে প্রত্যাখ্যান করে ভ্রমরও নারী পুরুষ সম্পর্কের বিশ্বে চিন্তাভাবনার পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনায়ও আধুনিক কালের নারীচিন্তার আভাস পাওয়া যায়। বঙ্কিমের মতো রবীন্দ্রনাথ নীতিকে প্রাধান্য দেন নি, প্রাধান্য দিয়েছেন প্রেমকে। 'চোখের বালি' উপন্যাসের প্রধান নারীচরিত্র বিনোদিনী ব্যক্তিত্বসম্পন্না ও বুদ্ধিমতী নারী। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ বিধবা বিনোদিনীকে প্রেমের পূর্ণ অধিকার দিলেও ঘর সংসার পাতানোর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন নি। বিনোদিনী ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মহেন্দ্রকে রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে নিজের দিকে টানলেও বিহারীকেই প্রেমিক হিসেবে পাওয়ার বাসনা ছিল তার। সে সময় বিধবা নারীর প্রেমের স্বাধীনতা, দয়িত নির্বাচনের ঘটনা নারী মুক্তির সংবাদই বহন করে চলেছে। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে অন্তঃপুর থেকে নারীর বেরিয়ে আসা ও স্ত্রীশিক্ষার আভাস পাওয়া যায়। 'যোগাযোগ' উপন্যাসেও নায়িকা কুমুদিনী স্বামী মধুসূদনের স্থূল, অমার্জিত নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়েছে, প্রথমে স্বামীর শয়নকক্ষ ত্যাগ করে ও পরে দরিদ্র ঋণগ্রস্ত দাদার সঙ্গে চিরকাল বাস করার সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে।

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' এ বিধবা নারীর ভালোবাসা সকরুণ অন্তর্দাহ, বিক্ষোভ ও অন্তহীন মাধুর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের কিরণময়ী একের পর এক কাজের মধ্য

দিয়ে সমাজের সমস্ত বাধা নিষেধকে উল্লঙঘন করেছে — অনঙ্গ ডাক্তারের সঙ্গে দৈহিক মিলন, উপেন্দ্রর প্রতি ভালোবাসা, দিবাকরের সঙ্গে প্রেমের নাটকের মধ্য দিয়ে। কিরণময়ী ব্যক্তিত্বসম্পন্না আধুনিক নারী, সমাজ নির্দিষ্ট ছক সচেতনভাবেই প্রত্যাখ্যান করে তার বঞ্চিত জীবনের প্রতিশোধ নিয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের 'ইছামতী' উপন্যাসে আমরা কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার আভাস পাই। তিলু, বিলু ও নীলুর ভবানীর সঙ্গে বিয়ে ও চন্দ্রকাকার বাবার সতেরটা বিয়ের মধ্য দিয়ে। বুদ্ধদের বসুর 'সাহিত্য চর্চা' গ্রন্থের "রামায়ণ" প্রবন্ধে রামায়ণের রামকেও তাঁর কার্যের জন্য রুচিহীন বলা হয়েছে। রামায়ণের রাম সীতা উদ্ধারের পর সীতাকে রাবণের অঙ্কশায়িনী বলে তাঁর চরিত্রে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব বা রাক্ষস বিভীষণ যে কোনো একজনের সঙ্গে চলে যাওয়ার কথা বলেছেন। আরো বলেছেন স্ত্রী বলে নয় শুধু ঈক্ষাকু বংশের কুলগৌরব রক্ষার্থে সীতাকে উদ্ধার করা হয়েছে। সীতার প্রতি তাঁর আর আসক্তি নেই, এবং সীতাকে যেখানে ইচ্ছা যেতে বলেছেন। নেত্ররোগীর সম্মুখে দীপশিখার মতো রামের কাছে সীতাও কষ্টকর ও পীড়াদায়ক এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। রামের এই নীচ মন্তব্য বুদ্ধদেব বসুর কাছে রুচিহীন মনে হয়েছে। রামের এরূপ নীতিহীন ও কাপুরুষোচিত বাক্যে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন — "ছি ছি - আমাদের সমস্ত অন্তরাত্মা কলরোল করে বলে ওঠে - ছী ছি। বিশেষ করে ওই শেষের কথাটা লক্ষ্মণ, ভরত, সুগ্রীব, বিভীষণ যার কাছে ইচ্ছা যাও - কী করে রামচন্দ্র মুখে আনতে পারলেন, ভাবতেই বা পেরেছিলেন কী করে। এ তো শুধু হৃদয়হীন নয় রুচিহীন",[৪৬] বুদ্ধদেব বসুর এই সমালোচনা প্রথাসিদ্ধ সমালোচনা পদ্ধতির পর্বান্তরের সংকেতবাহী যেখানে রামের মত একজন ধার্মিক পুরুষকেও নীতিহীন, হৃদয়হীন, নীচ বলা হয়েছে। তিনি বিনির্মাণের প্রক্রিয়ায় রামকে সীতার দিক থেকে বিচার করেছেন। এইটি বিশ শতকের নারীবাদী পুনঃপাঠের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত বলে বিবেচিত হতে পারে।

ক্রমে ক্রমে কলম ধরলেন বঙ্গ নারীরাও। All India Women's Conference এর সক্রিয় সদস্য সীতাদেবী মেয়েদের শিক্ষা, স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কে বলেছেন — "আমরা যে কোন অংশে পুরুষের চেয়ে হীন নই তা শুধু বক্তৃতায় জাহির করিলে ও কাগজে লিখিলে হইবে না ইহা আমাদের হাতে কলমে করিয়া দেখাইতে হইবে।"[৪৭]

নারীর নিজের কথা যখন নিজের কলমে প্রকাশ পায় তখন বেদনা হয়ে ওঠে অনেক বেশি জীবন্ত। নারী আত্মার রোদন যখন একজন নারীর কলমে প্রকাশ পেয়েছে তখন সেটি হয়ে উঠেছে অনেক বেশি মর্মান্তিক ও হৃদয়স্পর্শী। রাসসুন্দরী দেবীর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' এমনই একটি মর্মস্পর্শী রচনা। বাংলা সাহিত্যের প্রথম এই আত্মজীবনীতে দেখা গেছে রাসসুন্দরীর জীবনের দীর্ঘসময় কেটে যায় অন্তঃপুরের চার দেয়ালের মধ্যে। বারোটি সন্তান ও সংসার সামলাতে। সামলাতে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে নিজের জীবনের ছোট বড় ঘটনা ও নারী জীবনের মর্মান্তিক মুহূর্তগুলোকে নিজের অনুভবের মধ্য দিয়ে সাহিত্যে রূপ দেন তিনি। নারীর অন্তর-

বেদনার মর্মান্তিক প্রকাশ তাঁর রচনায় রয়েছে। বিয়ের প্রসঙ্গে 'আমার জীবন'এ তিনি লিখেছেন "তখন অনেক কষ্টে সকলে আমার মায়ের কোল হইতে আমাকে আনিলেন। ঐ সময় আমার কি ভয়ানক কষ্ট হইল। সে কথা মনে পড়িলে এখনও দুঃখ হয়। বাস্তবিক আপনার মা ও আপনার সকলকে ছাড়িয়া ভিন্ন-দেশে গিয়া বাস এবং যাবজ্জীবন তাহাদের অধীনতা স্বীকার, আপনার মাতা পিতা কেহ নহেন - এটি কি সামান্য দুঃখের বিষয়।"[৪৮] তাঁর সময়ে মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে সমাজের প্রচলিত ধারণা এরূপ ছিল — "আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না, তখনকার লোক বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক।"[৪৯] নারীরা হ'ল পিঞ্জরবদ্ধ পাখি। খাঁচার ভিতর থেকে ছটফট করা ছাড়া তাদের উপায় নেই। নারী যেন সমাজের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। এই বেদনার আর একটি মর্মান্তিক প্রতিফলন হ'ল রাসসুন্দরী দেবীর উক্তি — "আমি যদি পুত্র সন্তান হইতাম, আর মার আসন্ন কালে সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি যেখানে থাকিতাম, পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম।"[৫০]

কৃষ্ণভাবিনী দাসীর 'ইংল্যণ্ডে বঙ্গ মহিলা' (১৮৮৫) বাঙালি সাধারণ নারীর আর এক বেদনা গাথা। মা ও শিশু কন্যাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে স্বামীর সঙ্গে বিদেশ যাত্রা করেন। ফিরে এসে যখন দেখেন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে তখন মেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে যান। বিদেশ থেকে ফিরে আসা মায়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির লোক মেয়েকে দেখা করতে দেয় নি। তিনি আপন অন্তরের বেদনাকে 'মায়ের প্রতি মেয়ের অভিমান' কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর শুদ্ধাচারী বিধবা জীবন যাপন ও নারী কল্যাণে ব্রতী হ'ন তিনি।

১৮৮৮ তে প্রকাশিত স্বর্ণময়ী গুপ্তার 'উষাচিন্তা ঃ অর্থাৎ আর্য মহিলাগণের অবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা'র মধ্যে নারী জাগরণের আভাস পাই ঃ "আপনি মনুষ্য নামের অধিকারী হইয়া কী করিতেছেন? আপনার গৃহমধ্যে দশম বর্ষিয়া কন্যা ও একাদশ বর্ষিয়া পুত্র বধূ শোচনীয় বৈধব্যের মলিন বেশে। আর আপনি কলপ দিয়া রূপার তারে দাঁত বাঁধিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়সে বালিকার পাশে সঙ্কোচশূণ্য হইয়া দণ্ডায়মান হইতেছেন - ছি ছি আপনার কি লজ্জা হইতেছে না?"[৫১] এভাবেই মেয়েরা প্রচলিত বিধি বিধান ও সমাজের নিষ্ঠুর দিকগুলি অনাবৃত করেছেন, কখনো করেছেন আক্রমণ। নারী জাগরণের দীপশিখা প্রজ্জ্বলন করে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবস্থাকে তুলে ধরেছেন।

উনবিংশ শতকে নারীমুক্তির সাহিত্যিক আন্দোলন বিকশিত হলেও বিংশ শতাব্দীতেই তার বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ আমাদের চোখে পড়ে। বিংশ শতকের সমাজ ও রাজনীতি সচেতনতা নারীর মুক্তিতে বৃহৎ ভূমিকা নেয়। বিংশ শতাব্দীর এক শক্তিশালী লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর রচনার মধ্যেও অন্তঃপুরের নারীদের আর্তনাদ আমরা শুনতে পাই। তারই সঙ্গে পাই নারীর সামাজিক ও মানসিক উত্তরণের কাহিনি। পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদ গুলির আলোচনার ধারাবাহিকতায় অপেক্ষাকৃত উত্তরকালের বাংলা সাহিত্যের বলিষ্ঠ লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী তাঁর কখনবিশ্বে নারী

পুরুষ সম্পর্কের বিন্যাসকে কিভাবে দেখেছেন ও নিজের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন তা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

।।৫।।

আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসে নারী

আশাপূর্ণা দেবী বিংশ শতকের লেখিকা হলেও তাঁর ত্রয়ী উপন্যাসের ঘটনাকাল ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি তিন প্রজন্মকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা'। অন্তঃপুরের ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে নারীর উত্তরণের কহিনিকে তিনি দেখিয়েছেন এই ত্রয়ী উপন্যাসে। নারী মুক্তির প্রচেষ্টা কখনো হয়েছে প্রবল, কখনো স্তিমিত। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যর মুক্তির স্বপ্ন সুবর্ণর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে বকুলের মধ্যে পূর্ণতা পেয়েছে। এ যেন শুধু নারীর উত্তরণের কাহিনি নয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কালেরও উত্তরণের গল্প। আশাপূর্ণা তাঁর এই ত্রয়ী উপন্যাসে নারীসত্তার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়াকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে এসেছে নিরন্তর ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতার মধ্যেও অবিরত চেষ্টা চালিয়েছে নারী আপন স্বাধীন সত্তাকে গড়ে তোলার। এই গড়ে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্যে পিঞ্জরায়িত নারী তিলে তিলে দগ্ধ হয়েছে। মুক্তি পিয়াসী আত্মার সে দহন, সে আর্তনাদ আমরা আশাপূর্ণার উপন্যাসে শুনতে পাই।

একটি শতক থেকে আর একটি শতকে পাড়ি দিতে গেলে আসে অনেক পরিবর্তন, আশাপূর্ণা সেই পরিবর্তনকে আপন সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বহির্বিশ্বের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরেও চলেছে অনেক ভাঙাগড়া। ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে নারী মুক্তির পথ ও পাথেয়, স্বপ্ন ও প্রতিবাদ। তাই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সূচনাতে আশাপূর্ণা দেবী লিখেছেন - "বহিঃবিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তী কালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা উন্মাদনা, রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালে কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের, যুগের, সমাজ মানুষের মানসিকতার। চোখ ফেললে দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলা দেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।"[৫২] এই বিষয় সচেতনতাই তাঁকে মানবী চেতনাবাদী রূপে চিহ্নিত করেছে।

একাধিক উপন্যাসের ভূমিকাতেই আশাপূর্ণা ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করেছেন। কোন ইতিহাস? কালের প্রেক্ষাপটে মানবস্রোতের ভাঙাগড়ার ইতিহাস নয়, বরং তিনি রচনা করতে চান অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার ইতিহাস, যে অন্তঃপুর শব্দটি অভিধানিক অর্থের গণ্ডি পেরিয়ে বাঙালির

ভাষাতত্ত্বে 'মেয়েমহল' এর প্রতিশব্দ হয়ে উঠেছে। আশাপূর্ণা দেবী ভূমিকাতেই পাঠকের পাঠ গ্রহণ ও বিনির্মাণের অভিমুখটি তৈরি করে দিয়ে জানান, পুরুষের রচিত প্রতিবেদনের জগৎ 'অর্ধেক আকাশ' এর প্রতি উপেক্ষার জগৎ, আর তিনি এই অর্ধেক আকাশেরই ভাষ্যকার। অনামী মেয়েদের একজন সত্যবতীর কাহিনি বলতে গিয়ে তিনি ইতিহাস এবং কালি-কলমের প্রতিবেদনের জগতের সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে তোলেন। তাতে বুঝি সত্যবতী ব্যক্তিমাত্র নয়, সে ইতিহাসের কুশীলব, তার জীবন কথায় বিম্বিত হয় ইতিহাসের ভাঙাগড়া। বহু অসমসাহসিক বীরাঙ্গনার বুকের রক্ত দিয়েই রচিত হয়েছে গত শতবর্ষের বাংলার সমাজ ও পরিবার পরিসরে ঘটা অভাবনীয় ও অকল্পনীয় পরিবর্তনের ইতিহাস। সত্য, সুবর্ণ তাদেরই এক একজন প্রতিনিধি যারা আত্মলিদানের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত করেছে ভাবী প্রজন্মের মহৎ সম্ভাবনার সিংহদ্বার। তাদের বলিদানই প্রশস্ত করেছে বকুলের সম্ভাবনার দ্বার।

রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে আশাপূর্ণা প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সুযোগ তেমন পান নি। মায়ের পরোক্ষ উৎসাহে একক প্রয়াসে আশাপূর্ণা স্বশিক্ষিত হয়েছেন। পরবর্তীতে বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্য চর্চার প্রেরণা পান স্বামীর কাছ থেকে। প্রথাগত বিদ্যাচর্চার সুযোগ না পাওয়ায় বহির্জগতকে জানার সুযোগ তিনি খুব বেশি পান নি। তিনি নিজের পরিবার ও পারিপার্শ্বিক থেকে যতটুকু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাকেই সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন, তাই তাঁর রচনার সংঘাত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পারিবারিক গণ্ডিতে আবদ্ধ। আশাপূর্ণা দেবী তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থানকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে সত্যবতী নামে এক বালিকা। বয়স ৮ বছর। সে সাহসী, চঞ্চল, উদ্যমী কোনো কিছুতেই তাকে দমানো যায় না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে দ্বিধা বোধ করে না সে। সত্য একগুঁয়ে, জেদী। তার সব কিছুর মূলে ছিল পিতা রামকালীর অতিরিক্ত ভালোবাসা ও প্রশ্রয়। রামকালী জীবনে একটি ভুল করে বসেন— তা হল গৌরীদানের পুণ্য অর্জনের জন্য ছোট বয়সেই সত্যর বিয়ে দিয়ে দেন। পিতার অজ্ঞতায় করা ভুলের দায়ভার সত্যকেই বহন করতে হয়। শ্বশুরবাড়িতে এসে শাশুড়ির কটু কথা ও মুখচোরা স্বামী নবকুমারকে নিয়ে তার জীবনে নেমে আসে দুঃখের ভার। কিন্তু সত্য থেমে থাকেনি, ছেলে মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে 'মানুষের মত মানুষ' হিসেবে গড়ে তুলতে চায় সত্য এবং সে আশাতেই নবকুমারকে নিয়ে শাশুড়ি এলোকেশীর নিষেধ না মেনে কলকাতার বাসা বাড়িতে চলে আসে। কিন্তু সত্যর সব স্বপ্ন, আশা ধূলিসাৎ হয়ে যায় যখন শাশুড়ি এলোকেশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নাতিনী সুবর্ণকে সত্যর অজান্তে বাল্যকালে বিয়ে দিয়ে দেন। তার মধ্যে নবকুমারের সম্মতি সত্যকে আরো বেশি পীড়া দান করে। স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ও প্রতিবাদ করতে গিয়ে সত্য আপন সংসার ত্যাগ করে কাশীযাত্রা করে। সত্যর দুরন্তপনা দিয়ে কাহিনি শুরু ও কাশীযাত্রার মধ্য দিয়ে কাহিনির সমাপ্তি কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে গেছে ছোটবড় বহু ঘটনা, ঘাত প্রতিঘাত। যার মধ্যে নারী সামাজিক অবস্থান স্পষ্টরেখ হয়েছে আর অন্তেবাসী মানবীর প্রতিবাদ ভাষা পেয়েছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র শুরুতেই লেখিকা উপস্থাপিত করেছেন এক তৃতীয় প্রজন্মের নারীকে। বকুল সত্যবতীর তৃতীয় প্রজন্ম। সত্য হল সেই নারী যে নারীর স্বতন্ত্র সত্তাকে লেখিকা প্রত্যাশা করেছেন স্বপ্নে ও কল্পনায়। লেখিকা সত্যবতীর দুরন্ত শৈশবের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে অন্তঃপুরের অকথিত ঘটনার ইতিহাসকে আলো দিতে চেয়েছেন যা থেকে উদাসীন বহির্বিশ্ব বা পুরুষসমাজ।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে রয়েছে এক একান্নবর্তী পরিবারের ছবি। রামকালীর সংসারে বাবা ঠাকুরদার পরিবার ছাড়া আশ্রিতের সংখ্যা ছিল প্রচুর। যৌথ পরিবারের মধ্য দিয়ে লেখিকা সেই সময়ে সমাজে নারীর অবস্থানকে সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। রামকালী ব্রাহ্মণ হলেও ব্রাহ্মণোচিত পেশাকে গ্রহণ করেন নি। ব্রাহ্মণোচিত পেশা ত্যাগের জন্য যে সমাজ একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আবার সেই সমাজেরই শিরোমণি নিজের মেয়ে ভুবনেশ্বরীকে বিয়ে দেয় রামকালীর সঙ্গে সামান্য একটু প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে। রামকালীর বেশি বয়সের মেয়ে সত্যকে লেখিকা শৈশব থেকেই নেতৃত্বের সহজাত ক্ষমতার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। সত্যর দুরন্তপনা ও সাহসের পেছনে পিতার একটু পরোক্ষ প্রশ্রয়ও ছিল। তখনকার সমাজে মেয়েদের মাছ ধরা, বিধবার হাঁড়িতে পান্তাভাত ইত্যাদি অপাংক্তেয় ব্যাপার ছিল। মাছ ধরার জন্য মোক্ষদার কাছে পান্তা ভাত চাইতে যাওয়ার সাহসও সত্য করেছে। মেয়ে মানুষ বলে তাকে কেউ অবহেলা করলে সে প্রতিবাদ জানিয়েছে — "মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না বানের জলে ভেসে আসে।"[৫৩]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র আরো কিছু নারী চরিত্র যেমন দীনতারিণী, শিবজায়া, মোক্ষদা এরা পুরুষতন্ত্রের আদলে গড়ে ওঠা অসম্পূর্ণ নারী। তারা যেন পুরুষের তৈরি নীতি নিয়মকে বহন করে চলেছে। শুধু তাই নয় পুরুষদের উপনিবেশ হয়ে উঠেছে তাদের বোধ ও বুদ্ধির জগৎ, তারা নিজেরাই পুরুষের থেকেও কঠোর পুরুষতন্ত্রের ধারক বাহক হয়ে উঠেছে, যেমন দেখি মুক্তকেশীকেও (সুবর্ণলতা)। বিধবাদের জন্য প্রচলিত নীতি নিয়মের যাতে কোনো ঘাটতি না হয় সেদিকে মোক্ষদার বিশেষ নজর। তারা তাদের অসম্পূর্ণতাকে নীতিনিয়মের মধ্য দিয়ে ঢেকে রেখেছে। বিধবাদের সামাজিক কোনো শুভ কাজে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। বস্তুত এই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা আজও গ্রাম সমাজে বহমান। শহরের শিক্ষিত পরিসরেও উদার মানুষেরা আজও শুভকর্মে বিধবাদের উপস্থিতিকে ভ্রুকুঞ্চন করেন। সধবাদের থেকে বিধবাদের নীতি নিয়ম ছিল অনেক কঠোর। বিধবা হওয়া যে তখনকার সমাজে কী কষ্টের তা সারদার কথা থেকে বোঝা যায়। বিধবা হওয়ার অভিশাপ থেকে একশটা সতিনের ঘর করাও যেন সারদার কাছে শ্রেয় মনে হয়েছে। তাই রাসুর আত্মঘাতী হবার কথা শুনে সারদার প্রাণ কেঁপে উঠেছে। সে বলেছে —

"বিধবা -

বুকটা থর্ থর্ করে ওঠে সারদার। বরং একশটা সতীন নিয়ে ঘর করবে সারদা। বিধবা

হওয়ার মত অভিশাপ আর কি আছে?"[৫৪]

সমাজে মেয়েদের নিজস্বতা বলতে কিছুই ছিল না। নিজের পরিচয়টুকুও নির্মিত হয় পুরুষের সাপেক্ষে, সচেতনভাবেই আশাপূর্ণা তা দেখিয়েছেন। তাদের পরিচয় ছিল 'জটার বৌ', 'রামকালীর স্ত্রী', 'সত্যর মা', 'কাটোয়ার বৌ' ইত্যাদি রূপে। তারা এভাবেই অভ্যস্ত ছিল। মেয়েরা তখন সম্পূর্ণরূপে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অসচেতন ছিল। অধীনতাকেই তারা জীবন বলে মেনে নিয়েছিল। বিরোধ তাদের কল্পনার বাইরের কোনো জিনিষ। সত্যর মাকেও আমরা পাই ঘোমটায় আবৃত একটি মুখ যে সর্বদা রামকালীর ভয়ে তটস্থ। এরূপ পরিবেশে সত্যর মধ্য দিয়ে লেখিকা যেন নতুনের সূচনা করতে চেয়েছেন। তাই সত্যকে তৈরি করেছেন বিস্ফোরক রূপে। অন্যায়কে সত্য মেনে নেয় না। হারতে সত্য শেখেনি ঃ "হেরে যেতে একান্ত আপত্তি সত্যবতীর। কোন ক্ষেত্রে কোথাও হার মানবে না এই পণ।"[৫৫]

তখনকার কুলীনদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল তাই নারীদের সতিনের ঘর করতে হত অবমাননার সঙ্গে। স্বামীকে একা ভোগ করার অধিকার কোনো নারীরই ছিল না। স্বামীর ভালোবাসাকে ভাগ করার মতো মর্মান্তিক বেদনা বুকে নিয়েই তাদের বাঁচতে হয়েছে। তাই লগ্নভ্রষ্টা পটলীকে বিয়ের সূত্রে বাঁধতে গিয়ে রামকালীর মতো ব্যক্তিও সারদাকে স্বামী সোহাগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। সত্য ছাড়া আর কেউই সারদার দুঃখে মর্মাহত হয়নি। সত্য দুধ ওথলাবার মধ্য দিয়ে আপন প্রতিবাদকে জাহির করেছে — "আমি কি আর সাধে আগুনে হাত দিয়েছি বাবা, বড়বৌয়ের মুখ চেয়েই দিয়েছি। আহা বেচারী, একেই তার সতীনকাঁটার জ্বালা তার ওপর আবার দুধ ওথলাবার হুকুম। মানুষের প্রাণ তো।"[৫৬] আট বছরের বালিকার মুখে এ ধরণের প্রতিবাদ বাবা রামকালীকেও চকিত করে দেয়। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে সারদার দুঃখকে মোক্ষদা উপহাস করে বলে "সোয়ামী কি মণ্ডা মিঠাই যে একলা আস্তটা না পেলে পেট ভরবে না, ভাগ হয়ে গেলে প্রাণ ফেটে যাবে?"[৫৭] মোক্ষদার মুখে এই সংলাপ বসিয়ে লেখিকা কী বার্তা পৌছাঁতে চান, সুবেদী পাঠকের তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের কৌশলে নারী অস্তিত্ব তার নিজস্ব সংলাপ হারায়। পুরুষের স্বরকে নিজের অজান্তেই সে আপনার করে নেয়। মোক্ষদাকে দিয়ে এহেন উচ্চারণ করিয়ে ব্যভিচারী পুরুষ তার বহুগামিতার পক্ষে নারীর স্বতস্ফূর্ত সম্মতি আদায় করে নেয়।

নারী পুরুষের সামাজিক বিন্যাস কিংবা প্রচলিত সামাজিক প্রথাই হোক যে কোনো ব্যাপারে রামকালীকেও সত্যর কাছে হার মানতে হয়েছে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা কঠিন কাজ আর সে কাজের দায়িত্ব সত্যবতী নিজের কাঁধেই নিয়েছে। সংশোধনের ক্ষেত্রে রামকালী, সব থেকে শ্রদ্ধার পাত্রটিও সত্যর থেকে রেহাই পায় নি। যে জটাদা বউকে পিটিয়ে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল সেই জটাদার সঙ্গে বউ-এর ভাব দেখে রাগ হয় সত্যর।

দ্বিতীয় পর্যায়ে সত্যর শ্বশুর বাড়িতে আসা। সেখানে এসেও নিজের সত্তাকে লীন করে না

সত্য। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের সুরের মধ্যে এসেছে একটু গাম্ভীর্য। শাশুড়ির কটুবাক্য ও স্বামীর বিরূপ ব্যবহার সত্যকে দমন করতে পারে না। নিজের দৃঢ় সংকল্পে কলকাতার বাসায় নবকুমারকে নিয়ে চলে আসে। কলকাতায় এসে ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে মিলে ছেলেমেয়েদের ও নিজের বিদ্যাচর্চা অব্যাহত রেখেছে। সুহাসকে তার অতীত পরিচয়ের গ্লানি থেকে বের করার প্রয়াস ও সুহাসের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে লেখিকা সময়ের গতিকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। সত্যর ব্রাহ্ম সমাজে যাওয়া ও মেয়েদের পড়ানো ইত্যাদিতে নবকুমারের কোনো বাধাই সে মানে নি। এভাবেই আশাপূর্ণা সত্যর প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সমাজে নারী নির্যাতনের দিকগুলোকে প্রদর্শনের পাশাপাশি প্রতিবাদের সাহিত্যিক ভাষ্য রচনা করেছেন। শ্বশুর নীলাম্বর বাড়ুয্যের চরিত্রে অধঃপতনের জন্য সত্য তাকে প্রণাম করতে চায় নি। আবার যে স্বামী সদুকে অপমান করে বাড়ি থেকে বের করে দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী এনেছে সেই স্বামীর কাছে সদুর ফিরে যাওয়ার ব্যাপারও সত্যর মনঃপূত হয় নি।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র যেখানে শেষ সেখানেই 'সুবর্ণলতা'র শুরু। সত্যবতীর কাশীযাত্রার মধ্যেই শেষ হয়না মেয়েদের সংঘর্ষের আখ্যান। মার গৃহত্যাগের অপবাদ ও গ্লানিকে মাথায় নিয়ে শুরু হয় সুবর্ণর সংসার জীবন। তাতে রয়েছে শাশুড়ি মুক্তকেশী ও স্বামী প্রবোধচন্দ্রের কটু কথা। সত্যবতীর মেয়ে সুবর্ণ যার পরিচয় আভিজাত্যহীন পরিবারের মেজবউ রূপে। সেখানে বড় হয়ে উঠেছে আত্মপরিচয়ের থেকেও মেজবউ এর আবরণী সত্তা। নয় বছরের সুবর্ণকে সহ্য করতে হয়েছে দর্জিপাড়ার শ্বশুরবাড়িতে কর্ত্রী মুক্তকেশীর নীতি নিয়মের কঠোর শাসনকে। নিয়ম লঙ্ঘনের অধিকার বা ক্ষমতা তার নেই। এই নীতি নিয়ম তাকে পীড়িত করে। সে নতুন বাড়ি দেখতে যেতে চাইলে শাশুড়ি বারণ করলে তার্কিক স্বভাবা সুবর্ণ বলেছে — "আর এই যে আপনার ছেলেরা নিত্য-দিন যাচ্ছেন তাতে দোষ নেই।"[৫৮]

সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুল এই তিন প্রজন্মের নারীর মধ্যে সব থেকে বেশি আহত হতে হয়েছে সুবর্ণকে। মায়ের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে, মায়ের গৃহ ত্যাগের কলঙ্ককে মাথায় নিয়ে শুরু হয় সুবর্ণর সংসার জীবন। সব অপবাদ, কলঙ্ককে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছিল সুবর্ণ। কিন্তু তার মুক্তিকামী মনে অজন্তে জন্ম নেয় দক্ষিণের বারান্দার বাসনা। সেখানেও তাকে সহ্য করতে হয় স্বামীর প্রতারণা ও অন্যদের গঞ্জনা। নীতি নিয়মের ছক মেনে চলতে পারেনা সুবর্ণ, তাই আত্মমর্যাদার যন্ত্রণায় তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যর মত প্রতিবাদের দৃঢ়তা ও রামকালীর মতো পিতার আশ্রয় তার ছিল না। তাই খাঁচাবন্দী পাখির মত ছটফট করা ছাড়া তার আর কোনো উপায় থাকে না। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে সত্য চালিয়েছে খাঁচা ভাঙার দুঃসাহসিক অভিযান আর 'সুবর্ণলতা'র সুবর্ণর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে খাঁচাবন্দী মুক্তিকামী নারীর অব্যক্ত যন্ত্রণা। রীতি নীতির শিকলকে ছিন্ন করার ব্যর্থ প্রয়াস করেছে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সুবর্ণলতা। তার আত্মসত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার যে প্রয়াস সে চালিয়েছে তাই হল উপনিবেশিক মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা। সত্যবতীর আখ্যানে রয়েছে আপন ব্যক্তিত্বের জোরে রামকালী থেকে নীলাম্বর পর্যন্ত নিজের গণ্ডি তৈরি করে নেওয়ার আনন্দ আর সুবর্ণলতার আখ্যানে সফলতার আনন্দ নেই, রয়েছে দাসত্ব ও

মর্যাদাহীনতার যন্ত্রণা। বড় মর্মান্তিক এই উচ্চারণ — "আমার মন আচে বুদ্ধি আচে, মস্তিষ্ক আচে, আত্মা আচে, কিন্তু কেহ আমার সত্তাকে স্বীকার করে না।"[৫৯]

নয় বছর বয়সে সুবর্ণ মুক্তকেশীর যৌথ পরিবারের মেজবউ হয়ে আসে। তখন থেকেই তার জীবনে আসে চাওয়া ও না পাওয়ার নানারূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা। সংসার জীবন থেকে ক্ষণিকেরও বিশ্রাম নেই তার। নিজের ঘরের কল্পনা, সেখানে আবার দক্ষিণের খোলা বারান্দার প্রত্যাশা মুক্তকেশী ও তার কন্যা পুত্রবধূদের কাছে অবাঞ্ছিত মনে হয়, কারণ তাদের মন হ'ল উপনিবেশীকৃত। তাদের পরিসর স্বামী সন্তান পরিবারের গণ্ডিতেই আবদ্ধ। সুবর্ণলতা চেয়েছিল বারান্দার খোলা পথে সভ্যতা সংস্কৃতির মুক্ত প্রবাহ। বিংশ শতাব্দীতেও অনাড়ম্বর পরিবেশে লেখিকা তাঁর একান্ত ভাবনার নির্যাসেই গড়ে তোলেন এক নারীর স্বপ্ন হারানো অন্তর্দাহের ইতিহাস।

দর্জিপাড়ার তিনমহলা বাড়িই নিজের অন্ধ নিয়তি জেনেও সুবর্ণলতার মুক্তি পিপাসী মন স্থির হয়ে যায় নি, হয়েছে আরো কঠিন ব্রতে ব্রতী। সুবর্ণর মন বলেছে — "সুবর্ণর মূল্য ধার্য হয়েছে শুধু একটা অভ্যাস মলিন শয্যায়। সেখানে সুবর্ণর জন্য আগ্রহের আহ্বান অপেক্ষা করে। কিন্তু সে আগ্রহ কি প্রেমের ? সে আহ্বান কি পুরুষের ? তা নয়। সে শুধু অভ্যাসের নেশা। তাই সে আহ্বান সুবর্ণর চেতনাকে বিদ্রোহী করে, স্নায়ুদের পীড়িত করে, আত্মাকে জীর্ণ করে।"[৬০] না চাইলেও প্রবোধের কাম সঙ্গিনী হতে হয়েছে সুবর্ণকে। স্বামী, দেবর ও শাশুড়ির বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছে সুবর্ণকে। তাও সুবর্ণ স্বপ্ন দেখেছে পারুল ও বকুলকে নিয়ে। তাদের স্কুলে পড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে কিন্তু সেখানেও বাধা পেয়েছে ছেলেদের থেকে, স্বামীর থেকে। শুধু স্বামী নয় ছেলেরাও সব কিছুর জন্য মাকে দায়ী ভেবেছে, নিন্দা করেছে। স্বামী ও ছেলেদের অবহেলার জীবনকে বহন করা আর সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। তাই ডাক্তারের চিকিৎসাকে অস্বীকার করে ধীরে ধীরে নিজের অবহেলায় জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় সুবর্ণ।

ব্যক্তিত্বহীন শিশ্নোদরপরায়ণ স্বামীর সঙ্গে দিন কাটানোর তিক্ত অভিজ্ঞতা সুবর্ণকে স্বামী থেকে বহুদূরে সরিয়ে নিয়েছে। সুবর্ণলতা স্বামীকে ভালোবাসতে পারেনি। তার সংসার গড়ে উঠেছে ভালোবাসাহীন, ভাবশূন্য দুঃসহ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। তাইতো সুবর্ণ তার ও স্বামীর সম্পর্ককে এরূপ বলেছে — "ও আমায় বিশ্বাস করে না, আমি ওকে বিশ্বাস করি না। ও নাকি আমায় ভালবাসে বলে তো তাই সব সময়, কিন্তু ভগবান আমার অপরাধ নিও না, আমি ওকে ভাল বাসিনা। ওকে ভালবাসা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওর সঙ্গে একবিন্দু মিল নেই আমার। তবু চিরদিন ওর সঙ্গে ঘর করতে হবে আমায়?"[৬১] না চেয়েও সুবর্ণকে বার বার যেতে হয়েছে আতুর ঘরের মলিন শয্যায়। প্রবোধ যতই সুবর্ণর উপর ভালোবাসার অধিকার খাটাতে চেয়েছে ততই তার আত্মিক গ্রন্থি শিথিল হয়েছে। সুবর্ণর মন যে আত্মিক ভালোবাসা চেয়েছিল তা প্রবোধের কাছ থেকে সে পায় নি। তাইতো সুবর্ণর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে "আমার ইচ্ছে হয় কেউ আমায় ভালবাসুক আমি কাউকে ভালবাসি। জানি এসব কথা খুব নিন্দের কথা তবু চুপি চুপি না বলে পারছি না -

প্রেমে পড়তে ইচ্ছে হয় আমার।"[৬২] দাসত্বকে মেনে নিলেও মুক্তির জন্য সুবর্ণর আশা ও প্রয়াস আশাপূর্ণার নারীচিন্তার বিশিষ্ট মানসিকতাকেই ফুটিয়ে তুলে। সুবর্ণ অনেক বিরোধের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে সংগ্রাম করেছে; নুয়ে পড়লেও ভেঙে পড়েনি। সত্য ও সুবর্ণ জীবনের বহু দুঃখ কষ্টের মধ্যেও ভাগ্যকে দোষ দেয় নি বরং পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে আরও বেশি দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সত্যর কাশীবাস ও সুবর্ণর মৃত্যুকে বরণ দুটির মধ্যেই রয়েছে মুক্তিকামী নারীর নীরব প্রতিবাদ।

'বকুলকথা' উপন্যাসে এসে সত্য ও সুবর্ণর স্বপ্ন বকুলের মধ্য দিয়ে বাস্তবে সাকার হয়েছে। সত্যবতী ও সুবর্ণর সংগ্রাম বকুলের লেখিকা অনামিকা দেবী নামে প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সার্থকতা লাভ করেছে। তারই সঙ্গে বকুল মায়ের জীবনের যন্ত্রণার ইতিহাসকে বহির্বিশ্বে উত্তর প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবার যে শপথ গ্রহণ করেছিল তা বাস্তবায়িত করেছে। নিজের ভাগ্যকে জয় করার ও সমাজে নিজের পরিসর তৈরি করার জন্য যুগ যুগ ধরে বীরাঙ্গনাদের কঠোর সংগ্রামের প্রতিদান দিয়েছে বকুল, মা দিদিমার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তরিত করেছে, সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে সে। বকুল নিজের চেষ্টায় সমস্ত বিদ্রুপ অতিক্রম করেছে যা সত্যবতী ও সুবর্ণ অনেক চেষ্টা করেও পারেনি। দাদাদের নিষেধ সত্ত্বেও বকুল গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করেছে ও নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে দাদাদের যে অবহেলা তার উপযুক্ত উত্তর দানে সমর্থ হয়েছে। বকুলের প্রতিষ্ঠা নারী জাতির যোগ্যতারই প্রমাণ বহন করেছে। সময় বদলেছে সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে ফলে বকুল সমাজের বুকে নিজের প্রতিষ্ঠার পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হয়েছে।

শিক্ষার দ্বারা নারী নিজস্ব অভিজ্ঞান তৈরি করে পুরুষের ছায়ায় আচ্ছন্ন না থেকে সমাজের উন্নতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে। আশাপূর্ণার এই বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে তাঁর উপন্যাস তিনটির মধ্য দিয়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনে পারিবারিক জীবনেও এসেছে পরিবর্তন তাই নারীর অবস্থার পরিবর্তন আজ স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সত্য ও সুবর্ণর সংগ্রাম বকুলের চলার পথ অনেক মসৃণ করে দিয়েছে। সময় পুরুষের মানসিকতাকে উন্নত করে দিয়ে নারীর মানবিক রূপটাকে দেখার ক্ষমতা এনে দিয়েছে। তারা আজ স্ত্রীকে দাসী রূপে নয় সঙ্গিনী রূপে পাবার কথা ভেবেছে। সময়ের প্রবল অভিক্ষেপে বকুলের চলার পথে প্রথম অবস্থাতে থাকা ক্লেদ ঘুচে গেছে। বকুল স্বাদ পেয়েছে খোলা পৃথিবীর; স্বামী-সংসার-সন্তানের বাইরে যে পৃথিবী আছে, তার। নির্মলের স্মৃতি মাঝে মাঝে তাকে একটু অন্যমনস্ক করলেও নতুন উদ্যমে নতুন প্লট সে খুঁজে নিয়েছে।

লেখিকা আধুনিকতার আশা করেছেন নারীর ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্যে উত্তরণের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য যে কোনো বিকৃত রুচির আধার নয় সেটাও তিনি বোঝানোর প্রয়াস করেছেন শম্পা চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। 'বকুলকথা'য় শম্পার প্রেমের রুচিহীনতা, বিকৃত অবস্থাকে লেখিকা আধুনিকতা বলতে চান নি। 'বকুলকথা'য় বকুলের মধ্য দিয়ে লেখিকা যেন আপন ভাবনাকেই প্রকাশ করে

গেছেন। তাই 'বকুলকথা'য় বকুল দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ থেকে কাহিনির কেন্দ্র থেকে একটু সরে গেছে। তাইতো লেখিকা 'বকুলকথা'র শেষে বলেছেন "শুধু বকুলের কথাটা আর লেখা হ'ল না।"[৬৩]

এইভাবেই আশাপূর্ণা দেবী ত্রয়ী উপন্যাসের মধ্য দিয়ে পুরুষ প্রধান সমাজের নারীর অবমাননার দিকটির পাশাপাশি নারী সমানাধিকার ও আত্মা মর্যাদার সংগ্রামকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

।। ৬ ।।

অসমীয়া সমাজে ও সাহিত্যে নারীর স্থান

বঙ্গীয় সমাজের মত অসমীয়া সমাজও পুরুষ প্রধান সমাজ। মনু, ডাক, শংকরদেব ও মাধবদেবের মতাবলীকেই অসমীয়া সমাজ অনুসরণ করে চলেছে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রমজীবী মানুষের মতো নারীর সামজিক অবস্থানও অন্তেবাসী। মনু ও ডাকের বচনের মত অসমীয়া সমাজেও নারীকে মানবীয় মর্যাদাহীন করে রাখা হয়েছে। অসমীয়া সমাজ ডাকের ও মনুর নীতিসমূহ নারীর উপর আরোপ করেছে।

ডাকের বচনে নারীকে বাজারে পণ্য সামগ্রীর সমতুল্য করা হয়েছে। বিয়ের ব্যাপারে বলেছে পণ্য সামগ্রীর মতো ভালো লাগলেই মেয়ের বিয়ে হবে। শরীরের গঠন দেখে বিধবা ও কুলক্ষণ নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। নারী কোনো স্বাধীন চিন্তা ও বিচরণ করতে পারবে না।[৬৪] নারীর স্বাধীনতাকে অসমীয়া সমাজে এভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে —

"ঘরত ঢেঁকী পরর ঘরে যাই।
ধান বানু বুলি কথা কহই।
ডাক বুলে সেই নারীক এর।।
যিটো নারী ফুরে হাটে ঘাটে।
তাকে এরিও কহিলো জটে।।"[৬৫]

মিতবাক ও স্বামীর প্রতি আনুগত্য থাকা নারীকে সতী বলা হয়েছে। উচ্চ হিন্দু সমাজ ছাড়া অসমীয়া কৃষিজীবী সমাজে নারীকে যে মর্যাদা দেওয়া হয় - সে ক্ষেত্রে জনজাতীয় জীবনের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। তিব্বতবর্মীদের মধ্যে নারী পুরুষ যেভাবে মাঠে কৃষিকাজ করে, তেমনি অসমীয়া কৃষিজীবী সমাজেও স্ত্রীকে ক্ষেতে ধান রোপণ, ভাত রান্না সব কাজই করতে হয়। বিয়ের ক্ষেত্রেও জনজাতীয় প্রভাবে নারীকে হরণ করে আনা, বা ধন দিয়ে মেয়েকে আনা ইত্যাদি অসমীয়া সমাজেও লক্ষিত হয়। যুবতী কালে বিয়ে দেওয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদির প্রচলন অসমীয়া সমাজে জনজাতীয় প্রভাবেরই ফল।[৬৬] আহোমদের প্রভাবে বহুবিবাহ, অসবর্ণবিবাহ, যৌতুক প্রথারও প্রচলন ছিল।[৬৭]

অসমে মুসলমান সমাজ 'কোরান শরিফে' দেওয়া নারী সম্পর্কীয় মতবাদকেই পালন করে। মুসলমান সমাজেও নারীর স্থান পুরুষের থেকে নীচে। কোরান শরিফেও পুরুষকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে কারণ নারীর ভরণ পোষণের দায়িত্ব পুরুষের। মুসলমানদের মধ্যে পুরুষ যে কোনো সময় নারীকে ত্যাগ করতে পারে ও অবাধ্যতার জন্য শাস্তিও দিতে পারে। মুসলমান সমাজের রক্ষণশীলতার আর একটি প্রমাণ পর্দাপ্রথা।[৬৮] হিন্দুদের মধ্যে শংকরদেব, মাধবদেব সমাজে নবজাগরণের সূচনা করলেও নারী জাগরণের দিক উন্মোচন করতে দেখা যায় নি। মধ্যযুগের এই দুই ধর্মনেতাকে তাঁদের ধর্মেও নারীকে গ্রহণ ও প্রচারের অধিকার দিতে দেখা যায় নি।

অসমীয়া সামন্তবাদী রক্ষণশীল সমাজ আপন সুবিধার্থে নারীকে পর্দার পেছনে রাখাকে প্রাধান্য দিয়েছে। নারীকে ক্রমাগত অন্ধকার অন্তঃপুরে ঠেলে দেওয়াকে নারী অনেক সময় স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছে, কখনোবা মেনেছে অনিচ্ছায়। রক্ষণশীল সমাজ নারী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করতে পারে নি। ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে অসমে নারী নির্যাতন অব্যাহত ছিল। তুচ্ছ কারণেও স্ত্রী বর্জনের দৃষ্টান্তও রয়েছে অসমীয়া সমাজে। এ যেন রামায়ণের রামের গর্ভবতী সীতাকে পঞ্চবটী বনে ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বঙ্গদেশে নারী কল্যাণের প্রথম সূত্রধার রামমোহন রায়ের মতো অসমেও আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন স্ত্রী শিক্ষার প্রচারের দ্বারা নারীর অবস্থানকে উন্নত করার প্রয়াস করেন। তখন স্ত্রী শিক্ষা সমাজের অনুকূল ছিল না। তাই নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে নিজের ঘরেই লেখা পড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করে তুলেন। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনের মেয়ে পদ্মাবতী উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হন। ইংরাজি শিক্ষার সমর্থনকারী আনন্দরামের মেয়ে পদ্মাবতীকে বিয়ে করার জন্য রক্ষণশীল অসমীয়া ব্রাহ্মণ সমাজ নন্দীশ্বর বরুয়াকে একঘরে করে দেয়। মনে পড়তে পারে বাংলার ইতিহাসের তুলনীয় একটি ঘটনা, মেয়েদের ইংরেজি শিক্ষাদানের জন্য একঘরে হতে হয়েছিল পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালংকারকেও।

বহু কষ্টের মধ্য দিয়ে আনন্দরাম গোঁড়া অসমীয়া সমাজে পাশ্চাত্য চিন্তা ও ভাবধারার আনয়ন করে এক নতুন চেতনা প্রবাহ অসমের সমাজে প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন সংস্কার মুক্ত একটি সুস্থ ও সুন্দর অসমীয়া সমাজ।

ঢেকিয়াল ফুকনের পর সমাজ সংস্কারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন হেমচন্দ্র বরুয়া (১৮৩৫-১৮৯৬) এবং গুণাভিরাম বরুয়া (১৮৩৭-১৮৯৪) অসমীয়া সাহিত্যের সৃজনের মধ্য দিয়ে। অসমীয়া সমাজে ধর্মের নামে চলে আসা গোঁড়ামির মূলোৎপাটন করে সংস্কারমুক্ত সুন্দর অসমীয়া সমাজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। এক্ষেত্রে গুণাভিরাম বরুয়ার 'রামনবমী' নাটক (১৮৫৭) এবং হেমচন্দ্র বরুয়ার 'কানীয়ার কীর্ত্তণ' গ্রন্থ দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইংরাজি শিক্ষায় জাত যায় এই ভয়ে রক্ষণশীল অসমীয়া সমাজ ইংরাজি শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারেনি। হেমচন্দ্র বরুয়ার বাড়ির লোক তাঁকে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণে বাধা দিলেও নিজের

চেষ্টায় ও অসমীয়া রীতি নীতিকে না মেনে মিশনারিদের সহায়তার ইংরাজি শিক্ষা লাভ করতে সমর্থ হন তিনি। যে স্ত্রী শিক্ষাকে অসমীয়া সমাজ তুচ্ছতার চোখে দেখেছে সেই শিক্ষাকেই বরণ করে 'অরুণোদয়' পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করেন।

বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পর্দা প্রথা অসমীয়া নারীর জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়। মঙ্গোলীয় সংস্কৃতি এবং জনজাতীয় প্রভাবে অন্যান্য সমাজের মতো বহু কুপ্রথা অসমীয়া সমাজকে আশ্রয় করতে পারে নি। সতীদাহ প্রথা ও পন প্রথা অসমীয়া সমাজে প্রায় ছিল না বললেই চলে। অসমীয়া সমাজে পন প্রথা পরবর্তী কালের ফসল। গুণাভিরাম বরুয়া বলেছেন "এই দেশর স্ত্রী সকল বর উদ্‌যোগী আরু পরিশ্রমী। পুরুষে সইতে প্রায় সমভাবে আর্জ্জে আৰু গৃহকার্যত লিপ্ত থাকে। সেই হেতুকে অন্যান্য দেশতকৈ এই দেশীয় স্ত্রী সকল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন।"[৬৯] প্রাচীন আর্য সমাজে বাল্যবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল না। মনুর অনুশাসন মতে 'অষ্টম বর্ষে ভবেৎ গৌরী দশম বর্ষেযু রোহিনী।' এরপর থেকে পিতৃ মাতৃ এবং অসমীয়া সমাজ ধর্মীয় পূণ্য অর্জনের আশায় বাল্য বিবাহের প্রচলন করে। বাল্যবিবাহের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে অসমীয়া নারীর জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। ফলে বাল্যবিধবা হয়ে অল্প বয়সের মেয়েদেরও কঠোর নিয়মের বন্ধনে বাঁধা পড়তে হয়েছে। এখানে উনিশ শতকের অসমীয়া ও বঙ্গীয় সমাজে সারূপ্য লক্ষ্য করা যায়।

মধ্যযুগের উচ্চবর্ণ অসমীয়া সমাজে নারী ছিল অসূর্যস্পশ্যা, পুরুষের মতো মুক্ত বিচরণের অধিকার তাদের ছিল না। তাদের পর্দার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখাই ছিল প্রচলিত রীতি। অবশ্য পর্দা প্রথা উচ্চবর্গের মধ্যে থাকলেও নিম্ন বর্গের মধ্যে ছিল না। নিম্নবর্গের নারী ছিল তুলনামূলকভাবে স্বাধীন। যে সমাজ নারীকে অন্দরমহলের অন্ধকারে দেখতে অভ্যস্ত সে সমাজে নারী শিক্ষার প্রচলন না থাকাই স্বাভাবিক। পুরনো অসমীয়া সমাজে নারীকে বিচার বুদ্ধিহীন জীবও মনে করা হত। সেখানে নারী স্বাধীনতা তো পরের কথা মানুষের মতো বেঁচে থাকার অধিকারও নারীর ছিল না। লম্বোদর বরার মতো প্রভাবশালী ব্যক্তিও স্ত্রী স্বাধীনতা ও শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। অবশ্য হেমচন্দ্র বরুয়া এবং গুণাভিরাম বরুয়ার মতো ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় অসমীয়া সমাজ ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে অনেকটাই মুক্ত হতে পেরেছিল। তাঁরা বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি দেন ও নবজাগরণের সৃষ্টি করেন। গুনাভিরাম বরুয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন ও বিধবা বিবাহ করেন। হেমচন্দ্র বরুয়াও স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনর্বিবাহ করেননি। তাঁরা শুধু সংস্কার মূলক কাজই করেন নি, নারীর অন্তরাত্মার রোদনকে সাহিত্যে রূপ দান করে নারী চেতনার প্রবাহকে ছড়িয়ে দেন। গুণাভিরাম বরুয়ার 'রামনবমী' (১৮৫৭) নাটকটি এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে তিনি নবমীর মধ্যদিয়ে একজন বিধবার অন্তর্দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়াও পরম্পরাগত রক্ষণশীল সমাজকে কটাক্ষ করে, নারীর উপর হওয়া সামাজিক অন্যায় অত্যাচারের বিরোধিতা করেন। তাঁর 'স্ত্রী স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধটি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অসমে নারীর উন্নতিকল্পে মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৬ সনে। অসম মহিলা সমিতির

সম্পাদিকা ছিলেন ক্রমে চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী, ঘনকান্তি ফুকনী, শশীপ্রভা হাজরিকা প্রমুখ বিশিষ্ট নারীগণ। ১৯২৯ সনে ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত আইন সমগ্র ভারতে নারীকে বাল্য বিবাহ জনিত অভিশাপ থেকে মুক্তি দিলে অসমেও নারী মুক্তির সুচনা হয়। সমগ্র ভারত জুড়ে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে স্ত্রীরাও যোগদানে সমর্থ হয়। স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের ফলে নারীকে উচ্চ শিক্ষা দানের জন্য রাজধানী শহর শিলং এ 'লেডি কিনি' কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে নারী মঙ্গলের জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি নিষ্পেষিত, পদদলিত, নির্যাতিত নারীর কল্যাণের ব্রত গ্রহণ করেছিল এই প্রতিষ্ঠানগুলি নারীদের সংসারের বাইরেও যে একটি জগত আছে সেটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদেরকেও রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ করে নিয়েছিল। আসামে নারীবাদী আন্দোলনে মেয়েদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান সূত্রধার হলেন চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী। 'অসম প্রাদেশিক মহিলা সমিতি'র ১৯২৯ সনের গোলাঘাট অধিবেশনে 'বাল্য বিবাহ রোধের' প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভানেত্রী ছিলেন নারায়নী সন্দিকৈ এবং মহিলাদের নেতৃত্ব দেন চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী। এই মহিলা সমিতির স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

এভাবেই নারী মুক্তি ও নারী শিক্ষা বিস্তার আন্দোলন বিশ শতকে সমগ্র অসমে বিস্তার লাভ করে। ফলে নারীর সামাজিক অবস্থান উন্নতির জন্য বহু লেখালেখি শুরু হয়। পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে বহু নারীও নিজেদের অবস্থান নিয়ে লেখালেখি করতে এগিয়ে আসেন। রজনীকান্ত বরদলৈ ১৯৩০ সনে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রহদৈ লিগিরী'তে সামন্তবাদী সমাজের বিরুদ্ধে এক স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়মনা নারীর সংগ্রামের গাথা রচনা করেন। নারীবাদী আন্দোলনের নেত্রী চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানীর 'পিতৃভিটা' (১৯৩৭) উপন্যাসেও নারীবাদ প্রকটিত হয়েছে। লেখিকা দেখিয়ে দিয়েছেন একজন কন্যা একজন পুত্রের সমান দায়িত্ব পালনে সক্ষম হতে পারে। ১৯৪৪ সনে রচিত বীণা বরুয়ার (বিরিঞ্চি কুমার বরুয়া) 'জীবনর বাটত' উপন্যাসেও সংঘাতময় নারী জীবনের ছবিই ফুটে উঠেছে। 'জীবনর বাটত' উপন্যাসটিকে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর উপর হওয়া নির্যাতনের এক মর্মস্পর্শী ও বাস্তব ছবি বলা যেতে পারে। রাধিকা মোহন গোস্বামীর 'চাকলৈয়া' (১৯৪৬) তে একটি শিক্ষিত বিধবা নারীর পুরুষ প্রধান সমাজে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও সফলতার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের 'নষ্টচন্দ্র' (১৯৬৮) নারীর জীবনে এযাবৎকালের ধারণাকে এবং পুরুষ ও পুরুষের জীবনে নারীর স্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্যের 'মৃত্যুঞ্জয়' উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবী নারীকে দেখানো হয়েছে। মামণি রয়ছম গোস্বামীর 'নীলকণ্ঠী ব্রজ'তে (১৯৭৬) অকাল বিধবা এক হিন্দু নারীর পরম্পরাগত সমাজের ধর্মীয় রক্ষণশীলতাকে অস্বীকার করার মধ্যদিয়ে নারীবাদের দিকটি ফুটে উঠেছে। 'দঁতাল হাতীর উঁয়ে খোয়া হাওদা'তে (১৯৮৮) লেখিকা উচ্চবর্ণের বালবিধবার সমস্যাকে দেখিয়েছেন। পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান ও নির্যাতন নিয়ে যে সকল মহিলারা

অসমীয়া সাহিত্যে নিজের কলমের জোরে নারীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞিঞর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসেই নারী চেতনার আভাস পাওয়া যায়। আমরা তাঁর 'অন্য জীবন', 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', 'অভিযাত্রী' উপন্যাস তিনটিকে আলোচনা করে তাঁর নারী চেতনাকে বোঝার চেষ্টা করব।

।। ৭ ।।

নিরুপমার উপন্যাসে নারী

'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' (১৯৭৯) উপন্যাসটিতে পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের দ্বারা নারীর উপর হওয়া অত্যাচারের দিকটি দেখতে পাই। এই উপন্যাসে পটেশ্বরী নামের এক নারীর জীবনে ভোগবাদী পুরুষের অত্যাচারে নেমে আসা করুণ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে। অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ার জন্যই নারীরা নির্যাতিত ও শোষিত হয়ে থাকে। এই অর্থনৈতিক অসহায়তায় পটেশ্বরীর মেয়ে সাবিত্রীকে দশ টাকার জন্য শহুরে মহাজনের ঘরে কাজে দিতে হয়। শুধু তাই নয় বড় হলে আবার সাবিত্রীকে মহাজনের বাড়ি থেকে গ্রামে পটেশ্বরীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দরিদ্র নারীর জীবনের নেমে আসা অস্থায়িত্বের উদাহরণ মেলে এই উপন্যাসে।

এক দরিদ্র কৃষকের মেয়ে পটেশ্বরী মারোয়াড়ি যুবককে ভালোবেসে তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। এই ভালোবাসাই তার জীবনের কাল হয়ে ওঠে। আগে থেকে বিবাহিত মারোয়াড়ি যুবক পূজন পটেশ্বরীকে ভোগ করে তাকে হোটেলে ফেলে পালিয়ে যায়। হোটেলের কাজ করা চবিন পটেশ্বরীর রূপে মুগ্ধ হয়, তাকে বেশ্যা হবার ভবিতব্যের থেকে মুক্তি দেয় ও ভালোবাসতে শুরু করে। চবিন পটেশ্বরীকে বিয়ে করে ও হোটেলে মালিকের ঘরে দুজনে থাকতে শুরু করে। পটেশ্বরীকে চবিনের স্ত্রী হয়ে মালিকের বাড়িতে সব কাজ করতে হয়। এত দুঃখ কষ্টেও তাদের জীবন স্বাভাবিক ভাবেই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন মালিকের কামাতুর চোখ পড়ে পটেশ্বরীর উপর। তখনই চবিন ও পটেশ্বরীর সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করে। চবিন ক্ষমতা ও সম্পত্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে পটেশ্বরীকে নিজের হাতে মালিকের কাছে তুলে দেয়। চবিন ক্ষমতার কাছে হার মানলেও তার ক্ষোভ প্রকাশ করে পটেশ্বরীর উপর, পটেশ্বরীকে প্রহারের মধ্য দিয়ে। "চবিনে এচুকত শিলর মূর্তির দরে বহুতপর থির হৈ আছিল, তার পাছত সি হঠাৎ পগলার দরে হৈ গৈছিল আরু পটেশ্বরীক গার জোরেরে লুটিয়াই লৈ উধাই মুধাই বুকুয়ে পেটে গোর শোধাই দাঁত করচি অর্ধস্ফুট মাতেরে কৈছিল 'চালী বেশ্যা রণ্ডী কর্বার - মোর ঘর জ্বলাবাক্ গেলি আইহ্ছিলি রাক্ষসিনী।'"[৭০] হোটেলের মালিকের কাছে চবিন চাকর কিন্তু পটেশ্বরীর ক্ষেত্রে মালিক চবিন ক্রমশ পটেশ্বরীকে সন্দেহ করে ও পটেশ্বরীর কোনো কথাই শোনে না।

পটেশ্বরীর জীবনে আরও দুঃখ নেমে আসে চবিনের মৃত্যুর পর তিনটা সন্তানকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসার পর। অভাবের জন্য বড় ছেলেকে মামার বাড়িতে, মেয়েকে শহরে দশ টাকায়

মালিকের বাড়িতে কাজে দিতে বাধ্য হয়। পটেশ্বরীর রূপই পটেশ্বরীর জন্য শত্রু হয়ে দাড়ায়। অভাব অনটন ও তিনটি সন্তানের জন্মের পরও পটেশ্বরীর রূপে ঘাটতি না আসায় কামাতুর পুরুষেরা তার প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে "পটেশ্বরীয়ে আগতে বহুতবার অনুভব করার দরে আকৌ নতুনকৈ অনুভব করিছিল যে দরিদ্র মানুহর কারণে রূপ বস্তুটো অভিশাপহে।"[৭১] অবশ্য অভাব ও দুশ্চিন্তায় পটেশ্বরীর চেহারায় একদিন ভাঙন ধরে এবং নিজের চেহারা আয়নায় দেখে সে ভয় পায়।

পটেশ্বরী ছেলেমেয়েদের থেকেও আশানুরূপ কোনো ফল পায় নি। পটেশ্বরী বড় ছেলে নবীনের উপর আশা করেছিল কাজ করে পরিবারের দায়িত্ব নেবে কিন্তু সেও মার আশাতে জল ঢেলে মামার বাড়ি থেকে টাকা চুরি করে একটি মেয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। মেয়ে সাবিত্রী শহর থেকে ফিরে এলে গ্রামের কাজ কর্মে অনভ্যস্ত মেয়েকে নিয়ে পটেশ্বরীকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এভাবেই পটেশ্বরীর সারা জীবন কেটে যায় পুরুষ শাসিত সমাজের দায়ভার বহন করতে করতে।

পটেশ্বরীর জীবনের মতো রেখার জীবনেও দুঃখ নেমে আসে স্বামীর বন্ধুর দ্বারা ধর্ষিত হয়ে। রেখার স্বামী শিক্ষিত হলেও ধর্ষণের দায় শুধু স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেয় ও তাদের সুখের সংসারে ফাটল ধরে ও তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। তাই অঞ্জলি বলেছে, "হিষ্ট্রি! হিষ্ট্রি! কিন্তু এই হিষ্ট্রি থাকে কেবল মাইকী মানুহরহে, পুরুষ মানুহর নেথাকে। এই পটেশ্বরীর দরেই চহরত থকা তাইর সুন্দরী রেখাদিরো হিষ্ট্রি আছে, কিন্তু রেখাদির সর্বনাশ করা মানুহজনর হ'লে কোন হিষ্ট্রি নাথাকিল, তেওঁর সুখর সংসারখন হিষ্ট্রিয়ে ধ্বংস করিব নোয়ারিল।"[৭২] রেখার স্বামী শিক্ষিত আর চবিন অশিক্ষিত হলেও রেখা ও পটেশ্বরী দুজনকেই স্বামীর অত্যাচার, সন্দেহ সহ্য করতে হয়েছে। নির্যাতনের ক্ষেত্রে সুন্দরী শিক্ষাতা রেখাদি ও গ্রামের অশিক্ষিতা সুন্দরী পটেশ্বরী যেন একই সমতলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কামাতুর পুরুষের কামনায় বিসর্জিত হয়েছে দুটি নারীর জীবন।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামেরও বহু উন্নতির আভাস রয়েছে। তার মধ্যে স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদির আভাস রয়েছে উপন্যাসটিতে পরেশ কলিতার স্ত্রীর বয়ানে। উপন্যাসে অন্য একটি চরিত্র হ'ল অঞ্জলি, পরেশ কলিতার মেয়ে। কোমল, আদর্শবাদী, অধ্যয়শীল, যুক্তিশীল, বুদ্ধিমতি, রোমান্টিক, নারীপুরুষের বৈষম্যে সজাগ একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র। পটেশ্বরীর মত নারীদের উপর হওয়া অত্যাচারের উপর সে সর্বদা সজাগ ও প্রতিবাদে উচ্চ কণ্ঠ। বাস্তব জীবনের ঘাত প্রতিঘাত তার কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। বাকপটু অঞ্জলি তর্ক করে, ব্যঙ্গ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সবাইকে প্রভাবিত করেছে উপন্যাসে।

'অন্যজীবন' (১৯৮৭) উপন্যাসটিতে পূজার বন্ধে গ্রামের ছেলে সম্প্রতি কলেজ শিক্ষক মনোজ এবং তার শহুরে শিক্ষিত স্ত্রী অণিমা কয়েকদিনের জন্য গ্রামের বাড়িতে আসে। এই কয়েকদিনের সংহত কালখণ্ডে স্বাধীনোত্তর যুগের অসমীয়া গ্রাম্য নারীর সামাজিক অবস্থান কয়েকটি

ছোট ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। গ্রামের নারীর দুঃখ কষ্ট শোচনীয় অবস্থা ও নির্যাতিত রূপ দেখে অণিমা মর্মাহত হয়। অণিমা নারীর এরূপ শোচনীয় অবস্থার জন্য পুরুষ সমাজ দায়ী বলে মনোজকে নানা প্রকার বাক্যবাণে জর্জরিত করতে থাকে। গ্রামের মেয়েদের শহরের মেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। গ্রামের মেয়েদের নদী থেকে জল ভরা, ঢেকিতে চাল কুটা, সংসারের কাজের সঙ্গে সঙ্গে মাঠের কৃষিকাজ করতে হয়। এরূপ বহু শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করেও নির্যাতিত হয়ে এসেছে গ্রামের মেয়েরা। অণিমা শহরের মেয়ে বলে শাশুড়ি তাকে কাজ করতে দেয় না ও অনেক আদর যত্ন করে। মনোজের বোন আইকনের কাছ থেকে রম্ভার দুঃখের কথা, পুতুলীর বেদনা এবং রজনী চরিত্রটির তার স্ত্রীর প্রতি করা দুর্ব্যবহার ও নারীঘটিত দোষের কথা শুনে মর্মাহত হয় অণিমা। সে বলেছে "আচলতে আমার সমাজ ব্যবস্থাত তিরোতার স্থানেই এনেকুয়া যে মতা মানুহবোরর অবচেতন মনত তিরোতার প্রতি করা অত্যাচার এটা স্বাভাবিক ঘটনা হিচাপেই পোত খাই থাকে।"[৭৩]

নিরুপমা বরগোহাঞি তাঁর উপন্যাসে নারীবাদের তাত্ত্বিক দিকটি খুব সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'অন্যজীবন' উপন্যাসে নারীর প্রতি পুরুষের উদাস মনোভাবটি লক্ষ্য করে থাকি। উপন্যাসে ছেলে মায়ের প্রতি ও স্বামীর পত্নীর প্রতি থাকা উদাসীনতার ছবি ফুটে উঠেছে। মনোজের মা রান্না করে সবাইকে খাইয়ে নিজে শেষে একটি ছোট্ট বাটিতে সামান্য ভাত আর সবগুলো তরকারি এক সঙ্গে নিয়ে খায়। এই যেন নিয়ম, কারো মনে প্রশ্ন নেই এ নিয়ে। অণিমা শাশুড়ির এই স্বল্প আহার্য দেখে ব্যথিত হয় কিন্তু মনোজের ভ্রূক্ষেপ নেই। আসলে এই হল পুরুষের চিরাচরিত ঔদাসীন্য ও অবহেলা নারীর প্রতি। উদ্ধৃত করা যাক মনোজ ও অণিমার সংলাপ —

"অণিমা ঃ তোমার বৌটিয়ে কি খায় কেতিয়াবা মন করিছানে?

মনোজ ঃ এইটো কি আচরিত কথা - সুধিছা ? বৌটিয়ে কি খায় মন করিবলগীয়া কিটো আছে? তেওঁরতো কোন বেমার আজার হোয়া নাই যে কিবা স্পেসিয়াল খাব লাগিব বা আমি তেওঁর বাবে স্পেসিয়েল খাদ্যর বন্দোবস্ত করিব লাগিব ? তেওঁ নিশ্চয় আমি যি খাওঁ তাকেই খাব পারে আরু খায়ো।

অণিমা ঃ পারে হয় কিন্তু নাখায়। কোনো মাকেই বোধহয় নাখায়, কিন্তু সেই কথালৈ জীয়েকহঁতে চকু দিলে গিরিয়েক বা পুতেকহঁতে কেতিয়াও চকু নিদিয়ে।"[৭৪]

পুরুষের অত্যাচারের আর একটি উদাহরণ পুতলীর মা রম্ভার স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে টুনটুনী নদীর জলে আত্মহত্যা করা। মার প্রতি হওয়া অত্যাচারে পুতলী হয়ে উঠেছিল পুরুষ বিদ্বেষী। পরে মার্ক্সবাদী যুবক নরেনের সন্নিধ্যে এসে তার এই ধারণার অন্ত পড়ে। পুতলীর মা রম্ভাকে একদিন পুতলীর পিতা জয়মতীকে দেওয়া শাস্তি থেকে বেশি শাস্তি দেয়েছিল — "খুরীদেউক তেওঁ জয়মতীক দিয়া শাস্তিতকৈও বেছি শাস্তি দিছিল। এবার হেনো খুরীদেউক মৈত বান্ধি পথারর পকা চপরার ওপরেদি চোঁচোরাই নিছিল।"[৭৫]

আপন অন্তরবেদনাকে সহ্য করে মেয়েদের স্বামীর বহুবিবাহ ও রক্ষিতা রাখাকে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সমাজের সমর্থনকে নিরুপমা সহ্য করেননি। সমাজে বহুবিবাহ ও রক্ষিতা রাখার প্রচলিত ধ্যানধারণাকে ফুটিয়ে তুলে নারীর প্রতি সামাজিক অবিচারকে দেখিয়ে নারীর অন্তরবেদনাকেই শুধু ফুটিয়ে তুলেন নি প্রচলিত বিধি ব্যবস্থার প্রতি লেখিকার বিরোধ ভাবও আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। রজনীর রক্ষিতা রাখা নিয়ে তার স্ত্রী প্রথম প্রথম একটু রাগ করলেও পরে মেনে নেয় ও বলে — "তথাপিও ভাগ্য ভাল যে মই লক্ষীমপুরীয়ানীর দরে সতিনী খাটিব লগা হোয়া নাই।"[৭৬]

আইকণ পুরুষতন্ত্রের এই অত্যাচারে দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ, তাই সে বিয়ে করতে চায় নি। মনোজের বড়বোন মাজনীর স্বামী লম্বোদর কর্তৃক তার উপর করা অত্যাচার আইকণকে পীড়িত করেছে। মাজনী পর পর চারটি মেয়ের জন্ম দিলে তার স্বামী পুত্র সন্তানের জন্য তার উপর অত্যাচার চালায়। মদ খেয়ে এসে অত্যাচার করা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এই ভাবেই নারী নির্যাতনের দিকটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে 'অন্যজীবন' উপন্যাসটিতে।

'অভিযাত্রী' একটি জীবন ভিত্তিক উপন্যাস। এটিতে প্রাক্‌স্বাধীনতা কালের নারীর সামাজিক অবস্থান দেখিয়ে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নারীর স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেওয়া, মহিলা সমিতি গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর বিকাশকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখিকা। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানকারী চন্দ্রপ্রভার আপন ব্যক্তিত্ব ও কর্মোদ্যমের মাধ্যমে পুরুষের সমান আসনে প্রতিষ্ঠা করার সফল প্রয়াসকে দেখানো হয়েছে। নায়িকা চন্দ্রপ্রভা নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং নারী যে পুরুষের থেকে হীন নয় তা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন তিনি। পুরুষের নারী জাতির প্রতি অবহেলাকে সর্বদা প্রতিবাদ করেছেন তিনি। তাঁর মতে নারীজাতির মানসিক দুর্বলতাই নারীকে পুরুষের থেকে পিছনে রেখেছে। "আমি নারী জাতি যে পিছ পরি আছোঁ, তার এটা কারণ এই সাহর অভাব। সাহ করিব নোয়ারিলে সকলো বিষয়তে আমি পিছ পরিয়েই থাকিব লাগিব আরু আমিতো সমাজর আধা অংশ, এই আধা অংশ যদি আগবাঢ়িব নোয়ারে, আমার সমাজখনো এখন ভরির এই দুর্বলতার বাবে লেঙেরাই লেঙেরাই আগবাঢ়িব লাগিব।"[৭৭]

চন্দ্রপ্রভা নারীকে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে বাইরে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানান। পুরুষশাসিত সমাজে মহিলাদের 'অপর' বলে দূরে সরিয়ে রাখা দেখে ক্রোধের সঙ্গে বলেন — "কিয় পুরুষসকলক সসম্মানে মুকলিভাবে বহিবলৈ দি তিরোতাসকলক অস্পৃশ্যর দরে কুদৃশ্য সৃষ্টিকারিণীর দরে চিকর আঁরত লুকাই বহিবলৈ দিয়া হৈছে? তেঁওলোক পুরুষর দরে একে আসনত বহার যোগ্য নহয় নেকি ? তেওঁলোক তিরোতা কারণে পুরুষর দরে সমমর্যাদার মানুহ নহয় নেকি? তেঁওলোকক সৃষ্টি করা ভগবানজন পুরুষক সৃষ্টি করা ভগবানতকৈ বেলেগ নেকি? হীন নেকি? কোন শাস্ত্র অনুযায়ী আপোনালোকে এনেদরে পুরুষ মহিলার মাজত বিভাজন আনি মহিলাক আপোনালোক পুরুষ সকলর স্বার্থ সিদ্ধির হীন কৌশলেরে সমাজত পদদলিত করি রাখিব বিচারিছে?"[৭৮] শুধু তাই নয়

মহিলাদের অন্দর মহল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার জন্য নারীদের প্রতি তাঁর মুক্ত আহ্বান "আপোনালোক চিকর এই পাতাল জালক ছিঙি বাহিরর মুক্ত পৃথিবীলৈ ওলাই আহক।"[৭৯]

গ্রামের প্রতিকূল পরিবেশে বহু কষ্ট স্বীকার করেও লেখাপড়া করে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবল প্রয়াস চন্দ্রপ্রভার মধ্যে লক্ষ করা যায়। পড়াশোনার মূল্য অনুভব করে নিজের বোনকে বলেছে, "কণমাই, বারিষার দিনকেইটা কষ্ট করিবই লাগিব অ', নহলে আমার পঢ়া নহয়। কষ্ট নকরিলে জীবনত ডাঙর মানুহ হ'ব নোয়ারি। তোকতো মই সদায় কৈছো, আমি যদি লেখা পঢ়া নিশিকোঁ, গাঁওর অন্য তিরীবোরর দরেই আমারো গরু পশুর জীবন হব। কেবল ঘর সরা, বাচন ধোঁয়া, কাপোর ধোঁয়া, ঢেঁকী দিয়া, ভাত রন্ধা, তাঁতবোয়া – এইবোর করি জীবনটো শেষ করি দিব নোয়ারি।"[৮০] গ্রামের কাদা জল পেরিয়ে বহু কষ্টের মধ্যেও বিদ্যা শিক্ষাকে অব্যাহত রেখেছে তারা। মহিলার সমানাধিকার কিংবা মুক্তির সোপান হিসাবে নারীশিক্ষার সম্প্রসারণ যে কত জরুরি দায়, লেখিকার মুখপাত্র স্বরূপ চরিত্রটির আবেগভরা সংলাপেই তা শ্রুতিগম্য হয়ে উঠেছে।

সারা জীবন চন্দ্রপ্রভাকে সংঘর্ষ করতে হয়েছে। দণ্ডীনাথ কলিতাকে চন্দ্রপ্রভা ভালোবেসেছে ও একটি অবৈধ সন্তানের মা হয়ছে। দণ্ডীনাথ চন্দ্রপ্রভাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেয় নি। ব্যক্তিগত জীবনে এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও চন্দ্রপ্রভা পড়াশোনা করে শিক্ষয়িত্রীর চাকরি গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হয়েছে। শুধু তাই নয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে মহিলাদের দলনেত্রীর ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। এভাবেই সারা জীবন কেটে গেছে তাঁর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

।।৮।।

আশাপূর্ণা ও নিরুপমার রচনায় নারীচিন্তা ঃ তুলনার আলোকে

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোঞি দুজনেই বিংশ শতকের লেখিকা। ভাষিক ও ভৌগোলিক পরিসর স্বতন্ত্র হলেও আশাপূর্ণা ও নিরুপমার সামজিক ও রাজনৈতিক পরিসর কম বেশি পরিমাণে একই। বিশ্বযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের রূপান্তরশীল সামাজিক ও পরিবারিক জীবনের বাস্তবতা বঙ্গীয় এবং অসমীয়া সমাজের প্রেক্ষিতে অনেকটা একই রকমের। উভয়ের প্রধান উপন্যাস সমূহের কেন্দ্রে রয়েছে স্বতন্ত্র্য সন্ধানী নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, হতাশা, স্বপ্নভঙ্গ ও উত্তরণের আলেখ্য। নারীর স্বাতন্ত্র্য সন্ধান, পুরষতান্ত্রিক সমাজ পরিবেশের 'অপর' হিসাবে নারীকে প্রত্যাখানের পরম্পরার বিরুদ্ধে দুজন লেখিকাই উচ্চকণ্ঠ। নারী পুরুষ সম্পর্কের বিন্যাসের দিক থেকে বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজ একটিকে অপরটির প্রতিবিম্ব স্বরূপ বলা চলে। আশাপূর্ণা ও নিরুপমা উভয়েই এই বিন্যাসকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অভ্যস্ত সংস্কার গুলির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

অবশ্য দুই লেখিকার অভিজ্ঞতার জগৎ স্বতন্ত্র। আশাপূর্ণার তুলনায় প্রথাবদ্ধ শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরুপমা অনেকটা এগিয়ে আছেন। আশাপূর্ণা ও নিরুপমা দুজনেই নাগরিক পরিবেশে বড় হয়েছেন।

রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে আশাপূর্ণা প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চার সুযোগ তেমন পান নি, মায়ের পরোক্ষ উৎসাহে প্রায় একক প্রয়াসে আশাপূর্ণা স্বশিক্ষিত হয়েছেন, পরবর্তীতে বিদ্যাচর্চার উৎসাহ পেয়েছেন স্বামীর কাছ থেকে। যেহেতু তিনি প্রথাবদ্ধ বিদ্যাচর্চার সুযোগ পান নি, বিদ্যালয়ে যান নি, তাই বৃহত্তর সমাজ ও পরিবেশকে জানার সুযোগ পেয়েছেন নিরুপমার থেকে কম পরিমাণে। তাই তাঁর রচনাবলীতে সংঘাত, সংঘর্ষ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রয়েছে পারিবারিক গণ্ডিতে আবদ্ধ। অপর পক্ষে নিরুপমা যেমন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন তেমনি বিভিন্ন কর্মের সুবাদে বিভিন্ন পরিবেশ থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসের নারীর সংগ্রাম শুধু পরিবারের গণ্ডিতেই আবদ্ধ থাকে নি। তাঁর চরিত্রগুলি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে।

আশাপূর্ণা ও নিরুপমা দুজনেই কলম ধরেছেন নারীর হৃদয়ের যন্ত্রণাকে ভাষা দেওয়ার তাগিদে। তাঁরা আপন কর্মে সক্ষমও হয়েছেন। যেহেতু দুই লেখিকার চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভৌগোলিক-সামাজিক পরিসর আলাদা সেদিক থেকে তাদের রচনাভঙ্গির কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা দিলেও উভয় লেখিকাই নারীর অন্তর বেদনাকে সাহিত্যে অভিব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। আশাপূর্ণা দেবী এবং নিরুপমা বরগোহাঞির অনেক উপন্যাসেই পুরুষতন্ত্রের জাতাকলে পিষ্ট নারীর আর্তনাদ ও প্রতিবাদের যুগলবন্দি আমরা শুনতে পাই। স্বল্প পরিসরের বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা' এবং নিরুপমা বরগোহাঞির 'অন্যজীবন', 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', 'অভিযাত্রী' এই উপন্যাস কটির তুলনামূলক বয়ান উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি নারীর সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে। আশাপূর্ণা দেবীর এয়ী উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা', 'বকুল কথা'র মধ্যে একটি কালগত ও কাহিনিগত ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে নারীর অবস্থাকে সময়ের সঙ্গে গেঁথে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্য আমাদের নিয়ে গেছে উনিশ শতকে। যেখানে রয়েছে কেশবচন্দ্রের গৃহে রামকৃষ্ণের আগমনের প্রসঙ্গ, আর রামমোহন গত হলেও বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমের বেঁচে থাকার কথা। বেথুন স্কুলে পড়তে গেছে সুহাস আর ভবতোষ মাষ্টার ব্রাহ্ম হয়েছে। সত্য যে মুক্তির আশা করেছিল তা কাল প্রবাহে 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের সুবর্ণর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়ে 'বকুল কথা'র বকুলের মধ্যে এসে ধরা দিয়েছে।

অপরপক্ষে নিরুপমার 'অন্যজীবন', 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', 'অভিযাত্রী' উপন্যাস তিনটি স্বাধীনতা উত্তর পর্বের আখ্যান। উপন্যাস তিনটির কাহিনির মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা না থাকলেও বিষয়গত মিল দেখতে পাওয়া যায়। উপন্যাস তিনটির মধ্যেই নারী নির্যাতনকেই বড় করে দেখা হয়েছে ছোট ছোট ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। 'অন্যজীবন' উপন্যাসটি উত্তর স্বাধীনতা পর্বের আখ্যান। ধেমাজি শিলাপাথার অঞ্চলের আশে পাশের গাঁ গঞ্জে গিয়ে পৌঁচেছে প্রব্রজিত বাঙালি আর ব্যবসায়ী মারোয়াড়ি। সময়ের এই চিহ্নে স্পষ্টতই সাম্প্রতিকের ইশারা রয়েছে। উপন্যাসে উল্লেখ রয়েছে অসমের গ্রামাঞ্চলেও গড়ে উঠছে বহু কলেজ। উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে

শতবর্ষের ব্যবধানের দরুন হয়তো সমস্যার চেহারা ভিন্ন কিন্তু পুরুষ কর্তৃক নারীর অবমাননা ও অত্যাচারের মূলগত স্বরূপ প্রায় একই।

আশাপূর্ণাকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে ধরণের কষ্ট করতে হয়েছে নিরুপমাকে সেরূপ করতে হয় নি। নিরুপমা তাঁর গৃহে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে যান। আশাপূর্ণার ঠাকুরমা পুরনো কালের মানুষ। তাঁর ধারণা ছিল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বাচাল হয় ও অকালে বিধবা হয়।[৮১] এই চরিত্রই আবার ফিরে এসেছে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের উনিশ শতকের এলোকেশী আর উনিশ ও বিশের মুক্তকেশী রূপে। আশাপূর্ণাকে প্রথাবদ্ধ বিদ্যার জন্য যে ভাবে সংঘর্ষ করতে হয়েছে একমাত্র মার একক প্রচেষ্টায় আশাপূর্ণা বিদ্যার্জন করেন। তেমনি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা সত্যও বাবার প্রশ্রয়েই বিদ্যার্জনে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য নিরুপমার 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের নায়িকা চন্দ্রপ্রভাকেও অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়ছে বিদ্যার্জনের জন্য। তখনকার অসমীয়া সমাজেও মেয়েদের বিদ্যার্জনকে তেমন ভালচোখে দেখা হত না তাই চন্দ্রপ্রভার মা বাবাকে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য গ্রামবাসীর কটু কথা শুনতে হয়েছে। সত্যর মত চন্দ্রপ্রভাও মা-বাবার প্রয়াস ও নিজের চেষ্টায় বহু বিরূপতার মধ্যেও তাঁর বিদ্যাশিক্ষাকে সম্ভব করে তুলেছেন।

নিরুপমা বরগোহাঞি বেশ কয়েকটি উপন্যাস যেমন 'তিনকন্যা' (১৯৭৮), 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' (১৯৭৯), 'অন্যজীবন' (১৯৮৭), 'চম্পাবতী' (১৯৯০) ইত্যাদিতে নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজে বিভিন্ন স্তরে নর-নারীর সম্পর্কের বিশ্লেষণ করে সমাজে নারীর স্থান, নারী স্বাধীনতা সমানাধিকার ইত্যাদি প্রশ্নে প্রতিষ্ঠানের এক সমালোচনাত্মক বয়ান হাজির করেছেন। নারীর জীবনের বিভিন্ন সমস্যা, পরাধীন জীবনের অনিবার্যতা, মানিয়ে নেওয়া আর মেনে নেওয়ার হীনমন্যতাকে তিনি সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। নারীর নিজের বিকাশ এবং সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠা, তথা সমাজে সামগ্রিকভাবে নারীর প্রতিষ্ঠার চিন্তাচর্চার মধ্য দিয়ে সমাজের তথা নারীর সামগ্রিক বিকাশের দিক নির্দেশ করেছেন নিরুপমা বরগোহাঞি। তারই পাশাপাশি তুলে ধরেছেন পারিবারিক জীবনের সমস্যা। পারিবারিক জীবনের সমস্যা নারী পুরুষ সম্পর্ক ইত্যাদি খুটিয়ে দেখে তাকে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন তিনি। এই কথাকারের মূল কাজ হ'ল কলা সম্মতভাবে কাহিনি থেকে নারীবাদের তাত্ত্বিক দিকটিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা।

অণিমা, মনোজের মার থালায় শ্বশুরের তুলনায় কম খাদ্যবস্তু দেখে নিজের মার কথা ভাবে। সবাইকে বেশি করে দিয়ে নিজের জন্য কম করে রাখা দেখে বলে — "গাওর মাক, শহরর মাক - চব একেই আত্মত্যাগী মহীয়সী নারী, যি কেবল দিবকে জানে বিচারিব নাজানে।"[৮২] মেয়েরা শুধু দিতে জানে নিতে নয় আর পুরুষ শাসিত সমাজ সেই সুযোগে নারীকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করে নিজের সুখ সুবিধাকেই নিষ্কণ্টক করে রেখেছে। এখানে নিরুপমা বরগোহাঞি তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আত্মত্যাগী নারীর রূপকে ফুটানোর চেষ্টা করেছেন যাদের প্রতি পুরুষ সদাই উদাসীন। একই সঙ্গে দেবীপ্রতিমা বা আত্মত্যাগের ও সেবার প্রতিভূ হিসাবে নারীর ভাবমূর্তি

রচনার পেছনে যে পুরুষতান্ত্রিক রাজনীতি সক্রিয়, সেই বার্তাও উপন্যাসের পর্বাবয়নে রেখেছেন নিরুপমা।

এই আধুনিক বিশ্লেষণ না থাকলেও আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসেও আমরা দেখি নারীর সুখ-দুঃখের প্রতি পুরুষের উদাসীনতা। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে যে সময়ের বর্ণনা রয়েছে তখন পুরুষ শাসিত সমাজে নারী ছিল অন্তঃপুরবাসিনী। অন্তঃপুরের বদ্ধ জীবনে পুরুষ তাকে রাখতে বেশি পছন্দ করত। সত্যর মা ভুবনেশ্বরীর প্রতি তার স্বামী রামকালীর মতো উদারমনা স্বাধীনচেতা ব্যক্তির উদাসীনতা ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’তে ধরা পড়েছে। মায়ের প্রতি সত্য নিজেও যে উদাসীন ছিল মায়ের মারা যাবার পর সে কথাটি সত্যর মনকে পীড়িত করেছে আর তার মনে পড়েছে ভীত, কুণ্ঠিত ঘুমটা আবৃত মায়ের মুখ।

রক্ষিতা রাখা উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে তেমন গর্হিত কাজ ছিল না। তাই শ্বশুর নীলাম্বর বাঁড়ুজ্জের চরিত্রপতন ও নারীর প্রতি আসক্তির জন্য সত্যর তাকে প্রণাম না করার সিদ্ধান্তে শাশুড়ি এলোকেশী থেকে পতি নবকুমার পর্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে। পুরুষের চরিত্রে এ ধরনের বিকার তখনকার সমাজে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মেনে নেওয়া হত। নিরুপমার ‘অন্যজীবন’ উপন্যাসেও আমরা রজনীর স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার ও রক্ষিতা রাখার ঘটনাকে দেখে থাকি। অসমীয়া সমাজেও এটিকে সাধারণ ব্যাপার বলেই উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রজনীর স্ত্রী প্রথম প্রথম একটু কান্নাকাটি করলেও সতীনের জ্বালা থেকে রক্ষিতা রাখার জ্বালা কম বলে এটিকে মেনে নিয়েছে। স্ত্রীর উপর অত্যাচারের দৃষ্টান্ত দুই লেখিকার রচনায়ই রয়েছে। সত্যর জটাদার বউ পেটানো তথা পুতলির মা রম্ভার উপর হওয়া অত্যাচার সমাজে নারীর অবস্থানের মানদণ্ডই সূচিত করে।

কৌলীন্য প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার জন্য নারীর দুর্গতির কথা আশাপূর্ণার ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’তে যেমন রয়েছে তেমনি নিরুপমার ‘অন্যজীবন’ উপন্যাসেও দেখতে পাওয়া যায়। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র সারদার জীবনে নেমে আসা ঘনান্ধকারের মূলে রয়েছে বহুবিবাহ প্রথা। সারদার স্বামী রাসুকে দ্বিতীয়বার পটলীর সঙ্গে বিয়ে করানো হয় পটলীর লগ্নভ্রষ্ট হবার ভয়ে। তারপর থেকেই সারদার জীবনে আসে সতিনের ঘর করার পালা। তখনকার সমাজে স্বামীকে একা ভোগ করার অধিকার কোনো স্ত্রীরই ছিল না। তাই সারদার দুঃখ অভিমানকে পাগলামি বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তার দুঃখকে বোঝার চেষ্টা করা হয় নি। ‘অন্যজীবন’ উপন্যাসেও রমাকান্তের প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীমপুরীয়ানী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ের কথা রয়েছে। দুই তিনটি বিয়ে করা যেন তখনকার অসমীয়া সমাজেও স্বাভাবিক ঘটনা। মনোজ এ সম্পর্কে অণিমাকে বলেছে – “তুমি চহরর ছোৱালী, গতিকে তার মাপকাটীরে গাঁওক বিচার করিবলৈ নাযাবাচোন, গাঁওত আগতে দুজনী - তিনিজনী বিয়া করাটো সাধারণ ঘটনা আছিল।”[৮৩] নারী হয়ে জন্ম নিলে পুরুষের অত্যাচার সহ্য করতেই হবে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। মনোজের বোন মাজনীর স্বামী লম্বোদরও মদ খেয়ে তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করেছে। কৌলীন্য প্রথা, বহুবিবাহ প্রথার ফলে বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজে নারীর জীবনে নেমে

আসা দুঃখ কষ্টের কথা সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন দুই লেখিকা।

নিরুপমার 'অন্যজীবন' উপন্যাসটির পরিসর আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র মতো বিস্তৃত নয়। মাত্র কয়েকদিনের সংহত কালখণ্ডে স্বাধীনোত্তর যুগের অসমীয়া সমাজের ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গকে স্পর্শ করে গেছে এই আখ্যান। পরিসর যেমন সংহত, আধুনিক এলিট লেখিকার ভাষাও তেমনি ইঙ্গিতময়, বহুস্বরিক। আশাপূর্ণার পৌনপুনিকতার বিপরীতে ইঙ্গিতময় স্বল্পবাচনের এক বিপ্রতীপ সৃজনশৈলীর পরিচায়ক নিরুপমার বয়ান। অবশ্য এই বৈপরীত্য শিল্প কৌশলগত। আবার পাঠকের চোখে আখ্যান দুটির সাদৃশ্য এখানে যে, দুটির বিষয়ই কম বেশি 'প্রপোগেণ্ডাধর্মী'; তবুও দুটি রচনাই শেষ পর্যন্ত উপন্যাস। ভাষাশৈলীর স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে নিয়েও, নিরুপমার 'অন্যজীবন' সম্পর্কে ড০ গোবিন্দপ্রসাদ শর্মা যা বলেছেন তা বোধ করি আশাপূর্ণার পাঠক 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' সম্পর্কেও বলতে পারেন—

"উপন্যাসখনির বিষয়বস্তুক প্রপেগাণ্ডার শারীলৈ নমাই নিনিয়াকৈ কলার মাধ্যমতে প্রকাশ করাত ইয়ার ভাষারো এটা বিশেষ অরিহণা আছে। ইয়ার ভাষা হৃদয়স্পর্শী আবেগিক ভাষা নহয় যদিও ই ফিরিঙতি ছটিওয়া বক্তৃতাধর্মী ভাষাও নহয়। ইয়ার ভাষাত ধরা পরে এক স্বাভাবিক সাবলীল গতি আরু এক যথোপযুক্ত অর্থবহতা।"[৮৪]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' সেই সময়ের কথা যে সময় সমাজে ভাঙাগড়া চলছিল নারীমুক্তি নিয়ে রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো মহাপুরুষদের প্রচেষ্টায়, তার ছোঁয়া উপন্যাসে লাগা স্বাভাবিক। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ছিল অন্তঃপুরেরই কাহিনি, সত্যবতীর মাধ্যমেই বাইরের জগতের সঙ্গে তার সংযোগ। পিঞ্জরবন্ধ পাখি যেমন মুক্ত আকাশে উড়ার জন্য, খাঁচা ভাঙার আশায় থাকে তেমনি দীর্ঘদিন থেকে অবহেলিত, অবদমিত অন্তঃপুর চারিণীগণও আপনাকে মিলিয়ে দিতে চেয়েছে নিখিল বিশ্বের আলোতে। অন্ধকার থেকে তাদের আলোর পথে যাত্রার মধ্যে রয়েছে বহু ভাঙাগড়া, ক্রন্দন, নির্যাতন ও ত্যাগের চিহ্ন।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্য, 'সুবর্ণলতা'র সুবর্ণ, 'বকুলকথা'র বকুল সবাই নারী মুক্তির বার্তা বহন করেছে নিজেকে মুক্ত করে, স্বাবলম্বী করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে, নিজেকে শিক্ষিত করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে। সত্য ও বকুল থেকে সুবর্ণর সংগ্রাম বহু কঠিন কারণ সত্যর সঙ্গে ছিল রামকালীর মত পিতা এবং বকুল পেয়েছে বহু বীরাঙ্গনার পরিশ্রমে তৈরি মসৃণ পথ ও পরিবর্তিত সমাজ মানস। কিন্তু সুবর্ণকে সংগ্রাম করতে হয়েছে স্বামী প্রবোধ, শাশুড়ি ও দেবরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ একাকী, তথাপি সে স্বপ্ন দেখেছে সংসারের গণ্ডীর বাইরের একটি মুক্ত জীবন। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুবর্ণরা ঘোষণা করেছে নীরব প্রতিবাদ। সত্যবতীও প্রতিবাদ করেছে কাশী যাত্রার মধ্য দিয়ে সংসার ত্যাগ করে, সুবর্ণ প্রতিবাদ জানিয়েছে নিজের জীবনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে। তারা সংগ্রাম করেছে, সংঘর্ষ করেছে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য, নিজের পরিসর খুঁজে পাবার জন্য, হেলে পড়লেও ভেঙে পড়েনি তারা। তারা সংঘর্ষ করেছে, বিরোধিতা করেছে পুরুষতন্ত্রের কিন্তু

কখনো ভাগ্যকে দোষ দেয় নি।

নিরুপমার 'অন্যজীবন' এর অণিমা গ্রামের নারীর দুঃখ দেখে, নির্যাতন দেখে দুঃখ পেয়েছে মনোজকে পুরুষের প্রতিনিধি ভেবে তাকে কথা শুনিয়েছে কিন্তু সত্যর মতো মুক্ত প্রতিবাদ করার সাহস তার মধ্যে দেখা যায় নি। সত্য রামকালী থেকে নীলাম্বর পর্যন্ত নিজের প্রতিবাদের পরিধি বিস্তার করে নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছে।

স্ত্রীর উপর স্বামীর অত্যাচারের এক উদাহরণ হল 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র জটাদার বউ পেটানো। আবার সেই স্বামীর সঙ্গে জটাদার বউএর ভাব দেখে সত্য বিরক্তি প্রকাশ করেছে। "খ্যাংরা মারো অমন সোয়ামীর মুখে। যে সোয়ামী লাথি মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠায় তার সঙ্গে আবার হাসি-গল্প? গলায় দিতে দড়ি জোটে না? আবার আমায় কি বলেছে জানিস? আমার সোয়ামী আমার মেরেছে - তোমায় তো মারতে যায়নি - ঠাকুরঝি?"[৮৫] এই হল অসহায় নারীর মানিয়ে নেওয়ার দিক। পুরুষের অত্যাচার, স্বামীর অত্যাচার খুব স্বাভাবিক ঘটনা হিসাবেই অত্যাচারিত নারীও মেনে নেয়। নারীর চিন্তা চেতনার জগত পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যবাদী বয়ানের দ্বারা এভাবেই গ্রস্ত হয়, নারীর চেতনা হয় পুরুষের কলোনি। গায়ত্রী চক্রবর্তী এভাবেই বলেন self's shadow হিসাবে নিম্নবর্গের নির্মাণ। এভাবেই গড়ে তোলা হয় otherদের।

বহুবিবাহ ও স্বামীর অত্যাচার নিরুপমার উপন্যাস 'অন্যজীবন' এও আমরা দেখে থাকি। স্বামীর অত্যাচারে পুতলীর মা রম্ভা আত্মহত্যা করে। আইকণ রম্ভার উপর হওয়া অত্যাচার সম্পর্কে বলতে গিয়ে পুতলীর পিতা সম্পর্কে বলেছে — "আমার সেই দদাইজন স্বাভাবিক মনর মানুহ নাছিল, তেওঁর অস্বাভাবিকতা ঘৈণীয়েকক দিয়া শাস্তি বোরতে আটাইতকৈ বেছি প্রকাশ পাইছিল। খুরীদেউকে তেওঁ জয়মতীক দিয়া শাস্তিতকৈও বেছি শাস্তি দিছিল। এবার হেনো খুরীদেউক মৈত বান্ধি পথারর পরা চপরার ওপরেদি চোঁচোরাই নিছিল।"[৮৬]

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' সুহাস ও তার মায়ের অসহায়তার পেছনেও রয়েছে পুরুষশাসিত সমাজের নারীর প্রতি দায়িত্বহীনতা। শঙ্করী নগেনকে ভালোবেসে নগেনের সঙ্গে পালিয়ে গায়। কিন্তু নগেন নিজ সন্তানের দায়িত্ব নিতে অরাজি হওয়ায় কাটোয়ার বউ মেয়েকে নিয়ে দত্ত বাড়ির পানসাজুনির কাজ নিয়েছে। শুধু তাই নয় দত্তবাড়ির ছেলেদের কুনজর থেকে মেয়েকে বাঁচানোর জন্য মেয়ে সুহাসকে বিধবার পরিচয় দিয়েছে। এখানেই ক্ষান্ত থাকেনি সে, মেয়েকে নিয়ে সিঁড়ির কোণে অস্বাস্থ্যকর ঘরে স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছে, ভালোস্বাদ থেকে মেয়েকে বঞ্চিত করে আলোচাল ও কাঁচকলা সিদ্ধ খেতে দিয়েছে।

'ইপারর ঘর সিপারর ঘর'এ পটেশ্বরীর জীবনে দুঃখের মূলে রয়েছে যুবক পূজন। পটেশ্বরী পূজনকে ভালোবেসে তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। আগে থেকে বিবাহিত পূজন পটেশ্বরীকে হোটেলে ছেড়ে চলে যায়। ফলে পটেশ্বরীর হোটেলে কাজকরা চবিনকে ইচ্ছা না থাকলেও বিয়ে করতে হয়। শুধু তাই নয় হোটেলের মালিকের কামক্ষুধাও তাকে নিবারণ করতে হয়। চবিন নিজের

হাতে মালিকের কাছে পটেশ্বরীকে তুলে দিলেও সন্দেহ বসত তাকে মারধর করে পুরুষতন্ত্রের পরিচয় দেয়।

'অভিযাত্রী' উপন্যাসে চন্দ্রপ্রভা নারী কল্যাণ ও নারী স্বাধীনতার জন্য সামগ্রিক প্রয়াস করলেও নিজের জীবনে হওয়া অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করতে তাঁকে দেখা যায় নি। দণ্ডীনাথ কলিতাকে ভালোবেসে এক অবৈধ সন্তানের জননী হয় চন্দ্রপ্রভা। দণ্ডীনাথ তাকে সামাজিকভাবে স্ত্রীর মর্যাদা না দিলেও চন্দ্রপ্রভা সবসময় সিঁথিতে সিঁদুর দিয়েছে। নিজের জীবনে দণ্ডীনাথের অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদই করেন নি। এমন কি দণ্ডীনাথ কলিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রপ্রভা চিৎকার করে কেঁদেছে ও সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছে। চন্দ্রপ্রভা যতই নারীর উন্নতির জন্য চেষ্টা করুক না কেন ভারতীয় সনাতন ধর্মে যে পত্নীর পতি ভক্তির কথা রয়েছে, তাই তার চরিত্রে ফুটে উঠেছে। চন্দ্রপ্রভা যতই মুক্ত চিন্তার নারী হয়ে অগ্রগতির দিকে যাক না কেন ভারতীয় সনাতন ধর্মের বিশ্বাস কোথাও একটা পিছুটান তৈরি করেছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি' সত্যর মধ্যেও সনাতম ধর্মের এই টানকে লক্ষ্য করা যায়। তার ব্যক্তিত্বের কাছে স্বামী নবকুমারের ব্যক্তিত্ব যতই ম্লান মনে হোক না কেন সত্যবতী স্বামীকে ভালোবেসেছে। এমনকি স্বামী নবকুমারের অসুস্থ অবস্থাতে ব্যাকুল হয়ে পড়েছে, সবার বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্রিটিশ ডাক্তার দেখিয়ে নবকুমারকে সুস্থ করে কলকাতা নিয়ে আসে। পুরুষশাসিত সমাজে নারী অসহায়, সম্বলহীন তাইতো সুবর্ণকে না চাওয়া সত্ত্বেও স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে ও আতুর ঘরের মলিন শয্যায় যেতে হয়েছে বারবার। তেমনি নিরুপায় পটেশ্বরীকে রূপ গুণহীন চবিনকে বিয়ে করে চবিনের নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়েছে।

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি দুই লেখিকাই নারীচেতনাবাদী এবং নারীর অধিকার সম্পর্কে সজাগ। দুজনেই নারীর পুরুষের সামাজিক ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন এবং প্রয়োজনে তাঁদের সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলিকে প্রতিবাদ মুখর হতেও দেখা গেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে 'অপর' হিসাবে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতাকে আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাইতো আশাপূর্ণার সত্যবতী মেয়ে মানুষ বলে অবজ্ঞা করলে ক্রুদ্ধ হয়েছে — "মেয়েমানুষ ! মেয়েমানুষ ! মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না, বানের জলে ভেসে আসে? অত যদি মেয়েমানুষ-মেয়েমানুষ করবিতো আমার সঙ্গে খেলতে আসিস নে।"[৮৭] এই সুর আমরা শুনতে পাই নিরুপমা বরগোহাঞির অভিযাত্রী উপন্যাসের নায়িকা চন্দ্রপ্রভার মুখেও ছেলেমেয়ের ব্যবধান সূচিত কথার প্রত্যুত্তর দিতে গিয়ে বোনকে বলেছে — "মতা চ'লি হ'লে ডাক্তারী পঢ়িব পায়, আপী হ'লে নাপায়? কোন ভগবানে বা বিধান দিছে? তই ডাক্তর হ'বই লাগিব, মতা মানুহবোরক দেখুয়াই দিব লাগিব যে সিহঁতে করা সকলো কাম আমিও করিব পারোঁ। আমাক কেবল সুবিধা দিব লাগে।"[৮৮]

আশাপূর্ণার নারীচরিত্র সমূহ অন্তঃপুরের বন্দিত্ব থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস চালিয়েছে।

গৃহবধু আশাপূর্ণা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন অন্তঃপুর বন্দিনী নারীর মনস্তত্বকে, বুঝতে পেয়েছিলেন পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর অবমাননাকর অবস্থানকে তাইতো 'সুবর্ণলতা'র কেন্দ্রিয় চরিত্র সুবর্ণ বলেছে — "আশ্চর্যের কি আছে? পরাধীনতার যন্ত্রণা আমরা মেয়েমানুষ বুঝবো না তো আর কে বুঝবে? আমরা যে চাকরেও চাকরাণী।"[৮৯]

মেয়েদের পরাধীনতার জ্বালা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যও মর্মে মর্মে অনুভব করেছে এবং সুবর্ণকে দেওয়া চিঠির মধ্যে মেয়েদের পরাধীনতার কথা লিখেছে। তবে আশাপূর্ণা মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তনের আশাও রেখেছেন, তাই সত্য লিখেছে – "মেয়েমানুষ মমতার বন্ধনে বন্দী, ... মায়েরা বড়ো নিরুপায় প্রাণী আর নাই, এ তথ্য বুঝিয়া ফেলিয়াই না পুরুষের গড়া সমাজ এতো সুবিধা নেয়, এতো অত্যাচার করতে সাহসী হয়। তবে এ বিশ্বাস রাখি, একদিন এদিনের অবসান হইবে। দেশের পরাধীনতা দূর হইবে, স্ত্রী জাতির পরাধীনতাও দূর হইবে।"[৯০]

অপরদিকে নিরুপমা নিজের জীবনে অন্তঃপুরের বন্দিত্বকে অনুভব করেন নি তাই আশাপূর্ণার নারীদের মতো এত গভীর করে নারী বন্দিত্বের অনুভবের মনোস্তত্বকে বিশ্লেষণ করতে দেখা যায় না তাঁকে তাঁর উপন্যাসে। তবে সমাজে নারী পুরুষের মধ্য থাকা ব্যবধান ও পুরুষশাসিত সমাজে নারীকে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মূখীন হতে হয় তার নিদর্শন পাওয়া যায় নিরুপমার রচনায়। তাইতো পটেশ্বরীর সম্পর্কে বিমলার ধারণাকে খণ্ডন করে অঞ্জলি বলেছে - "মানুহ চরিত্রবান হব লাগে - দুশ্চরিত্র হব নালাগে। কিন্তু সেই নৈতিক দায়িত্ব অকল তিরোতারো নহয়, পুরুষরো কিন্তু আমার সমাজত চরিত্রহীন পুরুষে সদায় ক্ষমা পাই আহিছে। তিরোতাই পোয়া নাই।"[৯১]

সমাজে নারীপুরুষের ব্যবধানের ফলে নারী বহু সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। আশাপূর্ণার সুবর্ণও যেমন পুরুষের সমান সুবিধার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তেমনি চন্দ্রপ্রভার মেয়ে হবার দুঃখ প্রকাশের মধ্য দিয়ে তির্যকভাবে সে ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে। আশাপূর্ণার সুবর্ণ বলেছে - "সুবর্ণ কেন ওই রাস্তায় হেঁটে যাওয়া লোকদের একজন হলো না? সুবর্ণ কেন মেয়ে হয়ে জন্মাল?"[৯২] চন্দ্রপ্রভার পিতা মেয়ে হওয়ার জন্য চন্দ্রপ্রভা ও তার বোন রজনীপ্রভার স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলে চন্দ্রপ্রভাও দুঃখ করেছে ছেলে হয়ে না জন্মানোর জন্য - "সেয়ে ধর্মেশ্বর মজুমদার হৈ জন্ম হোয়ার ভাগ্য নাই তাইর চন্দ্রপ্রিয়া মজুমদারহৈ জন্ম লোয়ার দুর্ভাগ্য হ'ল যেতিয়া ভায়েকর দরে সকলোবোর সুযোগ সুবিধাতো সমানে ভোগ করিব নোয়ারে।"[৯৩]

মেয়েদের অধিকারহীনতা ও নিরুপায় অবস্থা এবং হীন অবস্থান আশাপূর্ণা দেবীকে আঘাত হেনেছে। আশাপূর্ণা দেবী দীর্ঘসময় ব্যাপী তাঁর এয়ী উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে নারীর অন্তরবেদনাকে এত গভীর আর্তি দিয়ে প্রকাশ করেছেন যে তাঁর নারীচেতনাবোধ আমাদের নারীর বন্দিত্ব নিয়ে ভাবিয়েছে। নারীর বন্ধন দশাকে তিনি অন্তঃপুরে থেকেই অনুভব করেছেন। বাইর থেকে উঁকি মেরে দেখেন নি তাই তার অনুভব আমাদের বেশি করে স্পর্শ করেছে। আশাপূর্ণা সুবর্ণর বেদনাকে তথা তৎকালীন বন্দী নারীর বেদনা এভাবে দেখিয়েছেন – "শুধু একজন সুবর্ণলতাই নয় এমন

হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সুবর্ণলতা এমনি করে দিনে দিনে তিলে তিলে ধ্বংশ হচ্ছে? কেউ লড়াই করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে কেউ ভীরুতায় অথবা সংসার শান্তির আশায় আপন সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে পুরুষ সমাজের 'ইচ্ছার পুতুল' হয়ে বসে আছে।"[৯৪] পুরুষশাসিত সমাজে বন্দিনীদের মধ্যেই আবার কেউ মুক্তির জন্য ছট ফট করেছে, তারা অনুভব করেছে বন্দিত্বকে। তাই তারা চালিয়েছে স্রোতের বিপরীতমুখী অভিযান। ফলে তাদের জীবনে এসেছে দুঃখ কষ্টের ফল্গুধারা, বুক ভরা যন্ত্রণা। তাইতো সুবর্ণলতা স্মৃতিকথা লেখার বাসনার কথা বলতে গিয়ে আশাপূর্ণা সংবেদনশীল নারী চরিত্র সুবর্ণ সম্পর্কে জানিয়েছেন — "মেয়েমানুষ হয়েও এমন বায়না কেন তোমার সুবর্ণ, তুমি সৎ হবে, সুন্দর হবে, মহৎ হবে। ভুলে যাও কেন মেয়ে মানুষ হচ্ছে একটা হাত-পা-বাঁধা প্রাণী। মানুষ নয়, প্রাণী।"[৯৫] তিনি আরও বলেছেন — "তবু বাঁধন ছেড়ার সাধনা চলিয়ে যেতে হবে তাকে। কারণ তাঁর বিধাতা ভারী কৌতুকপ্রিয়। তাই ওই হাত-পা-বাঁধা প্রাণীমাত্র গুলোর মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকেন বুদ্ধি, চেতনা, আত্মা।"[৯৬] সুবর্ণলতার মৃত্যুর পর মেয়ে বকুলের প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়েও লেখিকা সেই বোবা যন্ত্রণাকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন - "মা! মাগো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোয় পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।........"[৯৭] তবে 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে আশাপূর্ণা দেবী সুবর্ণকে দিয়ে মেয়েদের অবজ্ঞার প্রতিশোধ নিয়েছেন। সুবর্ণ আপন যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিয়েছে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে। সুবর্ণ আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে জানিয়ে গেছে হাজার হাজার সুবর্ণর ইতিহাস তারই সঙ্গে নিয়েছে সাংসার থেকে প্রতিশোধ, স্বেচ্ছায় ডাক্তারের চিকিৎসাকে অস্বীকার করে মৃত্যুকে বরণ করে। মৃতুর আগে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়েছে সুবর্ণ। লেখিকা সুবর্ণর প্রতিশোধকে এভাবে দেখিয়েছেন – "হয়তো সুবর্ণ ওই দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে দেওয়ালের লেখা পড়ে না, লেখে সেখানে। অদৃশ্য কালিতে লিখে রাখে বঞ্চনা জর্জর পীড়িত আত্মাদের ইতিহাস। না, শুধু তার নিজের কথা নয়, লক্ষ লক্ষ আত্মার কথা। পরবর্তী কাল পড়বে ওই লেখা।"[৯৮]

অপরদিকে নিরুপমা বাইরের থেকে গ্রামের অন্তঃপুরের জীবনকে দেখেছেন। তাছাড়া নিজের জীবনেও অন্তঃপুরের বন্দিত্বকে অনুভব করেননি তিনি। কর্মজীবনেও বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে তিনি নিজেকে জড়িত রেখেছেন তাই তিনি নারীপুরুষের ব্যবধানকে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটেই অনুভব করেছেন। তাই আশাপূর্ণার মতো তাঁর রচনায় অন্তঃপুরবন্দী নারীর করুণ আর্তনাদ নেই, রয়েছে সামাজিকভাবে নারীপুরুষের ব্যবধান জনিত প্রতিবাদের ভাষা। পূর্ণ শর্মা চন্দ্রপ্রভাকে ছেলেসুলভ চরিত্র বললে 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের চন্দ্রপ্রভা প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছেন ঃ "ভগবানে মানুহ-তিরোতাক বেলেগ বেলেগ ধরনে সৃষ্টি করিছিল তেওঁর সৃষ্টিকার্য অনন্তকাল স্থায়ী হোয়ার বাবে কিন্তু তার দ্বারা তেওঁ কেতিয়াও কাকো সরু ডাঙর করা নাছিল। আপোনালোক মতা মানুহবোরেহে সুবিধা বুজি সমাজর মুখিয়াল হৈ বহিলৈ তিরোতাক শ'লঠেকত পেলাই আপনালোকর সমানে বিকাশ লাভ করার সুযোগ নিদি এই হীন অবস্থাত পেলাই রাখিছে।"[৯৯]

নগাঁও সাহিত্য সভায় মেয়েদের পর্দার পিছনে বসতে দিলে চন্দ্রপ্রভা প্রতিবাদ জানিয়েছেন নিজের বক্তৃতায় – "সেই সকলোরে ভাষাজননীক সমানে শ্রদ্ধা করার, সমানে ভালপোয়ার অধিকার নাই জানো? সেই শ্রদ্ধা আরু ভালপোয়ার কারণেই আজি নগাঁওত বহা সাহিত্য সভার এই অষ্টম অধিবেশনখনত অসমর চারিওপিনর পরা আহি পুরুষ মহিলা সমবেত হোয়া নাই জানো? তেন্তে আজির এই সভাত দেখ্‌দেখকৈ পুরুষ আরু মহিলার মাজত এনে অপমানজনক বিভাজন কিয় সৃষ্টি করা হৈছে? কিয় পুরুষসকলক সসন্মানে মুকলিভাবে বহিবলৈ দি তিরোতাসকলক অস্পৃশ্যর দরে কুদৃশ্য সৃষ্টিকারিণীর দরে চিকর আঁরত লুকাই বহিবলৈ দিয়া হৈছে? তেওঁলোক পুরুষর দরে এক আসনত বহার যোগ্য নহয় নেকি ? তেওঁলোক তিরোতা কারণে পুরুষর দরে সমমর্যাদার মানুহ নহয় নেকি?"[১০০]

আশাপূর্ণা দেবী যেভাবে পুরুষশাসিত সমাজে অন্তঃপুরের বন্ধন জর্জরিত নারী আত্মার মুক্তির জন্য আকাঙ্খা আর্তনাদ এবং প্রয়াসকে দেখিয়েছেন তেমনি বহু বাঞ্ছিত মুক্তির অপপ্রয়োগকেও প্রশ্রয় দেন নি। তাই উগ্র আধুনিকতার কুফল স্বরূপ দেখিয়েছেন সত্যভামা ও নমিতার জীবনের রোমহর্ষক পরিণতিকে। অপরদিকে নিরুপমা বরগোহাঞি অন্তঃপুরে বন্ধন জর্জরিত নারীর মুক্তির আকাঙ্খাকে না দেখিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন সমস্যা দেখিয়ে তার সমাজতাত্ত্বিক কারণ বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে সমাজে নারীর সমস্যা ও সমস্যার কারণকে দেখালেও উত্তরণের উপায়কে নির্দেশ করতে দেখা যায়নি নিরুপমাকে। তবে সম্পূর্ণ নারীবাদী উপন্যাস 'অন্যজীবন' ও 'অভিযাত্রী'তে সামাজিক নারীর পদে পদে লাঞ্ছিত হওয়া ও সমস্যাকে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তির পথের আভাসও দান করেছেন লেখিকা। নারীকে নারী রূপে নয় মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন তিনি।

নারীর অধিকার নিয়ে দুই লেখিকাই পুরুষশাসিত সমাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করলেও দুজনের একজনকেও পুরুষবিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করতে দেখা যায় নি। আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে সত্যবতী শুধু ভবতোষ মাস্টারের কাছ থেকে শিক্ষাই গ্রহণ করে নি ভবতোষ মাস্টারের দ্বারা মেয়েদের জন্য তৈরি 'সর্বমঙ্গল বিদ্যাপিঠে' শিক্ষা দান করেছে স্বামীকে না জানিয়ে। ভবতোষ মাস্টারের কথাকে আদর্শ মেনে সত্যবতী সুহাসকে বলেছে — "এই আমাদের পোড়া দেশে মেয়ে মানুষ হওয়ার অনেক জ্বালা বুঝলি? একটা সৎ কাজ করতে যাও, তাও পায়ে পায়ে বাধা, মাস্টার মশাই বলেন অন্নদানের চেয়ে বড়পুণ্য বিদ্যাদান।"[১০১] সত্যর মতো 'অন্যজীবন' এর পুতলীও পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে তবে তার সংগ্রাম ব্যক্তিগত নয়, তা সামূহিক, সাংগঠনিক, রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রণোদিত। পুতলী মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সামগ্রিকভাবে নারী কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক চেষ্টা চালিয়েছে। পুতলী প্রশ্ন তুলেছে সমাজে মেয়েদের উপরে হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সে দীক্ষিত হয়েছে মার্ক্সবাদী আদর্শে।

পুতলী তার মায়ের উপর হওয়া অত্যাচারের জন্য প্রথম প্রথম পুরুষ বিদ্বেষী হলেও

পরবর্তীতে মার্ক্সবাদী যুবক নরেনের প্রভাবে তার পুরুষ বিদ্বেষী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর মুক্তির সংগ্রামে উদারমনা পুরুষকে সঙ্গে নিয়েই আন্দোলন চালাতে হবে পুরুষকে বাদ দিয়ে নয় সেটা সে অনুভব করেছে। তাই পুতুলী অণিমাকে বলেছে — "নবৌ, মই আজিকালি তেওঁলোকক ঠিক দোষারূপ করিব নোয়ারো। আমার এই পচা ঘূণে ধরা সমাজখনরতো তেওঁলোক একো একোটা ফচল। গতিকে এই সমাজ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন নোহোয়ালৈকে আমার পুরুষ প্রধান সমাজখনর দৃষ্টিভঙ্গির সলনি নহয়। সেয়ে এতিয়া মই বোমাটো মূল কারণটোর বিরুদ্ধে যুঁজিবলৈহে সুসজ্জিত করিব ধরিছো আরু সেই যুদ্ধ পুরুষর লগত একেলগেহে করো।"[১০২] একই সুর শোনা যায় 'অন্যজীবন' উপন্যাসের অণিমার মুখেও অণিমাও অনুভব করেছে উদার মনা পুরুষকে সঙ্গে নিয়েই এই মুক্তি যুদ্ধে জয় লাভ করা সম্ভব হবে। তাই অণিমা বলেছে — "হয়, প্রথমতে মই বেছি উত্তেজিত হৈ পরিছিলো। কিন্তু গাঁওর এজনী সরু ছোয়ালীয়ে, অদ্ভুত ছোয়ালীয়ে মোক শিকাই দিলে যে পুরুষর বিরুদ্ধে অস্ত্র লৈ নহয়, পুরুষর লগত হাতত ধরাধরি করিহে পুরুষে তিরোতাক করা অত্যাচারর বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ করিব পারিব"[১০৩] পুতলীর মত সত্যবতী মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডর সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও সে কিন্তু সমস্ত পুরুষজাতিকেই তার শত্রু ভাবেনি বরং উদারমনা পুরুষ ভবতোষ দত্তকে সে তার কর্মকাণ্ডের শরিক করে তুলেছে। এভাবেই ভিন্ন প্রেক্ষিতে দুজন লেখিকাই নারীর সমানাধিকার ও মুক্তির সংগ্রামে উদারমনা যুক্তিশীল পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এভাবে দুই লেখিকাই উদার নৈতিক নারীচেতনার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

উনিশ শতাব্দীতে ইংরাজি শিক্ষা প্রসারের ফলে ইংরাজি শিক্ষিত কিছু উদারমনা পুরুষের চেষ্টায় সমাজে নানা প্রকার সংস্কার সাধন আরম্ভ হল যেমন বাল্যবিবাহ রোধ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, স্ত্রী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ইত্যাদি, যার মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশে নবজাগরণের সূচনা হয়। এই নবজাগরণের ছোঁয়া আশাপূর্ণার উপন্যাসে লক্ষিত হয়েছে। এই নবজাগ্রত ভাবনাতে ভাবিনীর বোন পুঁটিকে তার স্বামী ও শাশুড়ি হত্যা করলে সত্য ইংরাজ পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছে — "তোমাদের দেশেতো শুনি মেয়ে মানুষের অনেক মান, অনেক সন্মান। সেই চোখ খুলে দেখতে পাও না, এই হতভাগ্য দেশে মেয়ে মানুষকে অপমানের মধ্যে, কী লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলে রেখেছে? আইন করে বন্ধ করতে পার না এসব?"[১০৪] বাল্যবিবাহেও সত্যর আপত্তি। সে বলেছে — "গৌরীদান, কন্যাদান, পৃথিবীদান আর কিছুই নয়, মেয়েগুলোকে চোখমুখ ফোটবার আগেই হাড়িকাঠে গলা দিয়ে রেখে দেওয়া।"[১০৫] সত্য শুধু বাল্যবিবাহের কুফলকেই অনুভব করেনি স্বামীর কাছ থেকে মেয়ে সুবর্ণকে বাল্যবিবাহ না দেবার প্রতিশ্রুতিও নিয়েছে কিন্তু স্বামী সেই প্রতিশ্রুতি না রাখাতে প্রতিবাদে সত্য গৃহত্যাগ করেছে।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্য স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেছে তাই সে সুহাসকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে, তাকে শিক্ষয়িত্রী বানিয়েছে। সত্য মেয়ে সুবর্ণকে বলেছে – "বিদ্যেই হচ্ছে আসল, বুঝলি? মেয়ে মানুষের বিদ্যে সাধ্যি নেই বলেই তাদের কত দুর্দশা।...... তাই তাদের

হেনস্থা করে। আর যে সব মেয়ে মানুষ বিদ্যা করেছে, করতে পেরেছে, বিদূষী হয়েছে? .... কত গৌরব তাদের কত মান্য। সেই মান্য, সেই গৌরব তোরও হবে।”[১০৬]

নিরুপমার রচনায়ও নবজাগরণের ছোঁয়া দেখা দিয়েছে। ‘অভিযাত্রী’ উপন্যাসের নায়িকাকেও সত্যব্রতীর মতো স্ত্রী শিক্ষার প্রচারে প্রয়াসী হতে দেখা গেছে। চন্দ্রপ্রভা বলেছে — “সরুরে পরা মোর যি ব্রত - আমার পিছপরা নারী জাতিক শিক্ষা-দীক্ষা দি সমাজত মর্যাদা দান করার মোর পবিত্র কর্তব্য পালনর দায়িত্বর যি ব্রত, তাকতো মই জীবনর কোন অবস্থাতে পরিহার করিব নোয়ারো। জীবনর হাজার ধুমুহায়ো মোক এই আদর্শর পরা বিচলিত করিব নোয়ারে।”[১০৭] পড়াশোনা শিখে স্বাবলম্বী হওয়ার কথা দুই লেখিকার রচনাতেই রয়েছে। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’তে সুহাসকে বিয়ে দেওয়ার কথা রামকালীর কাছে সত্য বললে রামকালীও মনে মনে চেয়েছে সুহাস শিক্ষা লাভ করে নিজে উপার্জন করতে শিখুক। আবার সত্য যখন স্বামীর সংসার ত্যাগ করেছে তখন সদুকে সত্য বলেছে - “অনেক আগে সুবর্ণ যখন জন্মায়নি, পাঠশালা খুলে পড়ানো পড়ানো খেলা করতাম মনে আছে তোমার ঠাকুরঝি? আবার দেখবো সে খেলা ভুলে গেছি না মনে আছে। ...... একটা মেয়েমানুষের ভাতকাপড় চলে যাবে না তাতে?”[১০৮] ‘সুবর্ণলতা’ উপন্যাসেও পারুল মা সুবর্ণলতাকে বকুলের ব্যাপারে বলেছে - “বেশ করছো মা ওকে লেখাপড়ায় এগোচ্ছো। বিদ্যেটো করে ফেলতে পারলে তবে তো এ প্রশ্ন তোলা যাবে - মেয়ে মানুষই বা চাকরি করবে না কেন?”[১০৯]

নিরুপমা বরগোহাঞিঞর ‘অন্যজীবন’ উপন্যাসে আইকণ বলেছে — “মই বিয়া-চিয়া নকরাওঁ, মোর কারণে কোনেও চিন্তা করিব নালাগে। মেট্রিক পাছ করি মই ঘোরমরা কলেজত পঢ়িম, আমার ঘরর পরা পাঁচ মাইলহে দূরৈত, সেইখিনি খোজকাঢ়ি আহা যোয়া করিব পারিম। বি. এ. পাছ করি চাকরি করিম, নিজর ভরিত থিয় দিম। তেতিয়া আরু কালৈকো পরোয়া করিব নালাগিব। বাইদেওয়ে পঢ়া শুনা করা হলে আজিতো এনেকৈ ভুগিব নেলাগিল হেঁতেন, কেতিয়াবাই ভিনদেউক এরি থৈ আহি স্বাধীনভাবে চাকরি-বাকরি করি শান্তিত জীবন কটাব পারিলেহেঁতেন। মাইকী মানুহবোরহে খোয়া-পিন্ধার বাবে মতা মানুহর ওপরত নির্ভর করিব লগা হয়, সেইবাবেইতো মরে। ইফালে পুয়া শুই উঠার পরা রাতি শোয়ার পরলৈকো বেগারী খাটি মরোতেই যায়, মতা মানুহতকৈও বেছি সময় কাম করিব লাগে - তারতো কোন স্বীকৃতি নাই, গতিকে বাহিরত চাকরি করি ধন ঘটি নললে বা সেই তিরোতাই হেনো খোয়া পিন্ধার বাবে গিরিয়েকটোর ওপরতহে নির্ভর করিব লাগে।”[১১০]

দুই লেখিকাই আধুনিক নারীচেতনাবাদী মনোভাব দেখিয়েছেন উপন্যাসে, আবার দুই লেখিকাই রক্ষণশীল মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েছেন কিছু নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র সত্য শাশুড়ি ও স্বামীর প্রতারণার প্রতিবাদে সংসার ত্যাগ করেছে, তবে যাবার আগে স্বামীকে প্রণাম করে রক্ষণশীল মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছে। শুধু তাই নয় সে স্বামীকে বলেছে – “জীবনভোর অনেক অকথা কুকথা বলেছি তোমায়, অনেক জ্বালাতন করেছি। পারো তো মাপ করো।”[১১১]

নিরুপমার ‘অভিযাত্রী’ উপন্যাসের চন্দ্রপ্রভাও সারা জীবন দণ্ডীনাথের নামের সিঁদুর লাগিয়েছে যদিও দণ্ডীনাথ তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দেন নি।

আবার দুই লেখিকার নারী চরিত্রের মধ্যেই রয়েছে ঘর সংসারের আকাঙ্খা। ঘর সংসারের আকাঙ্খার মধ্য দিয়ে উভয় লেখিকাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন যে নারী চেতনা ঘর সংসারকে বাদ দিয়ে নয়। সুবর্ণর মা সত্যবতী প্রতিবাদ করতে গিয়ে গৃহত্যাগ করলেও ঘর-সংসারের প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেছে তাই মেয়ে সুহাসকে পড়াশোনা শিখিয়ে স্বাবলম্বী করতে চাইলেও সুহাসকে একটি ঘর দেবার স্বপ্নও সে দেখেছে, তাই বাবা রামকালীকে বলেছে - “মাটাতো চির দুঃখিনী হয়ে দুঃখ-দুঃখেই মরল। মেয়েটাও কোন দিন ঘর সংসারের মুখ দেখবে না?”[১১২] মেয়ে সুবর্ণকে সংসারের মধ্যেই পূর্ণতা সে কথা জানিয়েছে চিঠি দিয়ে - “এখানে বহু তীর্থবাসিনী ও নানান অবস্থার স্ত্রীলোকদের সংস্পর্শে আসিয়া, এবং আপন জীবন পর্যালোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, যদি সংসারের মধ্যে থাকিয়াই জীবনের সর্ববিধ উৎকর্ষ সাধন করিয়া পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়, তাহাই প্রকৃত পূর্ণতা।”[১১৩] আবার ‘বকুলকথা’ উপন্যাসেও লেখিকা অনামিকা দেবী বিয়ে না করার জন্য এলিয়েনেটেড্ অনুভব করে ঃ “একটা অদ্ভুত জীবন তাঁর না ঘরকা না ঘাটকা। এ সংসারে আছেন, কিন্তু এর সঙ্গে যেন সম্যকযোগ নাই। যেহেতু যথারীতি অন্য সংসারে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হন নি, সেই হেতু অনামিকা যেন একটা বাড়তি বস্তুর মতো এখানে চেপে বসে আছেন। আজন্মের জয়গা, তবু জন্মগত অধিকারটুকু কখন যে চলে যায়। মেয়েদের জীবনে এ একটা ভয়ঙ্কর কৌতুক।”[১১৪]

একই ভাবে নিরুপমার উপন্যাসেও নারীরা নিজের ঘরের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছে। চন্দ্রপ্রভাকেও নিজের ঘর সংসারের জন্য ব্যাকুল হতে দেখা গেছে - “অ’ - অ’ - অ’ ... মোর জীবনত আরু কোনদিনেই এখন নিজর ঘর নহ’ব ..... ঘর। কি মধুর শব্দটো। আপোন ঘর, হেঁপাহর ঘর, প্রাণর প্রিয়র লগত মিলি রচা সপোনর ঘর। অথচ প্রায় সকলো ছোয়ালীয়েই দেখোন সেই ঘর পায়, এইটোতো কোন ছোয়ালীর বাবেই অলীক স্বপ্ন নহয়? কিন্তু মোর কি অপরাধর বাবে মই সেই প্রাপ্তির পরা চির-বঞ্চিত হৈ র’ব লগা হ’লো? কিয় মোর এই একৈছ বছরীয়া জীবনটোত যৌবনর আরু প্রেমর সকলো আশা-আকাংক্ষা আরু কামনা বাসনার ওপরত অকালতে এক নিকরুণ সমাধি রচনা করা হ’ল ?”[১১৫]

বিশ শতকের প্রথমার্ধে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পাবার জন্য দেশ ব্যাপী যে আন্দোলনের জোয়ার উঠেছিল তা আশাপূর্ণা দেবীকে স্পর্শ করেছিল। তাই তার উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী যেহেতু অন্তঃপুরের ঘুলঘুলি দিয়ে সমাজকে দেখেছেন তাই তাঁর নারীচরিত্র গুলির মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনের ছোঁয়া লাগলেও চরিত্রগুলিকে সরাসরি আন্দোলনে যোগ দিতে দেখা যায় নি। তবে দেশের পরাধীনতা নারী চরিত্রগুলিকেও ভাবিয়েছে, তাইতো ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র সত্যবতী স্বপ্ন দেখেছে — “দুই ছেলে সত্যবতীর দুই দিকপাল হবে, দেশ থেকে যত অন্যায় অনাচার কুসংস্কার আর কুপ্রথা দূর করার চেষ্টায় লাগবে একজন, আর

একজন দেশ স্বাধীন করবার কাজে আত্মনিবেদন করবে।"[১১৬] 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের সুবর্ণও পরাধীনতার গ্লানিকে অনুভব করেছে। সুবর্ণ স্বাধীনতা আন্দোলনকারী স্বদেশীদের ভালোবেসেছে, সে কারো সঙ্গে বন্দে্মাতরম পাতাতে চেয়েছে। শুধু তাই নয় নিজের ঘরের ছাদে বিদেশি কাপড় জ্বালিয়েছে। বাড়ির বউ ও মেয়েদের নিয়ে স্বদেশি মেলা দেখতে গেছে এবং আগামীতে স্বদেশি মেলায় দোকান দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অপরদিকে নিরুপমা বাইরের জগত ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাঁর রাজনৈতিক চেতনা শুধু চেতনা হয়েই থাকেনি তাঁর চরিত্র চন্দ্রপ্রভাকে আমরা সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে পেয়ে যাই। চন্দ্রপ্রভা বলেছেন — "মই ভারত মাতৃর স্বাধীনতার রণত নামি পরিছোঁ। এই কামত গ্রেপ্তার আৰু নানা নির্যাতনরো সম্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি ভালকৈ জানো। কিন্তু আপনি জানেনে যে মই সেইবোর একোলৈকে ভয় নকরো।"[১১৭]

আশাপূর্ণা ও নিরুপমা দুই লেখিকাই নারীর স্বাধীনতা চেয়েছেন, নারীর স্বাবলম্বী হওয়া আশা করেছেন কিন্তু আশাপূর্ণা দেবী মার্ক্সীয় নারীচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে নারী পুরুষের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দেখাননি, যা নিরুপমার রচনায় দেখতে পাই। নিরুপমার 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসে পটেশ্বরীকে দেখা গেছে সাবিত্রী মেয়ে হওয়ার জন্য দুঃখ করতে, পটেশ্বরী আপসোস করে বলেছে — "সাবিত্রী যদি ছোয়ালী নহে ল'রা হ'লহেঁতেন অতি কমেওতো সি কুরি পঁচিশ টকা অর্জিলেহেঁতেন - কিয় যে ল'রা চাকরতকৈ ছোয়ালী চাকরণীয়ে কম দরমহা পায়। অথচ ছোয়ালী এজনীয়ে কেঁচুয়ার গু-মূত উকটা, গৃহস্থনীর মেখেলা ধোয়ারে পরা আদি করি পাগঘরর রন্ধা-বঢ়ালৈকে সকলো কামেই করে। কিন্তু কোনো লরাইতো সেই লেতেরা কামবোর নকরে অথচ সিঁহতে টকা পায় বেছি।"[১১৮] পুতলী নিজে অণিমার কাছে স্বীকার করেছে যে সে কমিউনিস্ট। সে বলেছে "মই কমউনিষ্ট তার বাবে মোমাইদেউহঁতর খুব খং।"[১১৯] তাছাড়া পুতলী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের কথাও বলেছে। সে বলেছে – "এদিনতেতো আৰু চরকার সলনি নহয় বা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা নহয়, গতিকে এই চরকারর তলতে থকালৈকে এই চরকারর পরাই মহিলার বাবে নানা সা-সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করি থাকিব লাগিব, নানা দাবী পুরণর আন্দোলন করি থাকিব লাগিব।"[১২০] এ ধরনের স্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা নির্ভীক চরিত্র নিরুপমা বরগোহাঞিঞর দ্বারাই সম্ভব হয়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণার নারীবাদী চিন্তার প্রেক্ষিতে ঈশিতা ভাদুড়ি লিখেছেন — "আজকে নারীবাদ নিয়ে চিৎকার করি আমরা। আশাপূর্ণা কিন্তু তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিমায় নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এবং স্বতন্ত্রতা প্রকাশের কথা অনেক আগেই লিখে গেছেন। সুবর্ণলতার মধ্য দিয়ে প্রশ্ন করেছেন স্ত্রী কেন শুধুমাত্র স্বামীর ভোগ্য বস্তু হবে? বদ্ধ পরিবেশে মুক্ত বাতাস আনতে চেয়েছে সে, সন্তান পালন রান্নাবান্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ নারীর জীবনে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। এ কি নারীবাদী উচ্চারণ নয়?"[১২১]

এক সাক্ষাৎকারে আশাপূর্ণা দেবী বলেছিলেন — "আমি রাজনীতি নিয়ে লিখিনি, সমাজ সেবিকাদের নিয়েও তেমন নয়। লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়ে, লিখেছি তাদের যখন অসহনীয়

অবস্থা হয়, তখন তারা ঘর ছাড়ে অথবা বর ছাড়ে। চিরদিনই ভেতরে একটা আপসহীন বিদ্রোহ ছিল, কিন্তু সেটা প্রত্যক্ষ নয়। তাকে যদি নারীমুক্তির পিপাসা বল তাহলে তাই। সেটা ব্যক্তিগত নয় সমষ্টিগত, সমাজের জন্য। আমাদের সময়ে বিদ্রোহিণী কথাটাই ছিল, নারীমুক্তি শব্দটি ছিল না।"[১২২]

অপরদিকে ড. গোবিন্দ প্রসাদ শর্মা নিরুপমা বরগোহাঞি সম্পর্কে বলেছেন — "অসমীয়া সাহিত্যত সচেতনভাবে নারীবাদী উপন্যাস রচনা করা প্রথম গরাকী ঔপন্যাসিকা নিরুপমা বরগোহাঞি। তেওঁর 'অন্যজীবন' (১৯৮৭) বিষয়বস্তু আরু কলারূপর দিশর পরা এখন উৎকৃষ্ট নারীবাদী উপন্যাস।"[১২৩] তিনি উপন্যাসের শিরোনাম সম্পর্কে বলেছেন — "আমার সমাজত নারী 'অন্য' (the other) 'আত্ম' (Self) নহয়।"[১২৪] ড. জিতেন দাস কয়েকটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে এভাবে দেখিয়েছেন — "নারীবাদী দৃষ্টির পক্ষপাতপুষ্ট ওকালতি। লিখিকার 'অন্যজীবন' উপন্যাস নারীবাদী দৃষ্টির যি নিরপেক্ষতা আলোচ্য দুই স্খলনর গল্পসমূহত প্রায়ই বর্ণিত হোয়া নাই। গল্পসমূহত পুরুষর নারীমাংসলোভী রূপটো অতি কদর্য রূপত চিত্রিত। তেওঁর 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসর নারী মাংসলোভী পুরুষবোরকে এই গল্পসমূহত আকৌ এবার লগ পোয়া যায়।"[১২৫]

বর্তমান প্রতিবেদক নিরুপমা বরগোহাঞির সঙ্গে ১৬/০৩/২০১৩ তারিখে তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে নারীবাদী লেখিকারূপে নিজেকে তিনি কত দূর সফল মনে করেন এই প্রশ্ন করলে উত্তরে তিনি বলেছেন — "মই নিজকে প্রধানকৈ মানবতাবাদী লেখিকা হিচাপে ভাবোঁ, নারীবাদ তার এটা অংশ। সমাজত এক শ্রেণীর পুরুষ আছে যি নিপীড়িত অত্যাচারিত অবদমিত কিন্তু সেই সকল পুরুষর কথাও মই লেখোঁ কিন্তু নারী সকল সেই অবহেলিত পুরুষতকৈ বেছি অবহেলিত অত্যাচারিত। এনেকে সমাজর তলর শ্রেণীর অত্যাচারিত পুরুষ সকলেও এই সুবিধা অনুসরি নারী সকলক অত্যাচার করে। গতিকে নারী সকল দেখিলোঁ সমাজত বেছি অত্যাচারিতা। সেই কারণে মই তেওঁলোকর ওপরত লেখোঁ কিন্তু মুঠতে মই সামগ্রিকভাবে সমাজত নিপীড়িত মানুহ সকলক লৈ হে লেখোঁ বাবে মই নিজকে নারীবাদী নহয় মানবতাবাদী বুলি ভাবোঁ।"[১২৬]

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি পুরুষশাসিত সমাজে নারীপুরুষের মধ্যের ব্যবধানকে তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করেছেন যদিও পরিবেশের ভিন্নতার জন্য তাদের চেতনা ও অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তেমনি প্রতিবাদের স্বরের মধ্যেও পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে। তবে দুজনেই পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অধিকারহীনতায় সোচ্চার হয়েছেন। আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি একই সময়ের তলে দাঁড়িয়ে আপন আপন ভঙ্গিতে নারীর দুঃখ কষ্টের বয়ানকে বাংলা ও অসমীয়া ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। ভাষার অমিল থাকলেও নারীর বেদনাকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে দুই লেখিকাই কোথাও কোন ঘাটতি রাখেন নি। জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য, রচনাকৌশলের ভিন্নতা সত্ত্বেও বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান চিত্রণ

ও পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচনায়, প্রান্তিকায়িতা নারীর মুক্তি অভীপ্সার উচ্চারণে আশাপূর্ণা দেবী এবং নিরুপমা বরগোহাঞিঞর উপন্যাসবিশ্ব একই সমতলে দাঁড়িয়ে যায়। নারীবাদী ভাবনার বিকাশের যে আলোচনা এই অধ্যায়ের প্রথমদিকের পরিচ্ছেদগুলিতে রয়েছে, তার ভিত্তিতে নারীবাদী ভাবুক হিসাবে আশাপূর্ণাকে উদারনৈতিক বা লিবার‍্যাল নারীবাদী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ইউরোপীয় চিন্তায় দ্বিতীয় তরঙ্গের গোড়ার দিকের জিজ্ঞাসাও তাঁর রচনায় পেয়ে যাই আমরা। অন্যদিকে নিরুপমাও লিবার‍্যাল, কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে মার্কসীয় নারীবীক্ষাবাদী করে তুলেছে। উদাহরণ সহযোগে আমরা দেখিয়েছি, গৃহশ্রমের প্রশ্ন, তার আর্থিক মূল্যায়ণ, কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের শ্রমের মূল্যের পার্থক্য এসব বিষয়কে তিনি স্পর্শ করেছেন মার্কসবাদী অবস্থান থেকেই। তবে, নির্দিষ্ট কোনো তরঙ্গ অথবা 'স্কুল'ভুক্ত করে কোনো কথাকারকে দেখানোর চেষ্টাও খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। দুটি প্রতিবেশী ভাষার দুই প্রজন্মের দুই লেখিকা (প্রজন্ম ব্যবধান আশাপূর্ণা ও নিরুপমার মধ্যে যতখানি সময়গত, তার চেয়ে বেশি মানসিকতার দিক দিয়ে) স্ব-স্ব সমাজের প্রেক্ষিতের (Context) আধারে তাদের পাঠকৃতি (text) কে স্থাপন করেছেন, তন্ময় (objective) দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, নারীর সমানাধিকার, মানুষ হিসাবে মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নিয়ে ভেবেছেন, বিকল্পের প্রস্তাব রেখেছেন। আখ্যানের অন্তর্বয়নে পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা মাত্র নয়, বৈপ্লবিক রূপান্তরের এষণাটুকুও গেঁথে রেখেছেন তাঁরা। স্বর ও সুরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এখানেই দুই লেখিকা দাঁড়ান পাশাপাশি, অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবোচ্ছ্বাসকে কনক্রিট উপলব্ধির তটে নিয়ে যায় দুই ভাষার দুই লেখিকার রচনার যুগপৎ অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা।

তথ্যসূত্র : —

১. মুখোপাধ্যায়, কনক (অনুবাদ) : 'নারীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে' (August Bebel 'Woman in the Past, Present and Futur), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্কিম চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ মার্চ ১৯৮৩, উদ্ধৃত, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

২. দেবী, মীরা : নারীবাদ, অসমীয়া সাহিত্যত নারীবাদ, লোকায়ত প্রকাশন, দিসপুর গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ গ্রন্থমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১

৩. চৌধুরী, মলয় : 'মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে', রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পা.), হাওয়া ৪৯, কল্যাণী প্রিন্টার্স, ১/২ রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা, প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ১৩

৪. মুখোপাধ্যায়, কনক (অনু.) : 'নারীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে', প্রাগুক্ত, পৃ. ২-১৪

৫. তদেব, পৃ. ৪-১৪

৬. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৪

৭. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৪

৮. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৪

৯. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৪

১০. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৪

১১. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৫

১২. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৫

১৩. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৯

১৪. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৯

১৫. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৯

১৬. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৯

১৭. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৯

১৮. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৯

১৯. Sarma, Kiran : 'Manu Samhita with Assamese Translation'. Asom Ved Vidyalaya Vedapuran, Ghy-32, প্ৰথম প্ৰকাশ ১৯৯৮, উদ্ধৃত, পৃ. IX 3

২০. দেবী, মীরা : 'অসমীয়া উপন্যাসে নারীবাদ', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

২১. ভট্টাচার্য, নন্দিতা : 'মনুর দৃষ্টিত নারী', চন্দ্রপ্রসাদ শইকীয়া সম্পাদিত 'প্রকাশ' আলোচনী, সপ্তম সংখ্যা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৪

২২. চৌধুরী, মলয় : 'মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে', রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পা.), হাওয়া ৪৯, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ২০

২৩. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ২১

২৪. মৈত্র, শেফালী : 'নৈতিকতা ও নারীবাদ', নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ২০০৩, পৃ. ৪২

২৫. চৌধুরী, মলয় : 'মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে', রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পা.), হাওয়া ৪৯, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ২৩

২৬. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ২৩

২৭. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ২৩

২৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর : 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস, ১৬ মার্কাস লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৭, উদ্ধৃত, পৃ. ১১৯

২৯. মৈত্র, শেফালী : 'ফেমিনিজম : লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল', নৈতিকতা ও নারীবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৩০. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ৪৩

৩১. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ৪৪

৩২. চৌধুরী, মলয় : 'মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে', রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পা.), হাওয়া ৪৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৩৩. মৈত্র, শেফালী : 'ফেমিনিজম : লিবারাল এবং র‍্যাডিকাল', নৈতিকতা ও নারীবাদ, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ৪৭-৪৮

৩৪. তদেব, পৃ. ৪৯

৩৫. চৌধুরী, মলয় : 'মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে', রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পা.), হাওয়া ৪৯, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ২৮

৩৬. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ২৮

৩৭. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ৩১

৩৮. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ৩২-৩৩

৩৯. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ৩৫

৪০. ভট্টাচার্য, তপোধীর : 'প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব', প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ১২৭

৪১. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ১৩৫

৪২. চৌধুরী, মলয় : 'মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে', রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পা.), হাওয়া ৪৯, প্রাগুক্ত, উদ্ধৃত, পৃ. ৩৭

৪৩. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ৩৭

৪৪. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ৩৯

৪৫. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ৫৩

৪৬. বসু, বুদ্ধদেব : 'সাহিত্যচর্চা', দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - এপ্রিল ১৯৫৪, পৃ. ১৭

৪৭. দেবী, সীতা : দেশের কাজে বাংলার মেয়ে, বঙ্গলক্ষ্মী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

৪৮. দেবী, রাসসুন্দরী : 'আমার জীবন', বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা (সম্পা.), প্রয়াস প্রকাশন, প্র. প্রকাশ ২৯শে নভেম্বর ২০০২, পৃ. ৮

৪৯. তদেব, পৃ. ১০

৫০. তদেব, পৃ. ১১

৫১. বিশ্বাস, অনুপমা (সংকলক) : 'মেয়েদের কথা মেয়েদের লেখা', বরাক নন্দিনী প্রকাশনী, অম্বিকাপট্টি, শিলচর, ২২ মে, ২০০৫, উদ্ধৃত, পৃ. ২২

৫২. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে

স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭১, পৃ. ভূমিকা

৫৩. তদেব, পৃ. ২৫

৫৪. তদেব, পৃ. ৯৮

৫৫. তদেব, পৃ. ২৪

৫৬. তদেব, পৃ. ৬৪

৫৭. তদেব, পৃ. ৪৮

৫৮. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৩, পৃ. ৪

৫৯. তদেব, পৃ. ৩৩১

৬০. তদেব, পৃ. ১২৮-২৯

৬১. তদেব, পৃ. ৩০৬

৬২. তদেব, পৃ. ৩১৭

৬৩. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৮০, পৃ. ৩১২

৬৪. দেবী, মীরা : 'অসমত নারী-মংগলর চেতনা', অসমীয়া উপন্যাসত নারীবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৬৫. তদেব, উদ্ধৃত, পৃ. ৬৫

৬৬. বরুয়া, বিরিঞ্চিকুমার : 'অসমীয়া ভাষা আরু সংস্কৃতি' (১৯৫৭) লয়ার্স বুকস্টল, গুয়াহাটী, ১৯৭২, পৃ. ৮৩

৬৭. তদেব, পৃ. ৯৩-৯৪

৬৮. দেবী, মীরা : 'অসমত নারী-মংগলর চেতনা', অসমীয়া উপন্যাসে নারীবাদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

৬৯. বরুয়া, গুণাভিরাম : 'অসম বুরঞ্জী' (১৮৮৪), অসম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটী, প্রকাশকাল ১৯৭২, পৃ. ২০৪

৭০. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাস সম্ভার (২), জ্যোতি প্রকাশন, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পৃ. ৪৬

৭১. তদেব, পৃ. ৪৬

৭২. তদেব, পৃ. ২৩

৭৩. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২১

৭৪. তদেব, পৃ. ৭০৩-০৪

৭৫. তদেব, পৃ. ৭১১

৭৬. তদেব, পৃ. ৭১৭

৭৭. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', নিরুপমা বরগোহাঞিঙর উপন্যাস সম্ভার (১), জ্যোতি প্রকাশন, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৬৩৮

৭৮. তদেব, পৃ. ৬৭৯

৭৯. তদেব, পৃ. ৬৭৯

৮০. তদেব, পৃ. ৫৮১

৮১. দেবী, আশাপূর্ণা : 'আর এক আশাপূর্ণা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৪০১, পৃ. ৩৬

৮২. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৩

৮৩. তদেব, পৃ. ৭২১

৮৪. তদেব, পৃ. ৬৮৪

৮৫. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৮৬. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭

৮৭. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৮৮. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১

৮৯. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৯০. তদেব, পৃ. ২৭৬

৯১. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ.২৫

৯২. দেবী, আশাপূর্ণা : সুবর্ণলতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৯৩. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৭

৯৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১

৯৫. তদেব, পৃ. ২৯৫

৯৬. তদেব, পৃ. ২৯৫

৯৭. তদেব, পৃ. ৩৮৪

৯৮. তদেব, পৃ. ৩৫৯

৯৯. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১৭

১০০. তদেব, পৃ. ৬৭৯

১০১. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭২

১০২. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৩-৩৪

১০৩. তদেব, পৃ. ৭৪৪

১০৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৯

১০৫. তদেব, পৃ. ৪৮৫

১০৬. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

১০৭. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৭

১০৮. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৫

১০৯. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

১১০. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৭

১১১. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৩

১১২. তদেব, পৃ. ৩৮১

১১৩. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৬

১১৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪

১১৫. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২৯

১১৬. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩

১১৭. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১২

১১৮. তদেব, 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ.৮১

১১৯. তদেব, 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮

১২০. তদেব, পৃ. ৭৩৮

১২১. ভাদুড়ী, ঈশিতা : 'আশাপূর্ণা দেবী', মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পা.), শতবর্ষের আলোকে আশাপূর্ণা দেবী, গিরি প্রিন্স সার্ভিস, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা, দশম বর্ষ যুগ্ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ২৫২

১২২. দেব, চিত্রা : সাক্ষাৎকার : আশাপূর্ণা দেবী, মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পা.), শতবর্ষের আলোকে আশাপূর্ণা দেবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭

১২৩. বরমুদৈ, আনন্দ : 'নারীবাদী সাহিত্য আরু নারীবাদী আরু অসমীয়া উপন্যাস', বরা, লক্ষ্মীনন্দন (সম্পা.), গরীয়সী, সাহিত্যপ্রকাশ, ট্রিবিউন ভবন, গুয়াহাটী, মে ২০০৯, পৃ. ২৯

১২৪. তদেব, পৃ. ২৯

১২৫. দাস, জিতেন : 'গল্পযাত্রার জয়গাথা', শইকীয়া, চন্দ্রপ্রসাদ (সম্পা.), গরীয়সী, সাহিত্য প্রকাশন, ট্রিবিউন ভবন, গুয়াহাটী, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ৯৪

১২৬. ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ১৬-০৩-২০১৩ তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায়।

<u>ষষ্ঠ অধ্যায়</u>

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাসে চরিত্রায়ণ : একটি তুলনামূলক আলোচনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞিঁর উপন্যাসে চরিত্রায়ণ : একটি তুলনামূলক আলোচনা

উপন্যাসের অন্যতম দাবি চরিত্রায়ণ। প্রথম পর্বের বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দেখা যায় লেখকেরা চরিত্র নির্মাণের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস সম্পর্কে লেখক কিংবা পাঠকদের দৃষ্টিভঙ্গির বহু পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে চরিত্র সৃষ্টিকেই উপন্যাসের প্রথম দায় বলে মনে করা হয় না। তবে আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞিঁ উভয় লেখিকাই চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞিঁকে নতুন যুগের উপন্যাস ভাবনা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত করেছে, তাই তার উপন্যাসে পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। অপরপক্ষে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসের জগৎ বহুবিচিত্র পূর্ণায়তন চরিত্র নির্মাণের সাফল্যে পাঠক সমাজের প্রিয় হয়ে উঠেছে। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আশাপূর্ণা ও নিরুপমার চরিত্র নির্মাণ কৌশল বিষয়ে আমাদের পর্যবেক্ষণ দুজন লেখিকার উপন্যাসের কতগুলি চরিত্রের আলোচনা সূত্রে নিবেদন করব।

আশাপূর্ণা দেবীর ত্রয়ী উপন্যাসের চরিত্রসমূহ :

'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা' — আশাপূর্ণা দেবীর এই ত্রয়ী উপন্যাসের কেন্দ্রে রয়েছে তিনটি নারী চরিত্র। এই তিন নারী চরিত্র শুধু নিজেদের সময়েরই প্রতিনিধিত্ব করেনি বহন করে এনেছে তিনটি যুগের নারীর মনোস্তত্বকে। সমাজে নারীর প্রতি থাকা অবমাননা ও অবহেলাকে এবং তার ফলে মনের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া দুঃখ, কষ্ট ও ক্ষোভকে দেখানোর জন্য লেখিকা সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও বকুলের মতো চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করেছেন। তবে তিনি সময়ের পরিবর্তনে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মানদণ্ড ও ধরনের পরিবর্তন ও পার্থক্যকেও দেখানোর একটি প্রয়াস চালিয়েছেন।

নারীর বিচিত্ররূপ ধরা দিয়েছে আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস বিশ্বে। কখনো এরা এসেছে কন্যারূপে, কখনো এসেছে বধূরূপে, কখনো মাতৃরূপে কখনো বা প্রেয়সীরূপে। তবে তারা যে রূপেই আসুক না কেন, সামাজিক ও সাংসারিক লাঞ্ছনা, পুরুষতন্ত্রের নিপীড়ন থেকে অব্যাহতি পায় নি। সময়ের গতিতে সাড়া না দিয়ে কেউ পশ্চাদ্গামী ছায়াকে আঁকড়ে ধরার প্রয়াসী হয় আবার কেউ সময়ের গতিতে নিজেকে মিলিয়ে দেয়। কিন্তু যারা ব্যতিক্রমী তারাই সময়ের গতি থেকে অহরহ দু কদম

আগে থাকার প্রয়াস করে, তারা চেষ্টা চালায় সময়ের গতিকে অতিক্রম করার। সময়ের গতিকে অতিক্রম করতে গিয়ে তাদের প্রতি পদে পদে সম্মুখীন হতে হয় সংঘাত ও সংঘর্ষের। আশাপূর্ণার প্রধান নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সময়ের গতিকে অতিক্রম করার প্রবল প্রয়াস লক্ষিত হয়। এই প্রয়াসেই তারা ব্যতিক্রমী চরিত্র রূপে উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। তবে বকুলের তুলনায় সত্য ও সুবর্ণর চরিত্রে সময়ের গতিকে অতিক্রম করার তাগিদ অনেক বেশি লক্ষিত হয়েছে। এই প্রবণতা তাদের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে প্রতিবাদী নারীচরিত্র রূপে। চরিত্রগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে ব্যাপারটিকে বিষদভাবে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। প্রত্যেক চরিত্রের মধ্যেই দেখা যায় প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের মূল্যসন্ধানী প্রত্যয়। সময় এবং পরিসরের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত এই ঔপন্যাসিক চরিত্রগুলিকে গতিদান করেছে।

আশাপূর্ণা দেবী সমাজ ও সময় সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন সারস্বত সাধক। তাঁর সৃষ্ট প্রধান চরিত্রগুলি তাঁরই আত্মপ্রতিকৃতি যেন। আশাপূর্ণা দেবীর সময়ে সমাজের ঘেরাটোপে নারীর প্রতিবাদী সত্তা সরব হয়ে উঠতে পারে নি, মহানগরীর জীবনের চাঞ্চল্য ও গতিশীলতার মধ্যেও মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীকে বহু অনুশাসন ও অন্তঃপুরের বন্দিদশাকে মেনে নিয়ে মুখ বুজে কাটাতে হয়েছে। নারীর অন্তরের এই বেদনাই ক্ষোভ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে নারী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। তাই নারী চরিত্রগুলি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে উঠেছে। তাই তো উপন্যাসগুলির নায়িকা বা প্রধান চরিত্র সম্পর্কে তিনি বলেছেন — "আমার সেই নিরুচ্চার প্রতিবাদগুলোই যেন এক একটি প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি হয়ে আমার কাহিনীর নায়িকা রূপে দেখা দিয়েছে।"[১] তিনি আরও বলেছেন " 'আমি'হীন লেখা কি হয়?"[২] উপন্যাস ও গল্প লেখার সময় তিনি ঘটনা, কাহিনি ও চরিত্রের মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেন এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি চরিত্রকেই প্রাধান্য দেন বলে স্বীকার করেছেন। তিনি চরিত্রই প্রথম ভাবেন বলেছেন এবং তারই সঙ্গে সংগতি রেখে ঘটনা ভাবেন। তবে তিনি বিদ্রোহিনী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন প্রতিবাদের মাধ্যম রূপেই, তাল ঠুকে বিরোধ জানাবার জন্য নয়। সাক্ষাৎকারে বিদ্রোহিনী চরিত্র সৃষ্টি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন — "সৃষ্টি করেছি প্রতিবাদ করবার মাধ্যম হিসেবেই। তবে কখনোই সে প্রতিবাদ তাল ঠুকে জানাতে চাই নি। আমাকে যেটা পীড়া দিয়েছে, যা যন্ত্রণা আর চিন্তাজর্জরিত করেছে, সেটাকে বোঝাতেই ওদের মধ্যে দিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি।"[৩] শুধু যেমন দেখেছেন, স্বভাববাদী ভঙ্গিতে তা তুলে ধরেছেন, এমন কথাই বলেছেন লেখিকা : 'যা দেখি তাই লিখি'।[৪]

তিন প্রজন্মের তিনটি নারী আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসের কেন্দ্রে অধিষ্ঠান করলেও 'বকুলকথা'য় এসে আমরা সত্যর চতুর্থ প্রজন্মের সন্ধান পাই, সুবর্ণর নাতিনী শম্পার রূপে। আশাপূর্ণার প্রধান নারী চরিত্র তিনটিই সমাজে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে নিজ সত্তার জন্য, সামাজিক ও পারিবারিক পরিসরে স্বাধিকারের জন্য সংগ্রাম চালিয়েছে। সেদিক থেকে প্রধান চরিত্রগুলিকে বিদ্রোহিনী চরিত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। তবে সময়, সমাজ ও পরিস্থিতির সাপেক্ষে সত্যবতী ও সুবর্ণর

তুলনায় বকুল চরিত্রটি একটু কম পরিমাণেই বিদ্রোহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে সত্য ও সুবর্ণর সময় পালটে গেছে, বকুল যে সময়ে দাঁড়িয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে সেই সময়ে নারীর স্বাধিকারের প্রশ্নটি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। সত্যবতী ও সুবর্ণর তুলনায় তার পথ অনেক মসৃণ। সত্যবতী ও সুবর্ণরা সংগ্রাম করে করে যে পথ তৈরি করে গেছে সে পথ দিয়েই হেঁটেছে বকুল; তাই তার পরিশ্রম হয়েছে পরিমাণে কম সত্য ও সুবর্ণর তুলনায়। তবে সত্য ও সুবর্ণর স্বপ্ন ফলবতী হয়েছে বকুলের মধ্য দিয়ে।

আশাপূর্ণার প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যেই আমরা যে শুধু বিদ্রোহিনী বা প্রতিবাদী রূপ দেখতে পাই তা নয়, অপ্রধান নারীচরিত্র যেমন সারদা ('প্রথম প্রতিশ্রুতি'), পারুল ('সুবর্ণলতা') ও শম্পা ('বকুলকথা') চরিত্রের মধ্যেও বিদ্রোহীসত্তা ফুটে উঠেছে। তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে সেই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে পুরুষতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে তাদের চাওয়া-পাওয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রকে, তারা অস্বীকার করেছে পুরুষতন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নারীর চাওয়া-পাওয়ার পরিধিকে, অমান্য করেছে প্রচলিত নিয়ম ও ধ্যানধারণাকে এবং প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে নিজেদের একান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে। তবে আশাপূর্ণা তাঁর উপন্যাসে এমন কিছু নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যাদের মানসিকতা কাজ করেছে পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহকরূপে। এ সমস্ত চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে নারীর ভাগ্যের জন্য সব সময় পুরুষই শুধু দায়ী নয় কিছু নারীও নারীর দুঃখকষ্টের জন্য সমপরিমাণে দায়ী। এ সমস্ত চরিত্রের মধ্যে রয়েছে এলোকেশী ('প্রথম প্রতিশ্রুতি'), মোক্ষদা ('প্রথম প্রতিশ্রুতি'), মুক্তকেশী ('সুবর্ণলতা')র মত চরিত্ররা।

সত্যবতী

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র নায়িকা সত্যবতী। উপন্যাসে সে এক প্রতিবাদী, বিদ্রোহিনী নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তার প্রতিবাদ ছিল ঘুণে ধরা সমাজের রীতিনীতির বিরুদ্ধে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সমস্ত ঘটনা ও চরিত্র আবর্তিত হয়েছে তাকে কেন্দ্র করেই। তবে সত্যবতীর গল্প নেওয়া হয়েছে সত্যবতীর তৃতীয় প্রজন্ম নাতিনী বকুলের খাতা থেকে। বকুল বুঝতে পেরেছে যে তাদের মত শত সহস্র বকুলরা যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছে তার পেছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। সে সংগ্রাম "বকুল-পারুলের মা দিদিমা, পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস।"[৫] সে সংগ্রামে সত্যবতীর রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। সত্যবতীর সংগ্রাম ছিল পুরুষতন্ত্রের জাঁতাকলে বন্দী মানবীসত্তার মুক্তির লড়াই। 'সমস্ত মেয়েজাতটার' মুক্তির সংগ্রাম। উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে আলোকসন্ধানী বঙ্গনারীর প্রতিনিধি হিসাবে সত্যবতীকে সৃষ্টি করেছেন লেখিকা। এই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণা নিজের প্রশ্ন ও সমালোচনাকে ভাষা দিয়েছেন। তাই চরিত্রটির মধ্যে রয়েছে তীক্ষ্নতা, বলিষ্ঠতা। সত্যবতী লেখিকার সৃষ্ট সেই চরিত্র যাকে তিনি দেখেছেন "স্বপ্নে আর কল্পনায়, মমতায় আর শ্রদ্ধায়।"[৬] বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেনের জিজ্ঞাসা এ

ক্ষেত্রে মনে পড়ে যায় —

> "এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য সমাজ আমরা কী দাসী। পৃথিবী হইতে দাস ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে শুনিতে পাই, কিন্তু আমাদের দাসত্ব গিয়াছে কি? আমরা যে পরাধীন সেই পরাধীন।"[৭]

এই পরাধীনতা আশাপূর্ণার মনকে নাড়া দিয়েছে। এই পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে দেবার জন্যই হয়তো লেখিকা উনিশ শতকীয় পটভূমিতে সত্যর মত ব্যতিক্রমী চরিত্রের অবতারণা করেছেন। সত্যর মত চরিত্ররা সমকালীন স্রোতের গতানুগতিক ধারাতে নিজেকে বাহিত না করে সমকালের গতিকে অতিক্রম করার চেষ্টা চালায়; ফলে তাদের জীবনে পদে পদে আসে সংঘাত, কিন্তু সত্য ভয় পায়নি আরও অধিক প্রাণশক্তি সঞ্চার করে অগ্রসর হয়েছে। অন্তঃপুরচারী মেয়েদের ক্রন্দন মোচনের প্রতিশ্রুতি নিয়েই যেন সত্যবতীর আবির্ভাব।

তাই তো লেখিকা বলেছেন — "আজকের বাংলাদেশের অজস্র বকুল-পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বকুল-পারুলদের মা দিদিমা, পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস। তারা সংখ্যায় অজস্র ছিল না, তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক একজন। তারা একলা এগিয়েছে। এগিয়েছে খানা ডোবা ডিঙিয়ে; পাথর ভেঙে, কাঁটাঝোপ উপড়ে। পথ কাটতে কাটতে হয়তো দিশাহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজেরই কাটা-পথের পথ জুড়ে। আবার এসেছে আর একজন; তার আরব্ধ কর্মভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। এমনি করে তৈরি হল রাস্তা।"[৮] তাছাড়াও লেখিকা সত্যবতীর কাহিনি সম্পর্কে ভূমিকায় বলেছেন — "বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা, উন্মাদনা, রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রং বদল হয় সমাজের। সমাজ মানুষের মানসিকতার। চোখ ফেললেও দেখা যায় সেখানেও অনেক সঞ্চয়। তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত। বাংলাদেশের সেই অবজ্ঞাত অন্তঃপুরের নিভৃতে প্রথম যাঁরা বহন করে এনেছেন প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর, এ গ্রন্থ সেই অনামী মেয়েদের একজনের কাহিনী।"[৯]

নিত্যানন্দপুর গ্রামের কবিরাজ রামকালী চাটুয্যে ও ভুবনেশ্বরীর একমাত্র সন্তান সত্যবতী। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা সত্যবতীকে পাই "নাকে নোলক, কানে 'সার' মাকড়ি, পায়ে ঝাঁজল-মল, বৃন্দাবনী ছাপের আটহাতি শাড়িপরা আট বছরের সত্যবতী।"[১০] পিতা রামকালী গতানুগতিক সমাজের ধারায় গৌরীদানের পুণ্য অর্জন করতে গিয়ে আট বছর বয়সেই মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দেন। তবে বিয়ের আগে শর্ত করে নেন নাবালিকা কন্যা অবস্থা অতিক্রম হলেই মেয়েকে ঘরবসত করতে স্বামীগৃহে পাঠানোর। নির্ভীক ও জেদি সত্যবতী পাড়াশুদ্ধ ছেলেমেয়েদের দলনেত্রী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। সত্যর দুরন্তপনার পেছনে ছিল পিতা রামকালীর পরোক্ষ প্রশ্রয়। ছোট থেকেই কোনো ব্যাপারে হেরে যাবার পাত্রী সে নয়। তার মধ্যে ছিল যে কোনো বস্তুকে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে

বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। তার যুক্তি ও বুদ্ধির কাছে রামকালীর মত বিচক্ষণ ব্যক্তিও হার মানতে বাধ্য হয়েছেন। সত্যর হার না মানার ব্যাপারকে লেখিকা এরূপে দেখিয়েছেন :

"হেরে যেতে একান্ত আপত্তি সত্যবতীর
কোনো ক্ষেত্রে কোথাও হার মানবে না এই পণ।।"[১১]

কোনো পরিস্থিতিতেই তার প্রতিবাদী সত্তাকে ত্যাগ করতে তাকে দেখা যায় নি, বরং প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছে সে। মেয়েমানুষ বলে মেয়েজাতটাকে কেউ অবহেলা করলে সে প্রতিবাদে মুখর হয়ে বলেছে— "মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ! মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না বানের জলে ভেসে আসে।"[১২]

পাড়াশুদ্ধ ছেলেমেয়েদের মধ্যমণি সত্য। বিধবার হেঁসেলে পান্তাভাত চাইতে যাওয়া, ছিপ দিয়ে মাছ ধরার মতো কাজ করেছে সে দ্বিধাহীনভাবে। যে সময়ে তার সমবয়সী মেয়েরা পুতুল খেলায় ব্যস্ত সে সময় সত্য বাবাকে সেঁজুতি ব্রত নিয়ে প্রশ্ন করেছে, রামকালীর মতো ব্যক্তিকেও 'মেয়ে জাতটা' সম্পর্কে আরও গভীরভাবে ভাবনার প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করিয়ে দিয়েছে। সতীন আসার ফলে সারদার অন্তরবেদনাকে বাড়িশুদ্ধ লোক বুঝতে না পারলেও ক্ষুদ্র বালিকাটি হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করতে পেরেছে এবং নিজেই দুধ ওথলাতে গিয়ে হাত পুড়ে নিয়েছে। সত্য বাবাকে বলেছে — "আমি কি আর সাধে আগুনে হাত দিয়েছি বাবা, বড় বৌয়ের মুখ চেয়েই দিয়েছি। আহা বেচারী, একেই তার সতীন-কাঁটার জ্বালা তার ওপর আবার দুধ ওথলাবার হুকুম। মানুষের প্রাণ তো।"[১৩] মেয়েদের সতীন জ্বালাকে যেভাবে সত্য অনুভব করেছিল তেমনি ছেলেদের বউ পেটানোর ব্যাপারটাকেও সে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে। পুরুষের স্ত্রীর উপর অত্যাচারকে সে অন্যান্য নারীর মত মেনে নিতে পারে নি। তাই তো যে জটাদা বউকে মেরে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিয়েছিল সেই জটাদার সঙ্গে তার বউর ভাব দেখে এবং সবকিছুকে মেনে নেওয়া দেখে সত্য বিরক্ত হয়ে বলেছে — "খ্যাংরা মারো অমন সোয়ামীর মুখে। যে সোয়ামী লাথি মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠায় তার সঙ্গে আবার হাসি গপ্‌প?"[১৪]

যে সময় মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষাকে পাপ বলে মনে করা হত সে সময়ের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সত্য ছড়া বেঁধেছে, পয়ার গেঁথেছে, তালপাতায় লেখার মত দুঃসাহসিক কাজ করে মেয়েমহলে আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। সত্যর তালপাতায় লেখা নিয়ে পাপপুণ্যর কথা বোঝাতে গেলে সে পুণ্যিকে উদ্দীপ্ত তেজের সঙ্গে প্রতিবাদের সুরে বলেছে — "মেয়েমানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ শাপমন্যি করছে তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়?"[১৫] এভাবেই লেখিকার মুখপাত্র বালিকা সত্যবতী হয়ে ওঠে আধুনিক নারীচিন্তার প্রতিভূ চরিত্র।

ধমকে সত্যকে কোন দিনই দমানো যায় নি তবে ধিক্কারে সে দমেছে। সত্যকে লেখিকা বয়সের বেশি পরিপক্ক করে সৃষ্টি করেছিলেন। সময়ের আগে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিতে

এলে এবং শাশুড়ি এলোকেশী পুত্রের দ্বিতীয় বিয়ের ভয় দেখালে পিতার ইচ্ছার বিপরীতে সত্য শ্বশুরবাড়ি যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ছোট হলেও বিয়ের পর স্বামীত্যাগী মেয়েরা যে পিতার জন্য অপমানই বহন করে আনে সেটা সে অনুভব করেছে, তাই তো সে বাবাকে বলেছে — "সমিস্যে যে প্রবল। এরপর যখন তোমাকে আমায় নিয়ে ভুগতে হবে তখন যে মরেও শান্তি পাব না। ওরা ছেলের আবার বিয়ে নাকি দেবে বলেছে। সেটা তো অপমান্যি। তুশ্চু একটা মেয়েসন্তানের জন্য কেন তোমার উঁচু মাথাটা হেঁট হবে বাবা।"[১৬] শুধু আত্মমর্যাদাবোধের দৃষ্টান্ত নয়, সত্যবতীর মধ্যে দেশকাল সম্পর্কে যে স্পষ্ট ধারণা ছিল, তাও বোঝা যায় এহেন সংলাপ থেকে। তার কথায় খানিকটা ইঁচড়ে পাকা ভাব রয়েছে। কিন্তু মনে রাখার মতো, উনিশ শতকের বাংলার মেয়েরা আজকের তুলনায় পরিপক্কই ছিল, কেননা অল্পবয়সে বিয়ে হওয়ার পরই ওঠা বসা ছিল গিন্নি বান্নি মহিলাদের সঙ্গেই। 'বড়ো' মহলে জায়গা হয়ে যেত কিশোরী বয়সেই। পাকামোটা তাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। এই ছোট্ট বিষয়টি লেখকের বাস্তববোধেরই স্মারক।

শ্বশুরবাড়িতে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সত্য যেভাবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তেমনি বেনামি চিঠিতে মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচারের কথা শুনে রামকালী মেয়েকে আনতে গেলে বাবার সঙ্গে না এসে সত্য আবার তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে এসে সত্যকে দেখে রামকালী অবাক হয়ে যান। রামকালীর ধারণা ছিল সত্য আর পাঁচটি মেয়ে থেকে একটু আলাদা কিন্তু সত্যও আর পাঁচজনের মতো নিজেকে শ্বশুরবাড়িকে আপন করে নিয়েছে এবং বাপের বাড়ির থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সত্যর মধ্যে আর সেই চাঞ্চল্য নেই, নীরবে বাবাকে প্রণাম করে কম বাক্যে নাম না ধরে নীরবে বাড়ির সবার কুশল বার্তা নেওয়া দেখে রামকালী অবাক হয়ে গেছেন।

শ্বশুরবাড়িতে এসেও সত্য তার প্রতিবাদী সত্তাকে বাদ দিতে পারে নি। তাই চুল বাঁধতে গিয়ে শাশুড়ি এলোকেশী সত্য নড়াচড়া করাতে তার পিঠে কিল মারলে সে দৃপ্ত স্বরে প্রতিবাদ করেছে "তুমি আমায় মারলে যে।"[১৭] শাশুড়ি রেগে গিয়ে সাধ মিটিয়ে মারার জন্য জ্বালানি কাঠ তুলে আনলে সত্য কেড়ে নিয়ে বলেছে — "দেখ গুরুজন আছ গুরুজনের মতন থাক, শিরোধায্যে রাখব। নচেৎ তোমার ললাটে দুঃখু আছে।"[১৮] শ্বশুর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের বাগদীপাড়ায় যাওয়া নিয়ে নবকুমারকে ধিক্কার দিয়েছে। শুধু তাই নয়, শ্বশুরের চরিত্রপতনের জন্য তাকে প্রণাম করতে অস্বীকার করেছে। শাশুড়ির নিষেধ অমান্য করে স্বামীকে ইংরাজ ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলেছে। নিজের মনোবলে শাশুড়ির অভিশাপ মাথায় নিয়ে ছেলেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে কলকাতার বাসাবাড়িতে চলে এসেছে। সেখানে এসে ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ভবতোষ মাস্টারের কাছ থেকে বিদ্যাচর্চা করেছে।

সংসারজীবনে নবকুমারকে নিয়ে সত্যর কোনো ক্ষোভ না থাকলেও পিতা রামকালীর ব্যক্তিত্বর কাছে নবকুমারকে তার নিষ্প্রভ মনে হয়েছে। নবকুমারের মুখচোরা স্বভাব, সাহস ও দৃঢ়তার অভাব,

অহেতুক সন্দেহ এবং সব কিছুকে মেনে নেবার প্রবণতা সত্যকে পীড়িত করেছে। লেখাপড়া শিখে সত্য নবকুমারের নিষেধ সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজে গিয়ে শিক্ষকতা করেছে। নবকুমার যেমন সত্যর জন্যই শহরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যলাভে সক্ষম হয়েছে তেমনি নিতাইয়ের বৌ ভাবিনীর স্বামীর সঙ্গে কলকাতায় এসে থাকার সুযোগও ঘটেছে তারই জন্যে। নিতাই সত্যকে সম্মান করে হৃদয়ের নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজার বেদিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে কারণ সত্যই নিতাইকে কুপথ থেকে সুপথে এনেছে। ভাবিনীর আট বছরের বোনের হত্যা নিয়ে যেখানে ভাবিনী নীরব থেকেছে সেখানে সত্য বিচার চেয়ে সাহেবের আদালতে গেছে। বাড়িতে পুলিশের আগমন নবকুমারকে হতবাক করেছে আর ভাবিনীকেও বিস্মিত করেছে।

কঠোর, জেদি ও স্পষ্টবাদী এই চরিত্রটির অন্তরালে যে রয়েছে এক সংবেদনশীল হৃদয় তার পরিচয় বহুবার মিলেছে উপন্যাসে। ডালের বাটি হারানোর জন্য বাড়ির কাজের ঝিকে বাড়ির সবাই গালাগালি করলে সত্য দুঃখ পেয়েছে, বাধা দিয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের প্রতি করা অবহেলার স্মৃতি তাকে পীড়িত করেছে। কাটোয়ার বউ শঙ্করীর মৃত্যুসংবাদ সত্যকে বেদনা দিয়েছে। কলকাতায় এসে কাটোয়ার বউ ও তার মেয়ে সুহাসকে পেয়ে তাদের গ্লানি থেকে বের করে আনার চেষ্টাও করেছে সত্য। এমনকি নবকুমারের বাধা না মেনে সুহাসকে নিজের কাছে রেখেছে। সুহাসকে লেখাপড়া শিখিয়ে উপযুক্ত করে তুলে বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে ভবতোষ মাস্টারের দ্বারস্থ হয়েছে সে। সদুদির দুঃখে সত্য দুঃখিত হয়েছে তবে যে স্বামী সৌদামিনীকে তাড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় পক্ষ এনেছে তার কাছে সৌদামিনীর ফিরে যাওয়াকে সত্যবতী সমর্থন করেনি বরং সৌদামিনীর স্বামী মুকুন্দ মুখুয্যেকে কটু কথাও শুনিয়েছে। সংবেদনশীলতা এবং কর্তব্যবোধই তাকে টেনে নিয়ে গেছে কলকাতা থেকে গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুরের রোগের খবর পেয়ে স্বামী ও পুত্রদের ছেড়ে মেয়েকে নিয়ে দীর্ঘ দেড় বছর শ্বশুরবাড়িতে থেকে সে শ্বশুরের সেবা করেছে। কিন্তু এলোকেশী বউ-এর গুণগুলোকে চোখে দেখেনি, স্বামীর মৃত্যুর জন্য পুত্র ও পুত্রবধূকেই দায়ী করেছে।

যে ছেলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মত মানুষ করে গড়ে তুলার জন্য সত্য কলকাতায় এসেছিল সেই ছেলেরা মার ভাবনার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারে নি। সত্য ছেলেদের শুধু চাকরির পড়া পড়াতে চায়নি। লেখাপড়া শিখে ছেলেরা মানুষের মত মানুষ হবে এটাই ছিল তার চাওয়া। সাধন ও সুবল দুজনে দুই দিকপাল হয়ে অন্যায় অনাচার কুপ্রথা দূর করবে, দেশ স্বাধীন করার কাজে লাগবে এই ছিল তার আশা। সত্যর আশা পূরণ তো দূরের কথা, দুই ছেলে সাধন ও সুবল বাবা নবকুমারের ধাঁচেই গড়ে উঠেছে। ছোট ছেলে মাকে ভালোবাসে, তার আদর্শকে সম্মান করলেও মার জেদ ও একরোখা মনোভাবকে সেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তাই সত্যবতীর সব স্বপ্ন জমে উঠেছে মেয়ে সুবর্ণকে ঘিরে। সুবর্ণ বোঝে মার মন ও মেজাজ। সত্য নিজের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দিতে চেয়েছে সুবর্ণর মধ্যে। বাবার ভুলের জন্য সত্যর জীবনে ঘটা নানা ঘটনার জন্য তার মধ্যে নীরব প্রতিবাদ থাকলেও ভাগ্যকে সে কোনদিন ধিক্কার দেয় নি, হা হুতাশও করেনি। কিন্তু শাশুড়ি এলোকেশী যখন তার সঙ্গে শত্রুতা করে সত্যকে অন্ধকারে রেখে সুবর্ণর বাল্যকালেই বিয়ে দিয়ে

দিয়েছে নবকুমারের সমর্থনে, তখন সত্য বিদীর্ণ হৃদয় নিয়ে নিজের মনের ক্ষোভকে প্রকাশ করে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়েছে কাশীযাত্রার মধ্য দিয়ে। মেয়ের সঙ্গে দেখা না করে আশীর্বাদ না করেই সত্য চলে যায়। নবকুমার বহু চেষ্টায়ও সত্যকে আটকাতে পারে নি। যাবার আগেও সে মেয়েদের কল্যাণের কথাই চিন্তা করেছে, তাই তো সে স্বামীকে বলেছে — "সাধন সরল যদি মানুষ হয়, ওরা যেন ওই বিষয়টুকু থেকে ওই ত্রিবেণীতে মেয়েদের একটু ইস্কুল খুলে দেয়। .. .. .. আর ... আর নাম দেয় যেন 'ভুবনেশ্বরী বিদ্যালয়'।[১৯]

সত্যর সংগ্রাম ছিল সমাজ ও পরিসরে মেয়েদের উপর হওয়া অন্যায়ের বিরুদ্ধে। মেয়ের বিয়েকে রুখতে না পেরে স্বামী ও শাশুড়ির অন্যায়ের প্রতিবাদ জানিয়েছে কাশীযাত্রার মধ্য দিয়ে। নবকুমার সত্যকে কথা দিয়েছিল ষোলো বছর না হলে মেয়েকে বিয়ে দিবে না কিন্তু নবকুমার কথা রাখে নি; তাই স্বামী ও সমাজের অন্ধ অনুশাসনের প্রতি বিদ্রোহ দেখিয়েছে সত্য কাশীযাত্রার মধ্য দিয়ে সংসার ত্যাগ করে, তবে যাবার পূর্বে স্বামীকে প্রণাম করে নিজের স্ত্রী ধর্মও রক্ষা করেছে। জীবনের সব প্রতিকূলতার সঙ্গেই লড়াই করেছে সত্য। লড়াই করতে করতে ক্ষত বিক্ষত হয়েছে, জীবনের শেষ প্রতিরোধটুকু করতে না পারার জ্বালায় দগ্ধ হয়েছে সে। এভাবেই আশাপূর্ণা এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যে নারী অনর্গল নাড়া দিয়েছে সনাতল কাল থেকে বেঁধে দেওয়া নারীর উপর অযৌক্তিক সামাজিক বিধানের অচলায়তনকে। সমাজের সব কুসংস্কার ও প্রথাকে ভাঙার চেষ্টা করেছে যুক্তির শানিত আয়ুধে।

সুবর্ণলতা

আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্ব 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের নায়িকা ও কেন্দ্রীয় চরিত্র সুবর্ণলতা। ডাক নাম সুবর্ণ। সত্যবতীর যথার্থ উত্তরাধিকারী রূপেই গড়ে তোলা হয়েছে সুবর্ণলতা চরিত্রটি। সুবর্ণলতার আবির্ভাব ঘটে গেছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তেই সেখানে সে নেহাৎ ছোট এবং যাকে কেন্দ্র করে মা সত্যবতীর জীবনের পালাবদল ঘটে গেছে। সুবর্ণলতার বাল্যবিবাহকে কেন্দ্র করেই সত্যবতী সংসার ত্যাগ করে কাশী যাত্রা করেছে। মাত্র নয় বছর বয়সে শিক্ষা-সংস্কারবিহীন যৌথ পরিবারের মেজবৌ এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সুবর্ণ, যেখানে রয়েছে মুক্তকেশীর কর্তৃত্ব। সুবর্ণর সংসার শুরু হয়েছে মায়ের গৃহত্যাগের অপবাদ মাথায় নিয়ে। জীবনের চাওয়া ও না-পাওয়ার যন্ত্রণায় পিঞ্জরবদ্ধ পাখির মত ছটফট করেছে সুবর্ণ সারা জীবন। লেখিকা সুবর্ণর প্রসঙ্গে বলেছেন — "প্রকৃতি কৃপণ, তাই কাউকে পাঠায় ধারালো তলওয়ার হাতে দিয়ে, কাউকে পাঠায় ভোঁতা বল্লম দিয়ে। তাই কেউ সফল সার্থক, কেউ অসফল ব্যর্থ। তবু প্রকৃতির রাজ্যে কোন কিছুই হয়তো ব্যর্থ নয়। আপাত ব্যর্থতার গ্লানি পরবর্তীকালে সঞ্চিত করে রাখে শক্তি সাহস।"[২০] আপাত ব্যর্থ হলেও সুবর্ণলতা সেই দুর্লভ মেয়েদের একজন যারা কালকে অতিক্রম করার প্রয়াস চালায়। সুবর্ণলতার মধ্যেও ছিল কালকে অতিক্রম করার প্রয়াস। কালের গতিকে অতিক্রম করার প্রয়াসে

তাদের জীবনে আসে সংঘাত, সংঘর্ষ ও ব্যর্থতা তবুও তারা এগিয়ে যায়; আপাত ব্যর্থ হলেও কালের বহমান ধারাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এগিয়ে দিয়ে যায় — এখানেই তারা সার্থক। তাই তো লেখিকা বলেছেন — "কালকে অতিক্রম করতেও থাকে বৈকি কেউ কেউ, নইলে কারা এগিয়ে দেবে সেই প্রবহমান ধারাকে? সে ধারা মাঝে মাঝেই স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। তবু এরা বর্তমানের পুজো কদাচিৎ পায়, এরা লাঞ্ছিত হয়, উপহাসিত হয়, বিরক্তি-ভাজন হয়।

এদের জন্য কাঁটার মুকুট।

এদের জন্যে জুতোর মালা।"[২১]

প্রতিবাদ-প্রতিরোধে মুখর সুবর্ণর মানবী অস্তিত্ব গোটা উপন্যাসে ক্ষতবিক্ষত হয়, কাঁটার মুকুট - জুতোর মালার উপচারে ভরে ওঠে তার প্রাপ্তির ভাঁড়ার। সুবর্ণলতা নিজের সারা জীবনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত করে গেছে পরবর্তী প্রজন্মের সম্ভাবনার দ্বার। লেখিকার ভাষায় সুবর্ণলতা বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার প্রতীক। সুবর্ণলতা মা সত্যবতীর বেশিদিন সান্নিধ্য না পেলেও সত্যর প্রতিবাদী চেতনা সুবর্ণ উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়ে গেছে। সুবর্ণর মধ্যে লক্ষিত হয়েছে সত্যর আদর্শ ও ব্যক্তিত্বর প্রভাব। মায়ের গৃহত্যাগের গ্লানিবোধে সুবর্ণ প্রথম প্রথম চুপ থাকলেও ধীরে ধীরে গ্লানিবোধ অতিক্রম করে তার প্রতিবাদী সত্তা দৃঢ়ভাবে মাথা তুলেছে। রাগ চাপতে পারে না সুবর্ণ, কথার খই ফোটে তার। প্রবোধ স্ত্রীর খোঁপা ধরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করার কথা বললে সুবর্ণর বড় বড় চোখ জ্বলে ওঠে। সে প্রতিবাদের সুরে বলে উঠেছে — "তুমি আমার চুলের মুঠি ধরলে।"[২২] মাকে সবাই গৃহত্যাগিনী, কুলত্যাগী বললে সত্য চুপ করে সহ্য করেছে, মায়ের প্রতি অভিমান করলেও রাগ করেনি।

সুবর্ণর চোখের সামনেই তৈরি হয়েছে দর্জিপাড়ার তিনমহলার বাড়িটি। নিজের ক্ষমতার উপর আস্থা ছিল সুবর্ণর তাইতো বরের কাছে আবদার করেছিল দর্জিপাড়ার বাড়িতে দক্ষিণের বারান্দার, যেখান দিয়ে আসবে আলো, ভব্যতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মুক্তপ্রবাহ। কিন্তু স্বামী প্রবোধচন্দ্র সেখানেও তাকে প্রতারণা করেছে। সুবর্ণ চেয়েছিল দর্জিপাড়ার নিস্তরঙ্গ বাড়িতে সভ্যতার তরঙ্গ আনতে, চেয়েছিল বদ্ধ ঘরে স্বেচ্ছাবন্দী প্রাণীগুলির মধ্যে আলোর সঞ্চার করতে। সে চেয়েছিল একটুকরো বারান্দা, ছাদে ওঠবার একটা সিঁড়ি। তা পায়নি সে, তবুও সে চেয়েছে অনেক কিছু, লাঞ্ছিত হয়েও চাওয়ার মধ্যে লাগাম লাগাতে পারেনি। "সুবর্ণলতা ভব্যতা চেয়েছে, সভ্যতা চেয়েছে, মানুষের মত হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সুবর্ণলতা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নারীর যোগ রাখতে চেয়েছে, দেশের কথা ভাবতে চেয়েছে, দেশের পরাধীনতার অবসান চেয়েছে।"[২৩] শ্বশুরবাড়ির লোকদের মানসিকতার সঙ্গে সুবর্ণর বিস্তর তফাৎ, তাই সারাজীবন তাদের সঙ্গে কাটানো কথা ভেবে সুবর্ণর দুঃখ হয়েছে। রেষারেষি, ঝগড়াঝাটি, স্বার্থ নিয়ে মারামারি সুবর্ণর পছন্দ নয়। সে পছন্দ করে বই পড়তে। শাশুড়ি ননদদের লুকিয়ে সুবর্ণ বই পড়েছে। তার ইচ্ছে হয় স্কুলে যেতে। মনে পড়ে যায় মায়ের কথা "তোকে আমি দাদাদের মতো পাশের পড়া পড়াবো।"[২৪] তাই আকস্মিক বিয়ে নিয়ে

দুঃখ হয় সুবর্ণর তবে পরমুহূর্তেই আত্মস্থ হয়ে সংকল্প করে এ জীবনেই মাথা তুলে দাঁড়ানোর। মুক্তকেশীর সংস্কারবিহীন সংসারেই সুবর্ণ আত্মসম্মান নিয়ে বাঁচতে চেয়েছে, চেয়েছে মুক্তির উন্মুক্ত প্রান্তর ছুতে। তা সে পায়নি তাই তার মন বলেছে "পালাবো পালাবো।"[২৫]

মায়ের সঙ্গে মেয়ের পরিপ্রেক্ষিতগত ফারাক রয়েছে কিছুটা। সত্যবতীর ছিল পিতা রামকালীর মত ব্যক্তিত্বশালী চিন্তাশীল পিতা আর সুবর্ণর ছিল ব্যক্তিত্বহীন পিতা নবকুমার ও অত্যাচারী কূপমণ্ডুক গোঁয়ার স্বামী প্রবোধচন্দ্র। স্বামী প্রবোধচন্দ্র শুধু স্ত্রীকে সন্দেহই করেছে, ভালোবাসতে পারেনি। সে শিশ্নোদরপরায়ণ মানুষ। তাই যে ভালোবাসা সুবর্ণ চেয়েছিল তা সে পায়নি। সুবর্ণকে লড়াই করতে হয়েছে স্বামী প্রবোধ এর সঙ্গে, শাশুড়ি মুক্তকেশী ও দেবরদের সঙ্গে, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার কঠোর কঠিন পরম্পরার সঙ্গে। স্বামী প্রবোধের কাছে বার বার আঘাত পেলেও স্বামীকে সে ত্যাগ করতে পারে নি। না চেয়েও বার বার তাকে আঁতুড় ঘরের মলিন শয্যায় যেতে হয়েছে। স্বামীর কাছ থেকে অপমানিত হয়েছে, সে তর্ক করেছে স্বামীর সঙ্গে, কিন্তু আবার সমঝোতাও করে নিয়েছে। নিজের জিদে টিকে থাকতে পারে নি সে। কপট, বোধহীন প্রবোধের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে নি সুবর্ণ, তাই বিধ্বস্ত হয়েছে তাদের দাম্পত্য জীবন। সে তর্ক করেছে কিন্তু তোয়াজ করতে শিখেনি।

তার্কিক সুবর্ণ চিন্তা করেছে বাড়ির সবার জন্য, নিজের কথা কখনও একা ভাবেনি। শাশুড়ি মুক্তকেশী, বড়জা উমাশশী ও বাড়ির অন্যান্য শিশুদের প্রতি তাকে সচেতন থাকতেই দেখা গেছে তাকে। সুবর্ণর উদার মনের পরিচয় অত্যাচারী স্বামী প্রবোধের চোখেও ধরা পড়েছে। জামাকাপড় ধুতে গেলে বাড়ি সুদ্ধ সবার বিছানার ওয়াড় খুলে ধুয়ে দিয়েছে। নিজের ছেলেরা জিনিসের বায়না করলে বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের জন্য জিনিস এনেছে। বাড়ি সুদ্ধ সবাইকে ভোজ খাইয়েছে। আর পাঁচটি মেয়ের মতো সারাদিন রান্নাঘরে ঢুকে থাকা, মেয়েলি গল্প করাতে তার আপত্তি। সই পাতানোতে সে অনিচ্ছুক তার রুচি বন্দেমাতরম্ পাতানোয়। শ্বশুরবাড়িতে এসে সুবর্ণ বহু নীতিনিয়মের সংস্কার সাধন করেছে। বাড়িতে খবরের কাগজ আনার ব্যবস্থা করেছে, বাড়ির মেয়েগুলোকে সুদ্ধ পড়াতে বসিয়েছে। বাড়িতেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুল বসিয়েছে, তাদের কবিতা মুখস্থ করিয়েছে। নিজের বইপড়ার নেশাকে চরিতার্থ করার জন্য দুপুরবেলার সময়টুকু এবং অপ্রয়োজনে ফেলে রাখা নোংরা ঘরটাকে বেছে নিয়েছে সে।

সুবর্ণ শুধু মেয়েদের পরাধীনতার কথাই ভাবেনি, দেশের পরাধীনতাও তার মনকে নাড়া দিয়েছে। নিজের মানস কল্পনায় সে ঘুরে বেড়িয়েছে স্বদেশি করা মহাপুরুষদের দরজায় দরজায়। সুবর্ণ ভালোবেসেছে সেসব স্বদেশী ছেলেদের যারা দেশের কাজে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে চলে। সে ভালোবেসেছে স্বদেশী অম্বিকাকে। বাড়ির কাজের মেয়ে হরিদাসীর বিলিতি কাপড় বর্জন তাকে উত্তেজিত করেছে। সুবর্ণ স্বদেশিয়ানায় মেতে ওঠে বলেছে — "এবারে বিলিতি কাপড় আনা হবে না। জোলা তাঁতির জেলে গামছা কাপড় তার চেয়ে ভাল।"[২৬] ছাদের উপর বিদেশি পুজোর

কাপড়গুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। দুখানি গাড়ি ভাড়া করে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়াকে ভেদ করে বাড়িশুদ্ধ ছেলে মেয়ে ও ননদ বিরাজকে নিয়ে স্বদেশি মেলা দেখতে গেছে। সেখান থেকে স্বদেশি জিনিস কিনে এনেছে। এখানেই ক্ষান্ত থাকে নি সে, আগামী মেলাতে নিজে দোকান দেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছে।

সুবর্ণলতার সংবেদনশীলতা ও কোমল হৃদয়ের পরিচয় রয়েছে উপন্যাসে অনেক জায়গায়। বিরাজের বিয়েতে নিজের গহনা দিতে দ্বিধাবোধ করেনি সুবর্ণ। এক্ষেত্রে স্বামীর পরামর্শ ও অনুমতির অপেক্ষা করেনি সে। মুক্তকেশীর যৌথ পরিবার ছেড়ে এলেও শাশুড়িকে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছে। শাশুড়ি সুবর্ণর কাছে না থাকলেও শাশুড়ির খরচের জন্য স্বামীকে দিয়ে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। শাশুড়ির শ্রাদ্ধের খরচের জন্য নিজের গহনা এগিয়ে দিয়েছে ভাসুরের কাছে। শাশুড়ি মৃত্যুর সময় সুবর্ণকে দেখতে চাইলে সব অপমানকে ভুলে গিয়ে সে পাগলের মত ছুটে গেছে শাশুড়ির সেবা করতে।

অনেক আশা নিয়ে সবার নিন্দা সহ্য করে দর্জিপাড়ার বাড়ি ছেড়ে সুবর্ণ নিজের গোলাপি রংএর বাড়িতে এসেছে। সে সংসারে নিজের কর্তৃত্ব পেয়েছে, পেয়েছে দক্ষিণের বারান্দা। তবুও সুবর্ণ শান্তি পায় নি। শত চেষ্টা করেও সুবর্ণ ছেলেদের মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে পারেনি। সুবর্ণ চেয়েছিল ছেলেদের বাড়ির কর্তাদের ভাষা থেকে মুক্ত করে মার্জিত ও সুন্দর ভাষার অধিকারী করে তুলতে। যে ভাষাতে থাকবে ঔজ্জ্বল্য, কৈশোরের মাধুর্য ও যৌবনের লাবণ্য। বকুল ও পারুলকে স্কুলে ভর্তি করানো নিয়ে তার স্বামী ও ছেলেদের সঙ্গে সুবর্ণর মতবিরোধ ঘটেছে। সুবর্ণ দেশের স্বাধীনতার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করেছে। ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার সুবর্ণর যে বাসনা সেখানে সে ব্যর্থ হয়েছে। ছেলেরা শিক্ষিত হলেও সুবর্ণর চাওয়া মতো ভব্যতা ও সভ্যতা তাদের মধ্যে সঞ্চার করতে পারেনি সুবর্ণ। ছেলেরা মায়ের প্রত্যাশার ধারে কাছে পৌঁছাতে পারে নি। ছেলেদের মধ্যে সুবর্ণ বংশের ধারাকেই প্রত্যক্ষ করেছে। সুবর্ণর ছোটবেলায় পড়ে আসা স্কুলকে দেখার বাসনাকে ছেলেরা ব্যঙ্গ করেছে। মাকে ‘মেয়েমানুষ’ বলে উপেক্ষা করেছে। ছেলেদের থেকে সুবর্ণ আশা করেছিল মানুষের প্রতি থাকা মমত্ববোধ, রুচিশীল ব্যবহার। এখানেও সে ব্যর্থ হয়েছে। এমনকি বিয়ে হওয়া মেয়ে চাঁপা ও চন্নন বাড়ি বলতে দর্জিপাড়ার বাড়িকেই ভেবেছে, সুবর্ণর প্রাণ দিয়ে গড়া গোলাপি বাড়িকে ভাবতে পারে নি। বকুল ও পারুল ছাড়া অন্যান্য ছেলেমেয়েরা মাকে বুঝতে পারে নি। মেয়েরা বাড়ির অন্যান্যদের মতো মায়ের নিন্দা করেছে, ছেলেরাও মাকে বোঝার পরিবর্তে প্রতিবাদী আচরণকেই বড় করে দেখেছে, ক্ষুব্ধ হয়েছে।

সুবর্ণ আবেগপ্রবণ ও স্পর্শকাতর। সামান্য কারণে উদ্বেলিত ও উত্তেজিত হয় সে। মানুষের নীচতা, ক্ষুদ্রতা, হীনতা, দৈন্যতা তাকে আঘাত হেনেছে। যে মায়ের সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না সেই মায়ের মৃত্যুতে জীবনে শূন্যতা অনুভব করেছে। সে অনুভব করেছে তার ছেলেমেয়েদের

মতো সেও তার মাকে বুঝতে পারেনি। তার অনুশোচনা হয়েছে মূঢ় অভিমানে মাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য। স্বদেশি ব্যাপারে উত্তেজিত সুবর্ণ স্বরাজের ব্যাপারে একেবারে শিথিল হয়ে থেকেছে। ছেলে মেয়েদের ব্যবহার ও তারই সঙ্গে মায়ের মৃত্যু তাকে আরও দুর্বল করে দিয়েছে। তাই তার মানসিকতা মুক্তির সন্ধান করেছে, সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

সুবর্ণ চেয়েছিল নিজের জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে, অপূর্ণতা ও যন্ত্রণাকে লিখে রাখতে। যেখানে সে লেখিকার স্থান নিয়ে নিজের জীবনের দুঃখকে এভাবে প্রকাশ করেছে — "আমি একটি নিরুপায় বঙ্গনারী। আমার একমাত্র পরিচয় আমি একটি অন্ধপুরীর মেজবৌ।"[২৭] তার ছাপা বই বের হয়ে এলে সুবর্ণ খুশিও হয়েছিল কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা তার খুশিকে ঢেকে দিল। বই নিয়ে ছেলেদের ব্যঙ্গ শুনে আগুন জ্বালিয়ে সমস্ত জীবনের সঞ্চিত স্মৃতিকথাকে পুড়ে ফেলেছে সে। স্বামীর প্রতারণা, ছেলেদের অবহেলার জীবনকে আর বহন করতে পারল না সুবর্ণ। তার অন্তরাত্মা বলে উঠেছে — "আমার মন আচে বুদ্ধি আচে, মস্তিষ্ক আচে, আত্মা আচে, কিন্তু আমার সত্তাকে স্বীকার করে না।"[২৮] অবহেলায়, লাঞ্ছনায় জর্জরিত সুবর্ণ ধীরে ধীরে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। ডাক্তারের চিকিৎসাকে অস্বীকার করে নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল সুবর্ণ। পনেরো বছর থেকে যে মৃত্যুর অপেক্ষা করছিল সুবর্ণ সে মৃত্যু এল পঞ্চাশ বছর বয়সে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে অসহায় নারীর নীরব প্রতিবাদের তির্যক অভিব্যক্তিই লক্ষ করি আমরা।

সত্যবতীর সূক্ষ্ম অনুভূতি আর প্রতিবাদী মানসিকতা দিয়েই সৃষ্টি করেছেন লেখিকা সুবর্ণকে। প্রতিবাদ মুখর, সমস্ত মানসিক গুণের অধিকারী, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টিহীন, স্নেহ মায়া-মমতা প্রেম-ভালোবাসা-সরলতায় পূর্ণ করে সৃষ্টি করেছেন সুবর্ণলতা চরিত্রটি। তবে তার মধ্যে ত্রুটিও ছিল। সেটিকে লেখিকা এভাবে দেখিয়েছেন — "তা সুবর্ণলতার চরিত্রে হয়তো ওইটাই ছিল পরমতম ত্রুটি। সুবর্ণলতা যখন-তখনই ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে বসতো। সেই অতিক্রম করে বসায় যে নিজেই সে হাস্যাস্পদ হতো, হেয় হতো, সমালোচনার বিষয়বস্তু হতো, তা মনে রাখতে পারতো না।"[২৯]

এভাবেই বৃহৎ একটি উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে বন্ধন জর্জরিত নারীর মুক্তির চেষ্টাকে দেখাতে গিয়ে লেখিকা সুবর্ণ চরিত্রটিকে সার্থকরূপে অঙ্কন করেছেন।

বকুল

'বকুলকথা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বকুল। সুবর্ণলতা উপন্যাসেও বকুল সামান্য স্থান দখল করে রয়েছে। তাছাড়া ট্রিলজির প্রথম খণ্ড 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তেও শুরুতেই স্বীকার করা হয়েছে সত্যবতী, সুবর্ণর কাহিনি বকুলের খাতা থেকে নেওয়ার কথা এবং এখানেই নিহিত রয়েছে বকুলের লেখিকা হয়ে ওঠার পূর্বাভাস। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যবতীর মতো সমস্ত ঘটনা তাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়নি। উপন্যাসে তার ভূমিকা দর্শকের।

আশাপূর্ণা দেবী বলেছেন — "বকুলকথায় বকুলের ভূমিকা নায়িকার নয়, দর্শকের। সে তার ঘরোয়া লেখিকা-জীবনের মধ্যে আজকের সমাজকে যতটুকু দেখতে পেয়েছে, যতটুকু ধরতে পেরেছে, তারই কথা।"[৩০] আধুনিক নারীদের স্বরূপ দেখেছেন লেখিকা বকুলের চোখ দিয়ে। দর্শকের মতো নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে দূরত্বে থেকে বকুল জীবনকে দেখেছে, তাই কোনো ব্যাপারে তাকে মা সুবর্ণলতার মত উদ্বেলিত ও উত্তেজিত হতে দেখা যায় নি। বকুল চরিত্রটি সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন — "বকুল হল তার বেশি বয়সে সমাজকে দেখার প্রতিফলিত রূপ।"[৩১] সত্যবতী ও সুবর্ণলতার মত প্রতিবাদী সত্তা দিয়ে লেখিকা বকুলকে গড়ে না তুললেও সুবর্ণর যথার্থ উত্তরাধিকারী রূপেই লেখিকা বকুলকে নির্মাণ করেছেন। একমাত্র বকুলই তার মাকে বুঝতে পেরেছিল। বকুলের মধ্য দিয়েই সুবর্ণর মাতৃসত্তা কিছুটা সার্থকতা লাভ করেছে। বকুল মায়ের মানসিক যন্ত্রণাকে অনুভব করেছে হৃদয় দিয়ে। শুধু তাই নয়, নিজের জীবনের মধ্যেই পূর্ণতা দিতে চেয়েছে মায়ের আশা আকাঙ্ক্ষাকে। সে আশাতেই মায়ের মৃত্যুর পর জগন্নাথচন্দ্রের ভাঙা প্রেসে গেছে বাড়ির কাজের মেয়ের সঙ্গে মায়ের পুরনো পাণ্ডুলিপির সন্ধানে। মায়ের মৃত্যুর পর বকুল বলেছে — "মা, মাগো। তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখবো। দিনের আলোয় পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস।"[৩২] বকুল নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে, তবে মায়ের হারিয়ে যাওয়া লেখা না পেলেও নিজেকে লেখিকা অনামিকা দেবী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে প্রতিনিয়ত লিখে চলেছে সুবর্ণর মতো হাজার হাজার মেয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণার ইতিহাস। স্বল্পভাষী বকুল নিজ দায়িত্ব পালন করে সুবর্ণর যথার্থ উত্তরাধিকারীর স্থান অর্জন করেছে।

বকুলকে আমরা পেয়ে যাই সুবর্ণলতা উপন্যাসের মাঝামাঝি এসে। বকুল হল প্রবোধচন্দ্র ও সুবর্ণলতার কনিষ্ঠ কন্যা। শুরু থেকেই বকুল মুখচোরা স্বভাবের, কোনো কিছুতেই তার কোনো প্রতিবাদ নেই। বকুল যেন বুঝে নিয়েছিল মায়ের বুড়ো বয়সের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবহেলার সন্তান সে, তাই সংসার থেকে না ছিল তার কোনো দাবি না ছিল আশা। বরং অনাকাঙ্ক্ষিত বলে তার মনের মধ্যে একটি অপরাধবোধই কাজ করেছে। বকুলের একমাত্র আশা ভরসা ছিল সেজদি পারুল। পারুলের বিয়ের পর বকুল একদম একা হয়ে পড়ে। তার একাকিত্বের সঙ্গী হিসেবে বই পড়াকেই বেছে নেয় সে, তাকে বই-এর যোগান দেয় পাশের বাড়ির নির্মল। মায়ের মৃত্যুর পর বকুলের একাকিত্ব আরো গভীর হয়। সব ভাইবোনদের তুলনায় মায়ের মৃত্যু বকুলকেই বেশি কষ্ট দিয়েছে। মায়ের মৃত্যুতে বকুলের পৃষ্ঠবল কমে যায়।

মুখচোরা বকুল নিজের জীবনের সমস্ত গ্লানি প্রতিবাদ না করেই সহ্য করে নিয়েছে। সে সহ্য করেছে নির্মলদের বাড়ি যাওয়া নিয়ে বড়দার বিরূপ ব্যবহার, সহ্য করেছে নির্মলের জেঠিমার তার বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন। তবুও বকুল বন্ধ করতে পারে নি নির্মলদের বাড়ি যাওয়া, সে পারেনি নির্মলের নীরব আবেদন ভরা চোখের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করতে, তাই নানা অজুহাতে ছুটে গেছে নির্মলের কাছে। বকুলকে পড়ানো নিয়েও সুবর্ণর সংসারে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। বকুলের দাদারা বকুলের

পড়াশোনার ব্যাপারে উৎসাহ দেখায় নি বরং বন্ধুর বোনদের কৃতিত্ব নিয়ে প্রশংসায় মুখর হয়েছে ও বকুলকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছে। সেগুলিও বকুল নীরবে সহ্য করেছে। বকুলের মনে সঞ্চিত থাকা নির্মলের প্রতি গোপন প্রেমের টানেই বকুল বড়দা ও জেঠিমার কটূক্তি সহ্য করেও নির্মলদের বাড়ি গেছে। তবে বিয়ের ব্যাপারে নির্মলকে প্রশ্ন করার মতো সাহস বকুলের ছিল না। শুধু তাই নয় গুরুজনদের ভয়ে নির্মলের প্রতি তার প্রেমকে প্রকাশ্যে আনার সাহসও বকুলের মধ্যে দেখা যায় না। সে সময় ব্রাহ্মণঘরে আইবুড়ো মেয়ে থাকা অবিশ্বাস্য ব্যাপার কিন্তু বকুলকে বিয়ে দেওয়ার তাগিদ প্রবোধচন্দ্রের মধ্যে ছিল না, এর পেছনে প্রবোধচন্দ্রের স্বার্থপরতাই কাজ করেছে। প্রবোধচন্দ্রও নিজের শেষ বয়সের ভরসা বকুলের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে। এ সমস্ত বুঝতে পেরেও বকুল বাবার উপর রাগ করেনি কখনও। তবে বকুল নিজের জীবনের সমস্ত গ্লানিকে অতিক্রম করেছে। সত্যবতী ও মা সুবর্ণর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তৈরি হওয়া পথ দিয়ে হেঁটে নিজেকে লেখিকা অনামিকা দেবী রূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। এই আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে দাদাদের অবহেলারও উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছে।

সুবর্ণর মতো বকুলের জীবনেও রয়েছে বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস, তবে সে ইতিহাস সুবর্ণ থেকে আলাদা। বকুল নির্মলকে ভালোবেসেছে, মুখচোরা নির্মল তার ভালোবাসার যথার্থ মর্যাদা দিতে পারেনি। তবুও নির্মলের প্রতি তার কোনো অভিযোগ উপন্যাসে ফুটে ওঠেনি তাই লেখিকা বলেছেন — "বকুল মেয়েটাও বোধ হয় আরো বেশী অন্য টাইপের ছিল। তাই বকুলের অভিমান ছিল না, অভিযোগ ছিল না, শুধু ভালোবাসা ছিল। মানে সেই গোয়ালের দুধের জোলো ভালোবাসাই।"[৩৩] বকুলের চোখের সামনেই হয়েছে নির্মল ও মাধুরীর বিয়ে। নির্মলের বিয়ের কথাতে বকুল দুঃখ পেলেও সব নীরবে সহ্য করেছে। নির্মলের মায়ের অনুরোধে নির্মলের মায়ের নামে নির্মলের বিয়ে উপলক্ষে প্রীতি উপহার লিখে দিয়েছে বকুল। নির্মলের প্রতি বকুলের কোনো অভিমান অভিযোগ ছিল না শুধু ছিল ভালোবাসা। যন্ত্রণা ভরা বুক নিয়ে নির্মলের বিয়েতে উপস্থিতও থেকেছে বকুল। প্রেমের যন্ত্রণা সে বুকে বহন করলেও নির্মলকে কখনও দোষ দেয়নি বরং সে নির্মলের প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করেছে। সে মনে করেছে নির্মলের প্রতি তার ব্যর্থ প্রেমই অনামিকা দেবীর সৃজনশীল সত্তাকে উন্মোচিত করেছে। বকুল নির্মলের বউ মাধুরীর সঙ্গে সহজেই বন্ধুত্ব করে নিয়েছিল। তবে বকুল নির্মলের প্রতি থাকা প্রেমকে একেবারে মনের কোন থেকে সরিয়ে দিতে পারেনি কিন্তু অনামিকা দেবীর খোলসে সে সবকিছুকে ঢেকে দেবার চেষ্টা চালিয়েছে। নির্মলের কথা ভাববার অবকাশটুকু সে পায় নি তার জীবনে। বকুল অনামিকা নামের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিল চারদিকে। লেখিকার ভাষায় — "তখন আর 'বকুল' নামের পরিচয়টুকুর মধ্যেই নিমগ্ন ছিল না সে। ছড়িয়ে পড়েছিল আর এক নতুন নামের স্বাক্ষরে। সেই নতুন নামটার ভেলায় চড়ে বেরিয়ে এসেছিল নালা থেকে নদীতে, ডোবা থেকে সমুদ্রে।"[৩৪] তবে নির্মল বার বার তাকে তাদের প্রেমের কথা লিখার অনুরোধের মধ্য দিয়ে বকুলের ভিতরের সুপ্ত প্রেমকে জাগিয়ে রাখার প্রয়াস চালিয়েছে।

নির্মলের অনুরোধেও বকুল নিজেকে নিয়ে গল্প লিখতে পারেনি কারণ বকুল এখন আর

বকুল নয়। হয়ে গেছে অন্য মানুষ, নামীদামী লেখিকা অনামিকা দেবী। তাই তিনি তো আর নিজের ব্যর্থতাকে প্রকাশ্যে আনতে পারেন না। নারী প্রগতির ইতিহাসে অনামিকা দেবী ব্যর্থতার ইতিহাসকে ধরে রাখতে চান নি তাই বকুলকে বাদ দিয়ে তিনি শম্পার অর্থাৎ একালের বিজয়িনীদের নিয়েই গল্প লিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাইরে সবাইকে ফাঁকি দিলেও অনামিকা দেবী ভিতরের সুপ্ত প্রেমকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেন না তাই শম্পাদের যুগের আধুনিকাদের দেখলে নিজেদের ভীতু বলে ভাবেন তিনি। নামীদামী লেখিকাকেও হৃদয়ের সুষুপ্ত প্রেম অলস মুহূর্তে বিহ্বল করে দেয়। বকুল নামের চরিত্রটির মধ্য দিয়ে, বকুলের মধ্য দিয়ে নাম যশ সবকিছুকে অতিক্রম করে ফেলে প্রেমের ফল্গুধারা যেখানে নির্মল নামের পুরুষটির তিনি প্রেয়সী প্রেমিকা। অনামিকা দেবী নামের খোলসে প্রেমকে অস্বীকার করলেও নির্জনে বকুলের মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মজাগরণের মধ্য দিয়ে লেখিকা নারীর প্রেমিকা সত্তাকে উত্থাপিত করেছেন — "মনে করি বুঝি অনুভূতির ধারাগুলো সব ঘষে ঘষে ক্ষয়ে গেছে আমার, কিন্তু সত্যিই কি তাই? তাই যদি হয়, কেন তবে ওকে দেখলে ভিতর থেকে একটা উথলে ওঠা আহ্লাদের ভাব আসে? কেন ওর যে ক'দিন ছুটি থাকে, মনে হয় আকাশ-বাতাস সব যেন আনন্দে ভাসছে? কেন ওর ছুটি ফুরোলে মনে হয়, কী আশ্চর্য, এরই মধ্যে একমাস হয়ে গেল! আর মনে হয় দিনগুলো কেমন যেন একরঙা হয়ে গেল।"[৩৫] আশাপূর্ণা ঘর সংসার বর্জিতা নারীকে সমর্থন কোনো উপন্যাসে করেননি। ঘর সংসার করেও প্রগতিশীল ও সর্বক্ষেত্রে প্রসারিতা নারীকেই তিনি সমর্থন করেছেন। বিয়ে না করার গ্লানি না থাকলেও অনামিকা দেবী নামের মধ্য দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভে সার্থকতা পেলেও ব্যর্থপ্রেমের বেদনা তাকে মাঝে মাঝে ভারাক্রান্ত করেছে। অনামিকা দেবীর মধ্যে সবকিছু পেয়েও কিছু না পাওয়ার বেদনা বা নির্জন মুহূর্তে ব্যর্থ প্রেমের বেদনার মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণা ঘরসংসারের মধ্যে থেকেই নিজেকে প্রসারিত করা তথা প্রগতির দিকে এগিয়ে নেওয়াকেই সমর্থন করেছেন।

বকুলকে আত্মমগ্ন করেই সৃষ্টি করেছেন লেখিকা। বকুল যেন নিজের বাড়িতেই অতিথির মতো থেকেছে। নিজের জীবন সম্পর্কে অনামিকা দেবী অনুভব করেছেন — "এ একটা অদ্ভুত জীবন তাঁর, 'না ঘরকা না ঘাটকা'। এ সংসারে আছেন, কিন্তু এর সঙ্গে যেন সম্যক যোগ নেই। যেহেতু যথারীতি অন্য সংসারে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হন নি, সেই হেতু অনামিকা যেন একটা বাড়তি বস্তুর মতো এখানে চেপে বসে আছেন।"[৩৬] অনামিকা দেবী বিয়ে করেন নি তবে বিয়ে না করার গ্লানি তাঁর মধ্যে নেই। যদিও ব্যর্থ প্রেম তাকে মাঝে মাঝে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তিনি আত্মমগ্ন হলেও তাঁর হৃদয় মায়া-মমতায় পূর্ণ ছিল। শম্পা চলে গেলে রুগ্ন ছোড়দাকে দেখে অনামিকা দেবীর মায়া লেগেছে। শম্পার পালিয়ে যাওয়ার জন্য বৌদি অনামিকা দেবীকে দোষ দিলেও তিনি বউদির ওপর রাগ করেন নি বরং বউদির মাতৃত্বের বেদনাকে করুণার চোখেই দেখেছেন। ভাইঝি শম্পাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছেন অনামিকা দেবী। শম্পাও পিসিকে অত্যন্ত কাছের মনে করেছে ও তার জীবনের সমস্ত ঘটনা পিসির সামনে খুলে বলতে দ্বিধা বোধ করে নি। অনামিকা দেবী শম্পার একের পর এক প্রেমে পড়া জেনেও রাগ করতে পারেন নি। শম্পার পালিয়ে যাওয়ার পর

শম্পার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেছেন তিনি। সেজদির বাড়িতে গিয়েও শম্পাকে না পেলে তিনি অস্থির হয়ে গেছেন। শম্পা ও সত্যবানকে বাড়িতে এনেছেন এবং তাদের আলাদা সংসার করার বাসনা পূরণ করার জন্য তাদের ভাড়া বাড়ি খুঁজে দিয়েছেন। শম্পার প্রতি তিনি তাঁর কর্তব্যকে যথার্থ পূরণ করেছেন। এমনকি নির্মল মারা যাবার পর নির্মলদার বাড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি দুঃখ পেয়েছেন।

স্বনামধন্য লেখিকা অনামিকা ওরফে বকুলের কলম থেকে বেরিয়ে এসেছে ধারালো ও জোরালো লেখা। নিজের জীবনের অপ্রাপ্তির বোঝাকে তিনি তাঁর লেখিকা সত্তার উপর ভারি হতে দেন নি। তাঁকে দেখলে মনে হয় যেন মন বলে কোন বস্তুই নেই অনামিকা দেবীর জীবনে। যতই আধুনিকা ও প্রগতিশীল লেখিকা হোন না কেন ভাইঝি শম্পার কাছে ধরা পড়েছে পিসি অনামিকা দেবীর সেকেলে ভাব। শম্পা তার পিসিকে মাঝে মাঝে বলেছে — "আচ্ছা পিসি, তুমি এত ভিজেবেড়াল প্যাটার্নের কেন?"[৩৭] অথচ অনামিকা দেবী তাঁর হাতেই লিখে চলেছেন হাজার হাজার মেয়ের যন্ত্রণার ইতিহাস। তবে তার মা, দিদিমারা যে মুক্তির জন্য ছটফট করেছেন, যন্ত্রণা পেয়েছেন, সংগ্রাম করেছেন সেই মুক্তি আজকের মেয়েরা অনায়াসে পেয়ে তার দুর্ব্যবহার করে চলেছে তা অনামিকা দেবীর মনে আঘাত হেনেছে। তাকে আঘাত হেনেছে সভ্যতার নামে তাদের করা স্বেচ্ছাচার। আজকের প্রজন্মের আজন্মের মূল্যবোধকে হারানোর প্রচেষ্টা তাকে আঘাত হেনেছে। এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী বকুল চরিত্রটিকে দর্শকের ভূমিকায় রেখে মেয়েদের কালগত অবস্থান ও মূল্যবোধের বিবর্তনকে দেখিয়েছেন। অনামিকা দেবী সবার কথা লিখেছেন দর্শক হয়ে কিন্তু নিজের কথা লেখার বা নিজের জীবনের দিকে নজর দেবার ফুরসত পাননি তাইতো উপন্যাসের শেষে অনামিকা দেবীর মুখ দিয়ে লেখিকা বলিয়েছেন, বকুলের কথা ভাবিয়েছেন তাঁকে দিয়ে তাই তো তিনি বলেছেন — "শুধু বকুলের কথা আর লেখা হলো না... তোমার আর বকুলের কথা।"[৩৮]

বকুল চরিত্রটির অনামিকা দেবীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে লেখিকা সত্যবতী, সুবর্ণর স্বপ্নকেও বাস্তবে রূপায়িত করেছেন এবং বকুলকে দর্শকের স্থানে রেখে তার দেখার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করার নারী মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন এবং স্বাধীনতা মানে যে স্বেচ্ছাচার নয় বকুলের প্রশ্নের মধ্য দিয়ে তা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী।

আশাপূর্ণা দেবীর সৃজনবিশ্বের কয়েকটি পুরুষ চরিত্র :

রামকালী

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র এক বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্র রামকালী। তিনি অবস্থান করেছেন তৎকালীন সমাজের অসার পুরুষ সমাজের বিপরীত মেরুতে। জয়কালী ভট্টাচার্য ও দীনতারিণীর পুত্র রামকালী। কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যবতীর পিতা তিনি, যার প্রশ্রয়েই সত্যবতীর সংগ্রামী মন আরও বেশি দৃঢ়তা লাভ করেছিল। সত্যবতীর ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁর প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে। আচারনিষ্ঠ পরিবারের

সন্তান রামকালী একদিন গোপাল পূজার ত্রুটি করলে পিতা জয়কালীর খড়মপিটা খেয়ে গৃহত্যাগী হন। গৃহত্যাগ করে আশ্রয় নেন গোবিন্দ গুপ্তের বাড়িতে। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ গোবিন্দ গুপ্তের কাছ থেকে রামকালী আয়ুর্বেদশাস্ত্রের পাঠ নিয়ে যথেষ্ট পণ্ডিত হয়ে পড়েন। ব্রাহ্মণজনোচিত পেশা ত্যাগ করে রামকালী প্রচুর কৃতিত্ব অর্জন করেন আয়ুর্বেদশাস্ত্রে। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তাঁর যশ খ্যাতি ও অর্থ উপার্জনের কথা। প্রচুর অর্থ উপার্জনের পর রামকালী ফিরে আসেন নিজের দেশে, তখন পিতা জয়কালীর মৃত্যু ঘটে গেছে। তাঁর অর্থের প্রাচুর্য দেখে গ্রামবাসী তাঁকে আপন করে নেয়। তবে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে নেন গ্রামবাসী, গুপ্তের বাড়িতে থাকার জন্য। গ্রামে এসে রামকালী নিজের দান দক্ষিণা ও চিকিৎসা জনিত সেবার মধ্য দিয়ে গ্রামবাসীর মন জয় করে নেন। এমনকি গ্রামের একজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি ফেলু বাঁড়ুজ্যে নিজের নয় বছরের মেয়েকে রামকালীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেন। রামকালী নিজের বিয়েতে ঘটাও করেছেন প্রচুর। গ্রামের লোকের কাছে রামকালীর পরিচয় ছিল ভালো চিকিৎসক, সুপরামর্শদাতা, মহানুভব ব্যক্তি, বিপদকালের কল্পতরু। গ্রামবাসীর একমাত্র ভরসা স্থল রামকালী।

রামকালীর ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা, আচারনিষ্ঠতা, নীতিনিষ্ঠতা পাড়াশুদ্ধ লোককে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছে। রামকালীর প্রতিপত্তিও রামকালীকে উঁচু স্থানে পৌঁছে দিয়েছে। অব্যর্থ ঔষধদান ও দয়া দাক্ষিণ্যে নিত্যানন্দপুরের সবার মন জয় করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। বাড়ির লোকের কাছেও রামকালীর স্থান ছিল সম্মানের। রামকালী ছিলেন বাড়ির কর্তা, বাড়ির সমস্ত কাজ রামকালীর সিদ্ধান্তেই হয়েছে। রামকালীর কঠোর ব্যক্তিত্বকে স্ত্রী ভুবনেশ্বরী ছাড়াও বাড়ির অন্যান্যরাও ভয় পেয়েছে। রামকালীর ব্যক্তিত্ব নবকুমারকেও আকৃষ্ট করেছে এবং তাঁকে তার বটবৃক্ষ স্বরূপ মনে হয়েছে। শুধু ভয় পায়নি মেয়ে সত্য। তার এই নির্ভীকতার মধ্যেও ছিল বাবা রামকালীরই প্রশ্রয়।

প্রখর ব্যক্তিত্বের জন্যই পরিবারের সবাই রামকালীকে সমীহ এবং ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধাও করেছে। আপাতত কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিটির হৃদয় ছিল কোমল। যেখানে ছিল মেয়ের জন্য স্নেহ, স্ত্রীর জন্য ভালোবাসা, অন্যদের জন্য মমতা ও করুণা। মেয়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসার গভীরতা সব সময় ফুটে উঠেছে তাঁর কার্যকলাপে। সত্যর দুষ্টামি ও তালপাতায় লেখা নিয়ে বাড়ির সবাই ভয় দেখালে মা ভুবনেশ্বরীও ভীত হয়ে পড়েন। ভুবনেশ্বরী স্বামীকে সে ব্যাপারে সাবধান করতে গেলে রামকালী সেটিতে কর্ণপাত না করে মেয়েকে প্রশ্রয়ের সুরে ভুবনেশ্বরীকে বলেছেন — "বাজে কথা গায়ে মাখতে নেই মেজবৌ।"[৩৯] সত্যবতীর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ দেখে রামকালী খুশি হয়েছেন এবং তৎকালীন সমাজকে ভ্রূক্ষেপ না করে মেয়েকে বিদ্যার্জনে উৎসাহ দিয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। নবকুমারের ইংরাজি শিক্ষার কথা শুনে খুশি হয়েছেন। সত্যবতী স্বামী ও পুত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে কলকাতায় গেলে মেয়ের কৃতিত্বে গৌরব বোধই করেছেন। নাতিদের পাশের খবরে খুশি হয়েছেন। এসব থেকে মেয়ের প্রতি থাকা ভালোবাসার সঙ্গে বিদ্যার প্রতি রামকালীর অনুরাগও প্রকাশ পেয়েছে। মেয়ের প্রতি স্নেহবশতই মাতা দীনতারিণীর মৃত্যুশোকের মধ্যেও সত্যর প্রথম সন্তান সম্ভাবনার কথা শুনে উদ্‌বিগ্ন হয়েছেন। আবার মেয়ে বড় হয়ে গেছে

ভেবে চোখে জলও এসেছে তাঁর। যৌথ পরিবার ব্যবস্থার মধ্যেও সত্য বাবাকে অনেকটাই কাছে পেয়েছে যদিও মা ভুবনেশ্বরী ততটা পায়নি। সত্যর বুদ্ধিমত্তা, প্রশ্ন করার ভঙ্গী রামকালীকে বিচলিত করেছে, তাঁকে ভাবিয়েছে যে এসব কথা এটুকু মেয়ে সত্য কোথা থেকে শিখেছে এ নিয়ে। মেয়ের যুক্তিতর্কের কাছে কখনও কখনও তিনি হার মেনে গেছেন।

যুক্তিনিষ্ঠ ও বাস্তববাদী রামকালীর মত ব্যক্তি মেয়েকে এত ভালোবেসেও গৌরীদানের পুণ্য অর্জন করতে গিয়ে ভুল বশত মেয়ে সত্যবতীকে আট বছর বয়সে বিয়ে দিয়ে দেন। তবে ঘরবসতের জন্য মেয়েকে উপযুক্ত সময়ে পাঠানোর অঙ্গীকার করে নেন বিয়ের আগে। শাশুড়ি এলোকেশী সময়ের আগেই মেয়েকে নিতে চাইলে রামকালী দিতে রাজী হন নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত এলোকেশীর ষড়যন্ত্র ও মেয়ে সত্যবতীর জেদের কাছে বাধ্য হয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়িতে পাঠান তিনি। বেনামি চিঠিতে শ্বশুরবাড়িতে মেয়ের দুঃখের কথা শুনে বিচলিত হয়ে ছুটে যান মেয়ের কাছে। কিন্তু সত্য যখন নিজের দুঃখের কথা লুকিয়ে যায় তখন ব্যর্থ পিতৃহৃদয় নিয়ে ফিরে আসেন তিনি। সর্বদা ব্যস্ত দৃঢ় রামকালী স্ত্রী ভুবনেশ্বরীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন। স্ত্রীর প্রতি থাকা উদাসীনতাই স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর সংসারের প্রতি অনাসক্তি এনে দেয়। জীবনভোর স্ত্রীকে অবহেলা করার জন্য তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন, ব্যথিত হয়েছেন। স্ত্রীর প্রতি উদাস মনোভাবকে স্মরণ করে দুঃখিত হয়েছেন। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে নিজের জীবনে স্ত্রীর অভাবটুকু অনুভব করেছেন তিনি। স্ত্রীর প্রতি আজীবন উদাসীন ব্যক্তির হৃদয়েও যে স্ত্রীর জন্য গভীর ও অকৃত্রিম ভালোবাসা লুকিয়েছিল, তা বেরিয়ে এসেছে স্ত্রীর মৃত্যুর পর রামকালীর আবেগময় অবস্থায়। রুদ্ধ গম্ভীর আবেগ কম্পিত গলায় রামকালী বলে উঠেন — "মেজবৌ একী করলে? মেজ বৌ এমন কঠিন শাস্তি কেন? সত্যকে না দেখেই চললে?"[৪০] ভুবনেশ্বরী হঠাৎ বিনা নোটিসে চলে যাওয়ায় রামকালী স্ত্রীকে উপযুক্ত চিকিৎসাটুকুও করতে না পারায় কষ্ট পেয়েছেন। দেশশুদ্ধ লোককে চিকিৎসা করা রামকালী নিজের স্ত্রীকে চিকিৎসা করার সুযোগ পেলেন না। মোক্ষদার বারণ সত্ত্বেও ঘটা করে ভুবনেশ্বরীর শ্রাদ্ধ করেছেন রামকালী। স্ত্রীর মৃত্যুশোকে সংসার ত্যাগ করে কাশীবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।

যুক্তি, নীতি ও বাস্তববোধের দ্বারা চালিত রামকালী অন্যের সমস্যাকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে মেটানোর চেষ্টা করেছেন। তাই বিচক্ষণ রামকালী লগ্নভ্রষ্টা পটলিকে লগ্নভ্রষ্টার অপবাদ থেকে মুক্তি দেবার জন্য ভাইপো রাসুর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। মুহূর্তের জন্য রামকালী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাসুকে দ্বিতীয় বিয়ে করিয়ে বসেন। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিয়েতে আপত্তি না থাকলেও সত্য পিতাকে নারী সম্পর্কে গতানুগতিক ধারাকে ভেঙে দিয়ে সারদার বেদনাকে পিতার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। সত্যবতী রামকালীকে মেয়েদের সম্পর্কে গভীরে ভাববার অবকাশ তৈরি করে দিয়েছে। সত্য রামকালীকে চমকে দিয়েছে মেয়েদের প্রতি উদাস মনোভাবকে দেখিয়ে দিয়ে। মেয়েদের নিয়ে তাঁকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করিয়েছে। রামকালীর নিজের মনেই প্রশ্ন এসেছে মেয়েদের প্রতি থাকা উদাসীনতা নিয়ে। উপন্যাসের বয়ানে ধরা পড়েছে বিচলিত রামকালীর মনের ছবি — "বহুবিধ গুণের সমাবেশে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চরিত্র রামকালীর, পুরুষের আদর্শস্থল, তবু

সে চরিত্রের গাঁথনিতে একটু বুঝি খুঁত আছে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার শিক্ষা আছে তাঁর, শিক্ষা আছে বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান সমীহ করবার, কিন্তু সমগ্র 'মেয়েমানুষ' জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, নেই সম্যক মূল্যবোধ। যে জাতটার ভূমিকা হচ্ছে শুধু ভাত সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা করবার, কোন্দল করে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার আর শোকে উন্মাদ হয়ে বুক চাপড়াবার, তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু আসে না রামকালীর। অবশ্য আচারে-আচরণে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না হয়তো নিজের কাছেও — তবুও অবজ্ঞাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সম্প্রতি ক্ষুদে একটা মেয়ে যেন মাঝে মাঝে তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে, চমকে দিচ্ছে, বিচলিত করছে, 'মেয়েমানুষ' সম্পর্কে আর একটু বিবেচনাশীল হওয়া উচিত কিনা এ প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে।"[৪১]

রাসুর দ্বিতীয় বিয়ের পর রামকালীও অনুভব করেছেন যে একটি মেয়েকে বিপন্নতা থেকে রক্ষা করতে গিয়ে আর একটি মেয়েকে দুঃখের আঁধারে ঠেলে দিয়েছেন তিনি। সত্যবতীর মুখে 'সেজুতি ব্রতের' কথা শুনে ও রাসুর বিয়েতে সারদার অন্তরের জ্বালার কথা শুনে রামকালী অনুতপ্ত হয়েছেন। এই অনুতাপ হেতু সারদাকে কুড়ি বিঘে জমি লিখে দিয়েছেন। সারদা রামকালীর মুখের উপর দুর্গাপূজার আয়োজন করতে বারণ করলেও তিনি সারদার প্রতি রাগ করেন নি বরং নিজের ভুলের কথা ভেবে সারদাকে সমীহই করেছেন। শেষ পর্যন্ত সারদার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে সারদা ও মোক্ষদাকে নিজের সঙ্গে তীর্থ করতে নিয়ে গেছেন। নারী বলে তাদের ইচ্ছাকে তিনি উপেক্ষা না করে তৎকালীন সমাজে প্রচলিত পুরুষ মানসিকতাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না থেকে নিজের প্রখর ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন রামকালী।

রামকালী সারাজীবন একান্নবর্তী সংসারের দায়িত্বই পালন করে গেছেন এমনকি সংসার ত্যাগ করার সময়ও নিজের সব কর্তব্য শেষ করে গেছেন, রাসুর হাতে সব দায়িত্বভার অর্পণ করে। রামকালী শুধু কবিরাজি বিদ্যার জন্য এবং অর্থকৌলীন্যের জন্যই গ্রামবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না। তার চরিত্রে মানবিকতার ভরপুর সমাবেশ লক্ষিত হয়েছে উপন্যাসে। তিনি পরপোকারীও ছিলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পক্ষপাতশূণ্য। তাই ভ্রাতুষ্পুত্র রাসুকে সুযোগ সুবিধা দিতে কোনোদিন ঘাটতি দেখা যায় নি তাঁর মধ্যে, তাছাড়া তাঁর বাড়িতে আশ্রিতের সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তাদের সবার জন্য অন্ন-জলের ব্যবস্থাতে রামকালী ত্রুটি করেন নি। সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে কাশী যাত্রাকালে সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারাতেও কাউকে বঞ্চিত করেন নি তিনি। এমনকি রাসুর স্ত্রী সারদাকেও সম্পত্তির ভাগ দিয়েছেন তিনি। কাশী যাবার পূর্বে দাতব্য চিকিৎসালয়, স্ব প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিচালনার ভার দিয়েছেন রাসুর হাতে। অসহায় বিধবা, অপটু পুরুষ ও পিতৃমাতৃহীন শিশুদের জন্য অনাথ আশ্রমের ব্যবস্থা করে এবং দুঃস্থ মানুষের জন্য একটা বড় তালুকের আয় নিয়োজিত করে সেটিরও পরিচালনার ভার রাসুর উপর দিয়েছেন তিনি। জটার বউকে নিজের চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান রামকালী। শুধু তাই নয় জটার বউকে আবার পরিবারে স্থানও করে দেন তিনি।

মা দীনতারিণী রামকালীর অবিচলতা ও আবেগহীনতা দেখে পাথরের ঠাকুর বলেছেন। নবকুমার রামকালীর ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য দেখে নিজের বাবার মেয়েলি মানসিকতায় লজ্জিত হয়েছে। রামকালীকে তার বিশাল বটগাছ মনে হয়েছে। রামকালীর সামনে যাবার সাহস তার মধ্যে হয়নি, দূর থেকেই দেখেছে সে। একমাত্র সত্যবতীই নির্ভীকভাবে বাবার কাছে চেপেছে। সময়ের সঙ্গে মানিয়ে চলার সামর্থ্য ছিল রামকালীর। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ, পরিবর্তনশীল এবং সংস্কারমুক্ত। তার হৃদয় মানবিকতায় পূর্ণ, সংহত ও স্থিতিশীল, যেখানে আবেগের আধিক্য নেই। রামকালীর ব্যক্তিত্ব সত্যবতীর শিশু মনেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। রামকালীর চরিত্রে ছোট ছোট কিছু বিচ্যুতি থাকলেও তাঁর অনুশোচনা সেগুলিকে ক্ষালন করেছে এবং রামকালী একটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সম্পূর্ণ চরিত্র রূপেই আমাদের কাছে ফুটে উঠেছে।

রামকালীর চরিত্রটিকে এত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও দৃঢ় করে গড়ে দেওয়ার পেছনেও লেখিকার সত্য চরিত্রটিকে সমকালের ঊর্ধ্বে ও ব্যতিক্রমী চরিত্র রূপে সৃষ্টি করার প্রেরণাই কাজ করেছে। সত্য জীবনে পৃষ্ঠবল পেয়েছে একমাত্র এই চরিত্রটির থেকে, তাঁর ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়েছে সত্য। ট্রিলজির অন্যান্য চরিত্র থেকে এই পুরুষ চরিত্রটিকে লেখিকা একটু আলাদা ব্যক্তিত্বে ভরপুর করে সৃষ্টি করেছেন লেখিকা যা অন্যান্য প্রধান পুরুষ চরিত্রে লক্ষিত হয় নি।

নবকুমার

‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র কেন্দ্রীয় চরিত্র সত্যবতীর স্বামী নবকুমার। সত্যবতীর স্বামী হয়েও সে সত্যবতীর সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছে। নবকুমারের পুরো নাম নবকুমার বাঁড়ুয্যে। নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে ও এলোকেশী দেবীর পুত্র সে। নিতাই ছিল তার সঙ্গী। নিতাই জাতিতে নীচু হলেও তাদের বন্ধুত্বে কোনোদিন ব্যবধান আসেনি। ইংরাজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ হেতু ভবতোষ মাস্টারের কাছ থেকে তারা ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেছে। আশাপূর্ণা দেবী ব্যক্তিত্বহীন করে এই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। প্রথমদিকে নবকুমারকে দেখা যায় মা এলোকেশীর ব্যক্তিত্বের কাছে ম্লান চরিত্র রূপে। পরবর্তীতে স্ত্রীর সত্যবতীর ব্যক্তিত্বের পাশে গৌণ চরিত্ররূপেই দেখতে পাই এই চরিত্রটিকে। মা ও স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের কাছে তার ব্যক্তিত্ব ক্রমশ চাপা পড়ে গেছে উপন্যাসে। মাকে নবকুমার ভয় করেছে, মায়ের ডাকে ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে। মায়ের সম্মুখে তাকে সর্বদা চোরের মত ঠেকেছে। মায়ের সদুদির প্রতি করা অপমান ভালো না লাগলেও চুপ করে সহ্য করেছে কারণ মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল না। মাকে ভয় পেলেও সে স্ত্রীকে ভালোবেসেছে। স্ত্রীর কোনো কাজে বাধা দেবার ক্ষমতা নবকুমারের মধ্যে ছিল না। আগাগোড়াই নবকুমারকে আমরা একটু সহজ সরল ও বোকা প্রকৃতিরই দেখে থাকি। মায়ের কাছে সদুদির অপমানকে চুপ করে সহ্য করলেও স্ত্রীকে মার খেতে দেখে সহ্য করতে পারে নি সে। তাই নিতাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে ভবতোষ মাস্টারকে দিয়ে বেনামি চিঠি পাঠিয়ে শ্বশুর রামকালীকে

জানানোর ব্যবস্থা করেছে, যদিও কাজটি সত্যর মনঃপূত হয় নি। বউ-এর শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রথম আগমন বার্তা শুনে লাজুক নবকুমারের মনে ভয় ও রোমাঞ্চ জেগে উঠেছে। স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াতে সময় নিলেও স্ত্রীর প্রতি তার গভীর অনুরাগ উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। সেই অনুরাগেই ঘরের ভেতর থেকে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষা করেছে সে অধীর আগ্রহে। সত্য বাপের বাড়িতে কিছুদিন থাকার কথায় তার মন খারাপ হয়েছে এবং অভিমানের সুরে বলেছে — "বুঝলাম। তাই এই হতভাগা চলে যাবার পর আরও দু' মাস ভাল করে থাকা হবে—।"[৪২] সত্যকেও অনেক ভালোবাসলেও সত্যর রণচণ্ডী রূপকে সে তার কল্পনার সঙ্গে মিলাতে পারে নি। অনেক ক্ষেত্রে সত্যর আচরণ তাকে সংকোচিত করেছে। সত্য নিজের সামর্থ্যকে কেন যে অতিক্রম করার চেষ্টা চালায় তা নিয়ে তার মনে প্রশ্ন জেগেছে। তার মনে প্রশ্ন জেগেছে কেন সত্য সমস্ত সংসারের অন্যায় মোচনের দায় নিজের কাঁধে নেয়। সত্য অন্যান্য স্ত্রীদের মত আচরণ না করার জন্য তার দুঃখ হয়েছে। সত্যকে সদাই সে অন্যান্যদের স্ত্রীর মতো পাবার বাসনা মনে লালন করেছে। তবে নবকুমার সত্যর বাপের বাড়ির ঐশ্বর্য দেখে অভিভূত হয়েছে এবং অকপটেই সত্যকে বলেছে — "মাইরি বলছি, স্বপ্নেও ভাবিনি শ্বশুরবাড়িটা আমার এমন। কী ঐশ্বর্য্য, কী দব্‌দবা।"[৪৩] এমন কি শ্বশুরবাড়ির ঐশ্বর্য দেখে সত্যকে রাজকন্যা বলতেও সে দ্বিধা বোধ করে নি এবং সত্যর বাড়ি থেকে নিজের বাড়ির অবস্থানগত পার্থক্যকেও স্বীকার করেছে নবকুমার। এসবের মধ্য দিয়ে তার অকপট সরলতা আমাদের চোখে পড়ে।

শ্বশুর রামকালীর চোখেও ধরা পড়েছে নবকুমারের লাজুক স্বভাব। কলকাতায় যাবার পূর্বে সত্য যখন স্বামী ও পুত্রদের নিয়ে নিত্যানন্দপুরে এসেছিল তখন নবকুমারকে দেখে রামকালীর মনে এরূপ ভাব হয়েছিল — "রামকালী তাকিয়ে দেখেন। একটি স্বাস্থ্যবান, সুকান্তি পুরুষের দেহে এখনো যেন একখানা লাজুক কিশোরের মুখ। সুন্দর সুকুমার, কিন্তু বুদ্ধির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে মনে মৃদু আক্ষেপের হাসি হাসেন। একে স্নেহ করা যায় ভরসা করা যায় না। হয়তো এই জন্যেই ভগবান সত্যকে অমন দৃঢ় মজবুত করে গড়েছেন, ও লতার মত আশ্রয় চাইবে না, বনস্পতির মত আশ্রয় দেবে।"[৪৪] রামকালী নবকুমারকে ভরসা না করলেও ভালোবেসেছেন। নবকুমারও রামকালীকে ভালোবেসেছে ও শ্রদ্ধা করেছে। রামকালীর ব্যক্তিত্বে নবকুমার অভিভূত হয়েছে। রামকালীর ব্যক্তিত্বের বিপরীতে নিজের পিতার মেয়েলি স্বভাবের কথা মনে করে নবকুমারের লজ্জা হয়েছে। পিতার বাগদীপাড়ায় যাওয়াকে নবকুমার ভাল কাজ মনে করে নি তাই সত্যর সঙ্গে বাবার বাগদীপাড়ায় যাওয়ার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে নবকুমার বলেছে — "তা এ তো নিন্দেরই কথা। বামুনের ছেলে হয়ে বাগদীপাড়ায় যাওয়া। তাদের হাতের পান-জল খাওয়া, এসব কি আর খুব গুণের কথা?"[৪৫] উল্লাসী বাগদিনীকে দেখলে নবকুমারের রাগ উঠেছে। তবে শ্বশুরের চরিত্র পতনের জন্য সত্য শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করতে না পারার সিদ্ধান্ত নিয়ে যে ভাবে মুক্ত প্রতিবাদ জানিয়েছে নবকুমার তেমনটি করতে পারে নি। 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম' মনে করে সমস্ত নোংরামিকে সে মুখ বুজে সহ্য করে নিয়েছে এবং সত্যর শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করতে না পারার কথায় নির্বাক থেকেছে।

নবকুমার মাঝে মাঝে সত্যর ভয়ঙ্করী রূপ দেখে ভয় পেলেও সত্যর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছে। সত্যর প্রয়োজন অনুভব করেছে জীবনে, তাই মা এলোকেশী তাকে দ্বিতীয় বিয়ের কথা বললে সে আপত্তি জানিয়েছে। যদিও স্বামী হিসেবে সত্যর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পারে নি বরং সত্যর কাছে নিজেকে অসহায় মনে করেছে। সত্যকে অতিক্রম করার ক্ষমতা তার মধ্যে ছিল না তাই সত্যর কলকাতায় বাসা বাড়িতে যাওয়া নিয়ে প্রথম প্রথম আপত্তি করলেও সত্যর জেদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। আবার সাহেব ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করিয়ে তাকে সুস্থ করার জন্য সত্যর কাছে নিজেকে কৃতজ্ঞ মনে করেছে। তবে সত্যর অন্যায় জেদের উপর কখনো কখনো তার মনে অসন্তোষ এসেছে। কলকাতায় এসে সত্যর বার বার বাসা বদলানোর ঘটনাকে নবকুমার পছন্দ করেনি। আবার কিছু ক্ষেত্রে সে রক্ষণশীল। কলকাতায় বাসা বাড়িতে আসার কথা নিয়ে সত্যকে খোঁটা দিতে ছাড়ে নি নবকুমার। এমনকি নিতাইয়ের বউকে বাসা বাড়িতে আনার কথা নিয়ে খোঁটা দিয়ে বলেছে — "গাঁ সুদ্ধু বৌ কি তোমার মতন বাসায় আসার জন্যে পা তুলে বসে আছে?"[৪৬] এমনকি নিতাই-এর আলাদা ভাড়া বাড়িতে যাবার কথায়ও নবকুমার সত্যকে কথা শুনিয়েছে। সত্যর উপর রাগের সুরে বলেছে — "বিনি দোষে নিরপরাধ মানুষটাকে বাড়ি থেকে বিদেয় করে দিতে মনটা একবার কাঁদলও না? ধন্যি মেয়েমানুষ বটে?"[৪৭] সত্য উত্তর না দিলে নবকুমার সত্যকে পড়াশোনার খোঁটা দিতেও সংকোচ বোধ করেনি। নব বলেছে — "মা যা বলে ঠিকই বলে। মেয়েছেলের অধিক বিদ্যে সর্বনাশের মূল।"[৪৮] সত্যবতী ছেলের বিয়ের জন্য শিক্ষিত মেয়ের খোঁজ করলে নবকুমার ব্যঙ্গ করে বলেছে — "শুধু মেয়েকে বিদ্যেবতী করে সাধ মিটছে না, আবার বৌ আনতে হবে তাই? কেন, বৌ এসে তোমার ছেলের পড়া বলে দেবে?"[৪৯] এভাবে নবকুমার নিজের উক্তির মধ্য দিয়ে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি নিজের অসমর্থন ব্যক্ত করেছে। তার রক্ষণশীল, গড্ডলিকাপন্থী অবস্থান পাঠকের কাছে আর অস্পষ্ট থাকে না।

নবকুমার নিজের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে স্বার্থপরতা, অকৃতজ্ঞতা, নীতিহীনতার পরিচয় দিয়েছে। যে ভবতোষ মাস্টারের কাছে নবকুমার ইংরাজি শিক্ষা লাভ করেছে, যে কলকাতায় নবকুমারকে চাকরি ও বাসা বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেই ভবতোষ মাস্টার ব্রাহ্ম হলে তাকে নিজের বাড়িতে আসতে বারণ করেছে। অকৃতজ্ঞ নবকুমারকে ভবতোষ মাস্টারকে বারণ করতে গিয়ে একবারও বিবেকের দংশন হতে উপন্যাসে কোথাও দেখা যায় নি। আবার নিতাই-এর স্ত্রী ভাবিনীর বোনকে তার স্বামী হত্যা করলে বিচার চেয়ে সত্য ইংরাজ পুলিশের কাছে গেলে সে কার্য নবকুমারের মনঃপুত না হওয়ায় সত্যকে বাধা দেবার জন্য স্বার্থপরের মত ভবতোষ মাস্টারকে নিজের বাড়িতে ডেকে আনতে নবকুমার একটুকু সংকোচ বোধ করেনি। ভবতোষ মাস্টারকে দিয়ে সত্যকে প্রতিহত করানোর কাজটি হয়ে গেলে বাড়ি থেকে ভবতোষ মাস্টারের বিদায় হবার অপেক্ষা করেছে। পিতা নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের অসুস্থতার খবর পেয়ে বারুইপুরে গেলেও, শয্যাশায়ী পিতার কাছে সত্য থাকতে চাইলে নবকুমার নিজের অফিস ও সুবিধার জন্য সত্যকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসতে চেয়েছে। সত্য জোর করে থেকে গেলে মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করানোর প্রলোভন দেওয়ার

চেষ্টা করেছে নবকুমার। পিতার অসুস্থতা থেকে নিজের সুখ-সুবিধাকেই বড় করে দেখেছে সে। নিজে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখলেও সদুদির থেকে আশা করেছে নিজের সংসার ফেলে রেখে মামার সেবা যত্ন করুক। সত্য বারণ করলে সদুকে ভাত কাপড়ের খোঁটা দিতেও তার সংকোচ বোধ হয় নি। সে অগ্নিশর্মা মুখে সদু সম্পর্কে সত্যকে বলেছে — "তারও কিছু কম কর্তব্য নয়। যে মামা এতকাল ভাত-কাপড় দিয়ে পুষল—"[৫০] এসব দিক থেকে নবকুমারকে স্বার্থপরই মনে হয়েছে।

সত্য সুহাস ও তার মাকে তাদের বাড়িতে রাখতে চাইলে নবকুমার আপত্তি জানিয়েছে। সে বেজার মুখে বলেছে — "তা সে যার কথা সে বুঝবে, তোমার এত আগ বাড়াবার দরকার কি? শুধু গরীব দুঃখী অবীরে বিধবা ভাজ হত, তার মানে ছিল। এসব কি? না না, এসব কেচ্ছা কেলেঙ্কারি আমার বাড়িতে ঢোকানো চলবে না।"[৫১] এই উক্তির মধ্য দিয়ে নবকুমার নীচ মানসিকতারই পরিচয় দিয়েছে। তবে নবকুমার গুরুজনদের এবং দুর্লভ কুটম্বদের সম্মান দিতে জানে। তাই সদুদির স্বামী এলে সে শশব্যস্ত হয়ে হাতের জিনিস নামিয়ে হেঁট হয়ে পায়ের ধূলো নিয়ে বলেছে — "কী ভাগ্য আমার, পায়ের ধূলো পড়ল এতদিন পরে। কতক্ষণ এসেছেন?"[৫২] নবকুমার চরিত্র সম্পর্কে 'স্ত্রৈণ' শব্দটি বিভিন্ন চরিত্রের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। এমনকি নিজের আক্ষেপধ্বনির মধ্যেও শব্দটি এসেছে। সত্যও নবকুমার সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহার করেছে যখন নবকুমার পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে বিলাপ করে কাঁদতে বসেছে। সত্য কঠিন গলায় বলেছে — "তা স্ত্রৈণ পুরুষের তো এরকম হবেই। সে পুরুষের তুলনা ভেড়ার সঙ্গে। কেঁদে হাট বাধিয়ে আর কি হবে? এখুনি যাতে যাওয়াটা হয় সে ব্যবস্থা কর। কাঁদবার জন্যে অনেক সময় পাবে এর পর।"[৫৩]

নবকুমার সারা জীবন সত্যকে অতিক্রম করতে না পারলেও উপন্যাসের শেষে সে সত্যকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে। নবকুমার সত্যর মতামতকে গুরুত্ব না দিয়ে মায়ের সঙ্গে মিলে সত্যর সঙ্গে শত্রুতা করেছে, যে শত্রুতা তার সংসারকে ভাসিয়ে দিয়েছে। নবকুমার সত্যর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে ষোলো বছর না হলে মেয়েকে বিয়ে দেবে না কিন্তু সে মা এলোকেশীর সঙ্গে মিলে সত্যর অজান্তে নয় বছর বয়সে মেয়ে সুবর্ণকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। সত্যকে দেওয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে পারে নি নবকুমার। সুবর্ণকে বিয়ে দিয়ে সে শুধু সত্যকে দেওয়া প্রতিজ্ঞাই ভঙ্গ করে নি সত্যকে না জানানোর মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে ছেলেমেয়ের উপর মায়ের কোনো অধিকার নেই। তবে সুবর্ণকে বিয়ে দিতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে একটু ভয়ও পেয়েছে ভবিষ্যতে তার সংসারে আসতে পারা ভীষণ বিপর্যয়ের আশঙ্কায়। মাকে প্রতিরোধ করতে না পেরে মায়ের কাজের সমর্থন করলেও কন্যার বিদায়ের মুহূর্ত পর্যন্ত সত্যবতীর অপেক্ষা করেছে অধীর আগ্রহে। সত্য মেয়ের বিয়ে নিয়ে রাগ করে গৃহত্যাগের সংকল্প করলে তাকে বাধা দেবার জন্য অনুনয় বিনয় করেছে, ব্যর্থ হলে নিজের দোষকে লাঘব করার জন্য সত্যকে তার পিতার কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করে সে বলেছে — "তোমার বাবা এত বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনিও তোমাকে আট বছরে গৌরীদান করেছিলেন, সে কথা কই মনে করছ না।"[৫৪]

এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী ব্যক্তিত্বহীন একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তিত্বশালী সত্যবতীর পতি হিসেবে। নবকুমারের দৃঢ়তার অভাব ও প্রতিবাদের অক্ষমতা সত্যবতীকে সর্বদা পীড়িত করেছে এটিও লেখিকা উপন্যাসে দেখিয়েছেন। সত্যবতীর গৌরবময় চরিত্রের আলো স্পষ্ট করতে, আলোর পাশে এই কালো হয়ত সচেতন চরিত্র-পরিকল্পনার ফসল। নবকুমার বাস্তব চরিত্র, গায়ে তার লেগেছে সময়েরই চিহ্ন।

প্রবোধ

'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র সুবর্ণলতার স্বামী প্রবোধচন্দ্র। সেকালের সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দিয়েই তৈরি করেছেন লেখিকা চরিত্রটিকে। তার মানসিকতায় নারীর স্থান পুরুষের অধীনস্থ। স্ত্রীকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানসিকতা বহনকারী প্রবোধ পুরনো ধ্যান ধারণাকে আকড়ে থাকাতেই বেশি পছন্দ করেছে। প্রগতিকে সে ফ্যাশন বলে ভেবেছে। আবক্ষ ঘোমটায় থাকা, প্রতিবাদহীন, স্বামীর পদসেবা করাই স্ত্রীর কাছে তার কাম্য। সুবর্ণর জীবনে চাওয়া ও না পাওয়ার যে যন্ত্রণা তার পেছনে প্রবোধচন্দ্রের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। মুক্তকেশীর মেজ ছেলে প্রবোধচন্দ্র অতি মাত্রায় মাতৃভক্ত। সে জানে মাকে ভক্তি করতে আর স্ত্রীকে শাসন করতে। স্ত্রীর সঙ্গে সখ্যতার সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে তাকে দেখা যায় নি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে দেখা গেছে স্ত্রীকে শাসন করতে। সুবর্ণর জীবনে রয়েছে প্রবোধের কর্তৃত্ব। প্রবোধের সঙ্গে সুবর্ণ কৈশোর থেকে পঞ্চাশ বছর কাটিয়েছে এক অদ্ভুত দাম্পত্য জীবন, যেখানে নেই হৃদয়ের ভালোবাসা আছে শুধু প্রয়োজন। তাইতো সুবর্ণ বার বার এ সংসার ছেড়ে পালাতে চেয়েছে। প্রবোধের আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লেখিকা পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার যথার্থ প্রতিভূ প্রবোধচন্দ্রের চরিত্রে রয়েছে প্রতারণা, স্বার্থপরতা, সন্দেহপ্রবণতা। প্রবোধ আত্মকেন্দ্রিক ও মারকুটে স্বভাবের। সে অর্থবান কিন্তু উদার নয়, সে স্থূল এবং ব্যক্তিত্বহীন একটি চরিত্র। প্রবোধের সন্দেহবাকিতগ্রস্ততার প্রমাণ তার কার্যকলাপে ও কথাবার্তায় ফুটে উঠেছে। প্রবোধ স্ত্রীর ইচ্ছাকে কোনোদিন মর্যাদা দেয় নি। তাই সুবর্ণ দর্জিপাড়ার নতুন বাড়িতে একটা বারান্দা ও ছাতে উঠার সিঁড়ি চাইলে ভাসুর সেটিতে রাজী হলেও প্রবোধ সায় দেয় নি বরং তার নীচ মানসিকতায় বারান্দা চাওয়ার কারণ এরূপে ধরা পড়েছে — "ছাদে উঠে পাঁচবাড়ির জানালায় বারান্দায় উঁকিঝুঁকি দেওয়ার সুবিধে, নিজেকে আর দশজোড়া উঁকি ঝুঁকি মারা চোখের সামনে বিকশিত করার সুবিধে, আর বিশ্বাস কি যে ঢিল বেঁধে চিঠি চালাচালির সুবিধাটাও নয়?"[৫৫] সিঁড়ি দেওয়াতো দূরের কথা বরং মিথ্যা কথা বলে সুবর্ণকে প্রতারণাই করেছে। বাতিকগ্রস্ত প্রবোধ স্ত্রীকে সব সময় আটকে রাখতে চেয়েছে। প্রবোধচন্দ্র স্ত্রীর "পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা তাকানো পর্যন্ত পছন্দ করে না।"[৫৬] প্রবোধের সন্দেহ প্রবণতার কথা বোন সুবালার কথায়ও ধরা পড়েছে — "আজন্মের গোয়ার! বৌটাকে কি তিলার্ধ স্বস্তি দেয়। রাতদিন সন্দেহ,

ওই বুঝি বৌ মন্দ হলো।”[৫৭]

প্রবোধ শুধু সুবর্ণকে শাসনই করে নি শারীরিক অত্যাচারও করেছে। সুবর্ণ কৌতুক করে বিরাজকে অজ্ঞান করার এবং প্রবোধকে লাঞ্ছনা দেবার অপরাধে প্রবোধ সুবর্ণকে তিরস্কারের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক অত্যাচারও করেছে। প্রবোধ তর্ক করতে করতে বীরপুরুষের মত সুবর্ণর খোঁপা সজোরে নেড়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দেবার ভয় দেখিয়ে নিজের পুরুষোচিত মনোভাবকে প্রকটিত করেছে — “তোমার আস্পদ্দার মাত্রা বাড়তে বাড়তে বড্ড বেড়ে গেছে দেখছি! গলাধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিতে পারি তা জানো?”[৫৮] দু’তিন ছেলের মা হয়ে যাবার পরও প্রবোধ সুবর্ণকে প্রহার করা ছাড়ে নি। সুশীলার স্বামী পিতৃতুল্য কেদারনাথের সঙ্গে কথা বলার জন্য সন্দেহ করে প্রবোধ হিংস্র জানোয়ারের মত সুবর্ণর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেয়ালে সুবর্ণর মাথা ঠুকে বলেছে — “বল্ আর বুড়োর সঙ্গে কথা কইবি না। প্রতিজ্ঞা কর!”[৫৯] প্লেগের ভয়ে সুবর্ণকে বোন সুবালার ঘরে রেখে গিয়েও সন্দেহবাতিকগ্রস্ত প্রবোধ শান্তি পায় নি। না জানিয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে সুবালার গ্রামে। সুবর্ণকে অম্বিকার বাড়িতে পেয়ে সুবর্ণকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করেছে অম্বিকার সামনে। সুবর্ণকে অপমানিত করেছে, চিৎকার করে বলেছে — “সাধে কি আর শাস্ত্রে বলেছে, সাপ আর স্ত্রীলোক এই দুইকে কখনো বিশ্বাস করতে নেই।”[৬০] সে আরও বলেছে — “জুতিয়ে মুখ ছিঁড়ে না দিলে মেয়েমানুষ শায়েস্তা হয় না।”[৬১] এভাবেই প্রতি পদে পদে প্রবোধ সুবর্ণকে অপমানিত করেছে নিজের পুরুষতন্ত্রকে প্রতিফলিত করেছে। প্রবোধের ব্যবহারে শুধু অম্বিকাই নয় বোন সুবালাও কষ্ট পেয়েছে এবং দাদাকে গোঁয়ার বলেছে।

কলকাতা শহরের শিক্ষিত ছেলে হলেও প্রবোধের রক্তস্রোতে বয়ে চলেছে নারীকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাবার আদিম ধারাটি। সে নারীদেরকে ‘মেয়েমানুষ’ হিসেবেই ভাবতে শিখেছে। সে নবকুমারের পরবর্তী সময়ের হলেও তার মানসিকতা অনেক নীচু স্তরের। স্থুল, নরম ও বুদ্ধির অভাব হলেও রুচিহীন হতে কখনো দেখা যায় নি নবকুমারকে। তাই তো লেখিকা নবকুমারের বিপরীতে প্রবোধকে এভাবে দেখিয়েছেন “সত্যবতীর স্বামী অসার অপদার্থ ছিল, কিন্তু অশ্লীল ছিল না। সত্যবতীর অযোগ্য হতে পারে, তবে অত্যাচারী নয়। কিন্তু সুবর্ণলতার ভাগ্যে তো মাত্র ওই দ্বিতীয় বিশ্লেষণগুলোই। আজীবন সুবর্ণকে একটা অসভ্য, অশ্লীল আর অত্যাচারীর ঘর করতে হচ্ছে।”[৬২] বউ-এর কথায় মায়ের অপমান বোধের কথা শুনে প্রবোধ উত্তেজিত হয়েছে, মুক্তকেশীর পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে বলেছে — “মা, তোমাকে অপমান করার সাহস যার হয়েছে জুতো তারই খাওয়া উচিত!”[৬৩] আবার সেই পুরুষোচিত গলায় বউকে শাসনের সুরে বলেছে — “মল্লিকা ডেকে আন্ তোর মেজকাকীকে! সোজায় না আসে চুল ধরে নিয়ে আয়।”[৬৪] আরও উত্তেজিত গলায় বলেছে — “বড়বৌ, তোমাদের মেজবৌকে বল মা’র পায় ধরে ক্ষমা চাক্।”[৬৫] উত্তরে সুবর্ণলতা মাপ চাইব কেন বলে পুরুষতন্ত্রকে কাঁপিয়ে দিলে, বউকে শায়েস্তা করার জন্য প্রবোধ বউকে বাপের বাড়িতে দিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

প্রবোধ সুবর্ণকে যতই অপমান অত্যাচার করুক সুবর্ণর দেহের আকর্ষণকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে নি। এক মুহূর্তও সুবর্ণকে ছাড়া তার চলে নি। তাই সুবর্ণকে প্রহার করে পুরুষতন্ত্রকে প্রতিপন্ন করলেও পরক্ষণে নিজ স্বার্থের জন্য সুবর্ণর সঙ্গে আপস করে নিয়েছে সে। প্রবোধের এরূপ ব্যবহারকে লেখিকা এভাবে দেখিয়েছেন — "তাই প্রবোধ একবার জ্ঞানশূন্য হয়ে মারে, পরক্ষণেই জ্ঞানশূন্য হয়ে পায়ে ধরতে চায়।"[৬৬] প্রবোধ স্ত্রীকে ভালোবেসেছে কিন্তু যে আত্মিক ভালোবাসা সুবর্ণ চেয়েছিল তা প্রবোধের কাছ থেকে পায় নি সুবর্ণ, সুবর্ণর উক্তির মধ্য দিয়েও তা ফুটে উঠেছে। কেননা ঃ "সুবর্ণর মূল্য ধার্য হয়েছে শুধু একটা অভ্যাস-মলিন শয্যায়। সেখানে সুবর্ণর জন্যে আগ্রহের আহ্বান অপেক্ষা করে।

কিন্তু সে আগ্রহ কি প্রেমের?

সে আহ্বান কি পুরুষের?

তা নয়।

সে শুধু অভ্যাসের নেশা

তাই সে আহ্বান সুবর্ণর চেতনাকে বিদ্রোহী করে, স্নায়ুদের পীড়িত করে, আত্মাকে জীর্ণ করে।"[৬৭]

সুবর্ণ না চাইলেও বার বার তাকে আঁতুর ঘরের মলিন শয্যায় যেতে হয়েছে। আঁতুর ঘরে যেতে না চাওয়া স্ত্রীলোককে প্রবোধ অসতীর অবিধা দিয়ে বলেছে — "মা হতে অরাজী? তার মানে রূপ যৌবন ঝরে যাবার ভয়? তার মানে পরপুরুষ আর ফিরে চাইবে না এই আশঙ্কা, এই তো? বুঝি সব।"[৬৮] সুবর্ণ প্রবোধের মধ্যে যে তেজ, পৌরুষত্ব খুঁজেছে তা কোনোদিন সে পায় নি। প্রবোধ স্ত্রীকে শাসন করলেও সেটিতে সুবর্ণ প্রহসনই খুঁজে পেয়েছে। স্বামীর মধ্যে সুবর্ণ প্রতি মুহূর্তে অপদার্থের পরিচয় পেয়েছে, সুবর্ণ প্রবোধের মধ্যে চেয়েছে — "পুরুষের মত জ্বলে উঠুক, বজ্রের তেজ নিয়ে জ্বলে উঠুক? মা ভাইয়ের কাছে মুখ রাখতে শাসনের প্রহসন নয়, সত্যিকার শাসন করুক।"[৬৯] কিন্তু সে ব্যক্তিত্ব ছিল না প্রবোধের।

প্রবোধ ভাল মাইনের চাকরি করে, আয় বেশি হলেও পয়সার ব্যাপারে বরাবরই তাকে একটু কৃপণই দেখা গেছে। বোনের বিয়েতে যৌতুকের জন্য প্রবোধ টাকা দিতে চায় নি। এমনকি সুবর্ণ ননদের বিয়ের জন্য নিজের গহনাগুলি তাকে না জিজ্ঞাসা করে দিয়ে দিলে বউ-এর আসপর্দায় রেগে গেছে প্রবোধ। শুধু তাই নয় নিজের ঘরের জিনিস পাছে পরের ঘরে চলে যায় ভেবে গহনাগুলিকে লুকিয়ে ফেলে প্রবোধ চূড়ান্ত স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছে। বোন বিরাজের বিয়ে থেকে গহনা ও টাকা পয়সাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে প্রবোধ। এমনকি মা মুক্তকেশীর শ্রাদ্ধের সময় টাকা নেই বলে কৃপণতার পরিচয়ই দিয়েছে। তবে বরাবরই প্রবোধের স্বভাবে নিজেকে জাহির করার উগ্রতা লক্ষ করা গেছে। তাই যে প্রবোধ মায়ের শ্রাদ্ধের জন্য খরচের চিন্তা করেছে সেই প্রবোধই আবার নিজেকে জাহির করার জন্য সুবর্ণর মায়ের শ্রাদ্ধ করতে চেয়েছে ঘটা করে।

তবে সুবর্ণর উদারতায় মায়ের তীর্থের যাবার ভার সে বহন করলেও নিজের কৃতিত্ব দেখানোর জন্য বলেছে — "সবাইকে আর এই সামান্যর জন্য বলার কি আছে মা? তোমার আশীর্বাদে শ' দুই টাকা আমিই তোমাকে দিতে পারবো।"[৭০]

প্রবোধের মধ্যে মা মুক্তকেশীর মতই রক্ষণশীলতা লক্ষ্য করা যায়। সময়ের অগ্রগতিকে সে মেনে নেয় নি বরং পুরানো ধ্যানধারণাকে আকড়ে ধরে বসে থেকেছে। জাতপাতের ভেদাভেদ সমাজে লঘু হতে থাকলেও প্রবোধের ধ্যানধারণায় সেটিকে লঘু হতে দেখা যায় নি। তাই বোন সুবালার মেয়েদের অকুলীন ঘরে বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সে বলেছে — "মেয়েগুলোর অঘরে-কুঘরে বিয়ে দিচ্ছিস শুনলাম।"[৭১] এমনকি স্ত্রী শিক্ষাকেও সে সমর্থন করে নি। পারুল ও বকুলকে স্কুলে ভর্তি করাতে চাইলে প্রবোধ বাধা দিয়েছে। নির্মলের বকুলকে পড়াতে আসাও বন্ধ করিয়ে দিয়েছে। সুবর্ণর বই পড়া, খবরের কাগজ পড়া নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে। সুবর্ণর খবরের কাগজ পড়া নিয়ে কথা শুনিয়েছে। সুবর্ণকে লেখতে দেখলে বলেছে — "যে সংসারে মেয়েমানুষ 'বিদ্যেবতী' হয়ে উঠে কলম নাড়ে, তাদের যে লক্ষ্মী ছেড়ে যাওয়া অনিবার্য।"[৭২] সে আরও বলেছে — "কলম ধরা হাত যে আর হাতাবেড়ি ধরতে চাইবে না, তাতে আর সন্দেহ কি!"[৭৩] সুবর্ণর গ্রন্থ লেখার বাসনাকে সে ব্যঙ্গ করেছে। সুবর্ণকে লেখতে দেখলে থিসিস টিসিস লেখা হচ্ছে বলে প্রহসন করেছে এবং ছেলেকে বলেছে — "বলিস কিরে ভানু, এ যে সত্যি সেই কলাপাতে না এগোতে গ্রন্থ লেখা সাধ। তোদের গর্ভধারিণীর একেবারে গ্রন্থকার হবার বাসনা।"[৭৪] স্বদেশিদের সুবর্ণ সম্মান করলেও প্রবোধ কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের বিপ্লবীদের পছন্দ করেনি।

প্রবোধ সারা জীবন সুবর্ণকে প্রতারণা করেছে। সে প্রতারণা করেছে দক্ষিণের বারান্দা নিয়ে, প্রতারণা করেছে তাস খেলা নিয়ে, প্রতারণা করেছে জয়াবতীর সঙ্গে সুবর্ণর কেদার বদরি যাওয়া নিয়ে। প্রবোধ প্রতারণা করে সুবর্ণ কেদার বদরি যাত্রার সময় অসুস্থতার বাহানা করে সুবর্ণর যাত্রা ভঙ্গ করেছে। ছেলেদের মাথা ছুঁয়ে তাস খেলবো না বলেও আবার তাস খেলেছে। সুবর্ণকে বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে বলে মিথ্যাকথা বলেছে। বার বার স্বামী প্রবোধের কাছ থেকে প্রতারিত হতে হতে সুবর্ণ ক্লান্ত হয়ে গেছে, সে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। নিজেকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর দিকে। প্রবোধের চরিত্র লেখিকা সুবর্ণর মুখ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন — "এত নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারি না, সহ্য করতে পারি না এত অসভ্যতা। আমার ওই বর, ও কেন এত বিচ্ছিরি। এর থেকে ও যদি খুব কালো আর কুচ্ছিত দেখতে হতো, তাও আমার ছিল ভালো। কিন্তু তা হয়নি। ওর বাইরের চেহারাটা দিব্যি সুন্দর, অথচ মনের ভেতরটা কালো কুচ্ছিত বিচ্ছিরি। .... ও মিছিমিছি করে আমাকে বলেছিল লুকিয়ে আমাকে আমার বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে। সেই কথা বিশ্বাস করে ওকে ভালবেসেছিলাম আমি, ভক্তি করেছিলাম, ওর সব কথা রেখেছিলাম। — খারাপ বিচ্ছিরি সব কথা! — কিন্তু ওর কথা ও রাখে নি। রোজ ভুলিয়ে ভুলিয়ে শেষ অবধি একদিন হ্যা-হ্যা করে হেসে বলেছিল, 'ও বাবা, একবার গিয়ে পড়লে কি আর তুমি আসতে চাইবে! নির্ঘাত সেখানে থেকে যাবে। এমন পরীর মতন বৌটি আমি হারাতে চাই না বাবা!"[৭৫]

এভাবেই লেখিকা এক স্বার্থপর প্রতারক নিষ্ঠুর, আত্মকেন্দ্রিক একটি পুরুষ চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন সুবর্ণলতার যন্ত্রণাকে বৈপরীত্যের আলোয় দৃষ্টিগম্য করার উদ্দেশ্যে এবং তিনি তাতে সফলও হয়েছেন। তাই সুবর্ণর সংগ্রামের পথ সত্যবতীর সংগ্রামের পথ থেকে অনেক বেশি যন্ত্রণাদায়ক, হৃদয়স্পর্শী।

নির্মল (সুনির্মল)

'বকুলকথা' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত রয়েছে কেন্দ্রীয় চরিত্র বকুলের ব্যর্থ প্রেম। উপন্যাসে নির্মলের ভূমিকা শুধু বকুলকে অনামিকা দেবী নামের বিশাল সমুদ্র পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া, তার পর নিজে থেকেই তার জীবনের নৌকা গতি পেয়েছে। অবকাশ পায়নি আর নিজের কথা ভাবতে, বকুলকে নিয়ে চিন্তা করতে। তবে ব্যস্ততার মধ্যেও নির্মল অনামিকা দেবীর মধ্যে বকুলের সত্তাকে জীবিত রাখার চেষ্টা চালিয়েছে। বকুলকে অনামিকা দেবীতে রূপান্তরিত করা এবং মাঝে মাঝে বকুলসত্তাকে উজ্জীবনের কাজের জন্যেই কথাকার নির্মল চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন বলে মনে হয়। উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহে তার বিশেষ প্রয়োজন মনে হয় নি তাই লেখিকা অতি শীঘ্রই নির্মল চরিত্রকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তাকে শুধু জীবিত রেখেছেন বকুলের হৃদয়ের কোণে, অনামিকা দেবী ও মাধুরী বউ-এর সংস্পর্শে আসার মধ্য দিয়ে।

নির্মলকে আমরা পেয়ে যাই 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের শেষের দিকে। সে বকুলদের পাশের বাড়ির অনুপমবাবুর ছেল সুনির্মল। বকুলের নির্মলদা। 'সুবর্ণলতা'য় দেখা গেছে নির্মল বকুলকে পড়াতে এসেছে বকুলদের বাড়ি। প্রবোধচন্দ্রের রক্ষণশীল মানসিকতা সেটিতে সায় দেয় নি তাই সে নির্মলের বকুলকে পড়ানোর ব্যাপারটা বন্ধ করে দিয়েছে। ভীরু, লাজুক নির্মলের মনে ছিল জেঠিমার ভয়। সে সবসময় জেঠিমার ভয়ে তটস্থ থাকত। দু'মিনিটও নির্মল জেঠিমার চোখের আড়াল হতে পারত না। নিজের ঘ্রাণশক্তিতে নির্মলকে গরু খোঁজা করে বের করে নিত জেঠিমা। জেঠিমার ছিল নির্মলকে শাসন করার ভীষণ অধিকার। বকুল অনামিকা দেবী হবার পর সুনির্মলের স্বভাবকে মনে করে হেসেছে — "ভাবলে হাসি পায় একটা পুরুষ ছেলে প্রায় একটা ভীরুলাজুক তরুণী মেয়ের ভূমিকায় রেখে দিতো নিজেকে।"[৭৬] শুধু বকুলই নির্মলকে ভালোবাসেনি নির্মলও ভালোবেসেছে বকুলকে। নির্মলের ছিল বকুলের প্রতি গভীর ভালোবাসা। কিন্তু অভিভাবককুলকে বিয়েতে রাজী করিয়ে বকুল ও তার প্রেমকে সার্থকতা দেওয়ার মত সাহস তার ছিল না। বকুলও নির্বোধের মতই থেকেছে কোনোদিন নির্মলকে বিয়ে করবে কি না প্রশ্ন করার সাহস পায় নি। তাই অনামিকা দেবী বকুলকে ভীরু নির্বোধ ও বেচারী বলেছেন, তারই সঙ্গে নির্মলের ভীরুতা দেখিয়ে বলেছেন — "কিন্তু ভীরু হওয়া ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল বকুলের? কার ভরসায় সাহসী হবে? পাশের বাড়ির সেই ছেলেটার ভরসায়? অনামিকা দেবীর মুখে সূক্ষ্ম একটি কৃপার হাসি ফুটে ওঠে। হাতে একবার হাত ছোঁয়ালে শীতের দিনে ঘেমে যেত ছেলেটা। একটু 'ভালোবাসার' মতো কথা কইতে গেলে কথাটা জিভে জড়িয়ে যেতো তার আর জেঠিপিসির ভয়ে চোখে সর্ষেফুল দেখতো।"[৭৭]

তাদের প্রেমালাপের সীমানা ছিল লাইব্রেরির বই, নির্মলই বকুলকে বইয়ের যোগান দিত। হয়তো সুনির্মলের বইয়ের যোগান দেওয়ার মধ্য দিয়ে বকুলের লেখিকা হবার পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টাও লেখিকার মনে কাজ করেছে। তাদের দেখা হলেও কেউ আসছে কি না এ নিয়ে ভয়ে জড়সড়ো হয়ে থাকত তারা। তাদের মধ্যে প্রেমের কথা নয়, আলাপ হত বই নিয়ে। বকুল জিজ্ঞাসা করত "ইয়ে — নির্মলদা লাইব্রেরীর একটা বই দেবেন বলেছিলেন—"[৭৮] বকুল ও নির্মলকে জেঠিমা একসঙ্গে দেখে ফেললে বকুল কিছুদিন তাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিত। কিন্তু নির্মলের আবেদন ভরা চোখের কাছে বকুল হেরে যেত তাই আবার ছুটে আসত সুনির্মলদের বাড়িতে। নির্মলকে বকুলের সেজদি পারুল বলত — "বোকা, হাঁদা নীরেট।"[৭৯] পারুল আবার জেঠিমাকে নির্মলের ভয় পাওয়া নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলত — "হতভাগাটা বুঝি সেই মা-জেঠির আঁচলচাপা খোকা হয়ে বসে আছে? কোন চেষ্টা করেনি?"[৮০] পারুল বুঝে নিয়েছিল বকুল ও নির্মলের প্রেমকে তাকেই তরী বেয়ে সার্থকতায় পৌঁছে দিতে হবে এবং সে চেষ্টাও সে করেছিল। কিন্তু নির্মল পারুলের আহ্বানেও সাড়া দেয়নি বরং বাড়ির লোকদের কথাই চিন্তা করেছে। পারুলকেই অপদস্থ হতে হয়েছে জেঠিমার কাছে।

পারুল নির্মল ও বকুলকে বিয়ে দিতে চায়। তাই বাবা প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলে। প্রবোধকে জাতপাতের ঊর্ধ্বে রাজি করিয়েছে এবং জেঠিমাকেও বোঝানোর চেষ্টা করেছে। জেঠিমা বারণ করলেও পারুল শেষ চেষ্টাটুকু করেছে রাস্তায় নির্মলকে বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। পারুল নির্মলের কাছ থেকে কোনো সাড়া পায় নি, পারুলের হাতে লেগেছে শুধু ব্যর্থতা। এমনকি নির্মল পারুলের সঙ্গে রাস্তায় কথা বলতেও ভয় পেয়েছে পাছে তাকে কেউ দেখে নেয় ভেবে। পারুল তথাপি নির্মলকে জিজ্ঞাসা করেছে বাড়ির অমতে বিয়ে করার সাহস আছে কি না এবং বাড়ির অমতকে স্বমতে আনার শক্তি তার মধ্যে আছে কি না। পারুলের প্রশ্নের কাছে নির্মল নিজের ভীরুতাকে ফুটিয়ে তুলেছে এভাবে — "নির্মল মাথা নীচু করেছিল। নির্মল অকারণেই আবার কপালের ঘাম মুছেছিল। তারপর অস্ফুট ভাষায় বলেছিল, 'তা কী করে হয়?'[৮১] নির্মল আবার অবরুদ্ধ গলায় বলেছে মাকে রাজী করানো গেলেও জেঠাইমাকে রাজী করানো অসম্ভব। পারুল উপহাস করে বলেছে — "যাও আর তোমায় আটকাবো না। জেঠাইমা হয়তো তোমার দুধ গরম করে নিয়ে বসে আছেন!"[৮২] নির্মল জেঠিমার অবাধ্য হবার কথা ভাবতে পারেনি কিন্তু একটি মেয়ের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা বোধ করেনি। শুধু তাই নয় বকুলকে প্রত্যাখ্যান করার পরও সে তার প্রেমের গভীরতা ও নিজের অসহায়তার কথা পারুলকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে — "আমিও বেঁচে নেই পারুল— হঠাৎ নির্মলের চোখ দিয়ে দু'ফোটা জল গড়িয়ে পড়েছিল। কোঁচার কাপড় দিয়ে সেই জলটুকু মুছতে মুছতে চলে গিয়েছিল নির্মল, 'আমার মনের অবস্থা বোঝবার ক্ষমতা তোমাদের কারুরই নেই পারুল।"[৮৩] ব্যর্থ পারুল নির্মলকে মাটির পুতুল অভিধা দিয়ে বকুলকে বলেছে — "আশ্চর্য ভাবতেই পারি না একটা মাটির পুতুলকে তুই —"[৮৪] তারপর যথারীতি বাড়ির লোকের পছন্দমতো নির্মল বিয়েও করে নিয়েছে। ভীরু নির্মল বকুলের সঙ্গে তার

প্রেমকে সার্থকতা দিতে না পারলেও বকুলকে ভুলে যেতে পারে নি এবং ত্যাগ করতে পারে নি বিবাহিতা স্ত্রী মাধুরীকে। নির্মল নামের মেরুদণ্ডহীন ছেলেটার উপর বকুলও রাগ পুষে রাখতে পারে নি। ধীরে ধীরে নির্মল তার স্ত্রী মাধুরীর প্রেমে পড়তে থাকে। পারুলকে নিরুপায়তা বোঝানোর মত আর একবার বকুলকেও মাধুরীকে নিয়ে নির্মল তার নিরুপায়তা বোঝানোর চেষ্টা করেছে। নির্মলের নিরুপায়তাকে লেখিকা এভাবে দেখিয়েছেন — "বলেছিল নির্মলই ম্লান বিষণ্ণ মুখে। নির্মলের মুখে তখন চাঁদের আলোর মত একটা স্নিগ্ধ আলোর আভাস ফুটে উঠেছিল। নির্মল তার ওই 'দেবীর মত মেয়ে' বৌয়ের মহিমান্বিত হৃদয়ের পরিচয়ে বিমুগ্ধ হতে শুরু করেছে, নির্মল আস্তে আস্তে তার প্রেমে পড়তে শুরু করেছে তখন। আর নির্মল যেন তাই ব্যাকুল হয়ে বকুলকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে নির্মল কতো নিরুপায়।"[৮৫] নির্মল মাধুরীকেও ত্যাগ করতে পারেনি এবং তার প্রথম প্রেম বকুলকেও ভুলতে পারেনি তাই সন্তান জন্ম হওয়ার পরও নিভৃতে স্মৃতিকোঠার থেকে বকুল নির্মলের দিনলিপির খাতায় উঠে এসেছে — "বকুল বকুল। তুমি আমার জীবনের স্থির লক্ষ্য। তুমি আমার ধ্রুবতারা .... আমার সবকিছুর মধ্যে তুমি। .... বকুল .... যখন একা থাকি .... চুপি চুপি তোমার নাম উচ্চারণ করি ....।"[৮৬]

চাকরির সূত্রে নির্মল অন্যত্র চলে গেলেও ছুটিতে বাড়ি এলেই কম বয়সের মত নানা উপলক্ষ খুঁজে অনামিকা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে, একদিন যে ভাবে বকুল ছুটে যেত নির্মলদার বাড়িতে নির্মলকে দেখার জন্য। নির্মল খুঁজে খুঁজে বাংলা পত্রিকা এনে অনামিকা দেবীর লেখা পড়েছে। নির্মল অনামিকা দেবীকে অনুরোধ করেছে তাদের বাল্য প্রেমের কাহিনি নিয়ে গল্প লিখতে। এর মধ্য দিয়ে নির্মল বকুল ও তার ব্যর্থ প্রেমকে জীবিত রাখতে চেয়েছে লেখিকা অনামিকা দেবীর হৃদয়ে। নির্মল বলেছে — "কতো গল্প লিখছো, আমাদের গল্পটা লেখ না।"[৮৭] উত্তরে অনামিকা দেবী "আমাদের গল্প? সেটা আবার কী বস্তু?"[৮৮] বললে নির্মল বেদনাভরা হৃদয়ে ছেলে মানুষি গভীর চাহনির মধ্য দিয়ে গভীর গলায় অভিমানের সুরে বলেছে — "এখন হয়তো সে বস্তু তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে, অনেক বড় হয়ে গেছো তুমি, তবু আমার কাছে সে সমান মূল্যবানই আছে। তুচ্ছ হয়ে যায় নি।"[৮৯] এভাবে বার বার নির্মল অনামিকা দেবীর হৃদয়ে তাদের পুরানো প্রেমকে জীবিত রাখার চেষ্টার মধ্য দিয়ে অনামিকা দেবীর খোলসে থাকা বকুলের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। নির্মলের আবেগ ভরা উক্তিতে অনামিকা দেবীর মমতা হয়েছে তার মনে হয়েছে — "হঠাৎ যেন কোথায় কোন্ ধুলোর স্তরের নিচে থেকে মাথা তুলে একটা বিশ্বাসঘাতক দুষ্ট চুপি চুপি বলে উঠেছিল 'বাজে কথা বলছ কেন? বুকে হাত দিয়ে বল দিকি জিনিসটা জিনিসটা একেবারে তামাদি হয়ে গেছে, একথা তুমি নিজেই বিশ্বাস করো।"[৯০] তখন পর্যন্তও নির্মলের সেই চোখের ঝলকানিটা যায় নি যে চোখের আহ্বানে বকুল ছুটে যেত নির্মলদের বাড়িতে। সে চোখের ঝলকানি অনামিকা দেবীর কাছেও ধরা পড়েছে। অনামিকা দেবী হেসে উড়িয়ে দিলেও নির্মল বার বার তাদের গল্প লেখার কথা বলেছে, যে গল্প শুধু তারাই বুঝবে আর কেউ বুঝবে না। অনামিকা দেবী হেসে সুন্দরী স্ত্রী, সোনার চাঁদ ছেলে, মোটা মাইনের চাকরি, কর্মস্থলে প্রতিপত্তির কথা নির্মলকে

মনে করিয়ে দিলে নির্মলের চোখের ঝকঝকানি যেন মেঘের ছায়ায় আবৃত হয়ে যায় এবং সে ভারাক্রান্ত মনে বলে — "সুন্দরী স্ত্রী, মোটা মাইনের চাকরি, সেটা বাইরের লোক দেখবে। তুমি লেখিকা, তুমিও সেটাই দেখবে? লেখিকা দেখবে সমারোহের অন্তরালে অবস্থিত দৈন্য। দেখবে অনেক জমজমাটের ওপিঠের গভীর শূন্যতা।"[৯১] এসব উক্তির মধ্য দিয়ে নির্মল বকুলকে হারানোর বেদনাই দেখাতে চেয়েছে লেখিকা অনামিকা দেবীকে। নির্মলের কথায় অনামিকা দেবীর মনে হতে থাকে — "এমনি ছোট ছোট কথার চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নির্মল নামের ছেলেটা বুঝি অনামিকা দেবীর সেই অনেক আগে বন্ধ করে দেওয়া, অনেক নীচের পাতলা ঘরটা খুলে ফেলতে চায়।"[৯২] বকুলের ভাবতে অবাক লাগে যে ছেলে ও বউ মাধুরীকে প্রাণতুল্য মনে করে সেই আবার বকুলের প্রেমকে প্রথম প্রেম বলে আঁকড়ে ধরে আছে কেমন করে। "আশ্চর্য লাগে এই ভেবে, অথচ মাধুরী বৌকে ও প্রাণতুল্য ভালবাসে। নিবিড় গভীর স্নেহ-সহানুভূতি-ভরা সেই ভালবাসার খবর বকুলের অজানা নয়। অজানা নয়, এই অনামিকা দেবীরও। তবু সেই অতীত কৈশোরকালের 'প্রথম প্রেম' নামক হাস্যকর মূঢ়তাটুকুকে আজও আঁকড়ে ধরে রেখেছে লোকটা।"[৯৩] বদলির চাকরি তাই ছুটিতে বাড়িতে আসত নির্মল। নিজের সংসারে মগ্ন হবার পর ধীরে ধীরে বাড়িতে আসা কমে যায়। মা বাবা মারা যাবার পর নির্মল আর বাড়িতে আসে নি। নির্মলদের ঘরগুলো চাবিবন্ধ অবস্থায় পড়ে থেকেছে। ছুটিতে নির্মল অন্য দেশে যায়। নির্মলদার বাড়ির বাকি অংশের দখলদার জেঠিমার ভাইপোরা। একদিন মাধুরী বউ যখন আবার নির্মলদার তিনতলার ঘরটাতে থাকতে আরম্ভ করে তখন আর নির্মল বেঁচে নেই। নির্মল বকুলকে না জানিয়েই বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে। বকুলের বার বার মাধুরীকে নির্মলদার মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়েছে কিন্তু সাহস করে উঠতে পারে নি। নির্মলের প্রয়োজনটুকু ফুরিয়ে গেলে লেখিকা নির্মলকে আর উপন্যাসে রাখার প্রয়োজন মনে করেন নি। এভাবেই লেখিকা প্রয়োজনের তাগিদে নির্মল চরিত্রটিকে নির্মাণ করলেও চরিত্র সৃষ্টিতে ত্রুটি দেখা যায় নি। একটি আবেগকোমল অথচ কর্তব্যপরায়ণ পুরুষ হিসাবে, যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও, নির্মল যেন নবকুমার - প্রবোধচন্দ্র থেকে পাঠকের বেশি আপন মনে হয়। আশাপূর্ণার নির্মাণশৈলীর স্মারক এই চরিত্রটি।

আশাপূর্ণা দেবীর সৃজনবিশ্বে কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্র

প্রধান নারী চরিত্র ও পুরুষ চরিত্র ছাড়াও ত্রয়ী উপন্যাসে বহু পার্শ্ব চরিত্র রয়েছে যারা উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকে লেখিকার বক্তব্যকে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে, উপন্যাসকে গতি দান করেছে। প্রধান চরিত্র না হয়েও তারা উপন্যাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে পড়েছে। চরিত্রগুলির প্রধান চরিত্রের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। উপন্যাসে কিছু নারী চরিত্র রয়েছে যারা নারী হয়েও পুরুষতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। তাদের মন হয়ে উঠেছে উপনিবেশিকৃত। তাদের ধ্যানধারণায় কার্যকলাপে ছড়িয়ে রয়েছে পুরুষতন্ত্র তারা নারী

হয়েও নারীর মুক্তিতে অবরোধকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এরা নারী হয়েও নারীর উপর চালিয়েছে অত্যাচার। এসব চরিত্রের মধ্যে রয়েছে এলোকেশী, মোক্ষদা, মুক্তকেশী প্রভৃতি কর্ত্রীস্থানীয় চরিত্র। কিছু চরিত্র রয়েছে অন্তঃপুরের কঠোর অনুশাসনে পিষ্ট গৃহবদ্ধ বউয়ের ভূমিকায়, তাদের মধ্যে রয়েছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র ভুবনেশ্বরী এবং 'সুবর্ণলতা'র উমাশশীর মত চরিত্রগুলি। আবার পার্শ্বচরিত্র হয়েও প্রতিবাদী চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে সারদা ('প্রথম প্রতিশ্রুতি'), পারুল ('সুবর্ণলতা', 'বকুলকথা') চরিত্রগুলি। আবার প্রগতিশীল চরিত্রের মধ্যে রয়েছে সুহাস ('প্রথম প্রতিশ্রুতি') চরিত্রটি। পারুল চরিত্রটি সামাজিক বাধা নিষেধ অমান্য করে আধুনিক মনোভঙ্গীর পরিচায়ক আর শম্পা ('বকুলকথা') চরিত্রটির মধ্যে রয়েছে তেজ এবং সব বাধাকে অতিক্রম করার দুর্বার শক্তি। এভাবেই আশাপূর্ণা বিভিন্ন ধরনের পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টি করে উপন্যাসে দেশকালের ছবিকে জীবন্ত করে তুলেছেন।

এলোকেশী

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র একটি অন্যতম চরিত্র এলোকেশী। পার্শ্বচরিত্র হলেও তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে সত্যবতীর প্রতিপক্ষ রূপে চরিত্রটি উপন্যাসে যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে। এলোকেশী নবকুমারের মা, নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের পত্নী ও সত্যবতীর শাশুড়ি। উনিশ শতকের শেষার্ধের সামাজিক প্রেক্ষাপটে দজ্জাল শাশুড়ির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তিনি। এলোকেশী দাপুটে, ভয়ঙ্কর ঈর্ষাপরায়ণ এবং অসহিষ্ণু। ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে নেই। তাঁর চরিত্রে রয়েছে পারিবারিক অনুশাসনবদ্ধ সংসার রাজনীতির কূট কৌশল আর মিথ্যে অহংকার। মুখরা ও বাচাল স্বভাবের জন্য পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে তাঁর যথেষ্ট বদনাম রয়েছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ও ব্যবহারে গ্রাম্য সংস্কার ও সংকীর্ণতা লক্ষণীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এলোকেশী ও স্বামী নীলাম্বর দুজনেই কৃপণ প্রকৃতির। এলোকেশী গোপনে সুদের কারবার করেন। তাঁর সিন্দুকে পাড়া-প্রতিবেশীদের অনেক সোনাদানা গচ্ছিত রয়েছে। তিনি গ্রাম্য সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রেখে অন্যদের জীবন দুর্বিসহ করে তুলেছেন। এলোকেশী গ্রাম্য গিন্নি হলেও ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস নেই, তার আভাস মেলে সৌদামিনীর কথাতে — "মামী আবার এমন সময়ে কবে ওঠে রে নবু? ভোর ঠাকুরের সঙ্গে যে মামীর বিরোধ।"[৯৪]

এলোকেশীর কথা দিয়ে কথা না রাখার প্রমাণ রয়েছে সময়ের আগে সত্যকে বাপের বাড়ি থেকে আনতে পাঠানোর মধ্যে। এমনকি সময়ের আগে আনতে গেলে রামকালী দিতে রাজী না হওয়ায় ছেলেকে দ্বিতীয় বিয়ে করানোর কথা বলেছেন। বউ সত্যবতীর বাচালতার কথা নাপিত বউর মুখে শুনে এলোকেশী বলেছেন — "বাচাল! আর সে কথা এতক্ষণ বলছিস না তুই? হবেই তো, বাচাল হবে না? বাপের চালচলন তো বুঝতেই পারছি, পয়সার গরমে ধরাকে সরা দেখেন, মেয়েকে আসকারা দিয়ে ধিঙ্গী অবতার করে তুলেছেন আর কি! আমিও এলোকেশী বামনী, বাচাল

বৌকে কেমন করে টিট্ করতে হয় তা আমার জানা আছে?"[৯৫] এভাবেই এলোকেশী নিজের উপর আস্থা ও ক্ষমতাকে জাহির করেছেন। আবার সত্য শ্বশুরবাড়িতে এলে প্রতি পদে পদে সত্যকে দমানোর চেষ্টাও চালিয়েছেন তিনি। রেগে গেলে এলোকেশী জ্ঞানহারা হয়ে যান, তার প্রমাণ মিলে সত্যর চুল বাঁধার ঘটনার মধ্য দিয়ে। এলোকেশী সত্যর চুলে খোপা বাঁধতে গেলে সত্যর নড়ে বসায় তাঁর মনমতো খোঁপা বাঁধতে না পারায় সত্যর পিঠে কিল বসান। সত্য প্রতিবাদ করায় তিনি আরও রেগে যান, তাঁর আধিপত্যপ্রবণ মন বউ থেকে পালটা উত্তরের প্রত্যাশা করে নি। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় তাঁরা মূক, প্রতিবাদহীন, শাশুড়ির ভয়ে তটস্থ, ঘোমটায় আবৃত বউকে দেখতেই অভ্যস্থ। তাঁদের মানসিকতায় বউ-এর ভূমিকা শাশুড়ি, শ্বশুর ও স্বামীর সেবা করার মধ্যে আবদ্ধ। তাই সত্যর প্রতিবাদে রেগে গিয়ে এলোকেশী জ্ঞানশূন্য হয়ে যান, আরো বেশি রেগে গিয়ে বলেন "কী বললি? আর কোনদিন যেন? গলা টিপলে দুধ বেরোয় এক ফোঁট্টা মেয়ে, তার এত বড় কথা! মেরে তোকে ধুনতে পারি তা জানিস্? .... সদি লক্ষ্মীছাড়ি, আন্ দেখি চ্যালাকাঠ, কেমন করে বৌ টিট্ করতে হয় দেখাই ত্রিজগৎকে। চ্যালাকাঠ পিঠে পড়লেই তেজ বেরিয়ে যাবে।"[৯৬] এভাবেই এলোকেশীর নিষ্ঠুরতার চূড়ান্ত দিকটি আমাদের সামনে উৎঘাটিত করেছেন লেখিকা। এলোকেশীর মধ্যে মায়া মমতার লেশ মাত্র আমাদের চোখে পড়ে না। ছোট বলে সত্যকে ক্ষমা করতে দেখা যায় নি তাঁকে, বরং অহরহ বউকে দমানোর কৌশল, শায়েস্তা করার পন্থা বের করেছেন তিনি। তবে যতই চেষ্টা করুন সত্যকে অতিক্রম করতে তিনি পারেন নি। সত্যকে কিল দিয়ে গালি দিয়েও তার রাগ কমে নি তাই ছেলেকে দিয়েও বউকে শায়েস্তা করার কথা বলেছেন — "ওরে লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা মেনিমুখো ছোঁড়া, পায়ে কি তোর জুতো নেই? জুতিয়ে জুতিয়ে ওর মুখটা যদি জন্মের শোধ ছেঁচে শেষ করে দিতে পারিস তবে বলি বাপের বেটা বাহাদুর।"[৯৭]

এলোকেশী শুধু অত্যাচারীই ছিলেন না সন্দেহবাতিকগ্রস্তও ছিলেন। তাই রামকালী সত্যর শ্বশুরবাড়িতে এলে এলোকেশী সত্যকে বাবার সামনে একা যেতে দেননি পাছে সত্য যদি বাবার কাছে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে কিছু নালিশ করে, সে ভয়ে। এমনকি সত্যবতী ও সদু কথা বলতে থাকলে তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন কী ষড়যন্ত্র হচ্ছে তা শোনার জন্য। এলোকেশী দজ্জাল হয়েও স্বামীর বাগদিপাড়ায় যাওয়াকে অনায়াসে মেনে নিয়েছেন এবং শ্বশুরের চরিত্রহীনতার জন্য সত্যর শ্বশুরকে শ্রদ্ধা করতে না পারার কথায় এলোকেশী সত্যর উপরই রেগে গেছেন এবং স্বামীর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার অভিনয় করেছেন। সাংসারিক কাজের কোনো দায় নেই এলোকেশীর, সেগুলি বউ ও সদুর উপর ছেড়ে রেখেছেন। এলোকেশীর দেব-দ্বিজে পরম ভক্তি। তাই সকালবেলা স্নান সেরে এসেই পূজার ঘরে ঢোকেন। কর্তাগিন্নির যাবতীয় বিশ্রম্ভালাপ ঐ পূজার ঘরেই। কূটনীতিজ্ঞ এলোকেশী সত্যর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছেন, শয়তানি করেছেন। সত্যর মা মারা যাবার পর সত্যর দুঃখ থেকে নিজের চক্রান্তকেই বড় করে দেখেছেন এবং সত্যকে সবার কাছে ছোট করার চেষ্টা করেছেন। সত্যর মায়ের মৃত্যুর পর সত্যর আঁতুড় ঘরের দরজায় এসে এলোকেশী কঠিন মুখটা কোমল করে বলেছেন — "আঁতুড় ঘরে কাঁদতে নেই, কাঁদলে ছেলের অকল্যাণের ভয়, নাড়ির

দোষ হবার ভয়"[৯৮] বলে ভয় দেখিয়ে মায়ের মৃত্যুর সংবাদ সত্যর কাছে দিয়েছেন। সত্য ছেলের অকল্যাণের ভয়ে না কেঁদে দুঃখকে বুকের মধ্যে আটকে রাখলে এলোকেশীই আবার পাড়াগাঁয়ে প্রতিবেশীদের কাছে এসে সত্যর নিষ্ঠুরতাকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে বলেছেন — "দেখলি তো? মিথ্যে বলি কাঠ প্রাণ? মা মরার খবর শুনে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে বসে রইল, ডুকরে কেঁদে উঠল না।"[৯৯] এলোকেশীর এরূপ ব্যবহারে বোঝা যায় তাঁর মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ, দয়ামায়া করুণার লেশমাত্র নেই। আবার শ্বশুর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের অসুস্থতার সময় সত্য কলকাতা থেকে শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুরের সেবা করতে এলে এলোকেশী নাতিনী সুবর্ণকে নিয়ে পাড়া বেরিয়েছেন এবং শিশু সুবর্ণর মনকে মায়ের বিপক্ষে চালনা করার প্রয়াস চালিয়েছেন।

এলোকেশীর নীচ মানসিকতার পরিচয় আরো বেশী করে ফুটে উঠেছে ছেলে নবকুমারের অসুস্থতার সময়। ছেলে বউকে জব্দ করতে গিয়ে শাপ দিয়েছেন, সত্যর অকল্যাণের আশা করছেন কিন্তু সত্যর সঙ্গে সঙ্গে ছেলের অকল্যাণও যে তিনি ভাবছেন তা তাঁর চিন্তায় আসে নি। এলোকেশী চান বউয়ের তেজ-দাপট খর্ব হোক এবং সঙ্গে ছেলে বেঁচে উঠুক কিন্তু দুটার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। ছেলে সেরে ওঠার থেকে তার দর্পই বড় হয়ে উঠেছে এ পর্যায়ে। ছেলের জন্য শত সহস্রবার তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে মাথা খুঁড়লেও সত্যর বাবা রামকালীর ঔষধে নব ভাল হয়ে উঠলে এলোকেশীর অপমানবোধ হবে ভেবে এবং সত্যর দাপট আরো দেখতে হবে এই আশঙ্কায় রামকালীকে খবর দিতে তাঁর তৎপরতা দেখা যায় নি। এলোকেশীর মানসিকতাকে লেখিকা ব্যক্ত করেছেন এভাবে — "ছেলের প্রাণের জন্য শত-সহস্রবার তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে মাথা খুঁড়ছেন এলোকেশী, কিন্তু বৌয়ের তেজ-দর্পটা খর্ব হোক, এটাও প্রার্থনা। দুটোর সামঞ্জস্য বিধান হয় না।"[১০০] সত্যর সাহেব ডাক্তার ডাকা এবং নিজের গহনা বেঁচে স্বামীর চিকিৎসা করার ব্যাপারটিও এলোকেশীর মনঃপূত হয় নি। ছেলে মেয়ে ও স্বামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ভেবে সত্য নবকুমারকে নিয়ে কলকাতায় বাসাবাড়িতে গেলে সত্যকে অভিশাপও দিয়েছেন এলোকেশী।

অনেক ক্ষেত্রেই এলোকেশীর স্বার্থপরতার পরিচয় ফুটে উঠেছে উপন্যাসে। এমনকি নিজের স্বার্থে ব্যাঘাত হলে গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হন নি তিনি। সুবর্ণলতার জন্মের পূর্বে নবকুমার বারুইপুর থেকে সদুকে আনতে যায় সত্যর আঁতুড় কুলানোর জন্য। কিন্তু এলোকেশী তাঁর রাধুনি পরিচর্যাকারিণী এবং নিঃসঙ্গ সংসারের সঙ্গিনী সদুকে মর্যাদা দিতে নারাজ। বউ সত্যবতীকে 'হারামজাদী', 'শতেকখোয়ারী', 'হাড়বজ্জাত' ইত্যাদি গালাগালে ভূষিত করেন। এমনকি সৌদামিনী যেতে চাইলে তাকে বলেছেন — "আক্কেলখাকী, চোখের মাথাখাকী, নেমকহারাম, লক্ষ্মীছাড়ি। তুই আমাদের একা ফেলে সেই হাড়হাবাতির পাদোদক খেতে যাবি?"[১০১] এই ধরনের কথার মধ্য দিয়ে নিজের অশ্লীল ও গ্রাম্য রুচির পরিচয় দিয়েছেন। শুধু গালি দিয়েই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি, সত্যকে অভিশাপও দিয়েছেন তিনি — "ভগবান, যে সর্বনাশী আজীবন আমার বুকে কুল কাঠের আংরা জ্বেলে রেখে দগ্ধালো, আর বুড়ো বয়সে এই কোমরের বলটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে মজা দেখতে বসল, তুমি তার বিচার করো। যদি 'ন্যায়পরায়ণ' হও তো সর্বনাশীর যেন তেরাত্তির না

পোহায়! তার ভরা ঘরে যেন দোর পড়ে, তার মুখের গেরাস যেন বাসি চুলোর ছাই হয়ে যায়, এহকালে পরকালে যেন তার গতি না হয়।"[১০২] বলে সত্যকে অভিশাপ দিয়েছেন।

সত্যবতীর কোনো ভাল কাজই চোখে পড়েনি অকৃতজ্ঞ এলোকেশীর। তাইতো স্বামী নীলাম্বর বাড়ুয্যের সেবা সত্য যে দিনরাত করেছে তা তার চোখে পড়েনি। শ্বশুরের অসুস্থতার খবর পেয়ে সত্যবতী স্বামী নবকুমারকে সঙ্গে নিয়ে বারুইপুরে এসেছে কিন্তু এলোকেশী ভেবেছিলেন নবকুমারকে সত্য আসতে দেবে না, তাই বউ-এর নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। কিন্তু সত্য শাশুড়ির আশাভঙ্গ করায় এলোকেশী উত্তেজিত হয়ে বাইরে এসে বলেন — "ওরে নবা লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা, এই শেষাবস্থায় এলি তুই বাপের মরা মুখ দেখতে? এলি এলি, তুই একলা এলি না কেন? ওই মায়াবিনী রাক্ষুসীকে নিয়ে এলি কেন? কী দেখতে এসেছে ও? মজা দেখতে? চিরদিনের দাপুটে শাশুড়ির তেজ-দপ্প ভাঙা দেখতে এসেছে ও? শাঁখা-সিঁদুর ঘোচা দেখতে এসেছে?"[১০৩] এখানেও স্বামীর অসুস্থতার থেকে নিজের দর্পটাই বড় হয়ে উঠেছে এলোকেশীর। শ্বশুরের অসুস্থ অবস্থায় দেড় বছর বারুইপুরে থেকে শ্বশুরের সেবা করেছে সত্য। তাকে নবকুমার কলকাতায় নিয়ে যেতে চাইলেও সে যায়নি, এমনি মেয়ের স্কুলে ভর্তি করানোর স্বপ্নকেও জলাঞ্জলি দিয়েছে সত্য। কিন্তু অকৃতজ্ঞ এলোকেশী নিজের ছেলের দোষকে ঢাকা দিয়েছেন। ছেলেকে 'পিতৃমাতৃভক্ত' বলেছেন এবং বউ-এর দোষকেই বড় করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন বান্ধবীদের কাছে — "যাবার জন্য লাফিয়েছিল হারামজাদী। নবা কান করে নি। মুখে 'নাথি' মেরে একা চলে যাবে বলেছে! সেই নিয়ে ভাই কী ঝগড়া, কী ঝগড়া! কাক ওড়ে তো চিল পড়ে!"[১০৪] শুধু এই মিথ্যাচারই নয় নাতিনী সুবর্ণর পড়াতে বাধার সৃষ্টি করে সত্যর মনবাঞ্ছা পূরণ করতে না দিতে বদ্ধপরিকর হতে দেখা গেছে এলোকেশীকে। এমনকি সুবর্ণকে মায়ের থেকে দূরে সরানোর জন্য চক্রান্তও করেছেন। মায়ের প্রতি শিশু সুবর্ণর মনকে বিষিয়ে তুলেছেন — "তোর মা'র কি ইচ্ছে জানিস? কলকাতায় গিয়ে তোকে মেমের ইস্কুলে পড়িয়ে আপিসে চাকরি করতে পাঠাবে। বিয়ে দেবে না, গয়না কাপড় দেবে না, খালি চোখ রাঙাবে আর পড়াবে। আর যদি আমার কাছে থাকিস তো লাল টুকটুকে বর এনে বিয়ে দেব, এত এত গয়না দেব, লাল বানারসী শাড়ি দেব। তারপর সে বিয়েতে কতো ঘটা করবো!"[১০৫] এমনকি নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের মৃত্যুর জন্য সত্য ও নবকুমারকেই দায়ী করলেন এলোকেশী। সত্যর সেবাকে দেখার চেষ্টা করেননি এলোকেশী। নবকুমার পিতার শ্রাদ্ধ করেছে ঘটা করেই। কলকাতায় যাবার সময় সত্য শাশুড়ি এলোকেশীকেও নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু এলোকেশী যান নি।

সারাজীবন এলোকেশী সত্যকে জব্দ করার চেষ্টা করেছেন, ছোট করতে চেয়েছেন, সত্যর সঙ্গে রেষারেষি করেছেন কিন্তু কোনোদিক থেকেই সত্যর দৃঢ়তাকে টলাতে পারেন নি। নিজের জিদ বজায় রাখতে গিয়ে নাতিনী সুবর্ণলতার জীবনের সর্বনাশ করেছেন তিনি। নবকুমার মেয়ে সুবর্ণকে নিয়ে একা ছুটিতে মা এলোকেশীর কাছে এলে সত্যকে না জানিয়ে নাতিনী সুবর্ণকে বিয়ে দিয়ে দেন তিনি। তবে নবকুমার প্রথম প্রথম রাজি না হলেও পরে রাজি হয়েছে। ছেলের সঙ্গে মিলে

বউকে শায়েস্তা করার উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছেন সুবর্ণর বাল্যবিবাহ দেওয়াকে। এরই সঙ্গে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক পরিসরে ছেলে মেয়ের উপর মায়ের অধিকার হীনতার কথা। এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী উনিশ শতকের বাঙালি পরিবারের এমন এক শাশুড়ির ছবি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন, যার মন ও মেধা, চিন্তা ও চক্রান্ত পুরুষবাদের স্বরকেই সোচ্চার করে তুলতে চায়। সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে এলোকেশীর উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে নারী মানসেও পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যকেই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন।

মুক্তকেশী

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র এলোকেশীর মতোই সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা দিয়ে তৈরি আর একটি চরিত্র আমরা পাই সুবর্ণলতা উপন্যাসে মুক্তকেশী রূপে। পরিবর্তমান সময়ের স্তরকে অগ্রাহ্য করে পুরানো ধ্যান ধারণা ও মানসিকতা আঁকড়ে ধরে রেখেছেন মুক্তকেশী। সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় সময়ের পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগাতে গেলেই তৈরি হয় সংঘাত। সুবর্ণ ও মুক্তকেশীর মূল্যবোধের সংঘাতের মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরের অন্ধকারে বন্দী নির্যাতিতা, বঞ্চিতা, অবহেলিতা নারীর হৃদয়ের যন্ত্রণাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন লেখিকা। তারই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা কীভাবে বাইরের পরিবর্তনের আলোকে অন্তঃপুরে প্রবেশে বাধা দেয় তা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। মুক্তকেশীর চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখিকা সমাজ ও সময়ভাবনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

মুক্তকেশী সময়চিহ্নিত চরিত্র। সুবর্ণলতার দর্জিপাড়ার শ্বশুরবাড়ির প্রবল প্রতাপী কর্ত্রী মুক্তকেশী। দর্জিপাড়ার বাড়িতে মুক্তকেশীর অলিখিত নিয়মই চলে এসেছে এযাবৎ। দর্জিপাড়ার বাড়িতে পুরুষতন্ত্রের অচলায়তন প্রহরী মুক্তকেশী। মুক্তকেশীর চার পুত্র ও চার কন্যা। ছেলেরা প্রবল মাতৃভক্ত তাই বউয়েরা মন চাইলেও মুক্তকেশীর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করার কথা কল্পনাও করতে পারে নি। বড় পুত্রবধূ উমাশশীর উপর মুক্তকেশীর প্রবল শাসন। যৌথ পরিবারে মুক্তকেশী প্রবল প্রতাপেই রাজত্ব করে যাচ্ছিলেন। তাঁর রাজত্বে ফাটল ধরাতে শুরু করল মেজবউ সুবর্ণলতা এসে। বিশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে মুক্তকেশীর আজন্ম লালিত মূল্যবোধকে আঘাত হেনেছে সময়ের পরিবর্তন, সমাজের পরিবর্তন। পুরাতন ধর্মশাসিত পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা মুক্তকেশীদের বুদ্ধি ও বিচারের পথকে রুদ্ধ করে মনস্তত্বকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। মুক্তকেশী পুরানো সমাজকাঠামোকে আঁকড়ে ধরে স্বস্তি খোঁজেছেন। তাই সমাজ অনুশাসনের সামান্য ব্যতিক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন তিনি। অসহায়তাবোধ তাঁর মধ্যে কাজ করে তাই প্রাণপণ চেষ্টা চালান পুরানো ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার। চোখ রাঙিয়ে, শাসন করে আপ্রাণ চেষ্টা চালায় সংসারের রীতি অপরিবর্তনীয় রাখার। তাই মুক্তকেশীদের প্রতিনিয়ত দ্বন্দ্ব শুরু হয় নতুন কালের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। মুক্তকেশীর রুচিহীন পরিবারে ভব্যতা, সভ্যতা ও মানবীয়তার সঞ্চার করতে গিয়ে মুক্তকেশীর সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয় সুবর্ণ। মুক্তকেশীর সংসারে নতুন যুগের আলো প্রবেশ করে সুবর্ণর হাত ধরে। আসলে সুবর্ণ

ও মুক্তকেশীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে লেখিকা শুধু কোনো ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্বকে বোঝানোর চেষ্টা করেন নি, চেষ্টা করেছেন দু'যুগ, দু'কালের ভাবনার লড়াইকে দেখানোর। তাই মুক্তকেশীর আঘাতটা এত বেশি তীব্র হয়ে উঠেছে।

মুক্তকেশী বিধবা। বিধবা হওয়া অবধি তিনি গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জন করে চলেছেন নিত্য। নিত্য মালা জপেন। বৈধব্যের সব শুচিতা এবং কঠোরতা নিষ্ঠা সহকারেই তিনি পালন করে আসছেন। চুল কাটা, হাত শুধু করা, পান খাওয়া ছাড়া, এবং রাত্রে আচমনী খাদ্য সবই তিনি করেছেন। আপন শুচিতায় গরবিনী মুক্তকেশী সদাই বলেন — "জল? জল আমি কোনো বেটির হাতেই খাই না। আপন পেটের মেয়েদের হাতেই খাই নাকি? যেদিন থেকে হাত শুধু করেছি, একবেলা স্বপাক হবিষ্যি, আর একবেলা কাঁচা দুধ গঙ্গাজল, ব্যস।"[১০৬] মুক্তকেশী সন্দেশ রসগোল্লা খান না দোবরা চিনিতে হাড়ের গুঁড়ো আছে বলে, রাতে আচমনী খান না। অম্বুবাচীর কদিন অশুদ্ধ বসুমতীর সংস্পর্শ ত্যাগ করে দৈনিক একবার মাত্র গঙ্গাগর্ভে দাঁড়িয়ে মধু আর ডাব পান করেন। তাছাড়াও তিনি আরও অনেক কঠিন কৃচ্ছসাধন করে চলেছেন— "জলের কলের মধ্যে চামড়া আছে, এই বিচারে বিধবা হয়ে পর্যন্ত কখনো কলের জল খান নি। দৈনিক দু'ঘড়া করে ভারি'র গঙ্গাজল তাঁর বরাদ্দ। নিষ্ঠাবতী বলে বিশেষ একটা নামডাক আছে মুক্তকেশীর।"[১০৭] পাড়ার মহিলাকুল অলিখিত আইনে মুক্তকেশীর প্রজা। মুক্তকেশীর বাড়িতেই আড্ডা ছিল, পাড়ার সবাই আসত। মুক্তকেশীর জীবনে পালিত কঠিন নীতি নিয়মের মত তাঁর চেহারায়ও রুক্ষতা ও কাঠিন্য লক্ষিত হয়েছে।

মুক্তকেশী দজ্জাল, অত্যাচারী। আটটি ছেলেমেয়ের মা হয়েও মায়া, মমতা, ত্যাগ, দায়িত্ববোধ কোনো কিছুই তাঁর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নি। কোন মানবীয় গুণের অধিকারী করেই লেখিকা চরিত্রটি সৃষ্টি করেন নি। যেদিন প্রথম নয় বছরের সুবর্ণ মুক্তকেশীর সংসারে এসেছিল সেদিনই মুক্তকেশী রেগে যান সুবর্ণর উপর তার কান্না দেখে। রাগে আটখানা হয়ে সুবর্ণকে এখন মারি তখন মারি করেছিলেন। ইচ্ছে হলেই মুক্তকেশী সুবর্ণকে বিয়েতে পাওয়া জরি জবরজঙ বেগুনী রঙের বেনারসী শাড়ি আর কলকাতার লাল মখমলের জ্যাকেট পরিয়ে সাজিয়ে ফেলতেন আর বাড়িতে কেউ এলেই বউ সুবর্ণলতার স্বামীত্যাগিনী মায়ের নিন্দা করতে বসে যেতেন।

মুক্তকেশী ভালোবেসে বশ করতে জানেন না, সে জানেন শুধু কূটকৌশল। সংসারে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে কূট কৌশলেরই আশ্রয় নেন মুক্তকেশী। প্রথম থেকেই মুক্তকেশী জায়ে জায়ে বিভেদ সৃষ্টি করে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করেন। সংসারে নতুন বউরা এলে একজনকে নিজের সুয়ো করে নেবার চেষ্টা করেন। বিভেদ সৃষ্টি করাই ছিল মুক্তকেশীর রাজনীতি। লেখিকার ভাষায় — "প্রথম থেকেই বিভেদ সৃষ্টি করে রাখা ভাল। নইলে জায়ে জায়ে একদল হলে পৃষ্ঠবল বাড়বে না। শাশুড়িকে কি তাহলে গ্রাহ্য করবে?"[১০৮] তাছাড়া বউদের জব্দ রাখার, ছেলেদের বশে রাখার কৌশলও জানা রয়েছে মুক্তকেশীর। সুবর্ণ ও প্রবোধকে আলাদা ঘরে রাখার জন্য স্বপন

পাওয়ার কৌশল নিতেও পিছ পা হন না তিনি। মুক্তকেশীর এই ব্যবস্থার উপর ছোট খুড়শাশুড়ির চোখ পড়লে মুক্তকেশীকে ভবিষ্যতে বউয়ের হাতে পড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়ে মুক্তকেশীর ব্যবস্থার উপর সতর্কবাণী করলে তেজী মুক্তকেশী সদর্পে বলেন — "কেন? মানুষের হাতে পড়তে যাব কেন? মা গঙ্গা নেই? যতক্ষণ চক্ষুছরদ থাকবে, ততক্ষণ দাপট করে সংসারে থাকবো। ক্ষ্যামতা গেলে গঙ্গা গর্ভে ঠাঁই নেব।"[১০৯] মুক্তকেশীর দাপটের কথা বলতে গিয়ে মেয়ে সুরাজ সুবর্ণকে বলেছে — "মোটেই তা নয় বাবা, মায়ের এই দাপটের বহরে থাকবার বাসনা মিটে গেছে আমার।"[১১০]

মুক্তকেশীর ক্রুরতা ও নিষ্ঠুরতা ফুটে ওঠে তাঁর কথাবার্তায়। মল্লিকবাবুকে নিচের তলার বিশ্রাম ঘরের জানালার কাছে দেখে প্রবোধ রেগে গেলে মুক্তকেশী সুবর্ণকে 'নষ্ট মেয়েমানুষ' বলেছেন। তাই ছেলেকে নির্দেশ দিয়েছেন — "মানুষের রক্ত যদি তোর গায়ে থাকে তো ও বৌকে লাথি মেরে মেরে ফেল পেবো? আর যদি জন্তু-জানোয়ার হোস তো পরিবারকে মাথায় করে ভেন্ন হয়ে যা। নষ্ট মেয়েমানুষ নিয়ে ঘর করতে মুক্তকেশী পারবে না।"[১১১] সংবেদন ও সহানুভূতিহীন মুক্তকেশী নিজে মেয়ে হলেও মেয়েদের প্রতি মোটেই সহানুভূতি ছিল না তাঁর। তাই ভাইপো জগুকে বউকে পায়ের পাপোষ বানিয়ে রাখার কথা বলেছেন। হরিদাসীকে বউদের ও ছেলেদের কথা বলতে গিয়ে বউদের পা এবং ছেলেদের মাথার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুবর্ণ আঁতুড়ঘরে মলিন-শয্যায় যেতে না চাইলে তাকে রাজকন্যা বলে উপহাস করেছেন।

মুক্তকেশীর দৃষ্টিতে মেয়েছেলে ও বেটাছেলের মধ্যে ছিল বিস্তর ব্যবধান। সুবর্ণ নতুন বাড়িটা দেখতে যেতে চাইলে মুক্তকেশী শুভদিনে যাবার কথা বলেন। সুবর্ণ মুক্তকেশীর ছেলেদের যখন তখন যাবার কথা নিয়ে খোঁটা দিলে মুক্তকেশী বিরক্ত হয়ে বলেন — "তক্ক করা রোগটা ছাড়ো তো বাছা, এই রোগেই আমার হাড় পুড়িয়ে খেলে তুমি। বেটাছেলের আবার কিছুতে দোষ আছে নাকি? মেয়েমানুষকেই সব কিছু মেনে শুনে চলতে হয়।"[১১২] এই সব উক্তির মধ্য দিয়ে সমাজ মানসিকতায় ছেলেমেয়ের বিস্তর ব্যবধানটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা। মেয়েদের, বিশেষ করে বউদের থেকে ছেলেদের প্রাধান্য তাঁর কাছে ছিল অনেক বেশি। বিয়ে না হওয়া মেয়েদেরকে মুক্তকেশী গলার কাঁটা মনে করেছেন। পারুলের বিয়ের ব্যাপারেও ছেলে প্রবোধকে বলতে গিয়ে গলার কাঁটার সঙ্গেই তুলনা করেছেন মেয়েদের।

মুক্তকেশীর বাড়িতে বউদের উপর কড়া শাসন। মেয়েদের খেলা চললেও বউদের অসময়ে 'অপচো' খেলা চলে না। অবসর সময়ে কচি ছেলের মাদের যদিও কিছুটা ঘুমের ছাড়পত্র আছে, অন্যদের নেই। অবসর সময়ে বউরা সলতে পাকাবে, সুপুরি কাটবে, চালডালের কাঁকর বাছবে, নিদেনপক্ষে কাঁথা সেলাই করবে এটাই ছিল নিয়ম। পাড়ার গিন্নিদের সঙ্গে কথা কওয়ার রেওয়াজও ছিল না মুক্তকেশীর শাসনে। মুক্তকেশীর সংসারে এসে একের পর এক নিয়ম ভেঙেছে সুবর্ণ। মুক্তকেশী দর্শক হয়ে শুধু আর্তনাদ করেছেন। কেদারবাবুর সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন, বাড়িতে

কাজের লোক ঢোকানো, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো ইত্যাদি যে সমস্ত কাজ মুক্তকেশীর সংসারে নিষিদ্ধ ছিল, সবকাজই সুবর্ণ সম্ভব করেছে। মুক্তকেশীর রক্ষণশীলতাকে অতিক্রম করে সুবর্ণ প্রমাণ করে দিয়েছে সময়ের গতির কাছে মুক্তকেশী কত অসহায়। তবে সুবর্ণ মুক্তকেশীকে কখনও অসম্মান করে নি। ছেলে মেয়েদের কাছ থেকে না পাওয়া সম্মানও মুক্তকেশী অনায়াসে পেয়েছে সুবর্ণর কাছ থেকে।

মুক্তকেশী সবকিছুর জন্য সুবর্ণকেই দায়ী করেছেন সবসময়। এমনকি কাজের মেয়ে হরিদাসী মুখে মুখে কথা বললেও সুবর্ণকেই দায়ী করেছেন। ছেলেদের সামনে সুবর্ণর বদনাম করেছেন। মুক্তকেশী সবসময় সুবর্ণর দোষকেই দেখেছেন, প্রতিবাদকেই দেখেছেন। সুবর্ণলতার উদারতার জন্যই যে মুক্তকেশীর সব শখ আহ্লাদ মিটেছে সেটা স্বীকার করেন নি কখনও। মুক্তকেশীর গঙ্গাস্নানের খরচ, তীর্থের খরচ সবই জোটেছে সুবর্ণর উদারতার জন্য। এমনকি বিরাজের বিয়ের সময় নিজের গহনাগুলোও দিয়ে দিয়েছে সুবর্ণ। বউয়ের উঁচু মনটা বুঝতে পারলেও দাম্ভিক মুক্তকেশী নিজের দর্পকে বহাল রাখতে গিয়ে সুবর্ণলতার উদারতাকে অস্বীকার করে বলেছেন — "সুবর্ণলতা এত কিছু বাহাদুরি দেখায় নি। সুবর্ণলতা নতুন কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নি। সুবর্ণলতার মনটাকে যে 'উঁচু মন' বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন মুক্তকেশী, সে কেবল মুক্তকেশীর নিজের মন উঁচু বলে।"[১১৩] যে মুক্তকেশী বউদের দাবিয়ে রাখাকে বাহাদুরি মনে করেছেন সেই মুক্তকেশী মেয়েদের শ্বশুরবাড়িতে সুখ ও স্বামী সোহাগের বর্ণনায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। সুরাজের সুখ সমৃদ্ধিতে মুক্তকেশী বলেছেন — "সে কী বাড়ি! একেবারে সাহেব বাড়ি, বুঝলি হেমা? কোচ কেদারা, টেবিল আর্শি কত কেতা! সুরিও আমার বেড়ায় যেন মেম! পায়ে জুতো-মোজা, বিলিতি ঢং করে কাপড় পরা। আর জামাইয়ের আমার .... হি হি হি কী বলবো — অবস্থা যা! অত বড় একটা হোমরাচোমরা চাকুরে, সুরির কাছে যেন চোরটি। সুরির কথায় উঠছে বসছে, সুরি চোখ রাঙালে চোখে অন্ধকার দেখছে।"[১১৪] যে মুক্তকেশী নিজের ছেলেরা বউদের শাসন করলে আনন্দিত হয়েছেন সেই আবার নিজের মেয়ের জামাইয়ের মেয়ে সুরাজের কাছে বশ্যতা দেখে আহ্লাদিত হয়েছেন। শুধু তাই নয় সুবর্ণ মুক্তকেশীর আহ্লাদে প্রতিবাদ করলে সুবর্ণকে হিংসুটে বলেছেন। তারই সঙ্গে সুবর্ণরাও তাঁর ছেলেদের বশ করে রেখেছে বলে অভিযোগ করেছেন।

সময়ের অগ্রগতিতে মুক্তকেশীর জীবৎকালেই তার যৌথ পরিবারের ভাঙন ধরেছে। মুক্তকেশী ভাগের মা হয়েছেন। সুবর্ণ আলাদা বাড়ি করে চলে গেলেও মুক্তকেশীর আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে পারে নি। দর্জিপাড়ার বাড়িতে থাকাকালীন মুক্তকেশীর কাজে যেভাবে প্রতিবাদ করেছে সেভাবে নতুন বাড়িতে করতে পারে নি ভদ্রতা, মমতা ও চক্ষুলজ্জায়। তারই সুযোগ নিয়ে মুক্তকেশী সুবর্ণর নতুন বাড়িতেও নিজের দাপট বহাল রাখার চেষ্টা করেছেন। মুক্তকেশীর দাপটকে লেখিকা এভাবে দেখিয়েছেন — "এখন মুক্তকেশী যখন-তখন মেজছেলের বাড়িতে বেড়াতে আসেন, হুকুম আর শাসন চালিয়ে যান এবং অপর ছেলে বৌদের সমালোচনায় মুখর হন। হাত খরচের টাকায় ঘাটতি পড়লেই সেকথা কোনো ছেলে মেজবৌমার কর্ণগোচর করেন এবং নিজের মেয়ে-

জামাই, নাতি-নাতিনী বাবদ অর্থঘটিত যা কিছু সদিচ্ছা, সেও মেজছেলের কাছে প্রকাশ করে যান।”[১১৫]

মুক্তকেশী বুঝতে পারেন সুবর্ণর জন্যই প্রবোধের সংসারে কোনো অনাচার নেই। সুবর্ণর গুণ জেনেও মুক্তকেশী সুবর্ণকে সমর্থন করতে পারেন না, পারেন না সুবর্ণর উদারতার প্রশংসা করতে হয়তো তার উপনিবেশীকৃত মনোভাবই তাকে বাধা দেয়। মুক্তকেশীর সঙ্গে সুবর্ণর সংঘাত অনিবার্য কারণ মুক্তকেশী উচ্চকিত। তবে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙন পর্বে মুক্তকেশী মৃত্যুর আগে সুবর্ণকে দেখতে চেয়েছেন। মৃত্যুর সময় আত্মজ আত্মজাদের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ দেন নি, আশীর্বাদ দিয়ে গেছেন সুবর্ণর মাথায় হাত দিয়ে। আর মুক্তকেশীর আশীর্বাদ নিয়ে সুবর্ণ এগিয়ে চলে ভবিষ্যতের দিকে, নতুনের দিকে তবে পুরানোকে সঙ্গে নিয়ে, পুরানোকে ধ্বংস করে নয়। মুক্তকেশীর সুবর্ণকে আশীর্বাদ ও সুবর্ণর পুরানোকে সঙ্গে নিয়ে চলার প্রবণতার মধ্য দিয়ে আশাপূর্ণা দেবীর একদিকে যেমন রয়েছে পুরানো মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা তেমনি অন্যদিকে রয়েছে পুরানো মূল্যবোধকে অস্বীকার না করে সঙ্গে নিয়ে নতুনের দিকে এগোনোর নির্দেশ যা আমাদের কাছে ফুটে উঠেছে। পুরনোকে একসময় নবীনকে স্বীকার করে নিতেই হয়। অভ্যাসবশে, সেই স্বীকার করাটা হয়ত সম্ভব হত না অনেক সময়। মুক্তকেশীর অন্তরে কোথাও যে সুবর্ণর, নতুন সময়ের স্বীকৃতি ছিল, জীবনের অন্তিম মুহূর্তের নীরব আশীর্বাদে তাই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণা দেবী সত্যবতী, সুবর্ণ চরিত্রকে সৃষ্টি করে যেভাবে তাদের সময়ের গতিকে অতিক্রম করার প্রবণতাকে দেখিয়েছেন। আবার এলোকেশী, মুক্তকেশীর মত চরিত্রকে সৃষ্টি করে সময়ের গতিকে অগ্রাহ্য করে পশ্চাদগামী ছায়াকে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রবণতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি সমকালের সমাজের গতিতে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া গৃহবধূর ছবিও ফুটিয়ে তুলেছেন নিখুঁতভাবে ভুবনেশ্বরী, উমাশশীর মতো চরিত্র সৃষ্টি করে। তৎকালীন সময়ের সমাজের আদর্শ গৃহবধূ বলতে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র ভুবনেশ্বরী এবং 'সুবর্ণলতা'র উমাশশীর কথা বলা যেতে পারে। এদের সম্পর্কে সুবর্ণর ধারণা এভাবে ব্যক্ত হয়েছে 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে — “সুবর্ণলতা ভাবে, যারা লড়াইয়ের পথ ধরে নি, নির্বিচারে বশ্যতা স্বীকার করে বসে আছে। এখন আর অবজ্ঞা করি না তাদের। বুঝতে পারি, এদের লড়াইয়ের শক্তি নেই, তাই নিরুপায় হয়ে দ্বিতীয় পথটা বেছে নিয়েছে ওদের অনুভূতি নেই, ওরা ওতেই খুশী;— একথা আমাদের ভাবা ভুল হয়েছে। সত্তার বদলে শান্তি কিনেছে ওরা, আত্মার বদলে আশ্রয়।”[১১৬]

ভুবনেশ্বরী

ভুবনেশ্বরী রামকালীর পত্নী ও সত্যবতীর মা। দুই দৃঢ় ব্যক্তিত্বশালী চরিত্রের সঙ্গে নিকট সম্পর্কে থাকা সত্ত্বেও ভুবনেশ্বরী চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা আমাদের চোখে পড়ে নি। খুবই সহজ সরল সাদামাটা বাঙালি রমণী ভুবনেশ্বরী। ভুবনেশ্বরীকে দেখলে মনে হয় লেখিকা তৎকালীন

সমাজের উপেক্ষিতা শান্ত গৃহবধূর প্রতিনিধি করেই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। ভুবনেশ্বরীর মধ্যে সব সময় দেখা গেছে সব কিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ও মেনে নেওয়ার মানসিকতা। প্রতিবাদহীনভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্তঃপুরে নিয়মমাফিক জীবন কাটিয়েছেন তিনি। তবে লেখিকা নারীত্বের সমস্ত গুণের অধিকারী করেই চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন।

নিত্যানন্দপুরের ফালু বাঁড়ুয্যের মেয়ে ভুবনেশ্বরীর নয় বছর বয়সেই বিয়ে হয়ে যায় ত্রিশের বেশি বয়সের রামকালীর সঙ্গে। ন বছর বয়স থেকেই বধূরূপে শ্বশুরবাড়ির নানা রূপ অসুবিধার মধ্য দিয়ে তিনি নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। ভীরু কুণ্ঠিত পদক্ষেপে সারাদিন পরিবারের সবার মনোরঞ্জন করে চলেছেন তিনি। পরিবারে তাঁর পরিচয় ছিল মেজবউ-এর। নিটোল মুখ, ফর্সা রং ছোটখাটো দেখতে ছিলেন তিনি। রামকালী যৌথ পরিবারের কর্তা হলেও ভুবনেশ্বরীকে কখনো সংসারে কর্তৃত্ব খাটাতে দেখা যায় নি। কর্তৃত্বের দাপট সে কারো উপর খাটাতে যায় নি। স্বামীর প্রতিপত্তির উপরও তাঁকে কখনও অহংকার করতে দেখা যায় নি। শাশুড়ি দীনতারিণী, পিসশাশুড়ি মোক্ষদা, কাশীশ্বরী ইত্যাদি গুরুস্থানীয়দের শ্রদ্ধা করেছেন এবং তাঁদের কটু কথাও মুখ বন্ধ করে সহ্য করেছেন। সারদার তুলনায় ভুবনেশ্বরীর রূপ অভয়ার কাছে এরূপে ফুটে উঠেছে — "সংসারে ভুবনেশ্বরীর শূন্যস্থানটা কেমন করে কে জানে আস্তে আস্তে সারদার দখলে এসে গেছে। ভুবনেশ্বরীর মতই সারদা ভিন্ন যেন সব দিক অচল। কিন্তু ভুবনেশ্বরীর নম্র নীরবতা সারদার মধ্যে নেই। সারদা যতই চৌকস ততই প্রখর।"[১১৭]

সহানুভূতিশীল ভুবনেশ্বরীর একমাত্র সুহৃদ ছিল অসমবয়সী ভাসুরপো বউ সারদা। রাসুর দ্বিতীয় বিয়ে হলে সারদার দুঃখ অন্য কেউ না বুঝলেও ভুবনেশ্বরী সারদার দুঃখকে বুঝেছেন এবং বিয়ের কালরাত্রির দিন সারদা ও রাসুর মিলনের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। রাসুর কচি ছেলের ছুতো দিয়ে ভুবনেশ্বরী রাসুকে সারদার ঘরে নিয়ে এলে এর মধ্যে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তার আভাসও দিয়েছেন লেখিকা — "একটু কৌতুকের স্বাদ? হলেও শাশুড়ি সম্পর্ক তবু তো মেয়েমানুষ। আর রামকালীর ঘরণী হলেও ভূবনেশ্বরী যেন এখনও ভেতরে ভেতরে কোথাও একটু কাঁচা একটু সবুজ রয়ে গেছে।"[১১৮]

রামকালীর পত্নী হলেও সংসারের কাজ ছেড়ে আয়েশ করতে তাঁকে দেখা যায় নি। রামকালীও ভুবনেশ্বরীর প্রতি উদাসীনতাই দেখিয়েছেন। ভুবনেশ্বরী রামকালীকে ভয়ই পেয়েছেন জীবনভর। স্বামীর উপর অধিকার খাটাতে তাঁকে দেখা যায় নি। ভুবনেশ্বরী রামকালীকে সমীহ করেছেন, তবে রামকালী পত্নীর প্রতি উদাসীন হলেও তাঁকে স্নেহ করেছেন। প্রবল প্রতাপী স্বামী রামকালীর সব নির্দেশ মেনে নিয়েছেন ভুবনেশ্বরী। সংসারের কেউ তাঁর কাছে কোনোদিন কোনো পরামর্শ চান নি। নির্বাক জীবন যাপন করে গেছেন ভুবনেশ্বরী। সত্য প্রথম সন্তান সম্ভবা হলে ভুবনেশ্বরী জেলেঘাটের কাছে গিয়ে রামকালীকে জানাতে গেলে রামকালী তাঁকে সেখানে যাওয়ার জন্য বিরক্ত হলে ভুবনেশ্বরী রাগ না করে অভিমানের সুরে ঘোমটার ভিতরেই চোখ থেকে ধারা শ্রাবণ বর্ষণের সঙ্গে

বলেছেন — "কখন কোথায় পাচ্ছি"[১১৯] তিনি আরও বলেছেন — "তা কি করবো! চোরে আর কামারে তো দেখা নেই, একটা কথার দরকার থাকলে —"[১২০]

ভুবনেশ্বরী শুধু রামকালীকেই ভয় পান নি। তিনি গুরুস্থানীয় সবাইকে ভয় পেয়েছেন তারই সঙ্গে শ্রদ্ধাও করেছেন এবং মেনেও চলেছেন। সদাই তাঁকে দেখা গেছে কুণ্ঠিত, ঘোমটায় অবরুদ্ধ ভীরু অবস্থাতে। মাকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে দেখে সত্যও বিরক্ত হয়ে গেছে। সে বলেছে — "ভয় ভয় ভয়! এই ভয়ের জ্বালাতেই সগ্‌গ পাবে না তুমি মা, দেখে নিও।"[১২১]

ভুবনেশ্বরী মাতৃস্নেহের প্রতীক। তাই তো সত্য বাড়ির অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে শুতে গেলে ভুবনেশ্বরী তাকে নিজের কাছে শোবার জন্য অনুরোধ করতেন। সত্যর লেখাপড়া ও দুরন্তপনা নিয়ে বাড়ির অন্যান্যরা নানা কথা বললে ভুবনেশ্বরীও সত্যর ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন। স্বামীর কাছে বলতে গেলে স্বামীও সেটিতে গুরুত্ব দেন নি। ভুবনেশ্বরীকে মাঝে মাঝে সত্যর প্রতি একটু তিরস্কার ছাড়া বেশি কঠোর হতে দেখা যায় নি। মেয়ের লেখা একটুকরো কাগজ নিয়ে গেছেন ভাজ সুকুমারীর কাছে পড়ানোর জন্য ভবিষ্যতে মেয়ের অকল্যাণের ভয় পেয়ে। আবার সত্য শ্বশুরবাড়ি গেলে সেখান থেকে রামকালীর কাছে চিঠি এলে মেয়ের কিছু অমঙ্গল হয়েছে কি না তা ভেবে ভুবনেশ্বরী আবেগ বহুল হয়ে কান্নাকাটিও করেছেন। রামকালীর মা দীনতারিণীর শ্রাদ্ধে সত্য এলে বহুদিন মেয়ে বাপের বাড়ি না আসার জন্য ভুবনেশ্বরী মায়ের মন এভাবে তাঁর হৃদয়বেদনা প্রকাশ করেছে — "তারা সবাই পেরায় পেরায় আসে। তোর মতন কে এমন ঘরবসতে গিয়ে একেবারে তিন চারটে বছর—"[১২২] শুধু তাই নয় সত্য কদিন থাকবে তাও জিজ্ঞেস করেছেন। এসবের মধ্য দিয়ে মেয়ের প্রতি মায়ের ভালোবাসা এবং মেয়ের মঙ্গল ও অমঙ্গল চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত মাতৃ হৃদয়টিই আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে।

সর্বদা ভীত শান্ত এই চরিত্রটি মৃত্যুকালেও নীরবতাই অবলম্বন করল। কারো প্রতি কোনো অভিযোগ ছাড়া ভুবনেশ্বরী একদিন সবার অজান্তে শেষ নিঃশ্বাসটুকু ত্যাগ করেন। কবিরাজ স্বামী রামকালীকে চিকিৎসার অবসরটুকু না দিয়ে লাজুক, নির্বোধ ভুবনেশ্বরী ঘণ্টা কয়েকের ভেদবমিতে মারা যান। শেষ চেষ্টার অবকাশ না পাওয়ায় রামকালীর মত ব্যক্তিও বলে উঠেছেন "মেজবৌ এমন কঠিন শাস্তি কেন?"[১২৩] তবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই চরিত্রটি সংসারের আপন দায়িত্ব পূরণ করে গেছেন। লেখিকা জানাচ্ছেন — "গত রাত্রে সহজ সুস্থ ভুবনেশ্বরী সংসারের বহুবিধ কাজ সেরে, আগামী সকালের রসদ বাবদ তিন-তিনটে মোচা কুটে রেখে, এক জামবাটি ডাল ভিজিয়ে ঘুমোতে গিয়েছিল, আজ আর সে সেই সকালের মুখ দেখতে পেল না। ভোরের প্রথম আলো একজোড়া ঘুমন্ত চোখের ওপর এসে স্থির হয়ে পড়ে রইল ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে।"[১২৪]

শুধু পিতা রামকালী নয় ভুবনেশ্বরীর প্রতি মেয়ে সত্যবতীও উদাসীন ছিল তাই মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের প্রতি করা উদাসীনতার কথা মনে পড়ে সত্যর দুঃখ হয়েছে। ভুবনেশ্বরীর মৃত্যুর পর রামকালীও অনুভব করেছেন ভুবনেশ্বরীর প্রতি করা তার উদাসীনতার কথা। মায়ের মৃত্যুর

পর সত্যর শুধু মনে হয়েছে — "মাকে কেন ভাল করে দেখে নি সত্য, দু'দণ্ড কেন স্থির হয়ে বসে নি মায়ের কোলের কাছে। কেন রাতে আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে ঠাকুরমার ঘরে শোয়ার বদলে মায়ের গলাটি জড়িয়ে ঘুমোয় নি।"[১২৫]

প্রখর ব্যক্তিত্বে দীপ্যমান না হয়েও রামকালীর সংসারে নিজের ছাপ রেখে যান ভুবনেশ্বরী। তাঁর মৃত্যুর পরই সংসারে ভুবনেশ্বরীর প্রয়োজনীয়তা ও তাঁর অস্তিত্বকে সবাই অনুভব করেছে। রামকালীর মত ব্যক্তিত্ব ভুবনেশ্বরীর মৃত্যুতে ভেঙে পড়েন এবং কাশী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ভুবনেশ্বরীর মৃত্যু ভুবনেশ্বরীর অস্তিত্বকে আরও প্রখর করে তুলেছে। ভুবনেশ্বরীর সত্তাকে মৃত্যুর পর রামকালীও অনুভব করেছেন। লেখিকার ভাষায় — "রামকালীর মধ্যেও একটা আবেগের আলোড়ন উঠল। সেই ছোটখাটো মানুষটা, যাকে রামকালী কোনদিনই পুরো একটা মানুষ বলে গণ্য করেন নি, সে যে দৃঢ় কঠিন রামকালীর ভিতরের এতটা শক্তি হরণ করে ফেলবে, এ রামকালীর ধারণার মধ্যেই ছিল না। ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে যেন তাঁর একটা বাৎসল্য মিশ্রিত প্রীতি ছিল। জীবনের কোন আদর্শে, কোন চিন্তায়, কোন সুখ-দুঃখে তাঁকে দাগ দেননি। আজ মনে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিচার করেন নি রামকালী স্ত্রীর উপর। চিরদিন যাকে ছোট ভেবে এসেছেন, সে হয়তো এমন ছোট ছিল না যাকে সামান্য ভেবেছেন সে হয়তো সামান্য নয়। রামকালী যদি তাকে স্নেহের সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধাও দিয়ে হৃদয়ের সহধর্মিনী করে তুলতে পারতেন, হয়তো সারাটা জীবন এতখানি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতেন না।"[১২৬] এভাবেই সামান্য হয়েও ভুবনেশ্বরী এক উজ্জ্বল চরিত্র হয়ে উঠেছেন 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসে।

উমাশশী

উমাশশী সুবর্ণর বড় জা ও মুক্তকেশীর বড় ছেলে সুবোধচন্দ্রের স্ত্রী। শান্ত, ভীত, প্রতিবাদহীন এই চরিত্রটি। শাশুড়ি মুক্তকেশীর সংসারে আসা অবধি তাঁর কড়া শাসনেই থেকেছে উমা। মুক্তকেশীর ইচ্ছাকে অতিক্রম করার বা বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস করেনি কোনদিন। মুক্তকেশী উমাশশী সম্পর্কে সুবর্ণকে বলেন — "বড়বৌ উমাশশীর মুখ দিয়ে সাত চড়ে 'রা' বেরোয় না।"[১২৭] উমাশশী শান্তস্বভাবা, তার স্বামী সুবোধ ভালোমানুষ, সহানুভূতি ও অনুভবশীল হয়েও স্ত্রীর সঙ্গে সহজ সরল সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে নি। উমাশশী সর্বদাই শাশুড়ির ভয়ে তটস্থ থেকে শাশুড়ির সমস্ত নিয়ম কানুন মেনেই চলেছে এযাবৎ। উমাশশী কখনও ননদাইয়ের সঙ্গে কথা বলেনি এবং বলার প্রয়োজন অনুভব করে নি। ঘোমটা দিয়ে ভাত জল এগিয়ে দিয়ে নিজের কর্তব্য সেরেছে। উমাশশীর ডাক পড়লেই সে ভয়ে কাঁপতে থাকে। সুবর্ণর দোষে বড় বউ-এর ডাক পড়লেও উমাশশী ভয় পেয়ে যায়। মেজ দেবরের সঙ্গে কথা না বললেও ঘোমটা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মেজ দেবরের সামনে হাজির হয় উমাশশী। উমাশশীর উপর সুবর্ণকে মুক্তকেশীর কাছে ক্ষমা চাওয়ানোর ভার পরলে সে সুবর্ণকে এ নিয়ে বলতে গিয়ে সুবর্ণর চোখের চাউনিতে হিম হয়ে যায়। উমাশশী নিজের

সরল মনেই সব সমস্যাগুলো মিটাতে চেষ্টা করে, সুবর্ণকে বলে — "চাইলেই তো সব গোল মিটে যায় ভাই। বল্ — বল্ লক্ষ্মীটি, 'মা, যা বলেছি, না বুঝে বলেছি।'"[১২৮] এভাবেই উমাশশী সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছে, সারাজীবন আপোস করে চলেছে, প্রতিবাদ করে নি সে সাহস ছিল না তার।

বড়ো গরিবের মেয়ে উমাশশী। উমাশশী নির্বোধ, সংসারের সব দায়িত্ব সে আগ্রহেই নিজ কাঁধে নেয়, সেকালের বউদের ভালো হয়ে থাকার বাসনা তার মনে কাজ করে। উমাশশী পেতে চায় প্রশংসা। ভালো হবার জন্য সে সব কাজ মুখ বুজেই করে নেয়। তার সব থেকে প্রিয় জায়গা রান্না ঘর। তাই মুক্তকেশীর সংসারে সুবর্ণলতা এসে উপদ্রব আরম্ভ করলে মুক্তকেশী সুবর্ণলতাকে দমানোর জন্য বার বার উমাশশীর প্রসঙ্গ টেনেছে। সকালের রান্নার ভার সে একাই নিয়েছে বিকেলে আর তিন জা পালা করে কাজ করে। সুবর্ণ মুক্তকেশীর সংসারে বামুন রাঁধুনি ঢোকানোর কথা বললে সে শাশুড়ির সুয়ো হতে গিয়ে বারণও করে দিয়েছে। উমাশশীর বোকামিতে লেখিকা বলেন — "কিন্তু কে বলবে কেন উমাশশীর এমন বোকামী। কেন সে অবিরত সংসারের সবার মন রাখার চেষ্টা করে মরে? মন কি মন কি সত্যিই কারো রাখতে পেরেছে?"[১২৯] জীবনভর উমাশশী শুধু নিজেকে ভারাক্রান্তই করে তুলেছে বৃথা চেষ্টার বোঝা চাপিয়ে। কারো মন রাখতে সে পারেনি, তার উপর মুক্তকেশী সদাই বেজার। উমাশশী ভয় পায় সেজ ও ছোট জাকেও। তাই সুবর্ণর ছোট মেয়ের জ্বর হলে রান্নার পালা সুবর্ণর থাকা সত্ত্বেও উমাশশী নিজে থেকেই সে পালাটি সেরে দিতে চাইলে সেজবউ ও মেজবউ একচোখোমির কথা বললে এবং ছেলে মেয়ের সর্দি হলেই পালা কামাই করবে বলায় উমাশশী ভীত হয়। প্রতিবাদ করার সাহস সে যোগাতে পারে নি "উমা ভয়ে ভয়ে হাঁড়িখানাকে তাকে নামিয়ে, চালের গামলা হাতে নিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। জোর করে কর্তব্য করবার সাহসও তার নেই।"[১৩০]

উমাশশী সংসারের, রান্না ঘরের সব দায়িত্ব নিলেও ছেলে মেয়েদের দায়িত্বের ব্যাপারে তাকে উদাসই দেখা গেছে। উমাশশীর উদাসীনতা প্রকাশ পেয়েছে ছেলেমেয়ের সাজসজ্জায়ও — "মল্লিকার মা তো এদিকে গোছালো নয়। ভাঁড়ার গোছাতেই পটু। ছেলেমেয়েদের দিকটা তাকিয়েও দেখে না। আর সে না দেখাটাকেই সে বেশ একটু মহত্ত্ব ভাবে। বড় বড় মেয়েগুলোর সাজ-সজ্জার তদ্বির চাঁপার মা-ই করে।"[১৩১]

উমাশশী বড় বড় ছেলে মেয়েদের ছোট ভাইবোনদের দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়। তাই মেয়ে মল্লিকা বড়োদের আড়াল হলে — "কোলের ভাইটা - বোনটাকে ঠুকে ঠুকে বসায়, আর বলে, শত্তুর শত্তুর! একটু যদি শান্তি দেয়! মা'র যদি এই সাতগণ্ডা ছেলে মেয়ে না হত, একটু হাত-পা ছড়িয়ে বাঁচতাম রে।"[১৩২] প্লেগের ভয়ে সবাই কলকাতা ছেড়ে অন্যত্র গেলে উমাশশীও মাসতুতো দিদি শরৎশশীর বাড়িতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয় সঙ্গে মল্লিকাকে নিতে চাইলে মল্লিকা বলেছে — "আহা, তোমার সঙ্গে যাই আর তোমার ছেলে বইতে বইতে প্রাণ যাক আমার।"[১৩৩] মল্লিকার কথায়

উমাশশীর ছেলে মেয়ের প্রতি থাকা উদাসীনতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। তবে উমাশশী মেয়েকে যেতে রাজী করিয়েছে মেয়েকে একটা টাকা ঘুষও দিয়েছে।

উমাশশী অবাক হয়েছে সুবর্ণর সাহস দেখে, তার উপর হওয়া নির্যাতন দেখে। তার মনে প্রশ্ন হয় এত লাঞ্ছনা পেয়েও সুবর্ণ থামে না কেন, কোথায় পায় সুবর্ণ বড়দের সঙ্গে তর্ক করার সাহস। জ্ঞান হওয়া অবধি সুবর্ণর মত 'মেয়েমানুষ' উমাশশীর চোখে পড়েনি। উমাশশী ভয় পায় সুবর্ণকে। সুবর্ণলতার ছাদের উপর বাড়ির ছেলে মেয়েদের নিয়ে বিদেশি কাপড় পুড়ানো দেখে উমাশশী 'হাঁ' হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ দিয়ে কথা বেরয় না তার। তার বলতে ইচ্ছে হয় — "এ কী পোড়াতে বসেছে মেজ বৌ? কাপড় না ভবিষ্যৎ? তা সে তো পোড়াচ্ছেই জীবনভোর! আ-জীবনই তো ধ্বংস কার্য চালাচ্ছে।"[১৩৪] কিন্তু বলতে পারে নি উমাশশী। সে শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই রয়েছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তার আর রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছে, "এ কী হচ্ছে মেজ বৌ?"[১৩৫] এভাবেই সারাজীবন উমাশশী ভয় পেয়ে গেছে। মেনে নিয়েছে এবং মানিয়েও নিয়েছে সংসারের সব কিছুর সঙ্গে, তুচ্ছতার সঙ্গে। এভাবেই আশাপূর্ণা দেবী এক ভীত অবগুণ্ঠিত নারী চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন উমাশশীর মধ্যে।

আশাপূর্ণা দেবী উনিশ ও বিশ শতকের রক্ষণশীল সমাজের রক্ষণশীলতায় মানিয়ে নেওয়া নারী চরিত্র যেমন এঁকেছেন তেমনি উনিশ ও বিশ শতাব্দীর রক্ষণশীল পরিবেশে প্রতিবাদী ও মানিয়ে না নেওয়া চরিত্রও দেখিয়েছেন সারদা ও পারুল চরিত্রের মধ্যে। তারই সঙ্গে বিশ শতকের স্বাধীনতার ফলভোগী আধুনিক নারীর চিত্রও তুলে ধরেছেন তাঁর উপন্যাসে। 'বকুলকথা'র পারুল ও শম্পাকে আধুনিক নারীর অহংবোধে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী মনোস্তত্বের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন লেখিকা।

সারদা

সারদা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র একটি প্রতিবাদী চরিত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে এই চরিত্রটিকে লেখিকা প্রতিবাদী রূপেই গড়ে তুলেছেন। তৎকালীন সমাজে যেখানে গৃহবধূরা শাশুড়ি ও অন্যান্যদের ভয়ে তটস্থ থেকেছে সেই পরিবেশেই লেখিকা এক প্রতিবাদী গৃহবধূর ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছেন সারদাকে, যে নারীকে তৎকালীন সমাজেও নিজের অধিকারকে কেড়ে নিতে তৎপর দেখা গেছে। তাইতো স্বামী রাসবিহারীর নিকট থেকে সে সতীন না আনার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। তৎকালীন সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। নানা কৌশলে সারদা স্বামীর কাছে নিজের কথার উপস্থাপন করেছে এবং সতীন জ্বালার কথা বলেছে, সতীন নিয়ে নিজের ভয়কে প্রকাশ করেছে এবং স্বামীকে বলেছে — "তা বলে তোমাকে আমি এমন সত্যবন্দী করে রাখছি নে যে আমি মরে গেলেও ফের বে' করতে পারবে না। আমি মলে তুমি একটা কেন একশটা বে' করো, কিন্তু আমি

বেঁচে থাকতে নয়।"[১৩৬] চতুর এবং প্রতিবাদী হলেও সারদার পতিসেবায়ও কখনও ঘাটতি দেখা যায় নি। তাই তো বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে গিয়ে সারদার পতিসেবার কথা মনে করে রাসুর দুঃখ হয়েছে এবং সত্যবন্ধের কথা মনে পড়ে গেছে। রাসুর অনুভূতির প্রকাশ লেখিকা এভাবে করেছেন — "প্রাণের ভেতরটা হঠাৎ কেমন মোচড়ে দিয়ে উঠল রাসুর গতকাল রাত্রেও সারদা সেই পতিসেবার ব্যতিক্রম করেনি। রাসু মায়া করে বারবার বারণ করছিল বলে কচি ছেলেটার গরমের ছুতো করে পাখা নেড়েছে সারদা। আর সবচেয়ে মারাত্মক কথা, যেটা মনে করে হঠাৎ বুকটা এমন মুচড়ে মুচড়ে উঠেছে রাসুর, মাত্র কাল রাত্তিরেই সারদা তাকে ভয়ানক একটা সত্যবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিল।"[১৩৭] সারদা স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবরে ভেঙে পড়েছে, মাটিতে পড়ে কেঁদেছে। সারদা নিজের শাশুড়ির সামনে একগলা ঘোমটা দিয়ে থেকেছে এবং কথাও বলেনি। কিন্তু খুড়শাশুড়ি ভুবনেশ্বরীকে সে মেনেছে এবং তাঁর সঙ্গে সব কথাই বলেছে তাইতো স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের খবরে নিজেকে অভুক্ত রাখতে চাইলেও ভুবনেশ্বরীর নরম কণ্ঠস্বর তার চোখে জল এনে দিয়েছে এবং নিজেকে অভুক্ত রাখার পরিকল্পনা ত্যাগ করেছে। আবার রাসুর সঙ্গে দেখা হলে কথা বলবে না, কাঁদবে না এবং রাসুর সঙ্গে অপরের মত ব্যবহার করে উদাসীন থাকার কথাই ভেবেছিল সারদা। কিন্তু রাসুর দ্বিতীয় বিয়ের পর যখন ভুবনেশ্বরীর ছলনায় রাসুর সঙ্গে সারদার ঘরে দেখা হল তখন আর সারদা নিজেকে সামলাতে পারল না কেঁদে ফেলল। স্বামীর সঙ্গে অভিমান থাকলেও রাসু আত্মঘাতী হবার কথা বললে সারদার বুকটা কেঁপে উঠে। তবে সারদা স্বামীর কাছে তার ভয়কে প্রকাশ করেনি। লেখিকা সারদার মনের ভাবকে দেখাতে গিয়ে বলেছেন — "বিধবা। বুকটা থর্ থর্ করে ওঠে সারদার। বরং একশটা সতীন নিয়ে ঘর করবে সারদা। বিধবা হওয়ার মত অভিশাপ আর কি আছে? কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বলাই বা যায় কি?"[১৩৮] এবং সে নিজেও দড়ি কলসী কথা দিয়ে আত্মঘাতী হবার ভয় দেখাতে চেয়েছে রাসুকে। রাসু দ্বিতীয় পত্নী পটলীকে আঠারো বছর বয়সে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এলে সারদা স্বামীকে পটলীর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। সারদাকে শাশুড়ি অভয়া বশ করতে পারিনি বলে পিস্‌শাসুড়ি শশীতারা সে ভার নিয়ে সারদাকে বলেছেন — "যমের বাড়ির ভয় দেখিয়ে আমাদের জব্দ করতে পারবে না বড় বৌমা, আমরা রাসু নই। বলি ওই ভয় দেখিয়ে একটা বড়ঘরের মেয়ে এসেছে, যার বাপ ঘরবসতের দ্রব্যিতে বাড়ি ভরিয়ে দিয়েছে, তার দাবি দাওয়াটা মানবে না তুমি? আর ওই রূপের কাণ্ডি টাটকা পদ্মফুল, সোয়ামীকে তুমি এই ভোগ থেকে বঞ্চিত করেছ, এতে যে তোমার নরকেও ঠাঁই হবে না।"[১৩৯] এই কথায় সারদা বলে — "ভালই তো পিসীমা! নরকে ঠাঁই না হলে সগগে যাব। দুটো বৈ তো আর দশটা জায়গা নেই।"[১৪০] শাশুড়ি ও পিস্‌শাশুড়িকে হতবাকই করে কাজের ছুতা দিয়ে তাঁদের কাছে থেকে চলেও গেছে। ভুবনেশ্বরীর মৃত্যুর পর ভুবনেশ্বরীর স্থানটা অভয়ার হাতে না গিয়ে সারদার হাতে চলে যায়। তবে ভুবনেশ্বরীর মত সারদা নম্র নয়, চৌকস ও প্রখর যা অভয়ার কাছে ধরা পড়েছে। সংসারের সবাইকে খেতে দেবার ভার সারদার হাতেই এসে পড়েছে। দায়িত্বশীল গিন্নি হিসাবে সে পটলীকেও বলেছে — "নতুন বৌ, খাবে এসো। নতুন বৌ, এখন মুড়ি খাবে? নতুন

বৌ, তুমি মাছের পেটি ভালবাস না দাগা? নতুন বউ, তুমি ছ্যাঁচা আমের আচার খাও না? নতুন বৌ, আচারের তেল দিয়ে কৎবেল মেখে খেয়েছ কোন দিন? খাবে তো বল মাখি?"[১৪১] এত অভ্যর্থনা পটলীর হৃদয়ে যেন আঘাত হেনেছে এবং তার মনে হয়েছে তাকে নিয়ে তামাশা হচ্ছে। তাই তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে এবং নিজেকে তাড়িয়ে দেবার কথা বলে সারদাকে। পটলীর চোখে জল সারদাকে একেবারে বিচলিত করে দেয়। যে সারদা পটলী থেকে রাসুকে দূরে সরাবার নানা ছলনা করেছে একদিন সেই সারদাই আবার পটলীর দুঃখে পটলীকে রণক্ষেত্র থেকে সরে যেতে দেখে মমতার সঙ্গে নিজেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করেছে। কাকাশ্বশুর রামকালী তার নামে কুড়ি বিঘা জমি লিখে দিতে চাইলেও সে সব ত্যাগ করে রামকালীর সঙ্গে তীর্থ যেতে চেয়েছে। রামকালী লোকনিন্দার ভয় দেখালে সারদা বলেছে "খোকা বল, আপনার যদি একটা দুঃখিনী মেয়ে থাকত তাকে তীর্থে নিয়ে গেলে লোক নিন্দে করত?"[১৪২] সারদার কথায় রামকালীও তার প্রস্তাব নিয়ে ভাবতে বাধ্য করিয়েছেন এবং একই সঙ্গে মোক্ষদার কথাও মনে পড়েছে তাঁর। রামকালী ভাবতে চেষ্টা করেছেন মেয়েদের মনকে তাদের অন্তরদাহকে। লেখিকায় ভাষায় — "হ্যাঁ, ভাববেন রামকালী। অনেক কিছু ভাববেন। এইটুকু মেয়েটা কুড়ি বিঘে ধানজমির মোহ ত্যাগ করে তীর্থে যেতে চায় কোন মানসিক অবস্থায় তা ভাববেন, আর ভাববেন মোক্ষদাকে সঙ্গে নিয়ে রাসুর বৌয়ের প্রার্থনাটা পূরণ করা যায় কি না। মোক্ষদার হাত ভেঙেছে, পা-টা তো মজবুত আছে। তাঁর জীবনেও তো কখনও কিছু হয়নি। এ কর্তব্যটা করা উচিত ছিল রামকালীর রান্না-ভাঁড়ার ঘরের জীবনগুলো সম্পর্কে এত বেশি করে কখনও ভাবেন নি রামকালী।"[১৪৩] আবার, চিরতরে কাশী যাওয়ার আগে ছেলেকে বাবু করে তুলতে যেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছে সে স্বামীর সঙ্গে। এমনকি যে দুর্গাপূজার ভার সারদা নিজেই একা মাথায় তুলে নিত এবং রামকালীও তাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হত, সেটিতে সে অরাজী হয়েছে পূজোর ভার অন্য কাউকে দিতে বলেছে। সারদার চরিত্রে ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র রূপ দেখে রামকালীও বিচলিত হয়ে যান। সারদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে রামকালীও ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। লেখিকার ভাষায়— "রামকালী নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন, ওর বিধাতা কি ওকে কতকগুলো উল্টোপাল্টা জিনিস দিয়েই তৈরি করেছিলেন, নাকি জীবনটা ওর উল্টো স্রোতের মুখে পড়ল বলেই? রামকালী ওর হদিস পান না। কখনো ওর ভারসহ কর্মনিষ্ঠা, ওর অসাধারণ নৈপুণ্য, ওর অগাধ সহিষ্ণুতা দেখে তাক লেগে যায়, কখনো ওর বিস্ময়কর নির্লিপ্ততা, দৃষ্টিকটু ঔদাসীন্য দেখে স্তব্ধ হতে হয়।"[১৪৪]

এভাবেই লেখিকা গড়ে তুললেন সারদা চরিত্রটি যার মধ্যে রয়েছে প্রতিবাদী সত্তা নিজের অধিকারকে আদায় করে নেওয়ার ক্ষমতা। প্রতিবাদী হলেও হৃদয়ের অন্তরালে রয়েছে এক সংবেদনশীল হৃদয় যে হৃদয় সাড়া দিয়েছে পটলীর অশ্রুসিক্ত নয়ন দেখে। পটলী অনায়াসেই রণক্ষেত্র ত্যাগ করায় নিজেই যেন ছেড়ে দিয়েছে পটলীর পথ এবং তারই সঙ্গে স্বামীকে আকড়ে রাখার মানসিকতাও। জটিল নারীচরিত্র সৃষ্টিতেও আশাপূর্ণা যে যত্নশীল ছিলেন, সারদা চরিত্র তার প্রমাণ।

পারুল

পারুল 'বকুলকথা' উপন্যাসের বকুলের সেজদিদি যার সঙ্গে ছিল বকুলের গভীর ভাব। পারুল সুবর্ণলতা ও প্রবোধচন্দ্রের সেজ মেয়ে। পারুলকে আমরা 'সুবর্ণলতা'র শেষের দিকেই পেয়ে যাই। পারুল অভিমানী তাইতো তার স্কুলে ভর্তি নিয়ে ঝড় উঠায় সে বেঁকে বসেছে। স্কুলে যেতে চায়নি। সে বলেছে — "অত অপমানের দানে রুচি নেই আমার।"[১৪৫] মেধাসম্পন্ন পারুল বিয়ের আগে রোমান্টিক প্রেমের কবিতা লিখত, সেটাও ছেড়ে দিয়েছে বিয়ের পর সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামীর উপর অভিমান করে। পারুল সম্পর্কে মা সুবর্ণলতার উক্তি — "পারুর মুখে আমি মাঝে মাঝেই আর এক জগতের আলো দেখেছি, পারু লুকিয়ে লুকিয়ে কবিতা লেখে এ আমি বুঝতে পারতাম। কিন্তু পারুর জন্য আমার দুঃখ হয়, পারুর জন্য আমার ভাবনা হয়। বড় বেশী অভিমানী ও। ওর ওই অভিমানের মূল্য কি এই সংসার দেবে?"[১৪৬] পারুল শুধু অভিমানীই নয় একটু শান্তও তাই তো মা সুবর্ণ বলেছে — "ও ওর মায়ের মত অসভ্য হবে না, রূঢ় হবে না, সকলের অপ্রিয় হবে না। কারণ ও শান্ত ও মৃদু, ও সভ্য। ও শুধু অভিমানীই নয় আত্মঅভিমানী। ও ওর প্রাপ্য পাওনা না পেলে নীরবে সে দাবি ত্যাগ করবে, ও অন্যায় দেখলে নিঃশব্দে নিজেকে নির্লিপ্ত করে নেবে। ও অপরকে 'ভালো' করে তোলবার বৃথা চেষ্টা করবে না।"[১৪৭] কানুর ব্যঙ্গকে বহু চেষ্টা করেও সহ্য করতে না পেরে নিজের প্রকৃতিটা লঙ্ঘন করে বলে ফেলে — "মা ভাগ্যিস ওই বড় বড় কথাগুলো শিখিয়েছিলেন মেজদা, তাই তোমারও এত 'বড় কথা' বলার সুযোগ হচ্ছে।"[১৪৮] আবার ঠাকুমা মুক্তকেশীকে ঠাট্টা করে বলেছে — "তোমার কাছে কোন্‌টাই বা নিন্দের নয় ঠাকুমা, তোমাদের সবই বাবা অনাছিষ্টি! ইস্কুলে পড়লে বাচাল হয়, ইংরাজি শিখলে বিধবা হয় —"[১৪৯]

পারুল আর বকুলের মনের গড়ন সম্পূর্ণ আলাদা। পারুল আত্মমগ্ন হলেও বকুলের প্রতি ছিল তার গভীর প্রেম আর পারুলই ছিল বকুলের একমাত্র ভরসা। বকুলের বিয়ের জন্য পারুলকেই তৎপর হতে দেখা গেছে। সে সনাতনী ভাবধারায় বাবাকে বুঝিয়েছে জাতপাতের ঊর্দ্ধ্বে গিয়ে বকুলকে নির্মলের সঙ্গে বিয়ে দিতে, আবার নিজেই গেছে নির্মলের জেঠিমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। অপমানিত হলেও সে হাল ছাড়ে নি। নির্মলের সঙ্গে দেখা করেছে বোনের প্রেমকে সার্থকতা দিতে। নিজের উপর আস্থা ছিল পারুলের, তাই তো এই দুঃসাহসিক কাজ হাতে নিয়েছিল। কিন্তু সফল হতে না পেরে কুণ্ঠিত হয়েছে, বকুলকে ছোট করার জন্য কষ্ট পেয়েছে। তাইতো সে বলেছে — "তোর কাছে আমি অপরাধী বকুল, শুধু শুধু তোকে ছোট করলাম।"[১৫০]

পারুল একাকিত্ব ভালোবাসে। বিধবা হবার পর স্বামীর তৈরি গঙ্গাপারের ঘরটিতে সে একাকিত্বের আনন্দ উপভোগ করেছে। বিধবাদের কোনো নিয়ম সে পালন করে নি। সে লোকনিন্দাকে ভয় পায় নি কোনোদিন। একাকিত্বের আনন্দ ভোগে মগ্ন পারুলকে লেখিকা এভাবে দেখেছেন — "পারুল যে কেবলমাত্র সেই দীর্ঘদিন পূর্বে মৃত অমলবাবু নামের ভদ্রলোকটির স্ত্রী নয়, পারুল যে

মোহনলাল এবং শোভনলাল নামে দু দু'জন ক্লাস ওয়ান অফিসারের মা নয়, পারুল যে বহু আত্মীয়জনের মধ্যেকার একজন নয়, পারুল একটি সত্তার নাম, সেই কথাটাই অনুভব করে পারুল।"[১৫১] নিজের সত্তাকে অনুভবের মধ্য দিয়ে পারুলের মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। পারুল বুঝতে পারে মুক্তিকামী মায়ের আকাঙ্ক্ষার যন্ত্রণাকে, বেদনাকে যে বেদনাকে পারুল আগে বুঝতে পারে নি।

পারুল মোহন ও শোভনের মা। মোহন ও শোভনের প্রতি তার সহজাত বাৎসল্য থাকলেও সেটি আবেগবর্জিত। সন্তানের চাওয়া-পাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধা, ব্যক্তিগত সমস্যাকে একান্ত নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখেছে পারুল। পারুল নিজের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে ছেলে মেয়ের সুখ-শান্তির দিকে তাকিয়ে। অন্যান্য মায়ের মত সন্তানের কাছে নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কামনা করতে পারুলকে দেখা যায় নি। পুত্র শোভনের কাছে থাকতে ইচ্ছা হলেও পুত্রের সংসারে অশান্তি করে থাকাকে সে পছন্দ করেনি। পুত্রবধূ রেখার উদ্ধত ব্যবহার তাকে পীড়িত করলেও ছেলের সংসারে অশান্তি না হওয়ার জন্য শোভনকে তা জানায় নি। আবার শোভনও স্ত্রীকে শাসন করতে না পারায় যে মানসিক যন্ত্রণা পেয়েছে তাও সে দরদ দিয়ে অনুভব করেছে। ফলে ছেলে ও বউয়ের সংসার ত্যাগ করে নিজের গঙ্গার ধারের বাড়িতে চলে এসেছে। শোভন ও রেখার সংসারে ফাটল ধরলে তাতে জোড়া লাগানোর চেষ্টাও করেছে। ছেলের সুখের জন্য রেখাকে স্বামীর কাছে থাকার অনুরোধ করেছে নিজের পরিচিত নির্লিপ্তি থেকে বেরিয়ে। মা, বাবা আলাদা হলে শোভনের ছেলে মেয়ের কি হবে সেটা ভেবে কষ্ট পেয়েছে। শোভনের কথা ভেবে পারুল কেঁদে শোভনকে জিজ্ঞাসা করেছে — "তার মানে তোকে দুজনকেই ছেড়ে থাকতে হবে?"[১৫২] আবার শোভনের ছেলেমেয়ের কথা চিন্তা করে শোভনকে বলেছে — "কিন্তু নিজেদের হৃদয়ের দ্বন্দ্বই বড় হয়ে উঠল তোদের কাছে? ছেলেমেয়ে দুটোর কথা ভাববি না?"[১৫৩] পারুলের কথার মধ্য দিয়ে পারুলের উদ্বিগ্ন মাতৃহৃদয়ের চিন্তাকেও প্রকাশ করেছেন লেখিকা।

সেকালে ছাঁচ গড়া দজ্জাল শাশুড়ির ভূমিকা নেয় নি পারুল। ঠাকুরঘর আর ভাঁড়ার ঘর নিয়ে মেতে থাকেনি পারুল। সে দিন কাটিয়েছে পশম বুনে, সে খবরের কাগজ পড়েছে, বাইরের ঘরের সোফায় বসে। পারুল পুত্র ও পুত্রবধূর অসুবিধার কারণ হতে চায় নি, বরং নিজের মত করে জীবন কাটাতে চেয়েছে একাই। কিন্তু রেখা পারুলের মধ্যে গড়পড়তা শাশুড়ির রূপ না পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছে; পারুলকে সে সমালোচনা করেছে। পারুল নিঃশব্দে রেখার দেওয়া অপমানকে মেনে নিয়েছে, ছেলের সংসারে অশান্তি যাতে না হয় তা ভেবে। তবে সে অপমানিত হয়ে ছেলের কাছে থেকে যায় নি। পারুল ছেলেদের ভালোবাসে কিন্তু সে ভালোবাসা দিয়ে ছেলেদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখতে চায় না। ছেলেদের সুখেই সে সুখী হতে চায়। তাই সে বলেছে — "ব্যাপারটা ভারী সূক্ষ্ম রে বকুল, ও বলে বোঝানো শক্ত, অনুভবেই ধরা যায় শুধু। তুই তো আবার ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস : জগতের যে দুটি শ্রেষ্ঠ রস, তার থেকে দিব্যি পাশ কাটিয়ে কাল্পনিক মানুষের দাম্পত্যজীবন আর মাতৃস্নেহ নিয়ে কলম শানাচ্ছিস। আমি ওদের মুক্তি দিয়েছি, ওরা বলেছে —

"মা আমাদের ত্যাগ করেছে, আমি যদি ওদের আঁকড়াতাম ওরা বলতো, 'ওরে বাবা, এ যে অক্টোপাশের বন্ধন!' তবেই বল্, মার মধ্যে যদি সত্যি ভালবাসা থাকে, তবে সে কী করবে? নিজের সুনাম-দুর্নাম দেখবে? না সন্তানকে সে অক্টোপাশের বন্ধন থেকে মুক্তি দেবে?"[১৫৪]

এভাবেই লেখিকা পারুলের মধ্যে আধুনিক মনোভঙ্গি ছড়িয়ে দিয়েছেন। এমনকি পারুল ছেলেদের থেকে কিছু প্রত্যাশাও করে না। লেখিকার ভাষায় "পারুল কোনদিন তাদের কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করে না। পারুল যেন সব কিছুতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। মনে হয় 'দরকার' নামক বস্তুটিকে পারুল জীবন থেকে নির্বাসন দিয়েছে।"[১৫৫] সে নিজের গঙ্গার ধারের বাড়িতে স্বাধীনভাবে বেঁচেছে। এভাবেই লেখিকা এক ব্যতিক্রমী মা, শাশুড়ি এবং আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নারী সৃষ্টি করেছেন। রক্ষণশীল পরিবেশে গড়ে তুলেছেন আত্মসত্তায় মগ্ন, বৈধব্যের জ্বালাহীন এবং ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র।

শম্পা

শম্পা 'বকুলকথা' উপন্যাসের একটি অন্যতম চরিত্র। এ চরিত্রর মধ্য দিয়ে লেখিকা 'আধুনিক' কালের তরুণীদের বোঝার চেষ্টা করেছেন। 'শম্পা' বকুলের ভাইঝি, বকুলের ছোড়দার মেয়ে। শম্পা সুবর্ণলতার তৃতীয় প্রজন্ম ও সত্যবতীর চতুর্থ প্রজন্ম। পিতামহী ও মাতামহীর উত্তরসত্তা হয়েই প্রতিবাদী ভূমিকা নিয়ে উপন্যাসে আবির্ভূত হয়েছে। পার্শ্বচরিত্র হয়েও উপন্যাসে উজ্জ্বল ভূমিকা তার। কারণ প্রধান চরিত্র অনামিকা দেবী ওরফে বকুল দর্শকের ভূমিকায় থেকে শম্পাদের কালটাকে দেখার চেষ্টা করেছেন। লেখিকা আশাপূর্ণা এই চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন আধুনিককালের নারীদের প্রতীক রূপে। আশাপূর্ণা দেবী 'বকুলকথা'য় আধুনিক যুগে পুরুষতন্ত্রের যাতাকল থেকে বেরিয়ে আসা বিশ শতকের স্বাধীন মুক্ত নারীকে দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে উগ্র আধুনিক নারীর সমস্যাকে উন্মোচন করেছেন। বস্তুত আধুনিককালের মেয়েদের দুটি রূপ দেখিয়েছেন আশাপূর্ণা — শম্পা ও সত্যভামাকে পাশাপাশি রেখে, বৈপরীত্যের আলোয়। আধুনিক নারী শম্পা বহু ছেলের সঙ্গে ভাব করেছে। অনেকে আবার শম্পার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে কিন্তু শম্পা রাজি হয় নি, কারণ শম্পা সন্ধান করেছে প্রকৃত প্রেমিকের, যে প্রেমে থাকবে না কোনো চোখের নেশা। তার জীবনে সে প্রেম এসেছে রূপহীন কারখানার এক সাধারণ শ্রমিক সত্যবান রূপে। সত্যবান এর মধ্যে পুরুষতন্ত্রের মনোভাব নেই। শম্পা পুরুষতন্ত্রের মনোভাবাপন্ন পুরুষের সঙ্গ কামনা করে না। তার বিশ্বাস বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতায় পরিপূর্ণ এক সত্তার। সেই সত্তা সে দেখেছে সত্যবানের মধ্যে, তাই সত্যবান বিয়ে না করতে চাইলেও শম্পা তাকে বিয়ে করতে চেয়েছে। সে বংশগৌরব, কুলমর্যাদা, জাতপাত, সামাজিক স্তর টাকাপয়সা খুঁজেনি। শম্পার পছন্দকে মা বাবা মেনে নিতে পারেনি। সব মা বাবার মতই চাকরিজীবী রূপগুণযুক্ত জামাতারই কামনা করেছেন তাঁরা। তাই শম্পার প্রকৃত প্রেম তাঁদের কাছে সম্মান পায় নি। শম্পা সত্যবান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মানুষের মূল্য যে রূপে নয় তার গুণে সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে। এমনকি সে বাবাকে এটাও বোঝাবার চেষ্টা

করেছে মানুষের প্রকৃত মূল্য তার পেশায় নয়। "ছোট কাজ করলেই কেউ ছোট হয়ে যায় না বাবা।"[১৫৬] শম্পা নারীর মর্মবেদনা, যন্ত্রণা, মানবিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা পুরুষের প্রতিনিধি স্বরূপ বাবার বিরুদ্ধাচরণ করেছে দ্বিধাহীনভাবে। লেখিকার ভাষায় — "বাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল শম্পা। শম্পার বাবার বোনের মত ভীরু ভঙ্গীতে নয়, দাঁড়ালো নিজের ভঙ্গিতেই। যে ভঙ্গীতে ভীরুতা তো নয়ই, বরং আছে কিঞ্চিৎ অসহিষ্ণুতা। যেন ট্রেনের টিকিটই কাটা আছে, যাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, অতএব যা বলার চটপট বলে নাও বাপু।"[১৫৭] শম্পার এই আচরণ মধ্যযুগীয় মানসিকতা ও মূল্যবোধে আঘাত হানলেও, লেখিকা দেখান, পুরুষতান্ত্রিক অচলায়তন থেকে প্রান্তিকায়িত নারী সত্তার স্বাধীন নারীপরিসর পাবার জন্য এই প্রতিবাদ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যে পুরুষতন্ত্র নারীকে লাঞ্ছিত করে অপমানিত করে সেই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করে শম্পা আধুনিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু অলকার মেয়ে সত্যভমা আধুনিক হবার জন্য ফ্যাশনকে আষ্টেপৃষ্ঠে গ্রহণ করলেও প্রতিবাদী না হওয়ায় আধুনিক হয়ে উঠতে পারে নি কারণ আধুনিকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা এক নয়।

শম্পাকে লেখিকা ব্যতিক্রমী চরিত্র রূপেই সৃষ্টি করেছেন। শম্পার মধ্যে রয়েছে প্রবল আত্মসম্মান বোধ। অনামিকা দেবী মা সুবর্ণলতার আদলই দেখতে পেয়েছেন শম্পার মুখের মধ্যে। সুবর্ণলতার মত শম্পার মধ্যেও বারান্দার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। সত্যবানের সঙ্গে সংসার পাতার সময় সে পিসিকে ভাড়াবাড়ি দেখার অনুরোধ করে বলেছে — "বাসাটায় একটু বারান্দা যেন থাকে বাপু।"[১৫৮] সুবর্ণলতার ছিল বহির্জগতেরপ্রতি অশেষ আকুতি, বহির্জগতের মুক্তির স্বাদ সে পেতে চেয়েছিল কিন্তু পায় নি। তারই নাতিনী শম্পা আধুনিক যুগে এসে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে তারই সঙ্গে পেয়েছে বহির্জগতে স্বেচ্ছায় ঘুরে বেড়ানোর ছাড়পত্র। অনামিকা দেবী শম্পাদের যুগটাকে অবাক হয়ে দেখেছেন। এ যুগে শম্পাই নয় বকুলের বাড়ির অন্যান্য মেয়েরাও মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। আধুনিক যুগে এসে শম্পারা স্বাধীনতা পেয়েছে ঠিকই কিন্তু মা, বাবা, সমাজ তাদের উপরও আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা চালায় প্রতিনিয়ত। নিজের ইচ্ছায় চালাতে গিয়ে তারা তাদের ইচ্ছার রাশ, চিন্তা আরোপ করতে চায় ছেলে মেয়ের উপর কিন্তু শম্পাদের দলেরা মা, বাবা এবং সমাজের টেনে দেওয়া সীমানাকে অস্বীকার করে সৃষ্টি করে নিয়েছে নিজেদের চাওয়া পাওয়ার সীমানা। এখানেই বেঁধেছে মা বাবার ও সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষ। এই সংঘর্ষই তাদের করে তুলেছে বিদ্রোহী। তাইতো শম্পার বাবা কারখানায় ছোট কাজ করে বলে শম্পাকে সত্যবানের সঙ্গে মিশতে বারণ করে নিজের ইচ্ছাকে শম্পার উপর চাপাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শম্পা প্রতিবাদ জানিয়েছে দৃঢ়তার সঙ্গে। সে বলেছে — "তোমার চাওয়ার আর আমার চাওয়ার মধ্যে যদি মিল না থাকে বাবা।"[১৫৯] শম্পার বাবা ভুলে যান নিজেদের কাল অতিক্রম করে শম্পাদের কালে উপনীত হয়েছেন তাঁরা। তাই মেয়ের দুঃসাহস দেখে নিজের আধিপত্য জোর করে বিস্তার করতে গিয়ে মেয়ের তার বাড়িতে থাকা চলবে না বলে ফেললে অভিমানী শম্পা আত্মসম্মানবোধে পিতার নিরাপদ আশ্রয়কে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছে দ্বিধাহীনভাবে।

শম্পা প্রেমে পড়েছে অনেকের। একের পর এক জনের সঙ্গে শম্পা প্রেম চালিয়েছে। ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে সে জড়তাহীন ভাবে সিনেমায় গেছে। বকুলের ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে সনাতনী বাড়িতে বকুল দাদা, বাবার ভয়ে নির্মলের প্রতি তার প্রেমকে প্রকাশ করতে পারেনি, নির্মলদের বাড়িতে যেতে ভয় পেয়েছে। নির্মলদের বাড়িতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে গুরুতর অপরাধীর মত থেকেছে। সেই বাড়িতে থেকেই শম্পা পিসির কাছে নিজের প্রেমকে বীরত্বের সঙ্গে প্রকাশ করছে। সে প্রেমে পড়াকে বাহাদুরি মনে করেছে, উল্লাসের সঙ্গে বলেছে — "পিসি বললে তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আবার একটা নতুন শিকার জালে ফেলেছি।"[১৬০] শম্পার সামনে এলে অনামিকা দেবীর মনে পড়ে বকুলের অসহায় প্রেমের কথা, মনে পড়ে বকুলের অসহায় অবস্থার কথা। মনে হয় যেন আলোক থেকে বঞ্চিত নারী এগিয়ে চলেছে আলোর দিকে। আধুনিক নারী শম্পা জানে নিজের ভালোবাসার অধিকারকে জোর খাটিয়ে আদায় করতে, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে সে বেরিয়ে এসেছে সত্যবানের সঙ্গে নিজের প্রেমের পূর্ণতা দিতে। শম্পার বেপরোয়া, উদ্ধত আচরণের অন্তরাল থেকে বেরিয়ে আসে নারী হয়ে ওঠা একটি মেয়ের কোমল হৃদয় যা সত্য এবং চিরন্তন যেখানে রয়েছে সত্যবানের জন্য অশেষ ভালোবাসা। সে ভালোবাসা দিয়েই সে গড়তে চেয়েছে সত্যবান ও তার সংসার। কম বয়সেই শম্পা আধুনিক সমাজ ও মানুষকে বুঝে নিয়ে প্রকৃত প্রেমের সন্ধান করেছে। তার মধ্যে রয়েছে দৃঢ়তা যে দৃঢ়তা তাকে ঘর ছেড়ে পথে নিয়ে এসেছে, অনিশ্চয়তার পথে সত্যবানের হাত ধরে। শম্পার মধ্যে রয়েছে মানসম্মানবোধ, তার মধ্যে ভীরুতার লেশ মাত্র নেই। শম্পা সত্যবানকে নিয়ে উঠেছে পিসি পারুলের বাড়িতে, যে পিসিকে সে কোনোদিন দেখেনি এবং অনায়াসে পিসির সঙ্গে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। শম্পার কথা পারুল এভাবে বলেছে — "দুর্লভ মেয়ে! ওকে ওর মা-বাপ বুঝতে পারলো না। অবশ্য না পারাই স্বাভাবিক। সাধারণতঃ যে মালমশলা দিয়ে আমাদের এই সংসারী মানুষগুলো তৈরী হয়, ওর মধ্যে তো সেই মালমশলার বালাই নেই। যা আছে সেটা সংসারী লোকেদের অচেনা।"[১৬১] সেজপিসির বাড়িতে থাকাকালীন সত্যবানের বোমা দুর্ঘটনার কথা শুনে অচেনা ছেলের সঙ্গে চলে যেতেও ভয় পায় নি সে, যেভাবে ভয় পায় নি বাবার নিরাপদ আশ্রয়কে ত্যাগ করতে।

শম্পাকে লেখিকা আধুনিক করে গড়ে তুললেন মধ্যযুগীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে একেবারে মুছে দেন নি। তাই তো ঠাকুর দেবতা না মানলেও সত্যবানের অসুখের সময় সে মানত করে বসেছে। "সাতজন্মেও ঠাকুর-দেবতার ধার ধারি না, ধারেকাছেও যাই না, যারা ওই সব ঠাকুর-ঠাকুর করে তাদের দিকে বরং কৃপার দৃষ্টিতে তাকাই। কিন্তু তোমার কাছে বলতে আর লজ্জা কি, জাম্বোর যেদিন হঠাৎ একেবারে একশো ছয় জ্বর উঠে বসলো চড়চড় করে, ডাক্তার মাথায় হাত দিয়ে পড়লো বলেই মনে হলো, সেদিন না দুম করে ঠাকুরের কাছে মানত না কি যেন তাই করে বসলাম। বললাম, হে ঠাকুর, ওর জ্বর ভালো করে দাও, তোমার অনেক পুজো দেব।"[১৬২] চেষ্টা করেও পুরাতন মূল্যবোধকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না সেটাই প্রমাণ করলেন লেখিকা। আর এই মূল্যবোধের পিছুটানের ফলেই শম্পাকে আধুনিক করলেও উগ্র করেন নি। আর এই সনাতনী

টানেই শম্পা সত্যবানকে ত্যাগ করেনি বোমা দুর্ঘটনায় দু পা হারানোর পরও। পরে মা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেও স্বাভিমানী শম্পা মা-বাবার উপর নির্ভরশীল না হয়ে চাকরির ব্যবস্থা করে আলাদা বাড়িতে থেকেছে। শম্পা বাবার সঙ্গে রাগ করে গৃহত্যাগ করে মা-বাবাকে কষ্ট দেবার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। সে বলেছে পিসিকে — "পিসি তাদের কাছে এসে দাঁড়াবো, মাথা নীচু করে আশীর্বাদ চাইবো। বলবো বাবা স্বামীর সঙ্গে শত দুঃখ বরণ এ তো এদেশেরই গল্প। সাবিত্রী, দময়ন্তী, শৈব্যা, সতী কিম্বা দ্রৌপদী এঁদের গল্প তো তুমিই শুনিয়েছো ছেলেবেলায়, কিনে দিয়েছো এঁদেরই বই। আমার শুধু চেহারাটা আধুনিক, আমার শুধু কথাবার্তা এ যুগের আমার শুধু গতিভঙ্গী বর্তমানের — আর কি তফাৎ আছে বল?"[১৬৩] আবার সেজপিসির বাড়ি থেকে না বলে চলে যাওয়ার জন্য এবং কোনো সংবাদ না দেওয়ার জন্য পিসি অনামিকা দেবীর কাছে নিজের অপরাধ সহজেই মেনে নিয়েছে। সে এটাও জানিয়ে দিয়েছে এর পেছনে আর কিছু নয় সত্যবানের প্রতি তার ভালবাসাই কাজ করেছে। সে বলেছে — "বোমা তো ওর পায়ে পড়েনি, পড়েছিল আমার মাথায়। জ্ঞানগম্যি ছিল না। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে কেবল ওকে কী করে বাঁচিয়ে তুলবো সেই চিন্তায়।"[১৬৪]

আধুনিককালের নারী স্বাধীনতার প্রশ্ন, নবীন সাহস, পুরনো ধ্যানধারণার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা শম্পা একই সঙ্গে লেখিকার নারীস্বাতন্ত্র্যভাবনার সীমানা ও সীমাবদ্ধতাকেও তুলে ধরেছে।

নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাস 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', 'অন্যজীবন' এবং 'অভিযাত্রী' উপন্যাস তিনটির কয়েকটি প্রধান চরিত্র

নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাসে বহু ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ লক্ষিত হয়। ঘটনাগুলিকে আলোকিত করার উদ্দেশ্যেই তিনি চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেন। ঘটনা প্রকাশ বাঞ্ছাই কাজ করে তাঁর চরিত্র সৃষ্টির মূলে, তাই চরিত্র থেকে ঘটনাকেই বেশি প্রাধান্য পেতে দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে। ঘটনার প্রয়োজনেই চরিত্রগুলির আগমন হেতু চরিত্র সৃষ্টিতে নিরুপমা বরগোহাঞিকে তেমন যত্নবান হতে দেখা যায় নি, ঘটনার প্রয়োজনে চরিত্রগুলির আগমন ঘটে যায়। তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি বহুক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। নিরুপমা বরগোহাঞি তাঁর জীবনব্যাপী যে সমস্ত চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছেন সেই চরিত্রগুলিই ঘুরে ফিরে তাঁর উপন্যাসের চরিত্র হয়ে আমাদের সামনে প্রকাশ পেয়েছে। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', 'অন্যজীবন' এবং 'অভিযাত্রী' উপন্যাস তিনটিতে বিশ শতকের অসমীয়া সমাজের বিভিন্ন দিক ও সমস্যা ফুটে উঠেছে। উপন্যাসগুলিতে পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের সংখ্যা কম হলেও বহু ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। তিনি চরিত্রগুলিকে দেশকালীন পটভূমিতেই স্থাপন করেছেন। নিরুপমা বরগোহাঞি উপন্যাস সম্ভার (২) এর প্রাক্কথনে জানিয়েছেন — "ইয়াত সন্নিবিষ্ট 'অন্যজীবন'খন বহুতো পাঠক সমালোচকে মোর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বুলি ভাবে আরু 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর'খন মোর নিজর আটাইতকৈ প্রিয় উপন্যাস, সেইখনর দরে হৃদয় উজারি মই আন এখন উপন্যাস লিখা নাই।"[১৬৫] 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাস

সম্পর্কে রাজেন কলিতার উক্তিটি উল্লেখ করা যেতে পারে — " 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' পাগলাদিয়ার কাহিনি নহয়, তার পারর মানুহর কাহিনি। পহিলা উপন্যাসখনত দেখা পোয়া প্রতিশ্রুতিসমূহে আহি এই উপন্যাসত অধিক পূর্ণতা লাভ করিছে। পাগ্‌লাদিয়ার গাঁওত সিপা থাকা বহুকেইটা চরিত্ররে আশা-আকঙ্খা, দুখ-বেদনা, আনন্দ-আহ্লাদ আরু স্বপ্নভংগর নিদারুণ যাতনার কাহিনীয়ে এশ বায়ান্ন পৃষ্ঠার নাতিদীর্ঘ উপন্যাসখনর পাতে পাতে খলকনি তোলে। গাঁয়লীয়া জীবনর সরলতা আরু পোনপটীয়া নিষ্ঠার বিপরীতে চহরীয়া জীবনর অর্থ-গধূরতা, জটিলতা আরু স্বার্থই বান্ধি রখা মানব সম্পর্কর একোখন ছবিও লেখিকাই নিপুণভাবে আঁকিব পারিছে।"[১৬৬] গ্রাম্য জীবনের সরলতার পাশে শহরের জটিল ও স্বার্থপর জীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে লেখিকা উপন্যাসে করেছেন বহু চরিত্রের সমাবেশ। ঠিক একই ভাবে চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখিকার দক্ষতা দেখিয়ে ড০ গোবিন্দ প্রসাদ শর্মা 'অন্যজীবন' সম্পর্কে বলেছেন — ".... চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রত এই উপন্যাসত ঔপন্যাসিকার বিশেষ কৃতিত্ব এটা কথাতে ধরা পরিছে। নারীর দুখ-ভাগর, সুখ-শান্তির কথা নুবুজা কেইবাটাও চরিত্রক ইয়াত ভিলেইনর শারীলৈ ননমাই, রুচিবান, গুণী-জ্ঞানী, আনকি অন্যথাই হৃদয়বান করি রাখিও লেখিকাই তেঁওলোকক পাঠকর চকুত শ্রদ্ধা আরু সমাদরর পাত্র করিয়েই রাখিছে। .... চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রত প্রতিপক্ষর চরিত্রও সহানুভূতির বা বাস্তবনিষ্ঠতারে সৃষ্টি করিব পরা এনে ক্ষমতাই লেখিকার কলাকার হিচাপে হিচাপে দক্ষতার পরিচয় বহন করিব পারিছে।"[১৬৭]

প্রধান নারী চরিত্রসমূহ

নিরুপমা বরগোহাঞিও সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে তাঁর উপন্যাসের নারী চরিত্রগুলি তুলে এনেছেন। নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁর গভীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বিশ্লেষণ শক্তির প্রকাশ ঘটেছে। শিক্ষাগ্রহণ ও কর্মের সুবাদে তিনি বৃহত্তর সমাজের নানা স্তরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন ফলে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটেছে। তাঁর সংস্পর্শে আসা মানুষগুলি ও তাদের ঘটনাবহুল জীবন উপন্যাসে চরিত্র ও কাহিনি রূপে স্থান পেয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের নারী চরিত্র তাঁর উপন্যাসে স্থান পাওয়ায় চরিত্রগুলির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষিত হয়েছে। চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে কার্যাবলীর পার্থক্য, পারিবারিক জীবনের পার্থক্য অর্থনৈতিক দিকে পার্থক্য ও জীবনবোধের ক্ষেত্রের পার্থক্য। প্রগতিশীল লেখিকার নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারী মুক্তি এবং অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষাজনিত বক্তব্যই আভাসিত হয়েছে এবং তারই সঙ্গে অসমীয়া সমাজে নারীর বাস্তব অবস্থানও চিহ্নিত করেছে।

পটেশ্বরী

নিরুপমা বরগোহাঞির 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসের একটি চরিত্র পটেশ্বরী। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে পটেশ্বরীর ঘটনাবহুল জীবন। পটেশ্বরীর ঘটনাবহুল

জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে নিরুপমা বরগোহাঞিঃ নারীর উপর পুরুষশাসিত সমাজের দ্বারা হওয়া নিষ্পেষণ ও নির্যাতনের দিকটি এবং অর্থনৈতিকভাবে অস্বাবলম্বী দরিদ্র নারীর দুঃখময় জীবনকথাই উন্মোচিত করেছেন। এদিক থেকে পটেশ্বরীর চরিত্রটিকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের আসনে স্থাপন করা যেতে পারে। উপন্যাসে এই চরিত্রটির গতিশীলতা আমাদের আকর্ষণ করে। পটেশ্বরীকে করুণ চরিত্রের অভিধা দেওয়া যেতে পারে। জীবন যাপন করার জন্য তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম, চরিত্রটির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

পটেশ্বরী নলবারীর ঢলকুছি গ্রামের এক দরিদ্র কৃষকের মেয়ে। পটেশ্বরীর জীবনে ঘটা বিভিন্ন ঘটনার জন্য সে দুঃখ পেয়েছে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে কিন্তু প্রতিবাদ করে প্রতিবাদী চরিত্রের আসন অধিকার করতে পারে নি। এই চরিত্রটির মধ্যে প্রতিবাদী নারীর থেকে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত নারীর ক্ষোভ ও হতাশাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। সুন্দরী পটেশ্বরীর সংঘাতময় জীবন শুরু হয় ধনী মারবাড়ি ব্যবসায়ীর পুত্র পূজনের প্রেমে পড়ে যৌবনের স্বপ্ন নিয়ে পূজনের সঙ্গে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা থেকে। কমবয়সী অশিক্ষিতা সুন্দরী পটেশ্বরীকে বিয়ে করার কথা বলে পূজন নিয়ে গেলেও নিজের ভোগবাসনা চরিতার্থ করে পটেশ্বরীকে গুয়াহাটীর হোটেলে রেখে চলে যায়। হোটেলের কর্মচারী রূপ গুণহীন চবিন পটেশ্বরীর রূপে মুগ্ধ হয়ে পটেশ্বরীকে বিয়ে করে তাকে পতিতা হবার থেকে রক্ষা করে। পটেশ্বরীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও চবিনকে বিয়ে করতে হয়। চবিন ও পটেশ্বরীর সাংসারিক জীবন সুখেই চলছিল কিন্তু পটেশ্বরীর জীবনে আবার একবার নেমে আসে বিপর্যয়। হোটেলের মালিকের ভোগবাদী চোখ তার উপর পড়ে। নিরুপায় চবিন নিজের হাতে পটেশ্বরীকে হোটেলের মালিকের হাতে তুলে দিলেও সন্দেহ ও ঈর্ষাবশত পটেশ্বরীর উপর অত্যাচার শুরু করে। পটেশ্বরীর বুদ্ধির বলেই পটেশ্বরীকে চবিন মালিকের হাত থেকে রক্ষা করতে পারলেও, পটেশ্বরী আগে বুদ্ধি না দেওয়ার জন্য পটেশ্বরীর উপর আরও বেশি অত্যাচার করতে শুরু করে। চবিন পটেশ্বরীকে বলেছে — "তই চালী বেশ্যা সংসার করি সতী বোলাবা আইহলি কি হবো, বাঘে এক্‌বার তেজোর গোন্ধ পোয়ার দরে তোকো দহটা মতার গার গরম নহলি নচলা হৈছি, মোর চেহ্‌রা আচলোত তোর পছন্দো নহয় কারণেই তই দহটা মতার পাছোতে দউরিছ।"[১৬৮] চবিন পটেশ্বরীকে ভালোবেসেছে কিন্তু তার রূপের জন্য তাদের সংসারে অশান্তি নেমে এসেছে। চবিন পটেশ্বরীকে বেশ্যা বলে গালি দিলে এবং তাকে প্রহার করলে পটেশ্বরী কোনো প্রতিবাদ করেনি বরং চবিনকে ভালোই বেসেছে আর তার জন্য চবিনও জীবনে সুখী হতে পারেনি ভেবে দুঃখও পেয়েছে — "বেচেরা চবিন, তাইক বিয়া করাই সি আরু সুখ নাপালে। তাইর রূপ আরু তার মরম ভরা অন্তর — এয়ে তার কাল হ'ল।"[১৬৯]

পটেশ্বরীর জীবনে আরও দুঃখ নেমে আসে চবিনের মৃত্যুর পর। চবিনের মৃত্যুর পর পটেশ্বরী ছেলে নবীন ও মেয়ে সাবিত্রীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। গ্রামে ফিরে আসার পর পটেশ্বরীকে জীবন যাপনের জন্য অনেক দুঃখের সম্মুখীন হতে হয়। গ্রামে ফিরে এলে তার মা খুশী হয় এবং মায়ের কথায় দাদারা তাকে সাহায্য করলেও নিজেদের বাড়িতে স্থান দেয়নি, সে কলংকিনী বলে

তাকে বাড়ির পাশের খালি জায়গায় ঘর বানিয়ে দিয়েছে। পটেশ্বরীর কলংকিনী বলে বউদিরাও তাকে পছন্দ করে নি। কিন্তু পটেশ্বরীকে তাদের উপর কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় নি বরং আশ্রয় দেওয়ার জন্য তাদের প্রতি পটেশ্বরী কৃতজ্ঞই থেকেছে। দাদাদের দেওয়া কিছু পয়সা আর নিজে গ্রামের ধনী লোকের বাড়িতে কাজ করে জীবন যাপন করেছে সে কোনোপ্রকারে। এরূপ দরিদ্রতার মধ্যে তৃতীয় কন্যা দ্রৌপদীর জন্ম হয়। সংসার চালাতে না পেরে পটেশ্বরী মেয়ে সাবিত্রীকে শহরে মালিকের বাড়িতে কাজে দিতে বাধ্য হয়েছে।

পটেশ্বরীর রূপের জন্য বার বার পটেশ্বরীকে কষ্ট পেতে হয়েছে, তার রূপই যেন বার বার তার শত্রু হয়ে উঠেছে। নীলকণ্ঠ মহাজনের ছেলে ললিতের তার প্রতি থাকা আশক্তির প্রকাশ দেখে জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতায় সে ভেবেছে — "দরিদ্র মানুহর কারণে রূপ বস্তুটো এটা অভিশাপহে, এই রূপেই তাইক সমস্ত জীবন লটিঘটি করি মারিলে।"[১৭০] এমনকি তার রূপ দেখে মালিকের ছেলে বউ বিভাও তাকে সন্দেহের চোখেই দেখেছে। ভেবেছে যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে এত সুন্দর পটেশ্বরী তাদের বাড়িতে থাকতে নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশি সুন্দর ছিল ও তার স্বামীর চোখ নিশ্চয়ই পটেশ্বরীর উপর পড়েছে। তবে পরবর্তীতে অসুস্থতা ও দুঃখ কষ্ট তার রূপকে একদিন ক্ষয়িত করেছে। তার মধ্যে আগের সে আকর্ষণ না থাকায় ললিত আর তার দিকে নজর দেয় নি এমনকি ডাক্তারও তাকে আগের মতো গুরুত্ব না দেওয়ায় তার মনে এক তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্ম নেয় পুরুষের উপর। পুরুষের শুধু নারীর দেহের প্রতি আকর্ষণের কথা ভেবে, পুরুষের প্রতি পটেশ্বরীর পুঞ্জীভূত ঘৃণা বীভৎস বিকৃত উল্লাসের রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে — "অ' চালা শগুণহাত, তঁহতে মরাশ খুঁটি খুঁটি খাবাক্গেলি আরু মাংসো নাপায়া হলি নহয় — চালা তিরীর মাংসোর লুইভা শগুণহাত—।"[১৭১] (ও শালা শকুনের দল, তোরা মৃত মাংস খুঁটে খুঁটে খেতে গিয়ে মাংস এখন আর পেলি না — শালা নারীমাংসলোভী শকুনের দল।) এভাবেই পটেশ্বরী পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দেহের প্রতি পুরুষের কুদৃষ্টিকে তিরস্কার করেছে। যে পটেশ্বরী দরিদ্রতার জন্য রূপকে অভিশাপ মনে করেছে সেই পটেশ্বরীই নিজের দারিদ্র জর্জরিত, ব্যাধিগ্রস্ত, বীভৎস শরীর দেখে উল্লাস বোধ করেছে — "এক সাংঘাতিক শত্রুর যেন ইমান দিনর মূরত পতন হ'ল। আরু সেই সাংঘাতিক শত্রু হ'ল তাইর এই রূপ, — এই অপরূপ সৌন্দর্য, যি সৌন্দর্য হ'ল তাইর সকলো অপরাধর উৎস, যি অপরাধে আজি অত বছরে তাইর কায়ার ছায়া হৈ অনবরতেই তাইর লগে লগে লাগি ফুরিছিল — যি অপরাধ চবিনর অপার প্রেমে কোনদিন পুরাপুরি ক্ষমা করিব পরা নাছিল — আজি অবশেষত সেই সকলোরে মূল তাইর অপরূপ সৌন্দর্যর সঁচাকৈয়ে মৃত্যু ঘটিল। আজি অত বছরর মূরত আগর পটেশ্বরীর সঁচাকৈয়ে মৃত্যু ঘটিল, এতিয়া আরু এই পটেশ্বরীর রূপক লৈ তাইর কোনো দুর্ভাবনা নাই, এতিয়া তাই নিশ্চিন্ত মনেরে পুরুষর রাজ্যত চলা-ফুরা করিব পারিব—।"[১৭২] তবে তার এই উল্লাসের সঙ্গে সংগোপনে তার বেদনাও প্রকাশ পেয়েছে তার নিজের চেহারা আয়নায় দেখে শিউরে ওঠার মধ্য দিয়ে — "আইনার ভিতরর সেই মানুহজনী তাই? সঁচাকৈয়ে তাই? তাই পটেশ্বরী? ডিঙির হাড়, জকজকাই ওলাইছে, গাটো শুকাই এচটা খরির

দরে হৈছে, রদে-বরষুণে পুরি ক'লা হৈছে, নানা দুখ-দুর্গতি, অনাহার, অবসাদ-দুশ্চিন্তাত মুখখন ক্লান্ত আরু করুণ হৈ পরিছে — আইনার ভিতরর পরা বিষণ্ণ চাওনিরে তাইলৈ টেলটেলিকৈ চাই থকা এই বীভৎস চেহেৰার মানুহজনী স্বয়ং তাই?"[১৭৩] লেখিকা হৃদয়ের সহানুভূতির মধ্য দিয়ে পটেশ্বরীর বিপরীতধর্মী অনুভূতির প্রকাশ করে পটেশ্বরীর প্রতি পাঠকের হৃদয়ে করুণা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তার অনুভূতিকে বিকৃত রূপ দেওয়া পুরুষের প্রতি পাঠকের মনে ঘৃণার সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছেন।

দরিদ্র পটেশ্বরী এবং চবিনের সুখের সংসার ধ্বংসকারী মালিকের প্রতিও পটেশ্বরী ক্ষোভ পোষণ করে রাখে নি বরং তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞই থেকেছে। মালিকের মৃত্যুর পর মালিকগিন্নির সঙ্গে সহজ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। নীলকণ্ঠ মহাজনের মাস্টারনি বউ তাঁত বোনার ভার দিলে সেগুলোকে নিয়ে বিক্রি করার জন্য শহরে মালিকের ঘরে গেছে। শুধু তাই নয় দশ টাকার বিনিময়ে মেয়ে সাবিত্রীকে শহরের মালিকের ঘরে কাজে দিয়েছে। দরিদ্রতার জন্য মেয়ে সাবিত্রীকে মালিকের বাড়িতে কাজে দিতে বাধ্য হয়ে মায়ের মন গভীর বেদনা অনুভব করেছে। ছেলে নবীনকে বহু দুঃখকষ্টের মধ্যেও পড়াশোনা শিখিয়ে বড় মানুষ করার স্বপ্ন দেখেছে পটেশ্বরী। তাই অনেক কষ্ট করে নবীনকে বই কিনে দিতেও দেখা গেছে তাকে। ছেলে নবীনের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেলে ছেলেকে মামার দোকানে থাকার জন্য তেজপুরে পাঠাতে বাধ্য হলেও মামী ছেলেকে ভালো করে খেতে না দেওয়ার কথা শুনে কষ্টও পেয়েছে সে। মেয়ে সাবিত্রী নিপেনের বাগান থেকে চুরি করলে নিপেন প্রহার করার আগেই নিজে সাবিত্রীর শুকনো চুলগুলো টেনে কিল মেরে বলেছে— "মরাণ্ নহা। আপী মারিও নযাহ, মোক খাবাক্গেলি বাচি আছাহ্। আজিরপরাই নিপেনর বাগানোত ভরি দিলি জেং খরিদি তোর ভরি দুখান একেবারে কুইবে ভাঙি যাম....।"[১৭৪] এমন করে নিপেনের প্রহার থেকে যেমন মেয়েকে সে রক্ষা করেছে তেমনি গুয়াহাটি যাবার পূর্বে সাবিত্রীকে ভাত খাবার কথা বলে মেয়ের জন্য হৃদয়ের স্নেহ ভালোবাসা ও চিন্তাই প্রকাশ করেছে — "চালী আপী, আরু কিমান কান্দি থাকাহ্। চরুতে রাতির ভাত আছে, দুয়ো বইনেরে ভাগে খাগে যা।"[১৭৫] দারিদ্র্যের জন্য সাবিত্রীকে কাজে দিলেও সাবিত্রী মালিকনীর বাড়িতে থাকতে না চাইলে মেয়ের কান্না দেখে পটেশ্বরীও কেঁদেছে এবং মেয়েকে আশ্বাস দিয়েছে — "ইবারোক গেলি তই থাক্ মাই, অহাবার আহি তোক মোক্লে লৈ যাম, এতিয়া তোর আগধন লৈ থৈছো নহয়। এহ্নাই কিয় নিবা দিবো।"[১৭৬] সাবিত্রীকে আশ্বাস দেওয়া ও পটেশ্বরীর কান্নার মধ্য দিয়ে অনুভূতিপ্রবণ মাতৃহৃদয়েই প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসে। পেটের অসুখে ঔষধের অনেক টাকা লাগে যদিও চিকিৎসা না করে মৃত্যু হলে দ্রৌপদীর কি হবে এ চিন্তা করে সে ব্যাকুল হয়েছে। "পেটর বেমারর বাবে ডাক্তারে যিবোর ঔষধ দিছে সেইবোর কিনিবলৈ টকা লাগে। নিকিনি বিনা চিকিৎসাই থাকিলে তাই কেঁকাই-গেঁথাই বিছ্নাত পরি থাকিব লাগিব, তার পাছত হয়তো এদিন মরিব লাগিব। তাই মরিলে আনর কথা বাদেই দ্রৌপদীর কি দশা হব?"[১৭৭] কথার মধ্য দিয়ে মাতৃস্নেহের সঙ্গে মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তাও প্রকাশ পেয়েছে।

পটেশ্বরীর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দরিদ্রশ্রেণির দুঃখকষ্টের দিকটি ফুটে উঠেছে। দরিদ্র হওয়ার জন্য তার জীবনে আসা দুঃখকষ্টের জন্য তাকে হা হুতাশই করতে দেখা গেছে। আকুল কাকাকে বলা তার কথার মধ্য দিয়ে দরিদ্র হবার জন্য তার হৃদয়ের অনুতাপই প্রকাশ পেয়েছে — "আকুল কাকা, ভগবানে আমাক দরিদ্রোগিলাখানোক সদায় দুখোর উপরোত দুখেই জাঁপি থাকে, নিজর কপালোক দুষি থকার বাহিরে আরু কি কর্‌বা কোয়া?"[১৭৮] এমনকি সাবিত্রী বেগুন চুরি করে আনলে অভাবে জর্জরিত পটেশ্বরীর কাছ থেকে উৎসাহই পেয়েছে।

সাবিত্রী বড় হলে মালিকের বাড়ি থেকে তাকে পটেশ্বরীর কাছে পাঠিয়ে দিলে গ্রামের কাজকর্মে অনভিজ্ঞ মেয়ে সাবিত্রীকে নিয়ে পটেশ্বরী আবার সমস্যায় পড়েছে। এদিকে মামারবাড়িতে থাকা নবীন মামার বাড়ি থেকে এক হাজার টাকা চুরি করে একটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেছে। যে ছেলেকে পড়াশোনা শিখিয়ে বড়মানুষ করে তোলার স্বপ্ন দেখেছে। পটেশ্বরী আশা করেছে ছেলে চাকরি করে সংসারের দায়িত্ব নিবে। সেই ছেলেও শেষ পর্যন্ত তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে পালিয়ে গেছে। সারা জীবনভর পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের দ্বারা নির্যাতিত পটেশ্বরী বার বার নিজের ঘরের স্বপ্ন দেখে ব্যর্থতাই শুধু পেয়েছে এমনকি শেষপর্যন্ত ছেলে নবীনও মায়ের কথা চিন্তা না করে নিজের কথাই ভেবেছে। পুরুষের দ্বারা বার বার নির্যাতিতা প্রবঞ্চিতা পটেশ্বরী এত পুরুষবিদ্বেষী হয়েছে যে অতিষ্ঠ হয়ে নিজের পেটের ছেলেকেও গালি দিয়েছে। সারাজীবন দুঃখকষ্টে হতাশাগ্রস্ত পটেশ্বরী ছেলে থেকেও প্রতারিত হয়ে দুঃখ হতাশায় হাহাকার করে বলেছে — "চালা তিরী চোরর সঁচ, চালা পলেরারর সঁচ, চাল দহ্‌টা মাইহ্‌নাকোর লালাকোর সঁচ — চালা তাই ভাল হবি কেনাইকে — বাপ চাইহি বেটা হওে, গাছ চাইহি গুটি হওে, চালা তোর গোঁটাই গাটোতে তিরীক পলে নিয়া তেজোর পির্‌পিরণিয়ে খাই মার্‌ছি নহয় ...."[১৭৯] পটেশ্বরীর জীবনকাহিনির মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর উপর হওয়া নিষ্ঠুরতার বাস্তব চিত্রই প্রকাশিত হয়েছে।

অণিমা

'অন্যজীবন' উপন্যাসের প্রধান চরিত্র অণিমা। অণিমা সম্প্রতি ধুবরীর একটি কলেজে চাকরি করা মনোজের নববিবাহিত স্ত্রী। উপন্যাসের গোড়াতেই অণিমার গ্রামের শ্বশুরবাড়িতে আসে। তার দৃষ্টি ও অভিজ্ঞতার দর্পণে অসমের গ্রামজীবনের বহুস্বরিক বাস্তব উঠে এসেছে কথাবয়নে। কাহিনির কেন্দ্রে মনোজ ও অণিমা অধিষ্ঠান করলেও রম্ভা ও পুতুলীর জীবনের করুণ কাহিনি উপন্যাসে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। মনোজের গল্প পড়েই অণিমা মনোজের প্রেমে পড়েছিল।

অণিমা গুয়াহাটি শহরের শিক্ষিত মেয়ে। তাই মনোজ তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার প্রাক্‌মুহূর্তে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে প্রচলিত নীতি নিয়ম অণিমাকে শেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু সে নীতি নিয়মের জ্ঞান অণিমার পূর্ব থেকে থাকার আভাস দিয়েছেন লেখিকা অণিমার কথার মধ্য দিয়ে। শহরের মেয়ে হয়েও অণিমার গ্রামের নীতি নিয়মের জ্ঞান থাকার কথার মধ্য দিয়ে লেখিকা

গ্রামীণ রীতিনীতির প্রতি অণিমার আত্মীয়তা ও হৃদয়ের যোগকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তাই লেখিকা অণিমার উক্তির মধ্য দিয়ে ব্যাপারটিকে এভাবে বুঝিয়েছেন — "তুমি মোক এনেকৈ ভাটৌক শিকোওাই শিকাব নালাগে দিয়া, মই ক'রো বিলাত - আমেরিকার মেমনী নহও, ময়ো অসমীয়া মাকর অসমীয়া জীয়রী, তুমি যিবোর লিষ্ট দিছা সেইবোর প্রায় প্রতি ঘর চহরীয়া অসমীয়াই কম বেছি পরিমাণে মানি চলে। তুমি নির্ভয়ে থাকা, এই অগ্নি-পরীক্ষাত মই উত্তীর্ণ হ'মই।"[১৮০] অণিমা ব্রহ্মপুত্র পারের একটি শহরে থাকে, এবং কলেজ থেকে সোসিয়াল সার্ভিসের জন্য একবার কামরূপের একটি গ্রামে গেলেও মনোজের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ আলাদা। উজনির ব্রহ্মপুত্রের যাত্রা তার মনে রোমাঞ্চ ও বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। অণিমার প্রকৃতি প্রীতির দিকটিও আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। ব্রহ্মপুত্র দেখে অণিমার মনোভাবকে লেখিকা এভাবে ভাষা দিয়েছেন — "অণিমা ব্রহ্মপুত্রর পাররে চহর এখনত ডাঙর হোয়া ছোয়ালী, বিয়ার পাছতো নতুন জীবনর পাতনি মেলিছে ব্রহ্মপুত্রর পাররে আন এখন চহরত, কিন্তু তথাপিও উজনির সোঁত ঠেলি সিঁহতর নাওখন আগবাঢ়ি যোয়া এই ব্রহ্মপুত্রখন যেন এখন নতুন নদী, এখন অচিনাকি নদী। আচরিত, এই নদীর কিয় পারাপার নাই যেন লাগিছে? কি নিজান, কি বন্য, কি উদাস পরিবেশ।"[১৮১] এই নদী দেখে তার মুখ দিয়ে বীরেন দত্তর গাওয়া গান বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে দার্শনিকভাবে বলেছে — "একেখন ব্রহ্মপুত্ররে কিমান প্রকারর assessment, আমি সদায় গুয়াহাটীত থকা বাসিন্দাসকলর বাবে ব্রহ্মপুত্র এখন নদীয়েই, তোমালোকর দরে এই বিশাল পারাপারহীন ব্রহ্মপুত্রর এই অঞ্চলর মানুহর বাবে গুয়াহাটীর নদীখন খাল আরু আনহাতে লণ্ডনত থকা টেমছ্ নদীক ডাঙর নদী বুলি ভাবি থকা মোর অকণমান ভতিজাটোওে প্রথমবারর বাবে গুয়াহাটীত ব্রহ্মপুত্র দেখি চিঞিরি উঠিছিল — It's a sea! কথাবোর সঁচাকৈ relative দেই, absolute বোলা কথা বোধহয় থাকিবই নোয়ারে।"[১৮২] বিকাল বেলার যান্ত্রিক নৌকার শব্দ, ক্লান্ত যাত্রীর নীরবতা, আকাশে অচিন পাখির ডাক, শেষ সূর্যর আভায় রক্তিম মেঘ, ঝাউবনে বাতাসে শিহরণ, পারে বন্য প্রকৃতির উদাস স্তব্ধতা, বাতাসে দোদুল্যমান পাতার বিকাল বেলার সোনালী রোদের লুকাচুরি খেলা — সব মিলিয়ে অণিমার মনে বিচিত্র অনুভবের সঞ্চার করে। তার মনে হয় যেন রূপকথার ময়ূরপংখী নৌকায় অচেনা মায়াপুরীর যাত্রা। অণিমার মুখ দিয়ে একই ভাবের গান বেরিয়ে আসে। লেখিকা এভাবেই শহুরে, শিক্ষিতা ওই মেয়েটিকে দরদি, সংবেদনশীল এবং অনুভূতিপ্রবণ করে গড়ে তুলেছেন।

গ্রাম্য জীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ অণিমা দর্শকের ভূমিকায় থেকে গ্রাম্য নারীর দুঃখকষ্টের জীবনকে দেখেছে এবং পুরুষশাসিত সমাজে পুরুষের দ্বারা নারীর অত্যাচারের ও অপমানের কাহিনি শুনে মর্মাহত হয়েছে। এই সমস্ত তিক্ত উপলব্ধির মধ্য দিয়ে লেখিকা অণিমার হৃদয়ে নানা আলোড়নের জন্ম দিয়েছেন। তার হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া আলোড়নই তাকে প্রতিবাদী চরিত্র রূপে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে। সে তার ক্ষোভ, তার প্রতিবাদ উগরে দিয়েছে মনোজের কাছে। মনোজকে পুরুষের প্রতিনিধি ভেবে তার প্রতিবাদী সত্তা মনোজকে নানা বাক্যবাণে আক্রমণ করেছে। মনোজকে আক্রমণ করার মধ্য দিয়ে লেখিকা অণিমার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশের সঙ্গে

সঙ্গে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতি তার হৃদয়ে সৃষ্ট সমবেদনা আমাদের সামনে আনার চেষ্টা করেছেন। অণিমার গ্রামে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে এবং গ্রামে থাকাকালীন নানা ঘটনার অভিজ্ঞতা উপন্যাসটিকে গতি দান করেছে এবং গ্রাম্য নারীর সমস্যাময় জীবন আমাদের কাছে ফুটে উঠেছে। কিন্তু লেখিকা অণিমার মাধ্যমে এই অত্যাচারের সামাজিক প্রতিবাদ করে প্রতিকারের দিক নির্দেশ করেন নি। অণিমার মনে পুতুলি চরিত্র যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে তার থেকে অণিমা নতুন চেতনা লাভ করেছে।

স্পষ্টবাদী অণিমা আইকণের মুখ থেকে রম্ভার উপর হওয়া অত্যাচার শুনে আর্তনাদের বলে উঠেছে — "কি কৈছা আইকণও! মৈত বান্ধি পকা চপরার ওপরেদি চোঁচোরাই নিছিল? মানুহ মানুহক বান্ধি পকা চপরার ওপরেদি চোঁচোরাই নিব পারে? তুমি সচায়ে কৈছানে আইকণ? তিরোতা এজনীক এনে দানবীয় শাস্তি দিয়া সম্ভবনে?"[১৮৩] অণিমা শুধু রম্ভার প্রতি থাকা তার সমবেদনাই প্রকাশ করে নি রম্ভার উপর হওয়া অত্যাচারের জন্য গ্রামবাসীকেও বিশেষ করে মনোজের পরিবারকে দোষ দিয়েছে। তাই প্রতিবাদের সুরে আইকণকে বলেছে — "সঁচায়ে রম্ভা খুরীদেউক তেওঁর গিরিয়েকে এনেকুয়া নৃশংস শাস্তি দিছিল? উস্ .... কিন্তু এটা কথা নহয় আইকণ, তেতিয়া গাঁওর মানুহ - দুনুহ নাছিল নেকি? কিয়, তোমালোকর ঘরখনেই দেখোন একেবারে ওচরত আছিল, তেঁওলোকে তেতিয়া নাকত তেল দি শুই আছিল নেকি? নে আনর ঘরুয়া কথাত মুর সুমুয়াব নাপায় বুলি আত্মদোষ ক্ষালন করি সন্তুষ্ট মনেরে নির্বিকার হৈ বহি আছিল?"[১৮৪] একই প্রতিবাদের সুরে মনোজকে কঠোর চাপা সুরে আক্রমণ করে "অ, তোমার বয়স যদি বুজন ধরণর আছিল তেন্তে তুমিও এক পরোক্ষ অপরাধী হ'বা।"[১৮৫] অণিমার এই কথাগুলি থেকে প্রতিবাদের সুর যেমনি বেরিয়ে আসে তেমনি নির্যাতিত নারীর প্রতি সহমর্মিতা ও সংবেদনশীলতা প্রকাশ পায়।

অণিমা শুধু রম্ভার উপর হওয়া অত্যাচারেই দুঃখিত হয় নি গ্রাম্য নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে সচেতনতাও তার চরিত্রে লক্ষিত হয়েছে। তাই রজনীর তার স্ত্রীর প্রতি করা অবহেলা আর উপেক্ষা দেখে দুঃখিত হয়েছে এবং মনোজকে বলেছে — "আচলতে আমার সমাজ ব্যবস্থাত তিরোতার স্থানেই এনেকুয়া যে মতা মানুহবোরর অবচেতন মনত তিরোতার প্রতি করা অত্যাচার এটা স্বাভাবিক ঘটনা হিচাপেই পোত খাই থাকে। আজিয়েতো রজনী দাদাইদেউ ঘৈণীয়েকক মোর আগতে অনাহকত ইমান ককর্থনা করা শুনি আহিলো। অথচ মানুহজনে নানা কিতাপ-পত্রও পঢ়ে। চিন্তাচর্চার প্রতি আগ্রহও দেখুয়ায়।"[১৮৬] মনোজ রজনীর বড় মন ও পরোপচীকির্ষার পরিচয় অণিমাকে দিতে চাইলে অণিমা বলেছে — "সেই গুণটো থাকিলেই তেওঁর সাতখুন মাফ হই নাযায়। আরু মনোজ, Charity begins at home"।[১৮৭] রজনীর অন্য স্ত্রীর সঙ্গে থাকা অবৈধ সম্পর্কের দিকটিও সে দেখানোর চেষ্টা করেছে এবং বহুবিবাহের ফলে লক্ষীমপুরীয়ানীর সতীন খাটার কথা নিয়ে গ্রাম্য নারীর প্রসঙ্গ তুলে মনোজকে নানারকম বাক্যবাণে বিধৃত করেছে। আবার নারীর নির্যাতনের ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের কোনো পার্থক্য নেই এও সে লক্ষ করেছে। পুরুষশাসিত সমাজে

নারী পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে শোষণের শিকার হয়ে থাকার দিকটিকে উপস্থাপন করেছেন লেখিকা পুতলী ও অণিমার কথোপকথনের মধ্য দিয়ে। অণিমা বলেছে — "নহয় বুলিলো কেনেকৈ ক'বা। গাঁওত যদি প্রত্যক্ষ শোষণ চলে, চহরত পরোক্ষ। উদাহরণ হিচাপে ধরা — মতা-তিরোতা উভয়ে চাকরি করিলেও ঘরুয়া জঞ্জালর বোজা তিরোতাজনীয়েই বহন করিব লাগে। অন্য ধরণেও দেখিছো — বা কাকতে-পত্রে আলোচনীয়ে-মিটিঙে এনেধরণর আলোচনা হোয়া পঢ়িবলৈ পাইছো যে চহরর শিক্ষিতা মহিলাই যথাযথ স্বীকৃতি বা মর্যাদা নেপায়। রাজনীতির ক্ষেত্রত সাহিত্যর ক্ষেত্রত বা অন্যান্য ক্ষেত্রত তেওঁলোকর যোগ্যতাক অবদমিত করি রখার চেষ্টা হয়। তার একটা প্রধান উদাহরণ আমার অসম সাহিত্য সভাখন। তদুপরি আরু নানা সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতির অনুষ্ঠান আছে য'ত চহরর উপযুক্ত শিক্ষিতা মহিলাক সদস্য পদ দিয়া হোয়া নাই — এনে ধরণর আরু বহুতো উদাহরণ আছে।"[১৮৮] তাদের কথায় যেমন নারীবাদী চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি তারই সঙ্গে অণিমার সমাজ সচেতনতার দিকটিও ফুটে উঠেছে। তাছাড়া পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের উদাসীনতার দিকটিও অণিমার কথার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, মায়ের প্রতি ছেলের উদাসীনতা ফুটে উঠেছে। অণিমা মনোজের মার থালায় শ্বশুরের তুলনায় কম খাদ্যবস্তু দেখে দুঃখিত হয়েছে এবং মনোজকে প্রশ্ন করেছে — "তোমার বৌটিয়ে কি খায় কেতিয়াবা মন করিছানে?"[১৮৯] অণিমা এখানেই ক্ষান্ত থাকে নি। সে গ্রামের নারীর করা কঠোর পরিশ্রম দেখে মর্মাহত হয়েছে। শাশুড়ির পরিশ্রম করা দেখে দুঃখ পেয়েছে মনোজের উপর রাগ করেছে এবং মায়ের কষ্ট লাঘব করার জন্য মনোজকে কাজের লোক রেখে দেওয়ার কথা বলেছে। অণিমাকে রাধুনি হিসাবে দীক্ষিত করার জন্য যে 'সকামে'র (এক ধরনের অনুষ্ঠান) ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেখানে পরমান্ন রাঁধার ভার শাশুড়ির উপর থাকার কথা শুনে অণিমা বলেছে — "এগরাকি আধবুঢ়া মানুহর বাবে এয়া দেখোন অমানষিক পরিশ্রম হ'ব।"[১৯০] অণিমার কথায় সংবেদনশীলতা ও শাশুড়ির প্রতি থাকা ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে।

অণিমা ননদ আইকণের পড়বার ইচ্ছাকে সমর্থন করেছে শ্বশুরের ইচ্ছার বিপরীতে কারণ সে শিক্ষার মূল্য বুঝতে পেরেছে। অণিমা নারীর শিক্ষা-দীক্ষা থাকলে নারী স্বামীর অত্যাচার সহ্য না করে স্বাবলম্বী হয়ে স্বাধীন জীবন যাপন করতে পারার কথা ভেবেছে। শিক্ষিত অণিমা অনুভব করতে পারে যে শুধু গ্রামে নারীই পুরুষের দ্বারা অবদমিত হয় না। শহরেও চলে নারীর উপর পরোক্ষ অবদমন সে কথা বলেছে অণিমা। শ্বশুরবাড়িতে এসে আদর যত্ন পেয়ে অভিভূত হয়েছে এবং তার হৃদয়ে মনোজের বাড়ির প্রতি কৃতজ্ঞতাই দেখা গেছে। সে খুশী হয়েছে যে তার বিয়ে হওয়া গ্রামটি হতদরিদ্র এবং অশিক্ষিত নয়। গ্রামের খাওয়া-দাওয়ার উন্নত মান এবং কথাবার্তা, ভদ্র আচার ব্যবহার তাকে অভিভূত করেছে। গ্রামের মেয়েদের ঢেঁকীতে ধান ভানতে হয় তাই তাদের সকালে উঠে ধান ভানা এবং নদী থেকে জল আনা ছাড়াও বহু পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। অণিমা কষ্ট লাঘবের জন্য ধান ভানার জন্য হলার মেসিন ব্যবহার করতে বলেছে শাশুড়িকে। তাছাড়া গ্রামের মেয়েরা আধুনিক যন্ত্রচালিত মেশিনের ব্যবহারে নিজেদের সকালে উঠে কষ্ট লাঘব করতে

পারার কথা বলেছে সে।

এভাবেই অণিমা পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবমাননার দিকটি উদঘাটন করে প্রতিবাদী ও দৃঢ়চেতা ও স্পষ্টবক্তার ভূমিকা নিয়েছে যার অগ্নিবান থেকে অন্যান্য প্রসঙ্গ উঠিয়েও মনোজ নিস্তার পায় নি। তবে রাগ কমে গেলে মনোজের প্রতি করা রাগ ও ব্যবহারে সে অনুতপ্তও হয়েছে। মনোজকে পুরুষের প্রতিনিধি ভেবে তাকে করা আক্রমণের জন্য অনুশোচনা হয়েছে। এই অনুশোচনার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী, স্পষ্টবক্তার পাশাপাশি স্বামীর প্রতি থাকা ভালোবাসা ও সংবেদনশীল হৃদয়টিকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন লেখিকা।

অণিমা প্রতিবাদী, সে প্রতিবাদ কিন্তু সংঘাতের রূপ নেয় না। প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘাত নেই, উপন্যাসে সে নিজে কখনো নির্যাতনের শিকার হয় নি। কিন্তু সে যেন লেখিকারই মুখপাত্র হয়ে দেশকালের বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত করে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বাস্তবকে পাঠকের সামনে দাঁড় করায়। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজে, গ্রাম-শহর সর্বত্র নারী যে যথাযোগ্য পরিসর পাচ্ছে না, তার বিরুদ্ধে অণিমা মতাদর্শগতভাবেই প্রতিবাদ জানিয়েছে। এদিক থেকে নিরুপমার কথাবিশ্বে এই চরিত্রটির স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে।

চন্দ্রপ্রভা

নিরুপমা বরগোহাঞি 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের নায়িকা। লেখিকা উপন্যাসটি রচনা করেছেন আসামের নারী মুক্তি আন্দোলনের প্রথম ধ্বজাধারী চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানীর জীবনের উপর ভিত্তি করে। তাই উপন্যাসটিকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তথ্যভিত্তিক করে, কল্পনার রং অতি সামান্যই যোজিত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে দিয়ে আধুনিক নারীর যে মুক্তিলাভ তার পেছনে রয়েছে সংগ্রাম ও বিপ্লব। চন্দ্রপ্রভার জীবন জুড়ে চলা বিপ্লবেরই ফলস্বরূপ অসমীয়া নারী পেয়েছে নারীর সমাজে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ। উপন্যাসেও চন্দ্রপ্রভার বিদ্রোহিনী রূপই প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সারা জীবনজুড়েই চলেছে অনলস সংগ্রাম। তিনি শুধু নারীমুক্তির জন্যই সংগ্রাম করেন নি, তিনি দেশের মুক্তির জন্যও সংগ্রাম করেছেন। অসমের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যে তিনিও একজন। তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের Chandraprabha Saikiani Centre for Women's Studies-এ আয়োজিত ১৬.০৩.১৩-এর এক সভায় 'Chandraprabha Saikiani : Life and Struggle' শীর্ষক বক্তৃতায় নিরুপমা বরগোহাঞি তাঁর 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের প্রেরণা স্বরূপ পুষ্পলতা দাসের 'বিদ্রোহিনী চন্দ্রপ্রভা' নামক প্রবন্ধটির উল্লেখ করেছেন। এটিতে থাকা চন্দ্রপ্রভার বিদ্রোহী জীবনই তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে 'অভিযাত্রী' উপন্যাস রচনায়। তিনি চন্দ্রপ্রভাকে নানা অর্থে অভিযাত্রী বলে ঘোষণা করে তার জীবনযাত্রাকে এবং তাঁকে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার ভাববস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে উচ্চারণ করেছেন —

দুঃখের দুর্গম পথে তীর্থযাত্রা করেছি একাকি

চন্দ্রপ্রভা সম্পর্কে সাপ্তাহিক 'নীলাচলে' নিরুপমা বলেছেন — "অসমর কোন নারীক সবতকৈ আগতে যদি শ্রদ্ধা যাচিব লাগে সেই গরাকী হল চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী"[১৯১] নিরুপমা বরগোহাঞি 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের নায়িকা সম্পর্কে লিখেছেন — "অভিযাত্রী'খন উপন্যাস আকারত লেখা বাবে মই অ'ত ত'ত কিছু কল্পনার আশ্রয় ল'লেও মূল ঘটনা বা তথ্যর কোন বিকৃতি ঘটোয়া নাই। আচলতে চন্দ্রপ্রভার জীবনেই উপন্যাসের সমতুল্য, বরং তেওঁর জীবন কাহিনি অনুধাবন করি এই আপ্তবাক্যষারকে মনলৈ আহে যে Facts are stronger than fiction. 'অভিযাত্রী'র নায়িকা চন্দ্রপ্রভার ব্যক্তিত্বর উপস্থিতি উপন্যাসখনর লেখার সকলো সময়তে ইমান ব্যাপকভাবে অনুভূত হৈ আছিল যে ফলত মই আরু কোনো কাল্পনিক চরিত্রর সৃষ্টি করার প্রয়োজন বোধ নকরিলোঁ।"[১৯২] এখানে ড০ আনন্দ বরমূদৈর বক্তব্যটি আলোচনা করা যেতে পারে — "এখন মহাকাব্য হ'ব পরা পটভূমিত অভিযাত্রীর কাহিনী আরম্ভ আরু শেষ হৈছে। অসহযোগ আন্দোলন, মহাত্মা গান্ধীর অসম আগমন, বিদেশী বস্ত্র বর্জন আরু দাহ, পাণ্ডুত বহা জাতীয় কংগ্রেছর অধিবেশন, ভারত ত্যাগ আন্দোলন, অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন, মহিলা সমিতির অধিবেশন, কানি নিবারণীর কারণে করা আন্দোলন আরু পিকেটিং, ভারতর স্বাধীনতা লাভ, পঞ্চাশ চনর ভূমিকম্প আদি অনেক ঘটনার পটভূমিত নায়িকা চন্দ্রপ্রভার চরিত্রটো থির করোয়া হৈছে। ঘটনার বাহুল্যর বাবেই উপন্যাসর কাহিনী ও বিভিন্ন ঘটনার সমন্বিত কাহিনী হ'বলৈ বাধ্য হৈছে। বিভিন্ন ঘটনারাজির মাজত একমাত্র যোগসূত্র চন্দ্রপ্রভার কাহিনী।"[১৯৩]

'অভিযাত্রী' উপন্যাসটি চরিত্র প্রধান রচনা। যার নায়িকা চন্দ্রপ্রভা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। চন্দ্রপ্রভা তেজস্বিনী, বিদ্রোহিনী ও ব্যতিক্রমী চরিত্র। চন্দ্রপ্রভার জীবন ঘটনাবহুল। ছোট থেকেই চন্দ্রপ্রভার চরিত্রে লক্ষিত হয় দৃঢ়তা, কষ্ট করার ক্ষমতা এবং বিদ্রোহী সত্তা যা পরবর্তীকালে তাকে বিভিন্ন দিক থেকে বিদ্রোহিনী করে তুলেছে। তিনিই নারীমুক্তি আন্দোলনকে সাকার রূপ দিয়েছেন। দৈশিঙরি গ্রামের রাতিরাম মজুমদার ও গংগাপ্রিয়ার মেয়ে চন্দ্রপ্রভা। বাল্যকাল থেকেই শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহ লক্ষিত হয়েছে। শিক্ষার মূল্য উপলব্ধি করে বহু কষ্টের মধ্য দিয়েও বিদ্যাচর্চা অব্যাহত রেখেছেন। শিক্ষার মূল্য বোঝে নিজের বোনকে বলেছেন — "কণমাই বারিষার দিনকেইটা কষ্ট করিবই লাগিব অ' নহলে আমার পঢ়া ন'হয়। কষ্ট নকরিলে জীবনত ডাঙর মানুহ হ'ব নোয়ারি। তোকতো মই সদাই কৈছো, আমি যদি লেখাপঢ়া নিশিকোঁ, গাঁওর অন্য তিরীবোরর দরেই আমারো গরু পশুর জীবন হ'ব। কেবল ঘর সরা, বাচন ধোয়া, কাপোর ধোয়া, ঢেকী দিয়া, ভাত রন্ধা, তাঁত বোয়া — এইবোর করি জীবনটো শেষ করি দিব নোয়ারি। মই কেতিয়াও নোয়ারো, তয়ো নোয়ারো।"[১৯৪] শিক্ষার প্রতি এই আগ্রহবশতই গ্রামে মেয়েদের স্কুল না থাকলেও বহু দূরের ছেলেদের এম. ভি. স্কুলে পড়াশোনা করেছেন চন্দ্রপ্রভা বহু কষ্টের মধ্যে। পরে নগাঁও-এর মিশন স্কুলেও ভর্তি হয়েছেন এম.ভি পড়ার জন্য। স্ত্রী শিক্ষার যথেষ্ট

প্রচলন না থাকলেও চন্দ্রপ্রভা মা ও বাবার কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছেন। তিনি শুধু শিক্ষা লাভই করেন নি শিক্ষয়িত্রী হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠাও লাভ করেছেন। সমাজে ছেলেমেয়ের মধ্যে যে ব্যবধান সেই ব্যবধানকে তিনি কোনোদিনই মানেন নি। তিনি মেয়ে হয়েও সাইকেল চালিয়েছেন। ছেলেমেয়ের মধ্যে থাকা ব্যবধানকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বোনকে বলেছেন — "মতা চ'লি হ'লে ডাক্তারী পঢ়িব পায়, আপী হ'লে নাপায়? কোন ভগবানে বা বিধান দিছে। তই ডাক্তার হবই লাগিব, মতা মানুহবোরক দেখুয়াই দিব লাগিব যে সিহঁতে করা সকলো কাম আমিও করিব পাৰোঁ। আমাকে কেবল সুবিধা দিব লাগে।"[১৯৫]

চন্দ্রপ্রভার ব্যক্তিগত জীবন বেদনায় ভরপুর। সারাজীবন তাকে বহু দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এগারোটি ভাইবোনের মধ্যে তাঁরা মাত্র চারজনই জীবিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে বোন যোগমায়া ও ভাই ধর্মেশ্বর ছিল সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ছোট বোন রজনীপ্রভা ডাক্তার হলেও তার জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি শেষে মৃত্যু চন্দ্রপ্রভাকে আঘাত হেনেছে। তাছাড়া দণ্ডীনাথ কলিতাকে ভালোবাসা ও প্রেমে বিফলতা এবং অবৈধ সন্তানের জননী হওয়া ইত্যাদি নানা ঘটনায় তাঁর জীবন ও হৃদয় ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ে। তবে এত সমস্ত দুঃখের মধ্যেও চন্দ্রপ্রভা ভেঙে পড়েনি এবং সংসারের প্রতি নিজের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছেন। পিতার মৃত্যুর পর চন্দ্রপ্রভা আরো বেশি নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করেছেন। সংসারের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তার জীবন থেমে যায় নি। তাই কোনো দুঃখকে নিয়ে বেশি দিন ভাবার সময় পান নি। নিজের জীবনকে রেলগাড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। রেলগাড়ির মতোই তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি দ্রুতভাবে ঘটে চলেছে। রেলগাড়ি থেকে দেখার মতোই চোখের এক ঝলক দেখে দ্রুতগতিতে আবার ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছে। তাঁর জীবন জুড়ে দুঃখ ও সংগ্রামকে দেখে তাঁর জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ইন্দুপ্রভা মন্তব্য করেছে — "সংসার মন্থনত মানুহে অমৃত আরু বিষ দুয়োটারে ভাগ পায়, এই মানুহজনীয়ে কিন্তু বিষর ভাগেই বেছিকৈ পালে। কিন্তু তার বাবে তাইর যেন কোন আক্ষেপ নাই, কোন ক্ষোভ নাই, কোন বিরক্ত নাই, সঁচাকৈয়ে চন্দ্রপ্রভা যেন প্রকৃত অর্থতে এগরাকী নীলকণ্ঠ।"[১৯৬]

চন্দ্রপ্রভার নিজের পরিবার ও গ্রামের প্রতি গভীর আত্মীয়তা ছিল। সেই আত্মিক অনুভূতি দিয়েই তিনি সৃষ্টি করেছেন 'পিতৃভিটা' (১৯৩৭) নামের উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে তাঁর পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার প্রকাশ ঘটেছে। পরিবারের প্রতি ভালোবাসা, দণ্ডীনাথ কলিতার প্রতি ভালোবাসা থাকলেও দেশের প্রতি ভালোবাসাই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির উপর, নারীর উপর হওয়া অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি মুখর হয়ে উঠেছেন। সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন তিনি নির্ভীকতার সঙ্গে। কালজিপারা সত্রের সম্মুখে থাকা লোকেল বোর্ডের তৈরি কুয়ো থেকে নীচ জাতির লোকদের জল তোলার অধিকার না থাকার কথা জানতে পেরে চন্দ্রপ্রভা সেটির বিরোধিতা করেন। লোকেল বোর্ডকে এ ব্যাপারে

অবগত করানোর কথা বলে সত্রাধিপতির অনুমতি নিয়ে কয়েকটি নীচ জাতির মেয়েকে দিয়ে জল তুলিয়েছেন কুয়ো থেকে। তিনি যেভাবে অস্পৃশ্যতার বিরোধিতা করেছেন সেভাবেই সমাজে প্রচলিত পর্দাপ্রথারও বিরোধিতা করেছেন। নগাঁও সাহিত্য সভার অষ্টম অধিবেশনে যেখানে সভাপতির ভাষণে স্ত্রী শিক্ষার ও স্ত্রীর অধিকার বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। আবার সেখানেই স্ত্রীকে চিকের (পর্দার) ভিতরে রেখে স্ত্রী স্বাধীনতা খর্ব করে রাখা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্ত্রীদের অবরুদ্ধ করে রাখা দেখে চন্দ্রপ্রভা উত্তেজিত হয়ে পড়েন। পুরুষের মতো নারী সসম্মানে মুক্তভাবে বসার অধিকার থেকে বঞ্চিত কেন এই প্রশ্ন তাকে পীড়িত করতে থাকে এবং পুরুষশাসিত সমাজে স্ত্রীর প্রতি হওয়া এই অবিচারের বিরুদ্ধে মুক্ত প্রতিবাদ জানিয়ে স্ত্রীদের পর্দা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন — "আই সকল আপনালোকে মানুহ নাহে জন্তু নেকি যে এইদরে গরালর ভিতরত সোমাই আছে? আপনালোকে এনেকৈ নিজকে লুকুয়াই লুকুয়াই চিকর আঁরত বহি থাকি পুরুষর দাসী বুলি পরিচয় দিয়া নাই নে? আপনালোকর যদি অলপো আত্মসম্মান আছে তেন্তে এই গঁরালর ভিতরর পরা তুরন্তে ওলাই আহক আরু নিজকে এই অপমানর পরা বচাওক। আমার সৃষ্টিকর্তাই কেতিয়াও এই বিধান দিয়া নাই যে তিরোতা মানুহ পুরুষতকৈ হীন, সেইবাবে তেওঁলোক সদায় পুরুষর আজ্ঞাবহ ভৃত্য হৈ থাকিব লাগিব। নিজকে গঁরালর জন্তুতকৈ সঁচায়ে যদি ওপরর বুলি ভাবে, তেন্তে আইসকল আহক, মই আপনালোকক হাতযোর করি কৈছোঁ, সাহিত্য সভালৈ নিমন্ত্রণ করি আনি আপোনালোকক পুরুষতকৈ হীন প্রাণীর দরে ব্যবহার করি যি অসম্মান দেখুওাইছে, তার প্রতিবাদ করি আপোনালোক চিকর এই পাতল জাল ছিঙি বাহিরর মুক্ত পৃথিবীলৈ ওলাই আহক।...."[১৯৭] তিনি শুধু মহিলাদের পর্দার থেকে বের করেই আনেন নি, নারীমুক্তির সংগ্রামকে স্থায়িত্ব দান করার জন্য তিনি স্ত্রীদের মধ্যে সংগঠনের প্রয়োজন অনুভব করে নিজের দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছেন। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই নগাঁও সাহিত্য সভার মঞ্চে তিনি মহিলা সংগঠন স্থাপনের আহ্বান করেন। এরপর থেকে তিনি সমগ্র আসাম জুড়ে এমনকি গ্রামে গঞ্জেও মহিলা সমিতি গঠনের অনলস প্রয়াস চালিয়ে যান। স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করে স্বেচ্ছাসেবক দলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, তাদের সঙ্গে ক্যাম্পে থাকা থেকে শুরু করে স্বেচ্ছাসেবক দলের খাদ্যের যোগাড় করার জন্য অসমবাসী জনগণের কাছে সাহায্যের জন্য ভাষণ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে নিজেকে লিপ্ত রেখেছেন তিনি। জেলে গিয়েও তাঁর প্রতিবাদী সত্তার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। জেলের ভিতর রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে শ্রেণি বিভাজনের ফলে নিম্নশ্রেণির বন্দীদের নিম্নমানের খাদ্য দেওয়ার যে ব্যবস্থা সেটির বিরুদ্ধে চন্দ্রপ্রভা জেলের ভিতরই সংগ্রাম শুরু করেন এবং দেশের কাজে জেলে আসা সব কয়েদিকে একই খাদ্য দিতে বাধ্য করান।

নিজের জীবনের দুঃখ কষ্টের মধ্যেও সামূহিক কাজের জন্য, জনহিতের জন্য চন্দ্রপ্রভাকে সদা তৎপর থাকতেই দেখা গেছে। মহাত্মা গান্ধীর মত বিশিষ্ট ব্যক্তির সান্নিধ্য তিনি লাভ করেছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় চন্দ্রপ্রভা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানা প্রকার বিপ্লবী কার্যকলাপের দ্বারা এক গৌরবোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অসমের মহিলা সংগঠন সমূহের তিনি ছিলেন

একজন দলনেত্রী। এই সংগঠন সমূহের মাধ্যমে তিনি স্ত্রীশিক্ষার দ্বারা মহিলাদের মধ্যে থাকা কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা, মহিলা সমিতি গঠন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই তাকে সক্রিয় অংশ নিতে দেখা গেছে। সাধারণ নারী নিজের কাজের মধ্য দিয়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছেন। নারীর সমানাধিকার দাবির মধ্য দিয়ে নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত করে গেছেন তিনি। মিশন স্কুলে থাকাকালীন ছোটখাটো বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে তিনি বৃহত্তর সামাজিক বিক্ষোভে অবতীর্ণ হয়েছেন সর্বসাধারণ তথা নারীসমাজের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

চন্দ্রপ্রভার বিদ্রোহী সত্তার ভিতরে এক সুকোমল নারী হৃদয়ও বর্তমান রয়েছে তার প্রকাশ উপন্যাসে বহুক্ষেত্রে রয়েছে। চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথ কলিতাকে ভালোবেসেছেন, নীচ কূলের বলে দণ্ডীনাথ কলিতা তাকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিলেও দণ্ডীনাথ কলিতার স্ত্রী হয়েই থেকেছেন তিনি। দণ্ডীনাথের জীবনাবধি তিনি সিঁদুর পরেছেন এবং দণ্ডীনাথের মৃত্যুর পর সে সিঁদুর মুছে ফেলে তাঁর সনাতনী মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছেন। দণ্ডীনাথ চন্দ্রপ্রভাকে অতুলের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন না করার জন্য কথা শুনালে চন্দ্রও দণ্ডীনাথকে পিতৃ দায়িত্ব পালনের থেকে বিরত থাকার কথা নিয়ে কঠোর ভাবে চিঠি পাঠালেও পরে অনুশোচনাতে দগ্ধও হয়েছেন।

চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথকে শুধু ভালোবাসেননি তার এক অবৈধ সন্তানের মাতাও হয়েছেন। তৎকালীন সমাজে অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়ে তিনি যেমন সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি রক্ষণশীল সমাজকে কুঠারাঘাত করেছেন। তিনি অতুলকে শুধু জন্মই দেন নি সমাজের সামনে অতুলের জন্মবৃত্তান্ত স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত হন নি। অতুলকে যথাযোগ্য লালন পালনের মধ্য দিয়ে সমাজে একটি গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে রক্ষণশীল সমাজকে পরাস্ত করে নিজের জয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। চন্দ্রপ্রভার মুখে ফুটে উঠেছিল গৌরব, তৃপ্তি ও জয়ের হাসি — "হেরা রক্ষণশীল সমাজ, তোমাক পরাস্ত করি মই কেনেকৈ বিজয়িনীর রূপেরে আগুয়াই আহিলো দেখিলানে? শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও পঙ্কর মাজর পরা কেনেকৈ পঙ্কজ প্রস্ফুটিত করি তুলিলো দেখিলানে?"[১৯৮] চন্দ্রপ্রভার দণ্ডীনাথের উপর মাঝে মাঝে অভিমান, দণ্ডীনাথকে দোষারোপ করা, আবার তার জন্য অনুশোচনা করা, দণ্ডীনাথের চিঠিগুলোকে বার বার পড়ার মধ্য দিয়ে দণ্ডীনাথের প্রতি তাঁর অনুরাগই প্রকাশ পেয়েছে। দণ্ডীনাথ ও চন্দ্রের আমরণ চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। মা, বাবা, ছেলে এবং সংসারের দায়িত্ব তার দেশের কাজে বাধা হয়ে উঠতে পারে নি। দেশের কাজে বেশি ঘুরে বেড়ালেও সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিস যোগান ধরার চেষ্টা করেছেন নিজেই। শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে এবং পরে গাড়ির ব্যবসা করে সংসারের দায়ভার নিতে চেয়েছেন। পিতার প্রতি চন্দ্রের হৃদয়ে সঞ্চিত অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচিত উপন্যাস 'পিতৃভিটা'য়— " 'দশপুত্র সমকন্যা' এই আছিল যার কন্যাবোধ, 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া-শিক্ষানিয়াতি যত্নতঃ' এই মনুবাক্য আছিল যার সরোগত, যিজন পুরুষে বাক্যে ব্যবহারে ভুলতো কেতিয়াও ছোয়ালীক লরাতকৈ

সরু যা অশ্রেষ্ঠ বুলি নাভাবিছিল সেই কালত স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন আরু সুবিধা নথকা সত্ত্বেও যি পিতাই গাঁওলীয়া হৈও দূর প্রবাসত থৈ কন্যাসকলক যতনেরে পঢ়াই শিক্ষা দিছিল, — যি পিতার অগাধ জ্ঞানর মই আজিও পরিমাণ করি উঠিব নোঁওয়ারো, শিশুকালতে যার ওচরত গল্পচ্ছলে আৰ্থিক, নৈতিক আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করিছিলো যি আছিল ধৈর্যত ধীর, ক্ষমাত মহান, শত্রুলৈকো উদার আরু আছিল শিশুর দরে সরল, বিপদতো ধীর তেজীয়ান, মোর মনত যার ওপরত শ্রেষ্ঠ নাই, সেই মোর শ্রেষ্ঠ গুরু, বিদ্যানুরাগী, স্নেহময়, মহানুভব স্বৰ্গীয় পিতৃদেবতা স্বৰ্গীয় রাতিরাম মজুমদার শ্রীশ্রীচরণত জীয়েকর (৭ম কন্যা, দশম সন্তান) এই প্রথম প্রকাশিত কিতাপ ‘পিতৃভিটা’ অন্তরর গভীর ভক্তি-পুষ্পর পুত অর্ঘ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে নিবেদন করিলোঁ।”[১৯৯] ‘পিতৃভিটা’ ছাড়াও তাঁর অন্যান্য সাহিত্য কর্মের দ্বারা অসমীয়া সাহিত্য জগৎকে তিনি সমৃদ্ধ করে রেখেছেন।

চন্দ্রপ্রভা সম্পর্কে ইন্দ্রপ্রভা ও তাঁর স্বামীর ভাষ্য — “চন্দ্রপ্রভাতো এটুকুরা জুই, যি জুইর ক্ষমতা আছে সমাজর বহুত অন্যায় অনীতিক দহি পেলোওার যি জুইর উত্তাপে অতদিন প্রায় নির্জীব করি রখা রাইজর মাজত তাপ বিলাই সজীব করি,উত্তপ্ত করি দেশমাতৃর পরাধীনতার শিকলি ছিঙারে কর্তব্যকৈ পুনর আগুওাই পঠাব পারে।”[২০০] নারীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য দলবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য নারীকে সংগঠিত হবার প্রেরণাও যুগিয়েছেন তিনি। তাঁর বিচার করার ক্ষমতা ও দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদের থেকে পার্থক্যের দিকটিও লেখিকা সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলেছেন। দিদি যোগমায়ার বিধবা হবার পরের কাহিনি অন্যের কাছে কলঙ্কের বলে মনে হলেও চন্দ্রপ্রভার কাছে সেটি বীরত্বের, রোমাঞ্চে ভরপুর কাহিনি মনে হয়েছে। যে যোগমায়া সমাজের চোখে কলংকিনী চন্দ্রপ্রভার চোখে অনন্যা, বিপ্লবী এবং সাহসী। শুধু তাই নয় যোগমায়ার বোন হয়ে তিনি নিজেকে গর্বিতই অনুভব করেছেন।

লেখিকা ভালমন্দ দুটি গুণের সমাবেশ করেই চন্দ্রপ্রভা চরিত্রটি সৃষ্টি করেছেন। দুঃসাহসী, অগতানুগতিক কার্যক্ষম চন্দ্রপ্রভার চরিত্রে লেখিকা চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া, কথা বলা, কাজ করার মধ্য দিয়ে ত্রুটির দিকটিও তুলে ধরেছেন। তাঁকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবেগবিধুর হয়ে উত্তেজিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেখা গেছে। তাঁকে অমিতব্যয়িতার জন্য অনেক সময় অর্থসংকটে পড়তে হয়েছে। অমিতব্যয়িতার জন্য দণ্ডীনাথ কলিতা ও তাঁর মা তাঁকে বহুবার ভর্ৎসনাও দিয়েছেন। চন্দ্রপ্রভার কার্যকলাপ দেখে চন্দ্রপ্রভার চরিত্র সম্পর্কে কংগ্রেস দলের একজন প্রার্থীও মন্তব্য করেছিল। কংগ্রেস দলের প্রার্থী হয়ে চন্দ্রপ্রভা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিলে তাঁর দলে খেটে যাওয়া একজন সদস্য চন্দ্রপ্রভা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন — “মানুহজনীয়ে যিবোর কাণ্ড কারখানা করি ফুরে তার দ্বারা বুজিব পারি যে তেঁও ঠিক প্রকৃতিস্থ নহয়। অলপ বলীয়া এই গরাকী মানুহ রাজনীতির পাশাখেলত কেনেকৈ জিকিব?”[২০১] মায়ের কার্যকলাপের মধ্যে দ্বিত্ব রূপ ফুটে উঠেছে পুত্র অতুলের চোখেও। যে নারী সমস্ত নারীজাতির কল্যাণের জন্য মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে আবার সেই চন্দ্রপ্রভাই তাঁর উপর করা দণ্ডীনাথের অন্যায়কে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছেন, শুধু তাই নয় নিজের আত্মমর্যাদা হনন করে দণ্ডীনাথের পাঠানো টাকাও গ্রহণ করেছেন। তাই অতুল বলেছে —

"সঁচায়ে তার মাকজনী অদ্ভুত — এজনী নহয় দুজনী মানুহর বিপরীত ধর্মী দুটা ব্যক্তিত্বরহে সমষ্ঠি এই মানুহজনী। একফালে ইমান আত্মসচেতন, ইমান অহংকারী, ইমান বিদ্রোহী — আনহতে ইমান লেউসেউ এজনী তিরোতা। এফালে পুরুষর সমান নারীর অধিকার বিচারি জীবনটো সংগ্রামেরে কটাই দিলে — আনহতে অন্তরেরে এক পতিব্রতা পত্নীর ব্রতকে পালি থাকিল — প্রাণর পুরুষজনর দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যক্ত হৈয়ো সেই পুরুষজনর প্রতি আনুগত্য — নহয়, নহয় দাসীত্বর চিনকে চিরদিন কপালখনত বহন করি থাকিল। সঁচায়ে, মাকর জীবনর এইটো যে এটা অদ্ভুত প্রহসন।"[২০২] এভাবেই লেখিকা নিরুপমা বরগোহাঞি এক অনন্যা, ব্যতিক্রমী, প্রতিকূলতায় আপোসহীন এক চরিত্রকে নিয়ে সৃষ্টি করেছেন তাঁর 'অভিযাত্রী' উপন্যাস। এই উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে চন্দ্রপ্রভার তথ্যভিত্তিক জীবনকাহিনি। যে নারী বিপ্লবী, বিদূষী, মহীয়সী এবং সমাজের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অবহেলাকে অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমী চরিত্র তা ইতিহাসসম্মতভাবেই ফুটে উঠেছে উপন্যাসেও। প্রেম এবং প্রতারণা, অবৈধ সন্তানের মা হওয়ার জন্য সামাজিক লাঞ্ছনা, গঞ্জনার মধ্যেও প্রয়াস চালিয়েছে সমাজে নারীশিক্ষার প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নারী শিক্ষার প্রচারে মহিলার উন্নতির জন্য মহিলা সমিতি গঠন, জাতপাতের সমস্যা মিটানো এবং অন্যান্য সমাজ সংস্কারের সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার জন্যও তৎপর হতে দেখা গেছে চরিত্রটিকে। ইতিহাসের বাস্তবকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিরুপমা নারীভাবনার প্রগতিশীলতার প্রতিভূস্বরূপ চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানির ঐতিহাসিক ভূমিকাকে উপন্যাসের মানবিক জমিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

প্রধান পুরুষ চরিত্রসমূহ

পুরুষশাসিত সমাজে নিরুপমা বরগোহাঞি যেহেতু নারীসমস্যাকেই সামনে রেখে উপন্যাস রচনা করেছেন সেহেতু নারী চরিত্রগুলিকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে নারীর সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি। পুরুষচরিত্রগুলির মধ্য দিয়েও পুরুষের মানসিকতায় নারীর সম্মুখীন হওয়া সমস্যাগুলিকেই প্রধানত দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তবে নারী চরিত্রগুলি বেশি প্রাধান্য পেলেও পুরুষ চরিত্রগুলি অংকনেও লেখিকা নিপুণতা প্রদর্শন করেছেন। নারীবাদের প্রয়োজনীয়তার কথাকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছেন লেখিকা পুরুষ চরিত্রসমূহের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে। তবে লেখিকা পুরুষের প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষের প্রকাশ কোথাও করেন নি। পুরুষ চরিত্রগুলোকেও তিনি সহানুভূতির সঙ্গেই অংকন করার চেষ্টা করেছেন। নারীর প্রতি পুরুষের চিরাচরিত উদাসীনতা, অবহেলা, অবজ্ঞার কারণ হিসাবেও লেখিকা পুরুষপ্রধান সমাজে মজ্জাগত সামাজিক পরম্পরায় পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকেই দায়ী করেছেন। নারীর প্রতি যেখানে বিকৃত রুচিজনিত নিষ্ঠুরতা প্রদর্শিত হয়েছে পুরুষের দ্বারা সে সমস্ত পুরুষকে লেখিকা ভিলেনের সারিতে দাঁড় না করিয়ে তাদের মধ্যে মানবিক গুণসমূহের সমাবেশ করেছেন এবং চরিত্রগুলির স্বরূপ পাঠকের সামনে তুলে ধরে লেখিকা কাহিনির স্বাভাবিকতা অব্যাহত রেখে বিষয়বস্তুকে এভাবে রূপায়িত করেছেন যে চরিত্রাংকনে সূক্ষ্ম কলাজ্ঞান ফুটে উঠেছে।

চবিন

চবিন 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র। লেখিকা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর বিভিন্ন সমস্যাকে উদ্‌ঘাটন করার উদ্দেশ্য নিয়েই উপন্যাসটি রচনা করায় পুরুষ চরিত্রগুলিকে তেমনি বেশি প্রাধান্য দেন নি। পটেশ্বরী চরিত্রই বেশি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে আমরা সমগ্র উপন্যাসব্যাপী পটেশ্বরীকেই লক্ষ করে থাকি। লেখিকা চবিন চরিত্র চিত্রণের সময় দোষ গুণে ভরপুর মানবীয় চরিত্র রূপেই তাকে অংকন করেছেন। চবিনের মধ্য দিয়ে লেখিকা পুরুষ মানসিকতা ফুটিয়ে তুললেও তার মধ্যে থাকা ভালো গুণটিকেও দেখানোর চেষ্টা করেছেন ফলস্বরূপ চরিত্র সম্পূর্ণ ভিলেনের সারিতে পর্যবসিত হতে পারে নি। চবিন চরিত্রটিকেও পটেশ্বরীর মতই সমাজের একেবারে নিঃস্ব সাধারণ শ্রেণি থেকে তুলে এনেছেন লেখিকা।

রূপ গুণহীন চবিনের বর্ণনা লেখিকা এরূপে দিয়েছেন — "উজলা লেতেরা দাঁত, ক'লা বরণ, হাফ পেন্ট পিন্ধি থকা ভরির কলাফুলত ওলাই পরা খহু আরু জপরা চুলিরে চবিনটো পূজনর তুলনাত সঁচায়ে এটা দৈত্য।"[২০৩] কালো মলিন বেশধারী গুয়াহাটির হোটেলে কাজ করা চবিন প্রথম দিনই পটেশ্বরীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। পটেশ্বরীকে পূজন হোটেলে ছেড়ে চলে গেলে চবিনই তাকে সান্ত্বনা দান করেছে এবং পটেশ্বরীও নলবাড়ির গ্রাম্য পরিবেশ থেকে আসা চবিনের প্রতি অচেনা পরিবেশে একাত্মতা অনুভবই করেছে। চবিন পূজন চলে গেলে পটেশ্বরীকে সান্ত্বনা দিলেও পটেশ্বরীর প্রতি তার সদ্যজাগ্রত প্রেমানুভূতিতে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ পূজনের চলে যাওয়াতে মনে মনে আনন্দই অনুভব করেছে। তার মন উৎফুল্লিত হয়ে উঠেছে নায়িকাকে পাবার আনন্দে। সে মালিককে বলে পটেশ্বরীকে একদিন হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। অসহায় পটেশ্বরীকে আশ্বাসবাণী দিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে চবিন — " 'অ পটেশ্বরী কি দুখোত তুমি মই থাকওঁতে চাকন্নি হবাহা? তুমি হবা মোর আচল পটেশ্বরী, সি মারোয়ারীর বেটাই তোমাক ঠগলাক্ সি ঠগলাক্ মই আছো নহয়, মই তোমাক চিরজীবন এর রাণী করি রাখিম।"[২০৪] এই উক্তির মধ্য দিয়ে চবিনের পটেশ্বরীকে নিজের গৃহিণী রূপে পাবার বাসনাও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু পটেশ্বরী রূপগুণহীন চবিনের প্রেমে সাড়া না দিলে চবিন কিন্তু অসহায় পটেশ্বরীর উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করেনি। এমনকি পটেশ্বরীকে অসহায় রূপে ছেড়েও দেয়নি, নিজে থেকেই জালুকবারীস্থিত মহিলাদের আবাসস্থলে পটেশ্বরীর থাকার ব্যবস্থা করেছে। মাঝে মাঝে পটেশ্বরীর খবরও নিয়েছে। পটেশ্বরীর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিয়ে চবিন শুধু নিজের হৃদয়বান, দয়ালু হবারই পরিচয় দেয় নি পটেশ্বরীকে পতিতা হবার থেকেও রক্ষা করেছে।

পটেশ্বরী ও চবিনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব গড়ে উঠেছে। পটেশ্বরী নিজের সব মনের কথা, ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা দ্বিধাহীনভাবে চবিনের কাছে বলেছে। চবিন পটেশ্বরীর সবকথাই ধৈর্যের সঙ্গে শুনেছে কোনো কথায় উৎসাহ না পেলেও পটেশ্বরীকে নিরুৎসাহ করার

চেষ্টা চবিনের মধ্যে দেখা যায় নি। আশ্রয়গৃহে থাকা অন্যান্য মেয়েদের জীবনে আসা পুরুষদের দ্বারা পাওয়া দুঃখের কথা শুনে চবিন দুঃখ পেয়েছে। সে বলেছে — "পটেশ্বরী, এই যে তিরীবিলাকোর গল্প ক'লা, একমাত্র তারার বাহিরে সকলোরে কম-বেছি পরিমাণে পাপ করছিল, সেই পাপোরে শাস্তিও সেহাঁতে পালাক্। কিন্তু মই এটা কথা ভাবছো পটেশ্বরী, পাপতো সেই মতা মানুহকেইটায়ো কর্ছিল, বরং সেহাঁতে আরু বেছি পাপ কর্ছিল। কিন্তু সেহাঁতোরতো একো শাস্তি নহ'ল, তারার দাইদাকে নিজোর তিরীর লগোত সুখেরে ঘর সংসার করিয়ে থাকিল, পুরোহিতে মহা ধার্মিক ছেলে লোকোর ঘরে ঘরে শ্রাদ্ধ করি করি মরা আত্মাবিলাকোর সদ্গতি করিয়ে থাকিল, তের বছেরা নাউমানি ছোয়ালীজনীর বা ক'ত কি গতি হ'ল — কিন্তু তাইর সর্বনাশ করা লরাটোয়ে হয়তো এম.এ. বি.এ. পাছ করি ক'বাত মাষ্টর-প্রফেছর হৈ ল'রাবিলাকোক বর বর কথা কৈ নিজোর বিদ্যা জাহির করি আছে। ধেৎ চালা — এখান দুনিয়াত ঈশ্বরোর বিচার বোলা কোনো কথা নাই রে — ইগ্লা দেখি-শুনিতো আজিকালি মই মহা নাস্তিক হ'লো। মই আকৌ ঘরত গেলি দুখ করে, বোলে মোর ছলিতো হোটলত সাত মেলেছোর চুওা ধুই ধুই ধর্মো-কর্মো নামনা হ'ল। হাঃ হাঃ ... বারু পটেশ্বরী এতে থকা ছোয়ালীর কারো ক'তো বিয়া হোয়ার নিয়ম নাই নেকি?"[২০৫] এই উক্তির মধ্যে চবিনের মনোস্তত্ব তথা নারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হৃদয়ের হদিশ মিলে। এমনকি যে পটেশ্বরী রূপ গুণ না থাকার জন্য চবিনের প্রেম আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে সেই পটেশ্বরীই আবার চবিনকে বিয়ে করতে চাইলে সে সংকোচহীনভাবে পটেশ্বরীকে আপন করে নিয়েছে। চবিনের মধ্যে থাকা হৃদয়শীলতা, তার মধ্যে থাকা ভালো গুণগুলোকে পটেশ্বরীও উপলব্ধি করেছে। চবিন সম্পর্কে পটেশ্বরীর অনুভবকে এভাবে দেখিয়েছেন লেখিকা — "দুমাহর নানা ধরণর অভিজ্ঞতা পাছত পটেশ্বরীয়ে অতি দুখর দাম দি হ'লেও উপলব্ধি করিছিল যে দেওদুর্লভ চেহেরার অধিকারী পলরীয়া পূজনলাল ছেরাউগীহে আচলতে নরকর কীট আরু চবিনহে স্বর্গর তরা। গতিকে চবিনর লগতহে তাই আচল স্বর্গত থাকিব।"[২০৬]

পটেশ্বরী ও চবিন সংসার যাত্রা আরম্ভ করলেও তাদের সাংসারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল মালিকের অধীনস্ত হয়ে। চবিন পটেশ্বরীকে নিয়ে মালিকের বাড়িতেই থেকেছে। চবিনকে হোটেলের এবং পটেশ্বরীকে মালিকের ঘরের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়েছে। তাদের নিজের সংসারের স্বাদ পাওয়াতো দূরের কথা চবিন ঘরের ভাতটুকুও খেতে পায় নি। পটেশ্বরীর বুদ্ধিতে পরে চবিন ঘরের ভাত খেতে পেলে পটেশ্বরীর বুদ্ধির জন্য চবিন পটেশ্বরীকে প্রশংসাও করেছে — "তোর বর বুদ্ধি দে। টাউন-চহরোর ভাল ঘরোর ছোয়ালী হলি তুমি পঢ়ি-শুনি মহা পণ্ডিতেনী হ'বা পারলাহৈ।"[২০৭] দারিদ্র্য ও দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তাদের প্রেমের ঘাটতি হয় নি। তাদের সুখের সংসারে ফাটল ধরিয়েছে পটেশ্বরীর উপর পড়া মালিকের কুনজর। চবিন চরিত্রটির মধ্যে লেখিকা ভালো গুণ দেখালেও সম্পূর্ণরূপে পুরুষতন্ত্রকে বাদ দেন নি। তাই তাঁর কিছু কিছু কাজ পুরুষ মনোস্তত্বের গভীর পরিচয় বহন করে এনেছে আমাদের সামনে। মালিকের হাত থেকে চবিন পটেশ্বরীকে রক্ষা করতে পারেনি। চবিনের মনের ভিতর ভীষণ ক্রোধ উঠলেও ধনের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ

করেছে সে। তবে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে থাকে সে। চবিনের অন্তরের ভাবকে লেখিকা এভাবে দেখিয়েছেন — "চবিনে চকুরে ধোয়াকোয়া দেখিলে। মালিকর বর পেটটোত বিরাট এটা খোচা মারিবলৈ উদ্যত হোয়া হাতখন সি কোনমতে চম্ভালি রাখিলে। ওহোঁ, সি বীরত্ব দেখুয়াব নোয়ারে। তার বহুত অসুবিধা। ধন, প্রতাপ, প্রতিপত্তি এইবোর একো নথকা মানুহর বাবে বীরত্ব, সতীত্ব, সম্মানবোধ, ঈর্ষা আদি হৃদয় আরু আত্মার মানবীয় মূল্যবোধর কথাবোর হাস্যকর। ধনী আরু প্রতাপশালী লোকরহে এইবোর একচেটিয়া অধিকারর অংগীভূত, সিহঁতর দরে লাওলোয়া মানুহবোরর বাবে সেই ডাঙর ডাঙর কথাবোর ফুটুকরে ফেনর আন একো নহয়। আন একো হ'ব নোয়ারে। নহ'লে সি চবিনে তার সেই কৃশকায় হাতখনর বজ্র মুষ্টিরে সু-খাদ্যের পরিপুষ্ট সেই বিশাল পেটটো একেটা আঘাত করিয়ে বেলুনর দরে ফুটা করি দিব পারে।"[২০৮] কিন্তু মনের ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেনি চবিন। মালিকের কাছে চবিন বড় অসহায়। চবিন নিজের এই অক্ষমতাকে চাপা দিতে পটেশ্বরীর উপর রাগ প্রকাশ করে তাকে প্রহার করে পুরুষতন্ত্রকে বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। অসহায় চবিন নিজের হাতে মালিকের কাছে পটেশ্বরীকে তুলে দিয়ে ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। চবিনের অসহায়তাকে লেখিকা এরূপে দেখিয়েছেন — "সিদিনা রাতি হোটেলর পরা কোনটো বাটরে কেনেকৈ গৈ যে ঘর পালেগৈ, চবিনে ততেই ধরিব নোয়ারিলে। পটেশ্বরীক সি দুবারো নরকর পরা উদ্ধার করিও উদ্ধার করিব নোয়ারিল, সি শেষ রক্ষা করিব নোয়ারিলে। অক্ষম, অসহায় তার পৌরুষ।"[২০৯] পটেশ্বরীকে মালিকের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারায় নিজের অসহায়তায় দুঃখ পেয়েছে চবিন।

মালিকের সামনে অসহায় চবিন আবার সবকিছুর জন্য পটেশ্বরীকে দায়ী করে তাকে প্রহার করেছে — "চবিনে এচুতক শিলর মূর্তির দরে বহুতপর থিয় হৈ আছিল, তার পাছত সি হঠাৎ পগলার দরে হৈ গৈছিল আরু পটেশ্বরীক গার জোরেরে লুটিয়াই লৈ উধাই-মুধাই বুকুরে পেটে গোর শোধাই দাঁত করচি অর্ধস্ফুট মাতেরে কৈছিল 'চালী বেশ্যা, রাণ্ডী কর্বার— মোর ঘর জ্বালাওকে গেলি আইহ্ছিলি রাক্ষসিনী ...."[২১০] এখানে চবিন মালিক তাই সমস্ত দোষের ভাগী পটেশ্বরীকে নির্মম শাস্তি দিয়েছে। চবিনের এরূপ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লেখিকা সবকিছুর জন্য নারীকে দোষী করার পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ফুটিয়ে তুলেছেন। যে পুরুষতন্ত্র বলবানের কাছে হার মানলেও দুর্বলের উপর তার প্রতাপকে অক্ষুণ্ণ রাখে। এভাবে লেখিকা চবিনের মধ্য দিয়ে পুরুষতন্ত্রকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন। যে চবিন আশ্রয়গৃহের মেয়েদের দুঃখে সমবেদনার সঙ্গে তাদের দুঃখের জন্য দায়ী পুরুষ প্রধান সমাজকে ভর্ৎসনা দিয়েছে। সমাজে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে থাকা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবধানকে নিন্দা করেছে আবার সেই চবিনই সবকিছুর জন্য পটেশ্বরীকে দোষ দিয়েছে, মেরেছে। এভাবে চবিনের দ্বৈত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে লেখিকা চবিনের চরিত্রটি দোষগুণে ভরা সাধারণ চরিত্র রূপে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন। পটেশ্বরীর বুদ্ধির ফলে পরবর্তীতে চবিন পটেশ্বরীকে মালিকের কবল থেকে রক্ষা করতে পারলেও চবিন পটেশ্বরীর বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারেনি, বরং তার সন্দেহ আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। মালিকের পটেশ্বরীর চরিত্রের উপর বলা মিথ্যা

কথাই তার কাছে সত্য মনে হয়েছে। মালিকের রোপণ করা সন্দেহ বীজে বার বার চবিনের মনে একই প্রশ্ন জেগেছে — "সকলো ভাব-চিন্তার মাজত তার মনত প্রশ্ন এটা বার বার মূর দাঙি উঠিছিল — মালিকে এটা কথা ঠিকেই কৈছে — পটেশ্বরীয়ে প্রথমতেই এনে এষার কথা মালিকক কৈ নপঠিয়ালে কিয় — তাই আত্মঘাতী হ'ব, তাই ভিখারিণী হ'ব, তাই জালুকবারীলৈ যাব — এই কথা তাই আগতেই কৈ নপঠিয়াকে কিয়? কিয়? কিয়? বগা, থূলন্তর চেহেরার মালিকর প্রতি তাইরো কিবা লোভ জাগিছিল নেকি? সি কুৎসিৎ বুলি তাই তাক মনে মনে ঘিণ করে নেকি?"[২১১] এভাবেই লেখিকা চবিনের যৌন ঈর্ষার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। প্রশ্নে জর্জরিত চবিনের মানসিকতা তার ব্যক্তিত্বকে আক্রমণ করে এবং পটেশ্বরী ও চবিনের বিয়ের এক বছরের মধ্যেই ফুর্তিবাজ চবিন রূপান্তরিত হয় এক গম্ভীর কঠিন বয়স্ক দুঃখী ব্যক্তিত্বে।

লেখিকা চবিনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মধ্যে চরিত্রটির সমাপ্তি টেনেছেন, তাই উপন্যাসে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি চরিত্রটি। হয়তো লেখিকার বক্তব্যকে বোঝানোর জন্য পরবর্তীতে লেখিকা এই চরিত্রটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। দোষ গুণে পূর্ণ সাধারণ মানুষ চবিন। তাই তো পটেশ্বরীকে সন্দেহ করে মারধর করলেও তাকে ত্যাগ করেনি। মাঝে মাঝে ভালোবাসার মধ্য দিয়ে তার হৃদয়ের সংবেদনশীলতাও প্রকাশ পেয়েছে। চবিন চরিত্রটি সৃষ্টির মধ্য দিয়ে লেখিকা যেভাবে পুরুষতান্ত্রিক সমাজমানসিকতা দেখিয়েছেন তেমনি নারীর উপর পুরুষের আধিপত্যবাদকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তারই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন পুরুষতন্ত্রের কাছে পটেশ্বরীর মত নারীর অসহায়তার দিকটি। আবার শ্রেণিসমাজে চবিনদের অসহায়তাকেও অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন লেখিকা, চবিনের প্রসঙ্গে।

মনোজ

'অন্যজীবন' উপন্যাসের একটি প্রধান পুরুষ চরিত্র মনোজ। কেন্দ্রীয় চরিত্র অণিমার স্বামী। সমগ্র উপন্যাসেই মনোজের উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও স্ত্রী অণিমার সংলাপ, সমাজকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রতিবাদী সত্তার জন্য মনোজ থেকে অণিমা চরিত্রটিই বেশি উজ্জ্বল রূপে আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। তবে লেখিকা শিক্ষিত মনোজ চরিত্রটিকেও একেবারে মূল্যহীন করে সৃষ্টি করেন নি। অণিমার স্বামী মনোজ ও লেখক মনোজ দত্ত ডিব্রুগড়ের একটি গ্রামের শিক্ষক হেরম্ব দত্তর ছেলে এবং সম্প্রতি ধুবরী কলেজের অধ্যাপক। মনোজ মেধাবী, অধ্যয়নশীল ও সৃজনশীল। মনোজ অণিমার সহপাঠী এবং এক সঙ্গেই সোসিয়েল সার্ভিসের জন্য একটি গ্রামে গিয়েছিল। মনোজ সেই গ্রামের ভ্রমণ কাহিনিকে আপন সৃজনীশক্তিতে সুন্দর গল্পের রূপ দিয়ে সাময়িকপত্রে প্রকাশ করেছে। অণিমা মনোজের রচনা দেখে অবাক হয়ে গেছে। মনোজের গল্প পড়েই অণিমা মনোজের প্রেমে পড়েছে।

মনোজ নিজের কার্যকলাপে বার বার বাড়ির লোকেদের অসন্তুষ্ট করেছে। মেধা ও বাড়ির

লোকদের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে হাকিমের পরীক্ষা দেয়নি, অন্য চাকরি করলে সাহিত্যচর্চার সময় পাবে না ভেবে। তবে সে বাড়ি থেকে দূরে অধ্যাপকের চাকরি বেছে নেওয়ার পেছনে সে নিজের ও অণিমার কথাই চিন্তা করেছে। বাড়ির পাশে কোনো কলেজে অধ্যাপনা করলে যে কোনো সময় গ্রাম থেকে লোক তার বাড়িতে আসবে এবং অণিমার অসুবিধা হবে। তাছাড়া জেঠাতো দাদা রজনী দত্ত বেকার হওয়ায় যখন তখন এসে তাকে বিরক্ত করতে পারে একথা নিয়েও তার মনে একটু ভয় ছিল। মনোজকে নিতান্ত স্বার্থপর এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত করে আঁকা হয়েছে উপন্যাসের শুরুতে। মনোজ নিজের পছন্দে বিয়ে করেও বাড়ির লোকেদের অসন্তুষ্ট করেছে। মনোজ ও অণিমার বিয়ে হয়েছে গৌহাটিরই একটি ভবনে। বিয়ের পর মনোজ স্ত্রী অণিমাকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে কয়েকদিন কাটাতে গেলে অণিমার গ্রামের অভিজ্ঞতাতেই শেষ হয়েছে 'অন্যজীবন'-এর কাহিনি। মনোজের মুখে জীবনানন্দ তথা রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃতির মধ্য দিয়ে লেখিকা বাংলা সাহিত্যের প্রতি মনোজের অনুরাগকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

গ্রামের বাড়িতে এসে অণিমা শাশুড়ির আদর যত্নে অভিভূত হয়ে পড়ে এবং শাশুড়ির প্রতি মনোজের তথা অন্যদের করা উদাস মনোভাবকে দেখানোর মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি থাকা উদাস মনোভাবাপন্ন পুরুষ চরিত্র হিসেবে মনোজের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। অণিমা মনোজকে মায়ের খাবার দাবারের প্রতি দৃষ্টি না রাখার কথা নিয়ে প্রশ্ন করলে মনোজ বলেছে — "এইটো কি আচরিত কথা সুধিছা বৌটিয়ে কি খায় নাখায় মন করিবলগীয়া কিটো আছে? তেঁওরতো কোন বেমার-আজার হোওা নাই যে কিবা স্পেচিয়েল খাব লাগিল বা আমি তেওঁর বাবে স্পেচিয়েল খাদ্যর বন্দোওস্ত করিব লাগিব? তেঁও নিশ্চয় আমি যি খাওঁ তাকেই খাব পারে আরু খায়ো।"[২১২] মনোজের উক্তির মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি হওয়া উদাস মনোভাবেরই প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া অণিমাকে রাধুনি হিসেবে প্রস্তুতির দিনও অণিমা শাশুড়ির কষ্ট লাঘব করার জন্য রাধুনি আনার কথা বললে মনোজ বলেছে — "কিয়? বৌটির কি হ'ল?"[২১৩] প্রশ্নের মধ্য দিয়েও মায়ের প্রতি উদাস মনোভাবেরই প্রকাশ পেয়েছে। তবে অণিমার যুক্তিপূর্ণ কথায় মনোজের হৃদয়ে মায়ের প্রতি থাকা সুপ্ত ভালোবাসার বিকাশ ঘটেছে এবং সে অনুভব করতে পেরেছে মায়ের সংসারের জন্য করা অমানুষিক পরিশ্রমকে। এতদিন মায়ের যে জীবনধারা মনোজ স্বাভাবিক ভেবে মেনে নিয়েছিল অণিমার সজাগ মন্তব্য সেই বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করিয়েছে এবং মায়ের প্রতি করা উদাসীনতা তাকে মনে মনে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। মনোজ তার মায়ের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। মনোজের অনুতাপকে লেখিকা এরূপে দেখিয়েছেন — "এইবার ঘরলৈ আহি প্রথমবারর বাবেহে যেন তার মাকর চেহেরালৈ চকু গ'ল — বার্ধক্যর চাপ এইবার মানুহজনীর শরীরত প্রকট হৈ উঠিছে, চুলি আধা বগা হৈ গ'ল, গাটোও বহুত শুকাল, হাত-ভরিবোর যেন ছালসর্বস্বহে হৈ পরিছে — সিরবোর কি প্রকট হৈ ওলাইছে। আগর দরে পোন হৈও খোজ কাঢ়িব নোয়ারে নেকি, বেছ যেন হাউলি পরিছে .... বৌটি, এয়ে মোর মরমর বৌটি — নিজর কোন দুখ কষ্ট, সুখ-সুবিধালৈ নেচাই আমার বাবে জীবনটো শেষ করি পেলালে।"[২১৪] কথাগুলি ভেবে ভেবে

মনোজের গলা শুকিয়ে গেছে, মনোজ অশান্ত হয়ে উঠেছে, তার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মনোজের ভাবনার মধ্য দিয়ে মনোজের মাকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে মায়ের প্রতি থাকা তার গভীর প্রেমই ফুটে উঠেছে। মনোজ অণিমার কথা শুনে মার কষ্টের কথা অনুভব করে রাধুনির বন্দোবস্তে রাজী হলে পিতা তাকে স্ত্রৈণ বলে অভিহিত করলেও মনোজ তার জন্য পিতার উপরে কোনোরূপ ক্ষোভ পোষণ না করে অণিমাকে বলেছে — "কিন্তু তিরোতার বাবেতো করা নাই, মাতৃর বাবেহে করিছো, বরং সেই রান্ধনী আনি মোর নিজর তিরোতাজনীক রান্ধনী করার বন্দবস্ত পকাহে করিছো — একেবারে এণ্টি-তিরোতা সেরুয়া করবার। বারু সেইবোর ধেমালি বাদ দিয়া, তুমি কিন্তু রান্ধনী বন্দবস্ত করার কথা কৈ খুব ভাল করিলা অণিমা, ভাবিছিলো বৌটিয়েই আপত্তি করিব, কিন্তু তেঁও যেন খুব সকাহহে পাই গ'ল আরু তেতিয়াই মই প্রথমবারর বাবে অনুভব করিলো— অষ্টপ্রহর গেবারি খাটি খাটি কিমান ক্লান্ত হৈ পরিছে, প্রথমবারর বাবে আরু এটা কথা অনুভব করিলো মোর বৌটিজনী বুঢ়া হৈ আহিছে।"[২১৫] মনোজ শুধু মায়ের কষ্টই অনুভব করেনি মায়ের কষ্ট লাঘব করার ব্যবস্থাও করে রেখে যাবার প্রতিশ্রুতি অণিমাকে দিয়েছে। উপন্যাসে মনোজের শুধু মায়ের প্রতি থাকা উদাস মনোভাবই প্রকাশ পায়নি শিক্ষিত হয়েও বহু বিবাহকে সমর্থন করে তার পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গতানুগতিকতাকে নির্বিচারে মেনে নেওয়ার একটি মানসিক প্রবণতা আমাদের সামনে ফুটে উঠেছে। মনোজ অণিমাকে বলেছে "তুমি চহরর ছোয়ালী, গতিকে তার মাপকাঠীরে গাঁওক বিচার করিবলৈ নাযাচোক, গাঁওত আগতে দুজনী তিনিজনী বিয়া করাটো সাধারণ ঘটনা আছিল।"[২১৬]

উপন্যাসে মনোজের স্ত্রীর প্রতি থাকা গভীর ভাললাগার প্রকাশ ঘটেছে বহুবার। মনোজকে পুরুষের প্রতিনিধি মনে করে অণিমা মনোজকে নানা বাক্যবাণে বিব্রত করলে অণিমার প্রতি তার ভালোবাসা হেতু সবকিছুকে নীরবে সহ্য করেছে। সে পরিস্থিতিকে সামান্য করার জন্য নানা ধরনের হাস্যকর কথার মধ্য দিয়ে অণিমাকে অন্যমনস্ক করার চেষ্টা চালিয়েছে। অণিমার আক্রমণে মনোজের অবস্থাকে লেখিকা এরূপে প্রকাশ করেছেন মনোজের উক্তির মধ্য দিয়ে "তুমি তিরোতার ওপরত অত্যাচার করা বিশ্বর সকলো পুরুষর বাবে মোকেই জগরীয়া করি যেনেকৈ আক্রমণ করিবলৈ ধরিছিলা, মইতো চকুরে ধোঁয়াকোয়াই দেখি গৈছিলো।"[২১৭]

মায়ের পরিশ্রমের প্রতি উদাস হলেও স্ত্রীর পরিশ্রমের প্রতি সজাগ থেকেছে সে। সকাম পেতে অণিমাকে রাধুনি প্রস্তুত করতে চাইলে অণিমা নিমন্ত্রিত এত লোকের ভাত রাঁধতে পারবে কি না তা নিয়ে চিন্তার মধ্য দিয়ে অণিমার প্রতি তার প্রেমকেই দেখিয়েছেন লেখিকা। মনোজের মা পুতলীকে কটু কথা বললে মনোজের খারাপ লেগেছে। পুতলীকেও অন্যান্য কথার মধ্য দিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। পুতলীর সামনে নিজের স্ত্রীর প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গে নরেন ও পুতলীর হৃদয়ের সম্পর্কের কথা বলে পুতলীকে আনন্দ দেবার চেষ্টা করেছে। সে পুতলীকে বলেছে — "তই ঠিকেই ধরিছ পুতলী, পিছে তই কোনটো বাটেরে নরেনর অন্তরত সোমাইছ? নিশয় এনেকুয়া ফেমনিন্ বাটেরে নহয়?"[২১৮] পুতলীর জীবনে নরেনের আগমনকে মনোজ খারাপ নজরে দেখেনি

বরং নরেনের আগমনে পুতলীর জীবনের পথ পরিবর্তনকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করে নিজের উদার মনোভাবেরও পরিচয় দিয়েছে। মনোজ বলেছে — "ময়ো অলপতে গম পালো, তোমাক কোয়ার সুবিধাই পোয়া নাছিলো। পুতলীর জীবনত এইটোয়ে বোধহয় সকলোতকৈ সুখর আরু ভাল ঘটনা ঘটিছে। তাই ডাঙর হৈ আহার লগে লগে যেতিয়া মাকর কথা গম পালে— ছোয়ালীজনী হেনো কিবা হৈ পরিল, কারো লগত বিশেষ মাত বোল নকরে, নাহাঁহে ঘরর কাম নকরে, কেবল এচকুত কিতাপ এখনলৈ গোমোঠা বহি থাকে। মামীয়েক - মোমায়েকর গালি-শপনিত তাই হাঁহে পাখির পরা পানী জোকারি দিয়ার দরেই জোকারি দিয়ে। কিন্তু তাইর বুদ্ধি আছিল খুব চোকা, আরু বাহিরা কিতাপ-পত্রর প্রতি খুব আগ্রহ, স্কুলর লাইব্রেরীর তাই গোটেইবোর কিতাপেই পঢ়ি পেলাইছিল। সেই তেনেই কিতাপ আনোতাই বোধহয় তাই নরেনর চকুত পরিল। নরেন বাঁওপন্থী দল এটার সক্রিয় সভ্য, গতিকে তার প্রভাবত পরিয়ে পুতলী ফেমিনিষ্ট হৈ ন পরিল, সুস্থ স্বাভাবিক ছোয়ালী এজনীয়ে হৈ পরিল .... মই ভাবিছো, ঘরর পরা ওভোতার আগতে নরেনক এবার লগ ধরি যাম।"[২১৯] পুতলী ও নরেনের ভালোবাসাকে সে সমর্থন করেছে। নরেনের ভালোবাসাকে সমর্থন করলেও তার চিন্তায় ফেমিনিস্ট মেয়ে আর সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ের মধ্যে ধারণাগত ব্যবধান নারীবাদ সম্পর্কে মনোজের অসম্পূর্ণ ধারণার ইঙ্গিত দেয়। কারণ পুতলী মৌলবাদী নারীবাদী না হয়ে সমাজবাদী নারীবাদের সমর্থক হয়ে ওঠার ধারণাই হয়তো লেখিকা সঞ্চার করতে চেয়েছেন। বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অণিমার মতো আইকণের পড়ার ইচ্ছাকে সমর্থন করেছে মনোজ, আইকণকে পড়াতে রাজি হয়েছে। সে আইকণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়ার কথাতে অসম্মতি প্রকাশ করেছে। অণিমার সঙ্গে তার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ ও অণিমার যুক্তিপূর্ণ কথায় সমর্থন করার জন্য পিতা তাকে 'তিরোতা সেরুয়া' নামেও বিভূষিত করেছে।

এভাবেই লেখিকা স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, মায়ের প্রতি হৃদয়ে থাকা সুপ্ত প্রেম, অজান্তে মার প্রতি উদাস মনোভাব, স্ত্রীর আক্রমণ সহ্য করার মত সহনশীলতা, পুতলীর প্রতি থাকা সহানুভূতির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন মনোজ নামের পুরুষ চরিত্রটি যাকে হার মানতে দেখা গেছে স্ত্রীর যুক্তিপূর্ণ তর্কের কাছে। অণিমার যুক্তিপূর্ণ সংলাপের কাছে মনোজের সংলাপ একটু ম্লান মনে হলেও লেখিকা মনোজের চরিত্রে কোনরূপ খারাপ অভ্যাস ও দোষকে দেখান নি। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পুরুষের চেতনা জুড়ে থাকে মধ্যযুগের সামন্তবাদী সংস্কার — এই সত্য মনোজের মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন লেখিকা।

দণ্ডীনাথ কলিতা

দণ্ডীনাথ কলিতা 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের প্রধান পুরুষ চরিত্র। অবশ্য উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহেও তাঁর বিশেষ কোন সক্রিয় ভূমিকা নেই। তবে দণ্ডীনাথকে কেন্দ্র করে চন্দ্রপ্রভার হৃদয়ে যে প্রেমানুভূতি কখনও তিক্ত কখনও মিষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসে সেদিকটি বোঝানোর জন্য দণ্ডীনাথের

অনুপস্থিত উপস্থিতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। দণ্ডীনাথের উপস্থিতি ঘটেছে উপন্যাসে নায়িকা চন্দ্রপ্রভার নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে শিক্ষালাভ করে তেজপুরে শিক্ষয়িত্রী হয়ে আসার পর। তেজপুরেই দণ্ডীনাথ কলিতার সঙ্গে চন্দ্রপ্রভার প্রথম পরিচয় ঘটে। তেজপুরের স্থানীয় একটি স্কুলের শিক্ষক দণ্ডীনাথ কলিতা যথাক্রমে সমাজসেবক ও কথাসাহিত্যিক ছিলেন। প্রথম দর্শনেই দণ্ডীনাথ কলিতা চন্দ্রপ্রভার সাহসের প্রশংসা করেছেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে সুদূর বজালীর থেকে একটি মেয়ে এসে এতদূরে চাকরি করা তথা ঘরভাড়া করে থাকার মধ্যে চন্দ্রপ্রভার যে সাহসের পরিচয় পেয়েছেন, তাতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। সুচারুভাবে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীকে পরিচালনার জন্যও চন্দ্রপ্রভার প্রতি তাঁর হৃদয়ের অনুভূতিকে প্রশংসার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন তিনি। এছাড়া চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে সুরে সুর মিলিয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি থাকা তাঁর সংবেদনশীল ও সহমর্মিতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখিকা উপন্যাসে। দণ্ডীনাথ কলিতা বলেছেন — "ময়ো আপোনার লগত এই কথাত এক মত, স্ত্রী জাতির উন্নতি বিনে সমাজ কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোয়ারিব। তারবাবে প্রথমতে তেওঁলোকক শিক্ষিত করি তুলিব লাগিব আরু তেওঁলোকর মাজত থকা কুসংস্কারবোর আঁতরাব লাগিব। আরু এটা কথা আপনি ঠিকেই কৈছে, আমার সমাজর অতি পিছপরি থকা তিরোতাসকলক অজ্ঞান এন্ধারর পরা উলিয়াই আনিবলৈ হ'লে নেত্রীর অন্তরত প্রচণ্ড সাহস লাগিব। সাহস হ'ল নেতৃত্বর এটা প্রধান গুণ, তেওঁর অন্তরর সেই সাহস তেওঁ অনুগামীর অন্তরলৈও সঞ্চারিত করিব পারিব লাগিব। আপোনার বিষয়ে ইমান দিনে যি খবর পাইছিলোঁ আরু আজির ছাত্র সম্মিলনত আপনার বক্তা আরু স্বেচ্ছাসেবিকার নেতৃত্বর দ্বৈত ভূমিকা দেখি মোর দৃঢ় ধারণা উপজিছে যে আপোনার দরে সাহসী ছোয়ালী এজনীয়ে ভবিষ্যতে অসমর সমূহ নারী জাতিকে নেতৃত্ব দিব পারিব।"[২২০] উক্তির মধ্য দিয়ে নারীজাতির মঙ্গলের চিন্তার আভাসের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রপ্রভার নেতৃত্বশক্তির প্রতি মুগ্ধতাও প্রকাশ করেছেন দণ্ডীনাথ।

চন্দ্রপ্রভার প্রতি দণ্ডীনাথের প্রেম ধীরে ধীরে গাঢ় হতে থাকলে দণ্ডীনাথের অন্তরের দ্বন্দ্ব দ্বিধা ও দুঃশ্চিন্তাও বাড়তে থাকে। চন্দ্রকে নিয়ে, তার জাতি পরিচয় নিয়ে দণ্ডীনাথের সংঘাতময় হৃদয়কে লেখিকা এরূপে প্রকাশ করেছেন — "কোয়া আমার এই ভীষণ প্রেমর পরিণাম কি? কোওা কোওা, তুমি কিয় সুত কুলত জন্ম ল'লা? তোমার জীবনটো কিয় ইমান কলংকরে ভরা — কিয় তুমি এবার বিয়া হৈ যোওার পিছতো সেই স্বামীর লগত ঘর-সংসার কবির নোয়ারি ইয়ালৈ মোর জীবন ছারখার করি দিবলৈ আহিলা? মই যে দুখন নাওত দুটা ভরি থৈ কোনো এখান নাওতে উঠিব নোওারি সংসার সমুদ্রত ডুবি মরিবলৈ ওলাইছোঁ।"[২২১] সমাজসেবক হয়েও দণ্ডীনাথের চিন্তা জাত পাতকে অতিক্রম করতে পারে নি। দণ্ডীনাথ চন্দ্রপ্রভাকে ভালোবেসেছেন, তেজপুরের ভৈরবী মন্দিরে গান্দর্ব মতে চন্দ্রকে বিয়ে করলেও চন্দ্রপ্রভা সুত বলে সমাজের ভয়ে চন্দ্রপ্রভাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে সক্ষম হন নি। দণ্ডীনাথ চন্দ্রপ্রভাকে ঘর ও স্ত্রীর মর্যাদা না দিতে পারলেও অবৈধ সন্তানের মা হওয়ার লাঞ্ছনা দিয়েছেন। দণ্ডীনাথের চন্দ্রের প্রতি প্রেমের গভীরতা জাতপাতকে

অতিক্রম করতে না পারায় দণ্ডীনাথের ভালোবাসা থেকে প্রতারণাই আমাদের কাছে বেশি প্রবলরূপে ধরা পড়েছে। অতুলের জন্মের পূর্বে সমাজের ভয়ে দণ্ডীনাথ চন্দ্রকে ভ্রূণহত্যা করার জন্যও চাপ দিয়েছেন। এমনকি দণ্ডীনাথ মা বাবার ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে কমলের সঙ্গে সামাজিকভাবে বিয়ে করেছেন এবং কমলকে স্ত্রীর মর্যাদাও দিয়েছেন। তবে কমলের সঙ্গে কোনোরূপ প্রতারণা করতে দেখা যায়নি তাঁকে। তিনি কমলকে চন্দ্রপ্রভা ও অতুলের সম্পর্কে জানিয়েছেন তারই সঙ্গে এটিও স্বীকার করেছেন যে চন্দ্রপ্রভা ও অতুল তাঁর জীবনের অতীত স্মৃতিমাত্র নয়। ভালোবাসা ও তাঁর স্বামীত্ব ও পিতৃত্বর দায়বদ্ধতার মধ্য দিয়ে বর্তমানেও তাদের সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নির্ভীকতার পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রপ্রভার প্রতি থাকা ভালোবাসার কিছু প্রকাশ ঘটেছে, তারই সঙ্গে কমলের প্রতি থাকা সততারও প্রকাশ পেয়েছে এখানে।

দণ্ডীনাথ ও চন্দ্রপ্রভার প্রেম জীবিত রয়েছে মাত্র চিঠিপত্রের মাধ্যমে। চিঠির মধ্য দিয়েই দুজন দুজনের উপর মান অভিমানের পালা চালিয়ে গেছেন। দণ্ডীনাথ ছেলে অতুলের কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেননি এমনকি অতুলের পিতৃপরিচয়ও দেন নি। মাঝে মাঝে কিছু অর্থ সাহায্য ছাড়া তেমন কিছু চন্দ্রপ্রভা ও অতুলের জন্য করতে দণ্ডীনাথকে দেখা যায় নি। দণ্ডীনাথ চন্দ্রকে বিয়ে না করলেও চন্দ্রর উপর নিজের অধিকার ও আধিপত্যকে সারাজীবন বহাল রাখার চেষ্টা করেছেন। চিঠির মাধ্যমে চন্দ্রপ্রভার চাল-চলন, স্বভাব চরিত্রের উপর দোষারোপ করতেও দ্বিধাবোধ বা কুণ্ঠিত হতে তাঁকে দেখা যায় নি। দণ্ডীনাথ চন্দ্রপ্রভাকে বলেছেন — "তোমার প্রত্যেক কার্যতে ধৈর্যহীনতার, ভাব-প্রবণতার এনে আধিক্য যে পদে পদে বিফল মনোরথ বা গঞ্জনার ভাগী হোয়াটো নিতান্ত স্বাভাবিক কথা। তোমার সকলো অশান্তি আরু অনর্থর মূলত তোমার এই ভাবপ্রবণতা আ রু চঞ্চলতা। তুমি স্বীকার যদিও নকরা মই কিন্তু সেই একেটা দোষর পরা তোমাক এদিনলৈকে মুক্ত দেখা নাই ...."[২২২] শুধু তাই নয় দণ্ডীনাথ চন্দ্রপ্রভার উপর অভিযোগ দিয়েছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার। দণ্ডীনাথকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও চন্দ্রপ্রভা পুরুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে বলে অভিযোগ করেছে। অন্য ছেলেদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছে বলে নিন্দা করেছেন এবং চন্দ্রপ্রভাকে মিতব্যয়ী হবার উপদেশ দিয়েছেন। দণ্ডীনাথ অনুভব করতে পারেন নি চন্দ্রের দেশপ্রেম ও ত্যাগকে। তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে চন্দ্রের কলংকিত জীবন। দণ্ডীনাথ নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য ও দোষকে কোনোদিন অনুভব করেন নি। দণ্ডীনাথের নানারূপ দোষারোপ পূর্ণ চিঠিতে চন্দ্রপ্রভার প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে লেখিকা ফুটিয়ে তুলেছেন দণ্ডীনাথের চরিত্র তথা পুরুষশাসিত সমাজের মানসিকতাকে — "উস্ — এই মানুহজনে মোর কাম-কাজক লৈ কেতিয়াবা ভুলতো যদি অলপ প্রশংসা করিলেহেঁতেন। প্রশংসা বারু নালাগেই, তুমি কিয় সদায় চন্দ্রর কলংককেই দেখি থাকিলা, কিয় তার সামান্য কিরণো দেখিবলৈ নাপালা? মোর অন্তরত যেন কোনো দেশপ্রেমেই নাই, মই যেন কেবল ডেকা ল'রার আকর্ষণতহে এনেকৈ ঘরবারী এরি, প্রাণর অতুলটোক এরি, দুখুনী আইজনীক এরি লরি ফুরিছোঁ! আরু হেরা কঠোর হৃদয় বিচারক, মই কোনো গৃহস্থর গৃহিণী হ'বর উপযুক্ত হয়নে নহয় তার প্রমাণর সুযোগ তুমি মোক দিছিলানে? তুমিয়েই দেখোন মোক তার

পরা চির-বঞ্চিত করি রাখি এই অভিযোগর সত্য-অসত্য প্রমাণিত হোয়ার মুদা মারি থ'লা? ইয়ার পিছত এই সম্পর্কে মতামত দিয়ার তোমার কি নৈতিক অধিকার আছেহে? সমাজখন তোমালোক পুরুষসকলর দ্বারা শাসিত বাবেই এনে হৃদয়হীন আরু একপক্ষীয় বিচার করার অধিকার লাভ করি আহিছা নহয়? ....”[২২৩] এই উক্তির মধ্য দিয়ে লেখিকা দণ্ডীনাথের সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। আবার চন্দ্রপ্রভার প্রতি দণ্ডীনাথের প্রেমকেও প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন চন্দ্রের অনুভূতির মধ্য দিয়ে — “দণ্ডীনাথর মোর প্রতি প্রেমো এই আন্ধার-পোহরর দরেই এক বিচিত্র সংমিশ্রণ— কেতিয়াবা সি আকুলতার প্রকাশেরে পোহর-উজ্জ্বল আরু কেতিয়াবা সি দুঃসহ ঘৃণারে আন্ধার কলা।”[২২৪] দণ্ডীনাথ নিজের জীবনের নানা সমস্যার কথাও চিঠির মাধ্যমে চন্দ্রকে জানিয়েছেন। তাঁর সংসারের অভাব অনটনের কথা জানিয়েছেন। নিজের শহরে থাকার খরচ, গ্রামের বাড়িতে মা বাবা ও স্ত্রী কমলের জন্য পাঠানো খরচ, মা বাবার অসুখের খরচ এবং নিজের অসুখের খরচ বহন করা তার জন্য কষ্টকর হয়ে উঠেছিল এমনকি লেখার থেকেও আশানুরূপ অর্থ না পাওয়ার সংবাদও চন্দ্রপ্রভাকে জানিয়েছেন দণ্ডীনাথ। এত অভাব অনটনের মধ্যেও অতুলের জন্য টাকা পাঠাতে কোনোরূপ অবহেলা না করার কথাটি চন্দ্রপ্রভার মনে আঘাত হানে এবং দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে চন্দ্রপ্রভা বলেন — “এনেহেন কর্তব্যপরায়ণ, বিবেকবান, সৎপথত চলা মানুহজনর আরু সুখ নহ'ল। ইমান অভাবর মাজতো তাইলে টকা-পইচা পঠোয়াত বা অতুললৈ ইটো হিটো বস্তু পঠোয়াত কোনো দিন কোনো গাফিলতি হোয়া নাই।”[২২৫] চন্দ্রর এই অনুতাপের মধ্য দিয়ে দণ্ডীনাথের কর্তব্যনিষ্ঠারই পরিচয়ই তুলে ধরেছেন লেখিকা। চন্দ্র অসুস্থ হলে দণ্ডীনাথ চিঠির মাধ্যমে তাঁর খবর নিয়েছেন। শীঘ্র ভাল হয়ে ওঠার কামনা করেছেন এবং চন্দ্রপ্রভার জন্য কুড়ি টাকা পাঠিয়েছেন। এসবের মধ্য দিয়ে দণ্ডীনাথের চন্দ্রপ্রভার প্রতি থাকা প্রেমই প্রকাশ পেয়েছে। চন্দ্রপ্রভা রাগ করে দণ্ডীনাথকে চিঠি না দেওয়ার প্রতিজ্ঞার কথা বললে দণ্ডীনাথ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছে — “তুমি যি ভাল পোয়া করা, কিন্তু ভগবানে এনে এটা দিন দিব, যিদিনা মোর কথা সুঁওরিবলৈ বাধ্য হ্বা, যিদিনা তোমার ভুল নিজে বুজিবা।”[২২৬] এইভাবেই দণ্ডীনাথের চন্দ্রপ্রভার প্রতি প্রেম ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখিকা।

অভাব অনটন ও অসুস্থতার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে একদিন দণ্ডীনাথ সংসারের মোহ মায়া ত্যাগ করে জীবন লীলা সাঙ্গ করেন। চন্দ্রপ্রভার প্রতি প্রেম-প্রতারণা, স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস, পুত্র অতুলের প্রতি ভালবাসা ও সামান্য অর্থের সাহায্যের মধ্য দিয়ে নিজের কর্তব্যকে করার চেষ্টার মধ্য দিয়ে চিত্রিত হয়েছে দণ্ডীনাথের চরিত্রটি। অবশ্য চন্দ্রপ্রভার ব্যক্তিত্বের বিপরীতে এই চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে নি বরং ম্লান হয়ে গেছে।

নিরুপমা বরগোহাঞির সৃজনবিশ্বে কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র

নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাসে প্রধান নারী ও পুরুষচরিত্র ছাড়া আরো বহু চরিত্রের ভীড়

দেখা গেছে। চরিত্রগুলি অল্প পরিসরেও নিরুপমা বরগোহাঞিঞর সমাজের বিভিন্ন স্তরের বাস্তব উদ্‌ঘাটনের যে মনোবাঞ্ছা তা পূরণ করে গেছে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসের অঞ্জলি, পরেশ কলিতা, বলিন, উপেন বেপরী (কলিতা), নীলকণ্ঠ মহাজন, রেখাদি, 'অন্যজীবন' উপন্যাসের পুতলী, পুতলীর মা রম্ভা, আইকণ, মনোজের মা, মনোজের পিতা হেরম্ব দত্ত, রজনী দদাইটি, বিহুপুরীয়ানী, খুরীদেউ, 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের রাতিরাম মজুমদার, গঙ্গাপ্রিয়া, রজনীপ্রভা, ধর্মেশ্বর, যোগমায়া, দণ্ডী পিয়াদা ইত্যাদি। কিছু কিছু চরিত্রের উপস্থিতি ক্ষণকালীন তারা পূর্ণায়ত চরিত্রের রূপ না পেলেও লেখিকার আখ্যান বয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, পাঠকের চিত্তও ছুঁয়ে গেছে। কয়েকটি চরিত্রকে আলোচনা করে তাঁর পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টিতে দক্ষতাকে দেখানোর প্রয়াস রইল।

রাতিরাম মজুমদার

দৈশিঙরি গ্রামের গাঁওবুঢ়া রাতিরাম মজুমদার 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের নায়িকা চন্দ্রপ্রভার পিতা। চন্দ্রপ্রভার দৃঢ় ও নির্ভীক ব্যক্তিত্ব গঠনে রাতিরাম মজুমদারের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। চন্দ্রর পিতা রাতিরাম মজুমদারের কাছে খুঁজে পেতেন পৃষ্ঠবল। উপন্যাসে চরিত্রটি গ্রাম্য কৃষিজীবী ব্যক্তি হলেও যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে গড়ে উঠেছে। রাতিরাম মজুমদারের প্রতিপত্তি ও অবস্থাসম্পন্ন হওয়ার কথা উপন্যাসে বহু জায়গায়ই পাওয়া যায়। রাতিরাম মজুমদারের বাড়িতে গ্রামের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব ধরনের লোকই আপদে-বিপদে পরামর্শ তথা সাহায্য নিতে এসে থাকে। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তথা দেশের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে তার কাছে আসে। গ্রামের একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবেই তাঁর পরিচয় রয়েছে। রাতিরাম মজুমদারের প্রতিপত্তিকে লেখিকা এভাবে তুলে ধরেছেন — "দৈশিঙরি গাঁওর গাঁওবুঢ়া রাতিরাম মজুমদারর বৈঠকখানা ঘরর পিরালীতে বহি গুরঙরকৈ হোকা টানি আছিল। অলপ আগতে তেঁওর ওচরর পরা বিদায় লোয়া পাঠশালার পণ্ডিত এগরাকী আরু গাঁওর আন এজন মানুহ চাহ খাই এরি যোয়া বাটি দুটা, তামোল খাই পিরালীর অলপ দূর দূরৈত পেলাই যোয়া তামোলর চোবাখিনি যেন গাঁওবুঢ়ার প্রতাপ-প্রতিপত্তির একধরণর নিদর্শন, কারণ এনেধরণে চাহ-তামোল খাই আপ্যায়িত হ'বলৈ অহা গাঁওর গণ্যমান্য মানুহর সমাগম তেঁওর ঘরতে হয়।"[২২৭] রাতিরাম মজুমদারের প্রচুর জায়গাজমি রয়েছে। এই বিষয়সম্পত্তির উপর নির্ভরশীল কৃষিজীবী লোকটির সম্পূর্ণ পরিবারের দায়দায়িত্ব রয়েছে তাঁরই হাতে। রাতিরাম মজুমদারের এগারোটি ছেলে-মেয়ের মধ্যে মাত্র চারজনই জীবিত ছিল। যোগমায়া, চন্দ্রপ্রভা, রজনীপ্রভা ও ছেলে ধর্মেশ্বর। যোগমায়ার স্বামীকে রাতিরাম বাড়ির কাছে নিজের জমিতেই বাড়ি তৈরি করে দিয়ে ঘরজামাই রেখেছিলেন মেয়েকে নিজের কাছ থেকে দূরে না রাখার জন্য। বড় মেয়ে ভাতোপুরিয়ার মৃত্যু হলে নাতিনী রুক্মিণীকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন না থাকলেও এবং মেয়েদের জন্য স্কুলের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও মেয়ে চন্দ্রপ্রভা ও রজনীপ্রভার পড়াশোনার আগ্রহ দেখে তাদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য ব্যবস্থাও করেছিলেন তবে

দূরের ছেলেদের এম.ভি. স্কুলে যেতে মেয়েদের কষ্ট দেখে তিনি একটু বিচলিত হয়ে মেয়েদের পড়া বন্ধ করলেও পরবর্তীতে আবার তাদের পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তৎকালীন সমাজের ছেলে মেয়ের মধ্যে যে ব্যবধান অন্যান্যদের মানসিকতায় প্রবলভাবে ছিল তাঁর মধ্যে তেমন প্রকট হতে দেখা যায় নি উপন্যাসে। তাছাড়াও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাকে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারই করতে দেখা গেছে, পুরুষতান্ত্রিক ব্যবহার প্রকটিত হয় নি। উপন্যাসে রাতিরাম মজুমদারের বহুক্ষেত্রেই উচ্চ মানসিকতার পরিচয় রয়েছে। মেয়ে যোগমায়া বিধবা হবার পর সামাজিক শৃংখলা ভঙ্গ করে ঘনাবাবার সঙ্গে প্রেমবিবাহ করলে প্রথমে মেয়ের উপর রাগ করে সম্পর্ক না রাখলেও পরবর্তীতে মেয়েকে ক্ষমা করেছেন এবং অন্যান্য ছেলে মেয়েদের যোগমায়ার আশ্রমে যেতেও দিয়েছেন। রাতিরাম মজুমদার শিক্ষার মূল্যও বুঝতে পেরেছেন। গঙ্গাপ্রিয়ার স্বামীর প্রতি থাকা শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে লেখিকা রাতিরামের মানসিকতাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন — "গঙ্গাপ্রিয়ার মুখখন আত্মপ্রসাদত উজ্জ্বলি উঠিল, তেঁও মনে মনে স্বামী দেউতাক প্রণাম এটা করি ল'লে শিক্ষার প্রতি তেঁওর যিমানেই হেঁপাহ নাথাকক কিয়, গিরিয়েকে যদি তাত সহযোগিতা নকরি বাধাহে দি থাকিলহেঁতেন, তেন্তে তেঁও জানো খুচি মতে জীয়েকহঁতক পঢ়ুয়াব পারিলেহেঁতেন? তেঁওর পরম ভাগ্য যে এনে এজন শিক্ষার মোল বুজা, তিরোতারো শিক্ষার মোল বুজা মানুহর লগতে তেঁওর বিয়া হৈছে।"[২২৮] রাতিরাম মজুমদার ছেলে মেয়েদের যেমন ভালোবেসেছেন তেমনি তাদের দোষ দেখলে রেগে গেছেন এবং শাসনও করেছেন। তাইতো ধর্মেশ্বরের দুষ্টামিতে রেগে গিয়ে বলেছেন — "কুলাংগার, বাপেকর মুর খোয়া, দিনক দিনে তার অতপালি বাঢ়িহে গৈছে। আহক আজি সি ঘরলৈ ভালকৈ এপালি মজা দিম। মোর ল'রা হৈ সি লোকর বারীয়ে বারীয়ে আম কঠাল চুর করিবলৈ যায়। যেন মোর বারীত একো নাই। হেরৌ বদ্‌মাইচ, মোর এই যোল্ল পুরা মাটির এদিন তয়েই মালিক নহবিনে? গাঁওবুঢ়া রাতিরাম মজুমদারর একমাত্র ল'রা তই, তোর কিহর অভাব যে লোকর বারীয়ে বারীয়ে বান্দরর দরে চুর করি ফুরিব লাগে? আহ আজি তই ঘরলৈ, ভালকৈ শিক্ষা দিম —"[২২৯]

রাতিরাম মজুমদার গ্রামের লোক হয়েও দেশের সমস্ত খবরই তিনি রাখেন। তিনি খবরের কাগজের মূল্য বোঝেন এবং তাঁর মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে সব ব্যাপার নিয়ে একটি জিজ্ঞাসু মনের। তিনি মেয়ে জামাই দণ্ডীনাথ পিয়াদা কাজের জন্য নানান স্থানে ঘুরে বেড়ায় বলে তার থেকে দেশের খবর নিতে চেয়েছেন। তার কাছ থেকে ইংরাজি ভাষার খবরের কাগজ 'টাইমস্ অব আসাম' বেরোনোর ব্যাপারে খোঁজখবর করেছেন, জার্মান দেশে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার খবর নিয়েছেন। কিন্তু দণ্ডী পিয়াদা চন্দ্রপ্রভার জ্ঞানপিপাসু মনের খোরাক যোগান দিলেও শ্বশুরের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করার মত সাহস তার ছিল না। দণ্ডী পিয়াদার মতে — "শহুরেক যে এজন অতি জানাবুজা মানুহ সেই কথাত দণ্ডীর বর শ্রদ্ধা, এনেজন মানুহর আগতনো তেঁও কি করোভচহু খবরর টোপোলা মেলিব।"[২৩০]

যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অর্থসংকটের মুখে পড়েন রাতিরামও। বৃদ্ধ হয়েছেন, চাষবাসেও অশক্ত। পরিবারে অনটন দেখা দেওয়ায় গ্রামপ্রধান মুষড়ে পড়েন। রামেশ্বরী বৃত্তির টাকা থেকে কিছু টাকা পাঠায় চন্দ্রপ্রভাও তেল, মাছ, ডিম, মশলা ইত্যাদি এনে পিতার হাতে দেয়, এভাবেই চলতে থাকে তাঁদের সংসার। ছেলে ধর্মেশ্বর থেকে সংসারটিতে কোনো সাহায্যই পাওয়া যাচ্ছিল না। চন্দ্রপ্রভা দেশের কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে অতুলকে দেখাশোনা করতেন রাতিরাম ও গঙ্গাপ্রিয়াই। চন্দ্র ও অতুলকে তাঁদের কাছে রেখে নিশ্চিন্ত মনে দেশের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। সংসারের দায়িত্ব বহন করে করে শীর্ণ ক্লান্ত পিতার মুখখানি দেখে চন্দ্রর মন আর্তনাদ করে ওঠে। কিছুদিন পর রক্তবমি হয়ে রাতিরাম মারা যান। রাতিরামের মৃত্যুতে চন্দ্রপ্রভার দুঃখ অসহনীয় হয়ে ওঠে। রাতিরামের মৃত্যুতে শুধু চন্দ্রপ্রভাই বাবা হারায় নি চন্দ্রপ্রভার পুত্র অতুলও যেন আসল পিতাকে হারিয়ে ফেলে। দণ্ডীনাথ কলিতা অতুলের পিতা হলেও কোন দায়িত্বই তিনি নেন নি পিতার সব দায়িত্ব রাতিরাম মজুমদারই পালন করেছেন। রাতিরামের মৃত্যুতে চন্দ্রের জীবনে হওয়া ক্ষতির কোনদিনই পূরণ হবে না। তা চন্দ্রের অনুভূতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। চন্দ্রের চিন্তাকে লেখিকা এরূপ ব্যক্ত করেছেন — “বাপেক থকতে তাই যে কিমান নিশ্চিন্তভাবে অতুলক তেঁওর তত্ত্বাবধানত থৈ মহিলা সমিতির কামেতেই হওক বা কংগ্রেছর কামেতেই হওক, অ'ত ত'ত ঘুরি নুফুরিছিল। এতিয়া যে পরম আশ্রয়র সেইটে গছডালেই উঙাল খাই পরিল। এই বিপদটো চন্দ্রই যে কেনেকৈ চম্ভালিব ভাবি ভাবি তাইর মূর আচন্দ্রাই করে, বুকুত ধরফরণি আরম্ভ হয়।”[২৩১] এভাবেই লেখিকা একজন ব্যক্তিত্বশালী কর্তব্যপরায়ণ দায়িত্বশীল চরিত্র সৃষ্টি করেছেন উপন্যাসটিতে। রাতিরাম মজুমদারের চরিত্র আরো বেশি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে চন্দ্রপ্রভার রচিত ‘পিতৃভিটা’তে। সেখানে থাকা পিতার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিতে রাতিরামের চরিত্র বেশি করে ফুটে উঠেছে— “ ‘দশপুত্র সমকন্যা’ এই আছিল যার কন্যাবোধ, ‘কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষানিয়াতি যত্নতঃ’ এই মনুবাক্য আছিল যার সরোগত, যিজন পুরুষে বাক্যে ব্যবহারে ভুলতো কেতিয়াও ছোয়ালীক ল'রাতকৈ সরু বা অশ্রেষ্ঠ বুলি নাভাবিছিল, সেই কালে ত স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন আরু সুবিধা নথকা সত্ত্বেও যি পিতাই গাঁওলীয়া হৈও দূর প্রবাসতে থৈ কন্যাসকলক যতনেরে পঢ়াই শিক্ষা দিছিল,— যি পিতার অগাধ জ্ঞানর মই আজিও পরিমাণ করি উঠিব নোয়ারো, শিশুকালতে যার ওচরত গল্পচ্ছলে আর্থিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ করিছিলোঁ, যি আছিল ধৈর্যত ধীর, ক্ষমাত মহান, শত্রুলৈকো উদার আরু আছিল শিশুর দরে সরল, বিপদতো বীর তেজীয়ান, মোর মনত যার ওপরত শ্রেষ্ঠ নাই সেই মোর শ্রেষ্ঠ গুরু, বিদ্যানুরাগী, স্নেহময়, মহানুভব স্বর্গীয় পিতৃ দেউতা স্বর্গীয় রাতিরাম মজুমদারর শ্রী শ্রী চরণত জীয়েকর (৭ম কন্যা, দশম সন্তান) এই প্রথম প্রকাশিত কিতাপ “পিতৃভিটা” অন্তরর গভীর উক্তি - পুষ্পর পুত অর্ঘ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি রূপে নিবেদন করিলো।”[২৩২]

এভাবেই লেখিকা গ্রাম্য পরিবেশেও তুলে ধরেছেন এক জ্ঞানী গুণী ও সময়ের অগ্রগতিতে সাড়া দেওয়া এক ব্যক্তিত্বশালী প্রগতিশীল পুরুষচরিত্র যাঁর চরিত্র দৃঢ়তাই উত্তরাধিকারসূত্রে চন্দ্রপ্রভার মত ব্যতিক্রমী চরিত্র গড়তে সাহায্য করেছে।

অঞ্জলি

'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল, আকর্ষণীয় ও গতিশীল চরিত্র অঞ্জলি। কেন্দ্রীয় চরিত্র না হয়েও উপন্যাসের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করে বসে আছে এই চরিত্রটি। পরেশ কলিতার তৃতীয় মেয়ে অঞ্জলি শিক্ষিতা এবং সে মেট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে। গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে পরেশ দারোগার চাকরির জন্য শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক উচ্ছেদ করেন নি। শহরে লালিতা পালিতা অঞ্জলি বাবার পিছিয়ে থাকা রক্ষণশীল গ্রামে গিয়ে স্ত্রী শিক্ষা ও সমাজ সচেতনতা দিয়ে গ্রাম্য নারীর দুঃখ-কষ্ট তথা নারীর অবস্থানকে বিচার করেছে। অঞ্জলি অধ্যয়নশীলা, বুদ্ধিমতী, রোমান্টিক, বাকপটু এবং তার মধ্যে রয়েছে যৌবনের উদ্দীপ্ত উৎসাহ। কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ, রবার্ট ফ্রস্ট, এইচ. জি. ওয়েলসের উদ্ধৃতি দেওয়ার মধ্যে তার অধ্যয়নের বিস্তৃত পরিসর আমাদের সামনে ধরা পরে। জীবন ও জগৎকে দেখার এক নিজস্ব ভঙ্গি রয়েছে তার মধ্যে। নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা থেকেই সে মানুষের বিচার করে তাই বিমলার পটেশ্বরীকে খারাপ চরিত্র আখ্যাকে সে সমর্থন করতে পারে না। সে নিজের কামনা বাসনাকে অসামাজিক রূপে চরিতার্থ করা লোককে নিম্নমানের মনে করে।

অঞ্জলি প্রকৃতিপ্রেমী তারই সঙ্গে কল্পনাপ্রবণ। গ্রামের প্রতি রয়েছে তার দুর্বার আকর্ষণ। সে ভালোবাসে উন্মুক্ত জায়গা, নির্জনতা, দিগন্ত বিস্তৃত গ্রামের ধানের পাথার, বন জঙ্গলের শ্যামলিমা, ডাউকের করুণ ডাকে সে উদাস হয়ে যায়, গ্রামের প্রকৃতির শান্ত শ্যামল অরণ্যের শোভায় সে মাঝে মাঝে কল্পনাপ্রবণ হয়ে ওঠে। তার প্রকৃতি প্রেম অনেকাংশ বই থেকে অর্জিত বলে সে স্বীকার করে। এই গ্রাম্য প্রকৃতির ভালোবাসায় পিতার গ্রামের ঘর তৈরি করার কথা শুনে কল্পনামগ্ন হয়ে ফ্রস্টের কবিতা বলতে থাকে —

"Tree at my window, window tree
Let there be no certain dawn between you and me."[২৩৩]

রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' গল্পের মত বকুল গাছের তলায় পাকা বেদির কল্পনা করে সে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। প্রকৃতিপ্রেমী এই অঞ্জলির মনে প্রথম প্রেমের জাগরণও ঘটেছে পিতার গ্রামের বাড়ির গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যেই। গ্রামের বাড়িতে ঘুরতে গিয়ে অজানা প্রেমের আকর্ষণে চঞ্চল হয়ে উঠেছে অঞ্জলির মন। অঞ্জলির হৃদয়ে সদ্য জাগ্রত প্রেমকে লেখিকা এরূপে বর্ণনা করেছেন — "সেইবার ঢলকুছিত থকার তৃতীয় দিন পুয়া অঞ্জলি নৈর ঘাটলৈ আহি পানীত নামিবলৈ গৈ হঠাতে স্তব্ধ হৈ থমকি গৈছিল। আহিনর শেষ, কুঁয়লীরে বালি তিতি আছে, কুয়লীর পাতল বগা চাদরে নৈর ওপরখন ঢাকি রাখি এক অদ্ভুত অপার্থিব দৃশ্যর সৃষ্টি করিছে। কিন্তু প্রকৃতির সেই রহস্যময় সৌন্দর্যতকৈও অঞ্জলির বাবে তিতা বালিত এনে এক রহস্যই বাট চাই আছিল যে তার অভিনবত্ব আরু অভাবনীয়তাত অঞ্জলি পাষাণ মূর্তির দরে স্তব্ধ হৈ রৈ গৈছিল।

কুয়লীৰে তিতি থকা বালিত কোনোবাই ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰেৰে লিখি থৈছে দুটা শাৰী

তুমি কোন কাননৰ ফুল

তুমি কোন গগনৰ তৰা।

অঞ্জলিৰ বুকুৰ এক আঁজলি তেজ যেন ছলাৎকৈ উঠিল, অদ্ভুত কিবা এক আবেগ বুকু ঠেলি ঠেলি ডিঙিলৈকে উঠি আহিব খুজিলে। তুমি কোন কাননৰ ফুল, তুমি কোন গগনৰ তৰা। অসমীয়াত ৰবীন্দ্ৰনাথ। ঢলকুছি নামৰ এই পিছপৰা গাঁওখনত ক'ত এনে এজন ডেকা লুকাই আছে যি এই ধৰণৰ অভূতপূৰ্ব কাব্যিক কল্পনাৰে তাইক বন্দনা কৰিব পাৰে? ই কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? ঢলকুছিৰ দুখীয়া গাঁওলীয়া খেতিয়কৰ ল'ৰাৰ প্ৰাণত এনে কবিত্বময় আবেগৰ কেনেকৈ জন্ম হ'ব পাৰিলে? তাই সপোন দেখা নাইতো? তাই নীলকণ্ঠহঁতৰে ঘৰত শুই শুই পাগলাদিয়া পাৰৰ কোনো অবাস্তৱ কিন্তু অদ্ভুত মধুৰ সপোন দেখা নাইতো? কুঁয়লীৰে বালি তিতিছে, কুয়লীৰে অঞ্জলিৰ গাৰ কাপোৰ-কানি সেমেকি উঠিছে আৰু সেমেকি উঠিছে তাইৰ মনো। দুটোপাল মুকুতাৰ দৰে অশ্ৰু বিন্দু লাহে লাহে অঞ্জলিৰ চকুৰ পতাত টলমলাই উঠিল। সেই নিজান নৈৰ ঘাট, সেই কুয়লীৰে ঢাক খোৱা আধা এন্ধাৰ আধা পোহৰৰ মায়াসনা পৰিবেশ, সেই চৰাইৰ মধুৰ কাকলিৰ ধ্বনি আৰু সমুখৰ বালিত এই অদ্ভুত কবিতা — অঞ্জলিৰ মন বিচিত্ৰ আবেগেৰে, বিচিত্ৰ সুখ-দুখৰ অনুভূতিৰে তোলপাৰ লাগিবলৈ ধৰিলে।"[২৩৪] এভাবেই লেখিকা অঞ্জলির মধ্যে রোমান্টিকতা ছড়িয়ে দিয়েছেন। অচেনা অদেখা রোমান্টিক প্রেমে আত্মহারা অঞ্জলি সন্ধান পায় রহস্যময় প্রেমিকের। অসমীয়া অনার্সে প্রথম শ্রেণি পাওয়া বলিন চৌধুরীই সেই রহস্যময় প্রেমিক। প্রেমিকের সঙ্গে ঘর করার স্বপ্নে রঙিন হয়ে ওঠে অঞ্জলি। লেখিকার ভাষায় — "অঞ্জলিৰ মুখলৈ যেন এক আঁজলি তেজ উজাই আহিল, আৰু তাৰ পাছৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ল তাইৰ ৰাতিৰ তপস্যা, সকলো শুই পৰা নিজন স্তব্ধ ৰাতিত তাইৰ যৌবনৰ ৰঙীন সপোন। তাইতো দেউতাকহঁতৰ লগত গৈ সেই গংগাপুখুৰীৰ ঘৰত থাকিবই। কিন্তু এদিন তাতেই তাইৰ নিজা ঘৰ এখনো হৈ যাব। সেই ঘৰ ৰচনা কৰিব তাই — আৰু .... আৰু — শিহৰিত হৈ অঞ্জলিয়ে ভাবিলে — ইমান অপূৰ্বভাবে যিজন পুৰুষে তাইক প্ৰেমৰ অঞ্জলি যাচিছে — সেই পুৰুষজনে।"[২৩৫] প্রেমে বিহ্বল অঞ্জলি বাবা পরেশ কলিতার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথায় উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কিন্তু পরবর্তীতে পিতার গ্রামে ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাকে দুঃখিত করে তোলে। অঞ্জলির দুঃখকে স্বপ্ন ভঙ্গকে লেখিকা এরূপে দেখিয়েছেন — "অঞ্জলিয়ে কথাটো শুনি বিছনাত উবুৰি খাই পৰিছিল। তাৰ পাছত এটা বিৰাট ধুমুহা আহিছিল, অদৃশ্য সেই ধুমুহা অঞ্জলিৰ কাণৰ ওচৰত অনবৰত প্ৰবলভাবে সোঁ সোঁকৈ বলি থাকিছিল, সেই ধুমুহাৰ প্ৰচণ্ডতাত থাউৰিব নোৱাৰি বকুল গছডাল উভাল খাই মাটিত মুখ থেকেচা খাই পৰিছিল, সেউজীয়া ৰহণসনা ছবিৰ দৰে ঘৰটোও সেই ধুমুহাৰে জোকাৰণিত বাগৰি পৰি একেবাৰে গংগাপুখুৰীটোৰ বুকুতে আছাৰ খাই পৰিছিলগৈ আৰু তাৰ পাছত লাহে লাহে ডুব গৈ অতল তলিৰ জলকোঁওৰৰ দেশত অদৃশ্য হৈ গৈছিল।"[২৩৬] প্রেম, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের আবেগপ্রবণতায় অঞ্জলি এক উজ্জ্বল রোমান্টিক

চরিত্র হয়ে উঠেছে।

এই চরিত্রটিকে রোমান্টিক রূপে সৃষ্টি করাই লেখিকার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; চরিত্রটিকে লেখিকা বিদ্রোহী সত্তাও দান করেছেন। নারীর নানারূপ সামাজিক সমস্যা অঞ্জলির চোখে ধরা পড়েছে। সুকোমল মনের অধিকারী হলেও সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্যকে দেখে ক্রুদ্ধ স্বরে প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ব্যতিক্রমী চরিত্রের মাত্রা পেয়েছে সে। সমাজে নারী পুরুষের বৈষম্যে অঞ্জলি ব্যথিত হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর প্রতি থাকা দৃষ্টিকোণকে সে ঘৃণা করেছে ও প্রতিবাদ করেছে — "হিস্ট্রি। হিস্ট্রি। কিন্তু এই হিস্ট্রি থাকে কেবল মাইকী মানুহরহে, পুরুষ মানুহর নেথাকে। এই পটেশ্বরীর দরেই চহরত থকা তাইর সুন্দরী রেখাদিরো হিস্ট্রি আছে, কিন্তু রেখাদির সর্বনাশ করা মানুহজনর হ'লে কোনো হিস্ট্রি নাথাকিল তেওঁর সুখর সংসারখন কোনো হিস্ট্রিয়ে ধ্বংস করিব নোয়ারিলে।"[২৩৭] রেখাদি স্বামীর বন্ধুর দ্বারা ধর্ষিত হয়ে সংসার সুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছে কিন্তু রেখাদির ধ্বংস করা লোকটির সংসার নষ্ট করতে পারে নি কোনো ঘটনাই এবং তাকে দোষের ভাগীও হতে হয় নি। পুরুষশাসিত সমাজে সততা রক্ষার দায়িত্ব থাকে কেবল মেয়েদেরই পুরুষদের নয়। ক্রুদ্ধ অঞ্জলি সমাজের এই দৃষ্টিকোণকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে — "মানুহ চরিত্রবান হ'ব লাগে — দুশ্চরিত্র হ'ব নালাগে। কিন্তু সেই নৈতিক দায়িত্ব অকল তিরোতারে নহয়, পুরুষরো। কিন্তু আমার সমাজত চরিত্রহীন পুরুষে সদায় ক্ষমা পাই আহিছে। তিরোতাই পোয়া নাই।"[২৩৮] অঞ্জলির বক্তৃতা এবং কথোপকথনে আধুনিক নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। অঞ্জলি সমাজে নারীর উপর হওয়া অত্যাচার এবং বৈষম্যময় দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধিতা করেছে উপন্যাসে। সামাজিক বৈষম্যের যেভাবে বিরোধিতা করেছে একই ভাবে স্বামীর অত্যাচার ও অবমাননাকে নীরবে মেনে নেওয়া নারীর উপরও রাগ করেছে সে। রেখাদির বৃত্তান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে সে রেখাদিকে বলেছে — "মই তোমালোক বয়স হোয়া মানুহবোরক হেট্ করো, যি মানুহবোরর অন্যায়র বিরুদ্ধে থিয় দিয়ার ক্ষমতা লোপ পাই গৈছে সেই মানুহবোরক মই হেট্ করো, যি সময়ে মানুহবোরর স্পিরিটবোরক শিকলিরে বান্ধি পংগু, অথর্ব করি পেলাইছে সেই সময়কো মই হেট্ করো রেখাদি! আচলত মই এই গোটেই জগতখনকে হেট করো। তোমার কাহিনী শুনি আজি মই খঙত পাগল হৈ গৈছো। ...... রেখাদি তুমি কিয় কম্প্র'মাইজ করিবলৈ গলা। কি লাভ হ'ল তোমার রঞ্জিতবাবুর ভরি চেলেকি পরি থাকি? অৱশেষততো খেদা খালাই আরু অকল খেদা খোয়াই নহয় — ইউ হেড বিন্ রিপ্লেছ্ড্ বাই এনাদার ওমেন্! ...... রেখাদি, রেখাদি, মই হোয়া হলে পাগল হৈ গ'লোহেঁতেন, মই হোয়া হ'লে সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে কালীমূর্তি ধারণ করিব থিয় হৈ প্রচণ্ড বিদ্রোহ করিলোহেঁতেন। উস্!"[২৩৯] অঞ্জলি শুধু নারীর অপমানকেই দেখেনি অবমাননাকে অতিক্রম করার জন্য বিদ্রোহের পথকেও দেখিয়েছে।

অঞ্জলির চোখে ধরা পড়েছে সমাজে রেখা ও পটেশ্বরীর প্রতি করা পুরুষদের অন্যায়ের দিকটি এবং সমাজে তাদের শাস্তি না হওয়ার দিকটি। তাই তার সমাজের প্রতি ঘৃণা এসেছে। এই

সামাজিক বৈষম্যকে যৌবনে উদ্দীপ্তা তেজস্বী অঞ্জলি ক্ষুরধার কণ্ঠে বিরোধ করেছে — "আচলতে রেখাদির কথা মনত পরিগলেই তাইর মনটো কিবা এক অসহায় আরু নিরুপায় বেদনাত গুমরি উঠে। তাই যেন কিবা এটা করি পেলাব, কিবা এটা সাংঘাতিক কাণ্ড করি পেলাব, কিবা করি যেন ভাঙিছিঙি গুড়িকরি সকলো লণ্ড ভণ্ড করি পেলাব। কারোবার বিরুদ্ধে যেন ভীষণ বিদ্রোহ করি উঠি এই পৃথিবীঘন ছারখার করি দিব।"[২৪০] নারী পুরুষের সামাজিক বৈষম্যের মতো দুর্নীতির মূল উচ্ছেদের পথ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ হলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাকে সোচ্চার হতেই দেখা গেছে। তবে সামাজিক বৈষম্যকে দূর করার জন্য স্ত্রী শিক্ষার প্রকল্প গ্রহণ করেছে এবং পুরুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে নারীকে সজাগ করার প্রয়াস করেছে সে।

এভাবেই লেখিকা সৃষ্টি করেছেন এক কল্পনাপ্রবণ, রোমান্টিক, অন্যের প্রতি অনুভূতিপ্রবণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা সোচ্চার এক প্রতিবাদী চরিত্র। যে শিক্ষার মূল্য বুঝে নিয়ে নিজেই শিক্ষিত হয় নি অন্যান্য নারীকেও শিক্ষার দ্বারা পুরুষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সজাগ করার কথা চিন্তা করেছে। এইরূপ স্পষ্টবাদী নারী চরিত্র সৃষ্টি নিরুপমার মত ব্যতিক্রমী লেখিকার দ্বারাই সম্ভব হয়ে উঠেছে।

পুতলী

পুতলী 'অন্যজীবন' উপন্যাসের একটি সক্রিয় চরিত্র। কণদদাইটি ও রম্ভা খুরীদেওর মেয়ে পুতলী। পুতলীর পিতা তার মা রম্ভাকে জয়মতীকে দেওয়া শাস্তি থেকেও বেশি শাস্তি দিয়েছিল। একবার পুতলীর পিতা তার মাকে লাঙলে বেঁধে চাষের জমির পাশে পাকা রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। পুতলীর মা এই অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করে। পুতলীর ব্যতিক্রমী রূপ ধরা পড়েছে শহরের শিক্ষিত মেয়ে মনোজের স্ত্রী অণিমার কাছে। অণিমা পুতলীকে বলেছে — "সাধারণ ছোয়ালী বুলি কৈ তুমি বিনয় নেদেখুয়াবা পুতলী। তুমি কেনেকুয়া ছোয়ালী মই জানো, আইকণে মোক তোমার কথা কৈছে। আইন কথা বাদেই দিয়া, আমার শহুরর ঘরর গাঁওর চিরাচরিত নিয়মত ডাঙর দীঘল হোয়া ছোয়ালী এজনীক অর্থাৎ আইকণক তুমি ইমান মুক্ত আরু প্রগতিশীল মনর গঢ়ি তুলিব পারিছা কেবল সেইটোতে তোমার এক অসাধারণত্বর পরিচয় ফুটি ওলাইছে।"[২৪১] মায়ের প্রতি হওয়া অত্যাচার ও মায়ের আত্মহত্যা পুতলীর মনে গভীর ছাপ ফেলেছে। মায়ের উপর পিতার নির্মম অত্যাচার পুতলীকে সমাজবিদ্রোহী পুরুষবিদ্বেষী করে তুলেছে। আইকণদের বাড়িতে এলেও নিজের বাড়িতে যেতে পারেনি সে কারণ মায়ের উপর হওয়া অত্যাচারের কথা তার মনে পড়ে যায় এবং সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ভিতরে হওয়া যন্ত্রণার কথা পুতলী অণিমার কাছে প্রকাশ করেছে — "জানা নবৌ, প্রথম অবস্থাত মই আইকণহঁতর ঘরলৈ আহিলেও এই বারীখনলৈ আহিব নোয়ারিছিলো। মোর হৃদয় রক্তাক্ত হৈ পরিছিল, মোর মাক করা অত্যাচারবোর যেন মোর চকুর আগত জীবন্ত হৈ ভাহি উঠিছিল। মই খঙত, দুখত, আক্রোশত, হতাশাত, অসহায়তাত একেবারে পগলার দরে হৈ গৈছিলো। মোর নিঃসহায়, নিরপরাধ মাজনীর প্রতি যি বর্বর অত্যাচার চলিছিল সেই কথা যেন এই বাড়ীখনে মোক নতুনকৈ মনত পেলাই দিছিল। মার

প্রতি পুতৌত মোর অন্তরখন ভরি গৈছিল”[২৪২] — মায়ের প্রতি থাকা ভালোবাসা, আবেগ তাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে। তার বিদ্রোহী সত্তাকে লেখিকা এরূপে দেখিয়েছেন — “গতিকে অলপ বুজন হোয়াত যেতিয়া নিজর অবস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হ’বলৈ আরম্ভ করিলো — তেতিয়াই মোর মন সমস্ত পৃথিবীর ওপরত অভিমানেরে পরিপূর্ণ হৈ গ’ল। সমস্ত পৃথিবীর ওপরতে মন মতে জেহাদ ঘোষণা করিলো বিশেষকৈ পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে। তেতিয়াই মই ‘এ টেল অব্ টু চিটিজ’র মেডাম ডেফার্জে প্রতিশোধর জালখন গোঁঠার দরেকৈয়ে পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে অন্তরত শক্তিশালী বোমা এটা তৈয়ার করিবলৈ ধরিলো যিটো বোমারে সিহঁতক এনেকৈ আঘাত করিম যাতে মোর কপালর এই দাগটোর দরেই সিহঁতে আমরণ নিজর বুকুত একোটা তীব্র বেদনাময় ক্ষত বহন করিব — য’র পরা অতি সামান্য স্পর্শতো কেঁচা তেজ নিগরি ওলাব—”[২৪৩] কিন্তু লেখিকা সুকৌশলে ধীরে ধীরে পুতলীর এই মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। পুতলীর চেতনা পুরুষের শোষণের বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে পড়লে পুতলী সমাধানের পথ খুঁজেছে বই পত্রের মধ্যে। এই বই পত্রের সন্ধান করতে গিয়ে তার নরেনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বামপন্থী যুবক নরেনের সান্নিধ্যে এসে পুতলী নতুন চেতনায় দীক্ষিত হয়। মৌলবাদীদের মতো তার যে পুরুষবিদ্বেষী মনোভাব সেটির পরিবর্তন ঘটে, সে সমাজবাদী নারীবাদী হয়ে ওঠে। তাই সে আর পুরুষবিদ্বেষী হয়ে সমাজকে ধ্বংস করার কথা ভাবে না বরং পুরুষের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সমাজে নারীর অবস্থানগত দুর্দশাকে মিটিয়ে নারীমুক্তির চেষ্টা করার কথা ভাবে — “নবৌ, মই আজিকালি তেওঁলোকক ঠিক দোষারোপ করিব নোয়ারো। আমার এই পচা ঘুণে ধরা সমাজখনরেতো তেওঁলোক একো একেটা ফচল। গতিকে এই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন নোহোয়ালৈকে আমার পুরুষ প্রধান সমাজখনর পুরুষর দৃষ্টিভঙ্গি সলনি নহয়। সেয়ে এতিয়া মই বোমাটো মূল কারোণটোর বিরুদ্ধে খুঁজিবলৈহে সুসজ্জিত করিব ধরিছো। আরু সেই যুদ্ধ আমি পুরুষর লগত একেলগেহে করো।”[২৪৪] পুতলীর মানসিকতার পরিবর্তনকে লেখিকা এরূপে প্রকাশ করেছেন অণিমার সংলাপে — “সঁচায়ে আচরিত, অতি আচরিত পুতলী। তোমাক যে মই কি ঘোর পুরুষবিদ্বেষী বুলি ভাবি আছিলো। আরু তোমাক নিজর অলপ আগতে কোয়া কথাবোরেওতো তাকেই কয়। কিন্তু তোমার এনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নো কেনেকৈ হ’ল?”[২৪৫] পুতলীর এই পরিবর্তনে মনোজ অণিমাকে বলেছে — “ময়ো অলপতে গম পালো, তোমাক কোয়ার সুবিধাই পোয়া নাছিল। পুতলীর জীবনত এইটোয়ে বোধহয় সকলোতকৈ সুখর আরু ভাল ঘটনা ঘটিছে। তাই ডাঙর হৈ আহার লগে লগে যেতিয়া মাকর কথা গম পালে — ছোয়ালীজনী হেনো কিবা হৈ পরিল, কারো লগত বিশেষ মাত বোল নকরে, নাহাঁহে ঘরর কাম নকরে, কেবল এচকুত কিতাপ এখন লৈ গোমোটা হৈ বহি থাকে। মামীয়েক-মোমায়েকর গালি-শপনিত তাই হাঁহে পাখির পরা পানী জোকারি দিয়ার দরেই জোকারি দিয়ে। কিন্তু তাইর বুদ্ধি আছিল খুব চোকা, আরু বাহিরা কিতাপ-পত্রর প্রতি খুব আগ্রহ, স্কুলর লাইব্রেরীর তাই গোটেইবোর কিতাপেই পঢ়ি পেলাইছিল। সেই তেনেই কিতাপ আনোতেই বোধহয় তাই নরেনর চকুত পরিল। নরেন বাঁওপন্থী দল এটার সক্রিয় সভ্য, গতিকে

তার প্রভাবত পরিয়ে পুতলী ফেমিনিষ্ট হৈ নপরিল, সুস্থ স্বাভাবিক ছোয়ালী এজনীয়ে হৈ পরিল ..... মই ভাবিছো,"[২৪৬] মনোজের পুতলীকে এই ধরণে ফেমিনিস্ট অবস্থার থেকে সুস্থ স্বাভাবিক মেয়ে হয়ে ওঠার কথা প্রসঙ্গে গোবিন্দ প্রসাদ শর্মা এই মন্তব্য করেছেন— "গিরিয়েকর এই কথাত নারীবাদর ধারণা বিভ্রান্তিকর। দরাচলতে পুরুষ প্রধান সমাজর তিক্ত অভিজ্ঞতাই পুতলীক ফেমিনিষ্ট বা নারীবাদীহে করিলে আরু প্রগতিশীল শিক্ষক নরেনর সংস্পর্শলৈ আহার পিছতো তেওঁ নারীবাদী হৈয়েই আছে। অণিমার গিরিয়েক মনোজ ইয়াত আচলতে এইটো কথা ক'ব খুজিছে যে পুতলী মৌল নারীবাদী (Radical feminist) বা সমলিংগিনিবাদী হৈ নপরিল। নরেনর প্রভাবতে তাই দরাচলতে সমাজবাদী নারীবাদী করি তুলিলে।"[২৪৭] পুতলীও নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে ঘোষণা করেছে। মার্ক্সবাদী সমাজবাদী দলের সভ্য হয়ে মহিলাদের সঙ্গে মিলে নারী সমস্যা সমাধানের কাজে ব্রতী হয়েছে।

পুতলী বিদ্রোহিনী হলেও তার মধ্যে এক উদার সহনশীল হৃদয়ের প্রকাশ ঘটেছে। বড়দের সম্মান করার মানসিকতা তার মধ্যে রয়েছে। অণিমার শাশুড়ি পুতলীকে কটু কথা বললেও সে অণিমার শাশুড়িকে নিজের মায়ের মতো ভেবে সেগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে নিজের দৃঢ় চরিত্রের পরিচয় দিয়েছে। এমনকি মামীর গঞ্জনাকেও সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। কখনও কখনও সে হেসে হেসে বলেছে — "মামীদেউ তোমার কত কষ্ট, কত দুখ, দিন রাতি সংসারখনর বাবে খাটি মরা, কিন্তু তোমার স্বামী পুত্র কোনেও তোমার দুখ নুবুজে, বরং তোমার কর্তব্যত অলপ বিচ্যুতি হলেই সকলোবোর তোমার ওপরত গর্জি উঠে। মই তোমার এইবোর দুখ গুচোয়ার কামতহে লাগি থাকো।"[২৪৮] এগুলির মাধ্যমে সে পরিস্থিতিকে হালকা করার চেষ্টা করেছে। পুতলী পড়াশোনা থেকেও নারীর সামাজিক অবস্থানগত সমস্যার সমাধান করাতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। নিজেকে 'কমিউনিষ্ট' বলে ঘোষণা করে সমাজের পরিবর্তনের জন্য আন্দোলনের কথা বলেছে— "এদিনতেতো আরু চরকারর সলনি নহয় বা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা নহয়, গতিকে এই চরকারর তলতে থকালৈকে এই চরকারর পরাই মহিলার বাবে নানা সা-সুবিধা আদায় করার চেষ্টা করি থাকিব লাগিব, নানা দাবী পূরণর আন্দোলন করি থাকিব লাগিব।"[২৪৯]

পুতলীর পুরুষবিদ্বেষী মনোভাবের পরিবর্তন এবং পুরুষের সঙ্গে মিলে নারীর অবস্থার উন্নতির কথা চিন্তার মধ্য দিয়ে লেখিকা পুতলী চরিত্রের মধ্য দিয়ে সমাজবাদী ধ্যান ধারণাকে সমর্থন করেছেন। ব্যতিক্রমী, প্রতিবাদী, সহনশীল এবং অন্যান্য অনেক গুণের সমাবেশে সৃষ্টি হয়েছে পুতলী চরিত্রটি। একই সঙ্গে উপন্যাসের একটি পার্শ্বচরিত্র হয়েও, পুতলী হয়ে উঠেছে লেখিকার মতাদর্শগত বক্তব্যের ধারক, প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র।

গঙ্গাপ্রিয়া (গঙ্গাপুরিয়া)

'অভিযাত্রী' উপন্যাসের একটি চরিত্র গঙ্গাপ্রিয়া (গঙ্গাপুরিয়া), সে রাতিরাম মজুমদারের স্ত্রী

এবং চন্দ্রপ্রভার মা। লেখিকা এই চরিত্রকে সম্পূর্ণ গৃহকর্মরত গৃহিণী ও গড়পড়তা মায়ের আদলে সৃষ্টি করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে ছেলে মেয়ের জন্য ভালোবাসা ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা। রাতিরাম মজুমদার মেয়ে চন্দ্রপ্রভা ও রজনীপ্রভার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে মেয়ে দুটিকে স্কুলে দিলেও তাদের কষ্ট দেখে এবং অন্যদের কথা শুনে একটু বিচলিত হয়ে মেয়েদের পড়া বন্ধ করতে চাইলে গঙ্গাপ্রিয়া বাধা দিয়েছেন। স্বামী গঙ্গাপ্রিয়াকে মেয়েদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করার অভিযোগ দিলে তিনি বলেছেন — "নিজে জীবনত ক এটা পঢ়ি নাপালোঁ আরু চকু থাকিও কণা হৈ র'লোঁ। এতিয়া মই ছোয়ালীকো মোর দরে মূরুখ করি কিয় রাখিম?"[২৫০] তৎকালীন গ্রাম্য পরিবেশে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন না থাকলেও গঙ্গাপ্রিয়ার শিক্ষার প্রতি আগ্রহ আমাদের অবাক করে দেয়, তিনি শিক্ষার মূল্য বুঝতে পেরেছেন তাই বোন বিয়ের পরেও ভালুকী গ্রামের এল.পি. স্কুলের শিক্ষয়িত্রী হতে পারায় তিনি গর্ববোধ করেন। গঙ্গাপ্রিয়া এটিও আশা করেছেন মেয়েরা পড়াশোনা করে তাঁর মুখ উজ্জ্বল করবে। শিক্ষার প্রতি স্ত্রীর আগ্রহ দেখে রাতিরাম মজুমদার বলেছেন — "তোমার মুখ উজ্জ্বলাব দিয়া। তোমাক কোন ভগবানে সৃজিছিল নাজানো। ইমান পিছ পরা গাঁওর লেখাপঢ়া নজনা তিরোতা এজনী হৈ তই যে কেনেকৈ শিক্ষার মোল বুজা হলি — ভাবিলেও আচরিত মানো!"[২৫১] তিনি শুধু শিক্ষার মূল্যই বোঝেননি মেয়েদের শিক্ষাদানে প্রতিবন্ধক সমাজ তথা গ্রামবাসীর প্রতি ক্রুদ্ধ স্বরে বলেছেন — "মানুহবোরে যে এইবোর কথা ক'বলৈ আহে — তেওঁলোকে মোর ছোয়ালীক পঢ়ুয়াইছেই নে খুয়াইছেই নে আন ধরণর কিবা সহায় করিছে? সকলো চকু চরহার দল।"[২৫২] শান্ত গ্রাম্য মহিলার এরূপ প্রতিবাদ আমাদের অবাক করে দেয়। গঙ্গাপ্রিয়া মেয়েদের পড়ানোর জন্য স্বামীর সহযোগিতাকে স্বীকার করে স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে গঙ্গাপ্রিয়ার স্বামীভক্তিও প্রকাশ পেয়েছে — "গঙ্গাপ্রিয়ার মুখখন আত্মপ্রসাদত উজ্বলি উঠিল, তেঁও মনে মনে স্বামী দেবতাক প্রণাম এটা করি ল'লে। শিক্ষার প্রতি তেঁওর যিমানেই হেঁপাহ নাথাকক কিয়, গিরিয়েক যদি তাত সহযোগিতা নকরি বাধাহে দি থাকিলেহেঁতেন, তেন্তে তেঁও জানো নিজ খুচি মতে জীয়েকহঁতক পঢ়ুয়াব পারিলেহেঁতেন? তেওঁর পরম ভাগ্য যে এনে এজন শিক্ষার মোল বুজা, তিরোতারো শিক্ষার মোল বুজা মানুহর লগত তেওঁর বিয়া হৈছে।"[২৫৩]

স্নেহশীল গঙ্গাপ্রিয়ার মাতৃত্বও ছিল প্রখর তাই সংসারের সর্বপ্রকার কাজকর্মের মধ্যেও ছেলে মেয়েদের খাবার দাবারের খবর নিয়েছেন, নাতিনী রুক্মিণীকে স্নেহ ভালোবাসায় আঁকড়ে রেখেছেন। মেয়ে জামাই দণ্ডী পিয়াদা এলে তাকে আদর যত্ন করেছেন, সে কি খাবে না খাবে তার খবর রেখেছেন এবং যোগাড় করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন। কাজকর্মের মাঝে মাঝে তাঁত বোনার কাজও তিনি অব্যাহত রেখেছেন। শিক্ষার মূল্য বুঝে মেয়ে চন্দ্রপ্রভাকে শিক্ষাদান করলেও অন্যান্য মায়েদের মতো মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতেও দেখা গেছে তাঁকে। চন্দ্রপ্রভার ভাগ্য নিয়ে অনুতাপ করে দণ্ডী পিয়াদাকে বলেছেন — "বিয়া দিয়ো তাইক বিয়া নিদিয়ার দরে হল। আচলতে তাইর দরে ছোয়ালীক আমার বিয়া দিয়াই ভুল হৈছিল — আচলতে মোর কপালত ছোয়ালীর সুখর সংসার দেখার ভাগ্য নাই .... তোমাক আরু কি কম বাপা,"[২৫৪] চন্দ্রপ্রভার সাহস ও কার্যকলাপ

তাকে চিন্তিত করেছে, তাইতো দণ্ডী পিয়াদা গ্রামের অন্যান্য মেয়ের থেকে চন্দ্র আলাদা বললে তিনি বলেছেন — "জানো বাপা, ছোয়ালী মানুহর ইমান মরসাহ ভাল হয়নে নহয়। মোর কিন্তু তাইর বাবে মনত সদাই দুশ্চিন্তাই লাগি থাকে।"[২৫৫] তিনি চন্দ্রর পরিশ্রম দেখে শারীরিক কষ্ট দেখে দুঃখিত হয়েছেন এবং বলেছেন — "অকয়া গাঁওত তাই সঁচাকৈয়ে ছোয়ালীর পাঠশালা স্কুল পাতিয়ে পেলালে। সেই কেইদিন তাই যি হাড়ভাঙা পরিশ্রম করিলে ইমান কোমল বয়সর ছোয়ালী এজনীর কারণে সম্ভব বুলি ভাবিবই নোয়ারি। ঘুরি ঘুরি শরীর মাটি করি পেলালে, অকয়ার এনে এখন ঘর নাই যিটো ঘরলৈ তাই যোয়া নাই; ছোয়ালীক কিয় পঢ়াব লাগে, কিয় লরাতকৈ তল বুলি ভাবিব নালাগে — ছোয়ালীর শিক্ষা নহ'লে দেশ আগবাঢ়িব নোয়ারে— কংগ্রেছী নেতার দরে তাই বোলে চরিওফালে এই 'বক্তিতা' মারি ফুরিছিল। পিতাকে এইবোর কথা গৌরব করি কয়, কিন্তু তাতো মোক কিবা ভয়ে খুলি খুলি খায়—"[২৫৬] গঙ্গাপ্রিয়ার বক্তব্যে মাতৃত্বের গভীরতা স্পষ্টতর। মেয়েকে নিয়ে মেয়ের ভবিষ্যতকে নিয়ে চিন্তাশীল মাতৃহৃদয়েরই প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসে।

স্বামী গৃহত্যাগী চন্দ্রপ্রভার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দেখে এবং চন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্রের হাতে দিতে না পারায় নিজের অক্ষমতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন দণ্ডী পিয়াদার কাছে। চন্দ্র স্কুলে যাবার সময় তার কপালের ফোঁটা ও তাকে দেখে গঙ্গাপ্রিয়ার ভাবনাকে লেখিকা দেখিয়েছেন — "তেতিয়া জীয়েকর সেই মনোহারিণী মূর্তিটোলৈ চাই মাক গঙ্গাপ্রিয়ার এটা হুমুনিয়াহ ওলাইছিল। কপালর রঙা ফোঁটাবারে বগা সুগঢ়ী মুখর ছোয়ালীজনী যেন পুয়ার এই সূর্যটোর দরেই প্রখর হৈ জিলিকিছে। গাঁওর সকলো ছোয়ালীতকৈ বেলেগ এই ছোয়ালীজনীর কপালর ফোঁটটো বারু আইন বিয়া দিয়া ছোয়ালীবোরর দরে, বাধ্য সুশীলা গৃহলক্ষ্মীর দরে কিয় জিলিকি নাথাকিল? চন্দ্রই কিয় আন দহজনী ছোয়ালীর দরে সংসার করি খাব নোয়ারিলে? আচলতে দোষটো বারু তেওঁলোকরেই নেকি যে চন্দ্রক তাইর উপযুক্ত পাত্রত গতাবলৈ তেওঁলোক সমর্থ নহ'ল? সেইবাবেই তাই সেই পুতলার সংসারখন ত্যাগ করি গুচি আহিল।"[২৫৭] গঙ্গাপ্রিয়া শুধু মেয়ে চন্দ্রপ্রভার জন্যই চিন্তা করেন নি নাতি অতুলের জন্যও তাঁকে চিন্তা করতে দেখা গেছে। দৈশিঙরী গ্রাম থেকে চার মাইল দূরে কলজিপারার স্কুলে চাকরিতে যাবার সময় অতুলকে সঙ্গে নেওয়া দেখে ও অতুলের কষ্টের কথা ভেবে তিনি বলেছেন — "এই আপার চানাটোক লৈ ইমানদূর বাট গৈ স্কুল করিব ওলাইছ বুজি নাপাওঁ। নিজেতো কষ্ট খাবি খাবিয়েই, বাচাটোক কষ্ট দিবি।"[২৫৮] এর মধ্যে গঙ্গাপ্রিয়ার স্নেহশীল মনের প্রকাশ পেয়েছে। তারই সঙ্গে অতুলের খাবারের খবর নিতেও দেখা যায় তাঁকে। মায়ের কথা না শুনে চন্দ্রপ্রভা অতুলকে সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলে গঙ্গাপ্রিয়া বলেছেন — "তার খোয়াখিনি লৈছতো?"[২৫৯]

চন্দ্রপ্রভা ও অতুল স্কুলে চলে গেলে রাতিরাম ও গঙ্গাপ্রিয়া চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থেকেছেন বহু সময় এবং গঙ্গাপ্রিয়া মনে মনে ভেবেছে "মোর যে ছোয়ালীকেইজনীর কপালত বিধাতাই ইমান দুখ লেখি পঠাইছিল—।"[২৬০] চন্দ্রপ্রভার থাকার ব্যবস্থা কালজিরাপারার গোপীনাথ মেধির বাড়িতে হয়ে গেলে চন্দ্রপ্রভার গৃহত্যাগের কথায় গঙ্গাপ্রিয়াকে ব্যাকুল হতে দেখা গেলেও মেয়ের কষ্টের

কথা ভেবে সে নিজেকে সংযত করার মধ্য দিয়ে মেয়ের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের প্রকাশ ঘটিয়েছে। "আপীর পরা মোর কপালত সুখ লেখা নাছিল। সকলোতকৈ দুখ খাব লগা হ'লো চন্দ্রটোর পরাই। এতিয়া তাইতো যাবই, চলিটোকো বুকু শুদা করি লৈ যাব। কিন্তু যাব নিদিওঁ বুলিয়েই বা আমি কেনেকৈ কওঁ! কত কষ্ট হৈছে তাইর।"[২৬১] এভাবেই নিরুপমা বরগোহাঞি একটি মাতৃহৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। এক স্নেহময়ী, করুণাময়ী গ্রাম্য নারীচরিত্রের রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন নিরুপমা চরিত্রটির মধ্যে।

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাসে চরিত্রায়ণ : তুলনার দর্পণে

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি দুই লেখিকাই নারীর পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাকেই প্রধান করে দেখেছেন উপন্যাসের মধ্যে। তাই তাদের রচনায় নারী চরিত্রগুলিই বেশি বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ পেয়েছে। পুরুষ চরিত্র থেকে নারী চরিত্রগুলিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে দুজনেরই কথাবিশ্বে।

আশাপূর্ণার উপন্যাসের দুই একটি পুরুষ চরিত্র যেমন — রামকালী, ভবতোষ মাস্টার, তেমনই নিরুপমার উপন্যাসের দুই একটি পুরুষ চরিত্র যেমন — রাতিরাম মজুমদার, নরেন মাস্টার ছাড়া তেমন কোনো বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্র আমাদের চোখে পড়ে না।

আশাপূর্ণার প্রধান নারী চরিত্র যেমন সত্যবতী ('প্রথম প্রতিশ্রুতি'), সুবর্ণলতা ('সুবর্ণলতা') চরিত্রগুলিকে লেখিকা প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি রূপে সৃষ্টি করেছেন তেমনি নিরুপমার অণিমা ('অন্যজীবন'), চন্দ্রপ্রভা ('অভিযাত্রী') কেও প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি রূপেই গড়ে তুলেছেন। তবে দুই লেখিকার উপন্যাসেই পার্শ্ব নারীচরিত্রের মধ্যেও প্রতিবাদী সত্তা লক্ষিত হয়েছে যেমন আশাপূর্ণার উপন্যাসে সারদা ('প্রথম প্রতিশ্রুতি'), পারুল ('সুবর্ণলতা'), শম্পা ('বকুলকথা') তেমনি নিরুপমার পুতলী ('অন্যজীবন'), আইকণ ('অন্যজীবন'), অঞ্জলি ('ইপারর ঘর সিপারর ঘর') চরিত্রগুলি।

আশাপূর্ণা কিছু কিছু চরিত্রকে অধ্যয়নশীল করে এঁকেছেন, কিন্তু নিরুপমার উপন্যাসে বহু চরিত্রই অধ্যয়নশীল। আশাপূর্ণার লেখায় প্রধান নারী চরিত্রগুলির চেতনাগহনের বিশ্লেষণের প্রবণতা কম। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নাটকীয় সংলাপে চরিত্রগুলি স্বয়ংপ্রকাশ হয়ে উঠেছে। কম বেশি এই লেখিকার চরিত্রগুলি একমাত্রিক ও সরলগোত্রের ফ্ল্যাট চরিত্র। নিরুপমা শুধু ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চরিত্র গড়েন না। নাটকীয় পদ্ধতির পাশাপাশি তাঁর শিক্ষিত চরিত্রগুলির গহন অন্তঃপ্রদেশে ডুব দিয়ে চরিত্রের আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব সংঘাতের আভাস দিয়েছেন লেখিকা। তাই চরিত্রগুলি নানামাত্রিক ও জটিল গোত্রের।

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি দুজনেই বিংশ শতাব্দীর শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। দুজনেই আপন আপন দৃষ্টিকোণ দিয়ে সমাজকে ও জীবনকে দেখেছেন এবং উপন্যাসে তাঁর প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি দুজনেই নাগরিক পরিবেশে বড় হলেও আশাপূর্ণা

অন্তঃপুরের গণ্ডিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের বিশেষ সুযোগ পান নি অপরপক্ষে নিরুপমা কর্মসূত্রে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের অবকাশ পেয়েছেন। আশাপূর্ণা যেহেতু অন্তঃপুরের গণ্ডিকেই দেখেছেন তাই তাঁর চরিত্রগুলিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই অন্তঃপুরের গণ্ডি থেকেই বিচার করতে দেখা গেছে। তিনি মধ্যবিত্ত অন্তঃপুরের প্রতিনিধি করেই গড়ে তুলেছেন চরিত্রগুলিকে। তবে যেহেতু তিনি অন্তঃপুরকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন তাই তাঁর চরিত্রগুলিতে ফুটে ওঠা অন্তঃপুরচারী নারী চরিত্রের আর্তনাদ আমাদের স্পর্শ করেছে অনেক বেশি; তাই তারা হয়ে উঠেছে জীবন্ত মূর্তি। অপরদিকে নিরুপমা বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের সঙ্গে যোগ হেতু সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে তিনি তাঁর উপন্যাসের চরিত্র নির্বাচন করেছেন। নিরুপমা নাগরিক সভ্যতায় বড় হলেও গ্রাম্যজীবনের প্রতি আসক্তি হেতু গ্রাম্য জীবনের নারীর বিভিন্ন ঘরোয়া ও সামাজিক সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছেন চরিত্রের বয়ানে। তবে তিনি নাগরিক জীবন থেকে উঁকি মেরে গ্রাম্য নারীর জীবনকে দেখার প্রয়াস করেছেন। নাগরিক সভ্যতায় লালিত পালিত হলেও, দূর থেকে গ্রাম জীবনকে উপলব্ধি করলেও চরিত্রগুলির রূপদানে কোনোপ্রকার ফাঁকি আমাদের চোখে পড়ে নি। নিরুপমা বৃহত্তর সমাজ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হেতু চরিত্রগুলি সমাজ জীবনের বৃহত্তর পরিবেশের নানা স্থান থেকে তুলে এনেছেন এবং চরিত্রগুলির চেতনাগহনের চিন্তাধারা ভাবনা আশাপূর্ণার মতো পারিবারিক গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তাই চরিত্রগুলির মধ্যে পারিবারিক সমস্যা ছাড়াও সমাজ পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাও আলোড়ন তুলেছে, আগের আলোচনায় আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

আশাপূর্ণা দেবীর নারীচরিত্র যেমন সত্যবতী, সুবর্ণলতা, পারুল ও বকুল এর মধ্যে মানসিকতায় অমিল থাকলেও গুণগত দিক থেকে মিল রয়েছে। সব কয়টি চরিত্রই নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতন তবে সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও পারুল চরিত্রগুলির মধ্যে প্রতিবাদী সত্তা দান করলেও বকুল চরিত্রটিকে প্রতিবাদী রূপে সৃষ্টি করেন নি। তবে প্রত্যেকটি চরিত্রকেই কার্যকলাপ, মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন লেখিকা। অপরদিকে নিরুপমা বরগোহাঞিঃ বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে নারী চরিত্রগুলি নিয়ে এলেও মানসিক গঠনের দিক থেকে চরিত্রগুলির মধ্যে কিছু মিল দেখা যায়। চরিত্রগুলিকে লেখিকা মানবতাবাদী ও নারীবাদী রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতী চরিত্রটির সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে নিরুপমা বরগোহাঞির 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের চন্দ্রপ্রভার মিল দেখা যায়। দুজনেই সাহসী, স্পষ্টবাদী ও নারীবাদী ভাবাপন্ন। উভয় চরিত্রকেই প্রতিবাদী, নারীপুরুষের সামাজিক ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন ও প্রয়োজনে প্রতিবাদমুখর হতেও দেখা গেছে। নেড়ু নারায়ণ পুজো ছেলেদের কাজ বললে সত্য ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠেছে — "হ্যাঁ, বলেছে ভগবান তোর কান ধরে। ভগবান কখনও অমন একচোখো নয়। ওসব বেটাছেলেরাই সৃষ্টি করেছেন।"[২৬২] পুণ্যি বিদ্যা শিখলে মেয়েদের পাপ হবে

বললেও সে প্রতিবাদের সুরে বলে উঠেছে — "কেন, পাপ হবে কেন? মেয়েমানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ শাপমন্যি করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয়? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না?"[২৬৩] একই সুর শুনতে পাওয়া যায় চন্দ্রপ্রভার বয়ানে। বোন রামেশ্বরীকে সে বলেছে — "মতা চলি হ'লে ডাক্তারি পঢ়িব পায়, আপী হ'লে নাপায়? কোন ভগবানে বা বিধান দিছে। তই ডাক্তার হ'বই লাগিব, মতা মানুহবোরক দেখুয়াই দিব লাগিব যে সিহঁতে করা সকলো কাম আমিও করিব পারোঁ, আমাক কেবল সুবিধা দিব লাগে।"[২৬৪] ছেলেদের মতো করেই স্কুলে তাদের মারলে তা নিয়ে চন্দ্রপ্রভার বোন রজনীপ্রভা দুঃখ প্রকাশ করলে বোনের বিভেদসূচক দৃষ্টিভঙ্গিকে খণ্ডন করে চন্দ্রপ্রভা বলেছেন — "তয়ো দেখোন আন সকলোবোরর ল'রা লরাই, ছোয়ালী ছোয়ালীয়েই — এনেবোর কথা ক'ব ধরিছ — অলপ আগতে এই কথার বিরুদ্ধেই কোয়া নাছিলানে? আচলত এইবোর ভাব আমার মনত এনেকৈ সোমাই গৈছে যে তাক সহজে আঁতর করা টান।"[২৬৫]

ঊনবিংশ শতকের সত্যবতী ও বিংশ শতাব্দীর চন্দ্রপ্রভা উভয়েই সমাজে নারী পুরুষের সমানাধিকার স্থাপনে তথা নারীর উন্নতির জন্য বিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছে। সত্য সুবর্ণকে বলেছে — "বিদ্যেই আসল, বুঝলি? মেয়েমানুষের বিদ্যে-সাধ্যি নেই বলেই তাদের এত দুর্দশা! .... তাই তাদের সবাই হেনস্থা করে। আর যে-সব মেয়েমানুষরা বিদ্যে করেছে, করতে পেরেছে, বিদূষী হয়েছে? .... কত গৌরব তাদের — কত মান্য সেই মান্য, সেই গৌরব তোরও হবে।"[২৬৬] চন্দ্রপ্রভাও এই সত্য উপলব্ধি করে বলেছেন — "বিদ্যাই মানুহক জ্ঞান দিয়ে, বিদ্যাই মানুহর বহুত কথাত চকু মুকলি করে।"[২৬৭] সে তার বোন রজনীপ্রভাকে বলেছে — "আমি যদি লেখাপড়া নিশিকোঁ, গাঁয়র অন্য তিরীবোরর দরেই আমারো গরু পশুর জীবন হব।"[২৬৮]

সত্যবতী ও চন্দ্রপ্রভা দুজনেই নারীর অধিকারহীনতা নিয়ে প্রতিবাদ করলেও দুজনের প্রতিবাদের স্বরূপের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়েছে। সত্যবতী সামাজিকভাবে প্রতিবাদ না করলেও নিজের জীবনেও প্রতিবাদী সত্তাকে অব্যাহত রেখেছে। তাই স্বামী না চাইলেও স্বামীকে না জানিয়ে ভবতোষ মাস্টারের প্রতিষ্ঠিত 'সর্বমঙ্গল বিদ্যাপীঠে' পড়াতে গেছে, এমনকি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নবকুমার সত্যর অজান্তে মেয়েকে অল্পবয়সে বিয়ে দিলে তার প্রতিবাদে স্বামীর সংসার ত্যাগ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা যায় নি সত্যকে। তবে স্বামীর অস্তিত্বকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতেও তাকে কখনও দেখা যায় নি, তাইতো গৃহত্যাগের পূর্বে রক্ষণশীল মনোভাব লক্ষিত হয়েছে সত্যবতীর স্বামী নবকুমারকে প্রণাম করার মধ্য দিয়ে।

অপরদিকে চন্দ্রপ্রভা নারী পুরুষের বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নারীর উন্নতির জন্য স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন। নারীর উন্নতির কল্পে, সামগ্রিকভাবে নারীর উন্নতির জন্য মহিলা সমিতি গঠন করার মধ্য দিয়ে গঠনমূলক কাজ করেছেন এবং জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে

প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নারী শিক্ষার বার্তা, অবৈধ সন্তানের জন্মদান, সমাজের অপবাদ সহ্য করা, জাতপাতের উত্তরণের মানসিকতা নিয়ে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠলেও নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করতে তাকে দেখা যায় নি। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব পোষণ করেছেন তিনি। চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথকে ভালোবেসেছেন ও অবৈধ সন্তানের জননী হয়েছেন কিন্তু দণ্ডীনাথের প্রেমের প্রতারণার তিনি প্রতিবাদ করেন নি। বরং সারা জীবন দণ্ডীনাথের নামে সিঁদুর পরেছেন এবং দণ্ডীনাথের মৃত্যুর পর সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছেন। দণ্ডীনাথের উপর কোনো কোনো সময় অভিমান করলেও, তাকে দোষারোপ করলেও তাঁর হৃদয়ের প্রেমের কোন ঘাটতি হতে দেখা যায় নি এবং দণ্ডীনাথ প্রেরিত সামান্য কিছু টাকাও তাকে গ্রহণ করতে দেখা গেছে।

সত্য ও চন্দ্রপ্রভার ব্যতিক্রমী হওয়ার মধ্যে দুজনেরই পিতার যথেষ্ট অবদানের আভাস দিয়েছেন দুই লেখিকা। সত্যর পৃষ্ঠবল যেমন রামকালী তেমনি চন্দ্রপ্রভার পৃষ্ঠবল ছিলেন পিতা রাতিরাম মজুমদার। সত্য যেমন জীবনের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিতাকে জানিয়ে এবং গৃহত্যাগ করার পর পিতার সঙ্গে কাশীতেই থেকেছে তেমনি চন্দ্রপ্রভাও পিতার মৃত্যুতে নিঃসঙ্গ বোধ করেছেন কারণ তাঁর পিতাই ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠবল। পিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েই চন্দ্রপ্রভা লিখেছেন ‘পিতৃভিটা’ উপন্যাসটি।

আশাপূর্ণা দেবী সুবর্ণকেও প্রতিবাদী রূপেই সৃষ্টি করেছেন। তবে বকুলকথার বকুলকে আমরা প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি রূপে পাই না। সত্যবতী ও সুবর্ণরা যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেছিল সে মুক্তি বকুল অনায়াসেই পেয়ে গেছে, হয়তোবা সে কারণেই তার প্রতিবাদী সত্তা বেশি প্রকট হয় নি। কিন্তু অনামিকা দেবী হয়ে বকুল পদে পদে অনুভব করেছে মা দিদিমারা যে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে নিজেদের জীবনকে বিলীন করে দিয়ে সেই মুক্তির স্বেচ্ছাচারী অপপ্রয়োগকে। অলকা, সত্যভামারা স্ত্রী স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করছে দেখে বকুল ওরফে অনামিকা দেবী প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়েছেন, হয়তোবা লেখিকা অনামিকা দেবীর অন্তরালে পরোক্ষভাবে উগ্র আধুনিকতাকে নীরবে সমালোচনা করেছেন। তাই লেখিকা অলকা, সত্যভামা, রেখা ইত্যাদি চরিত্রকে উগ্র আধুনিক করে গড়ে তুলেছেন। আশাপূর্ণা দেবী নারীর মুক্তি চেয়েছিলেন, অবহেলার অবসান চেয়েছিলেন কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতাকে চান নি কখনও। অপরদিকে নিরুপমার কোনো চরিত্রের মধ্যেই অন্তঃপুরের দাহ, কিংবা উগ্র আধুনিকতা লক্ষ করা যায় না, তাঁর নারীচরিত্রের মধ্যে নারীর সামূহিক সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অণিমা, পুতলীরা নারীবাদের সমর্থন করেছে, প্রথমে তারা উগ্র নারীবাদ তথা মৌলবাদকে সমর্থন করলেও পরবর্তীতে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে তারা মার্ক্সবাদী তথা সাম্যবাদী নারীবাদের সমর্থক হয়ে উঠেছে। লেখিকার সৃষ্ট চরিত্র পুতলী নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে ঘোষণা করেছে। এর মধ্য দিয়ে নিরুপমা বরগোহাঞি মার্ক্সবাদী নারীবাদের সমর্থনই করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’র সত্যর মা ভুবনেশ্বরী এবং অভিযাত্রীর চন্দ্রপ্রভার মা

গঙ্গাপ্রিয়ার মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই মাতৃত্বের আদিকল্পে গড়া স্নেহময়ী ও করুণাময়ী রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছেন। ভুবনেশ্বরী যেমন সত্যর দুরন্তপনার জন্য সত্যর ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত তেমনি গঙ্গাপ্রিয়ার চন্দ্রপ্রভা মেয়ে হয়েও অতিরিক্ত সাহস দেখানোর জন্যে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সারা জীবন চিন্তা করেছেন। তবে দুজনের মধ্যে একটি তফাৎও রয়েছে। ভুবনেশ্বরী বিদ্যার মূল্যকে অনুভব করতে পারেন নি। তাই মেয়ের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ তাকে চিন্তিত করেছে। কিন্তু গঙ্গাপ্রিয়া গ্রাম্য শিক্ষাদীক্ষাহীন নারী হয়েও শিক্ষার মূল্যকে অনুভব করেছেন এবং মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন।

অধ্যয়নশীলতার দিক থেকে সুবর্ণ ও অঞ্জলি চরিত্রদুটির মিল রয়েছে। দুজনেই অধ্যয়নশীল। সুবর্ণ অনেক বই পড়েছে। অঞ্জলিও অনেক বইপত্র পড়ে এবং কথায় কথায় বই থেকে উদ্ধৃতি টেনে কথা বলে। নিরুপমার উপন্যাসের অঞ্জলি তথা অণিমাকে সাহিত্য থেকে জীবনী রস আহরণ করতে দেখা গেছে। তবে আশাপূর্ণার নারীচরিত্রকে এভাবে বিশ্বসাহিত্য থেকে জীবনরস আহরণ করতে দেখা যায় নি।

আশাপূর্ণার কোনো চরিত্রের মধ্যে তেমন রোমান্টিকতা লক্ষ্য করা যায় না। বকুলকথায় বকুল নির্মলের প্রেমে পড়লেও সেই প্রেম প্রকাশ্যে আনার সাহস তার হয় নি। শম্পা চরিত্রটির মধ্যে প্রেমিকা সত্তার কিছু আভাস তিনি দিয়েছেন এবং শম্পা প্রেমবিবাহ করেছে। কিন্তু নিরুপমা বেশিরভাগ চরিত্র যেমন অণিমা, অঞ্জলি, চন্দ্রপ্রভাকে রোমান্টিক করে গড়ে তুলেছেন। তারা শুধু রোমান্টিকই নয়, তাদের প্রেমবিবাহও হয়েছে। যদিও চন্দ্রপ্রভার প্রেমবিবাহ সামাজিক মর্যাদা পায় নি। তাছাড়াও 'অভিযাত্রী'র যোগমায়া, রজনীপ্রভারও প্রেমবিবাহ হয়েছে। যোগমায়াতো বিধবা বিবাহেরও উদাহরণ বহন করে এনেছে। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর'-এর পটেশ্বরীর প্রেম করে পূজনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে এবং অন্যজীবন'-এর পুতলীও নরেন মাস্টারকে ভালোবেসেছে।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে আমরা এলোকেশী, মুক্তকেশী ও মোক্ষদার মত উপনিবেশগ্রস্ত মানসিকতার নারীচরিত্রও পাই, যারা তাদের জীবনকে অতিবাহিত করেছে পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক রূপে। নিরুপমার উপন্যাসে পুরুষতন্ত্রের আদলে গড়ে ওঠা নারীচরিত্র আমাদের চোখে পড়ে না।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে প্রবোধচন্দ্রের মত অত্যাচারী পুরুষ চরিত্রকে যেমন পাই তেমনি নিরুপমার উপন্যাসেও রম্ভার স্বামী কণদদাইটির মত অত্যাচারী পুরুষকে নিয়ে এসেছেন লেখিকা। তবে রম্ভার মত নির্মম অত্যাচার ভোগ করা কোন চরিত্রই আমরা আশাপূর্ণার উপন্যাসে পাই না এবং কোনো চরিত্রকে আত্মহত্যাও করতে দেখা যায় নি।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে 'বকুলকথা'র নির্মল চরিত্রটির সঙ্গে নিরুপমা বরগোহাঞির 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের দণ্ডীনাথ কলিতা চরিত্রটির বাহ্যিক মিল রয়েছে। নির্মলের মধ্যে তার ও বকুলের প্রেমকে বিবাহ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মতো দৃঢ়তা দেখা যায় নি। সে বকুলকে বিয়ে না করলেও সারা

জীবন ভালোবেসেছে এবং স্ত্রীর কাছেও বকুলের প্রেমকে প্রথম প্রেমের স্বীকৃতি দান করেছে। অপরদিকে নিরুপমার ‘অভিযাত্রী’ উপন্যাসেও দণ্ডীনাথ কলিতা জাতপাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে পিতা মাতার ইচ্ছার বিরোধিতা করে চন্দ্রপ্রভাকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিলেও সারাজীবন চন্দ্রপ্রভাকে ভালোবেসেছে অধিকার খাটিয়েছে এবং স্ত্রীর কাছে চন্দ্রপ্রভা ও অতুলের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে।

আশাপূর্ণার কোনো চরিত্রের মধ্যে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের জন্য কোনোরূপ দুর্বলতা দেখতে পাই না এমনকি লেখিকা অনামিকা দেবীর মধ্যেও আমরা প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের প্রতি দুর্বলতা দেখতে পাওয়া যায় নি। নিরুপমা বরগোহাঞির সৃষ্ট চরিত্র চন্দ্রপ্রভার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের প্রতি দুর্বলতা লক্ষ করে থাকি।

আশাপূর্ণার সত্য ও সুবর্ণ দুজনেই পরাধীনতার গ্লানিকে অনুভব করেছে, দেশের স্বাধীনতা কামনা করেছে কিন্তু তারা কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে নি। কিন্তু নিরুপমার উপন্যাসে চন্দ্রপ্রভা চরিত্রটি স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেছেন, স্বেচ্ছাসেবী দলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে গেছেন এবং মহিলা সংগঠনের দলনেত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন। দেশের ও দশের কাজের জন্য সংসারের দায় দায়িত্বকে অবহেলাও করতে তাঁকে দেখা গেছে। এমনকি পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের আগেই দেশের কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন।

সত্যবতীর পিতা রামকালীর কাশীবাসের কথায় সত্য দুঃখিত হয়েছে, মায়ের মৃত্যুর পর মায়ের প্রতি করা উদাস মনোভাবের জন্য দুঃখ পেয়েছে। মায়ের মৃত্যুর পর সত্যর কাছে বার বার ভেসে উঠেছে ঘোমটায় আবৃত মায়ের মুখ। তেমনি চন্দ্রপ্রভাও পিতার মৃত্যুর পর নিজেকে একা মনে করেছেন, নিঃসঙ্গ মনে করেছেন, এবং পিতার শ্রাদ্ধের আগেই দেশের কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে পিতার মৃত্যুশোকের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের ব্যথাকাতর মুখের ছবি তাঁর সামনে ভেসে উঠেছে এবং তারই সঙ্গে বহন করে আনা দুঃখ তাঁকে আরও বেশি বেদনাবিধুর করে দিয়েছে। এভাবেই দুই লেখিকা নিজ নিজ সমাজ সংস্কৃতির প্রেক্ষিত থেকে বিভিন্ন চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন তাঁদের উপন্যাসের বক্তব্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে। আশাপূর্ণা দেবীকে তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন — “আমি চরিত্রই প্রধানত ভাবি। তারপরে চরিত্রটির পরিপ্রেক্ষিতে ঘটনাগুলো একটু একটু ভেবে নিয়ে সাজাতে চেষ্টা করি। অনেক সময় ভাবনার বাইরেও চলে যায় ঘটনাগুলো চরিত্রটাকে ঠিক রাখতে অনেক সময় যে ঘটনাগুলো ভাবি সেগুলো হয়তো অনেক বদলে যায়। এক সময় মনে হয় যে ওদের নিয়ন্তা আমি নই ওরা আপন-ইচ্ছায় নিজের পথে চলে যাচ্ছে।”[২৬৯]

অপরদিকে নিরুপমা বরগোহাঞি তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে এবং চরিত্রের সান্নিধ্যে তিনি এসেছেন সেগুলিকেই তার উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। তাঁর জীবনে যে সমস্ত চরিত্রগুলির সংস্পর্শে তিনি এসেছেন সেই চরিত্রগুলি ও তাদের জীবনের ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন নামে তাঁর গল্প ও

উপন্যাসে স্থান পেয়েছে বলে তিনি আত্মকথার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালার ১৬.০৩.১৩ বর্তমান প্রতিবেদক এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি ‘অন্যজীবন’ উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছেন যে এটি সত্যনির্ভর কাহিনি এবং কল্পনার পরিমাণ খুবই অল্প। নিরুপমা বরগোহাঞি বলেছেন যে তাঁর শ্বশুরবাড়ি ঢকুয়াখানায় তাঁর খুড়শাশুড়ির উপর হওয়া অত্যাচারই তাঁকে ‘অন্যজীবন’ উপন্যাস লেখার প্রেরণা দিয়েছে। তাঁর খুড়শাশুড়ির স্বামী নির্মমভাবে তাকে মেরে বেঁধে পাকা রাস্তা দিয়ে ছেচরিয়ে নিয়ে যায়। নির্মম অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাঁর খুড়শাশুড়ি ছিপজড়ী দিয়ে আত্মহত্যা করেন। খুড়শাশুড়ির চরিত্রটিই রম্ভা খুরীদেউ রূপে এসেছে ‘অন্যজীবন’ উপন্যাসে। তাই বলা যায় নিরুপমার উপন্যাসে চরিত্রগুলি আসে ঘটনার বাহক রূপে। তিনি আগে থেকে কোনো চরিত্র ভেবে উপন্যাস রচনা করতে বসেন না। আবার চরিত্রকে মাথায় রেখে ঘটনাপ্রবাহকে সাজিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী। সত্য কিংবা সুবর্ণর সংগ্রামকে তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ফলে এদের কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা গেঁথেছেন তিনি। অপরদিকে নিরুপমা দেশ কাল পরিবেশের বাস্তবতাকেই আখ্যানের রূপ দেন, ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রগুলি বিকশিত হয়, তাদের চিনে নিতে পারেন পাঠক। দুজন লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র, আশাপূর্ণার লেখনবিশ্বের অভিমুখ চরিত্রমুখ্যতার দিকে, নিরুপমার ঘটনামুখ্যতার দিকে। আশাপূর্ণার চরিত্রগুলি নাটকীয়, মুখর, কিন্তু ততটা অন্তর্দ্বন্দ্বজটিল নয়। অপরপক্ষে আধুনিক কালের চেতনাপ্রবাহ রীতির সঙ্গে পরিচিত উচ্চশিক্ষিত নিরুপমার লেখায় চরিত্রের মনোগহনে দৃষ্টি দেবার প্রবণতা দেখা যায়। আশাপূর্ণা আর নিরুপমা দুজন লেখিকার প্রধান চরিত্রগুলি চরিত্র হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েও, নারী পুরুষ সম্পর্কের নতুন বিন্যাসের প্রস্তাবনায় ও প্রতিবাদে লেখিকাদের নিজস্ব বক্তব্যেরও বাহন হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :—

১. দেবী, আশাপূর্ণা : ‘আর এক আশাপূর্ণা’, ‘যা দেখি তাই লিখি’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪০১, পৃ. ১৭

২. তদেব, পৃ. ১৬

৩. মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পা.) : ‘শতবর্ষের আলোকে আশাপূর্ণা দেবী’, গিরি প্রিন্স সার্ভিস ৯১৭, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯, পৃ. ২৯৬

৪. দেবী, আশাপূর্ণা : ‘অন্য এক আশাপূর্ণা’, আর এক আশাপূর্ণা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৫. দেবী, আশাপূর্ণা : ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৭১, পৃ. ৩

৬. তদেব, পৃ. ৪

৭. মণ্ডল, তপন : ‘প্রসঙ্গ : আশাপূর্ণা দেবী ও প্রথম প্রতিশ্রুতি’, অরুণকুমার সাঁফুই (সম্পা.), ‘সত্যবতী: জীবন সংগ্রামে প্রতিবাদী নারী কণ্ঠ’, লেজার টাইপসেটিং, কলকাতা, মে ২০১১, পৃ. ২৪৪

৮. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪

৯. তদেব, পৃ. ভূমিকা

১০. তদেব, পৃ. ৪

১১. তদেব, পৃ. ২৪

১২. তদেব, পৃ. ২৫

১৩. তদেব, পৃ. ৬৪

১৪. তদেব, পৃ. ৬৪

১৫. তদেব, পৃ. ১২১-২২

১৬. তদেব, পৃ. ১৬৪

১৭. তদেব, পৃ. ১৭৭

১৮. তদেব, পৃ. ২০১

১৯. তদেব, পৃ. ৫০৩

২০. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৩, পৃ. ১

২১. তদেব, পৃ. ১

২২. তদেব, পৃ. ১৩

২৩. তদেব, পৃ. ৩১

২৪. তদেব, পৃ. ৭

২৫. তদেব, পৃ. ৩০৫

২৬. তদেব, পৃ. ১০৫

২৭. তদেব, পৃ. ৩৩১

২৮. তদেব, পৃ. ৩৩১

২৯. তদেব, পৃ. ৪৪

৩০. দেবী, আশাপূর্ণা : 'খেলা থেকে লেখা', আর এক আশাপূর্ণা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩১. দেব, দুর্বা : 'শতবর্ষে আশাপূর্ণা : সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র', পাল, কস্তুরী (সম্পা.), বরাক নন্দিনী সাহিত্য চর্চাকেন্দ্র, শিলচর ২৯শে মে ২০০৮, পৃ. ৬

৩২. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪

৩৩. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৩৮০, পৃ. ৪২

৩৪. তদেব, পৃ. ৭৯

৩৫. তদেব, পৃ. ৯৬-৯৭

৩৬. তদেব, পৃ. ২০৩-০৪

৩৭. তদেব, পৃ. ১০৬

৩৮. তদেব, পৃ. ৩১২

৩৯. দেবী আশাপূর্ণা : ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪

৪০. তদেব, পৃ. ২৪০

৪১. তদেব, পৃ. ৭৩

৪২. তদেব, পৃ. ২৩১

৪৩. তদেব, পৃ. ২৩০

৪৪. তদেব, পৃ. ২৮৫

৪৫. তদেব, পৃ. ২১১

৪৬. তদেব, পৃ. ৩০৪

৪৭. তদেব, পৃ. ৩০৫

৪৮. তদেব, পৃ. ৩০৫

৪৯. তদেব, পৃ. ৪৭৪

৫০. তদেব, পৃ. ৪৪২

৫১. তদেব, পৃ. ৩৪৩

৫২. তদেব, পৃ. ৩৯৮

৫৩. তদেব, পৃ. ৪৩৭

৫৪. তদেব, পৃ. ৫০২

৫৫. দেবী আশাপূর্ণা : ‘সুবর্ণলতা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৫৬. তদেব, পৃ. ৮

৫৭. তদেব, পৃ. ১৮০

৫৮. তদেব, পৃ. ১৩

৫৯. তদেব, পৃ. ৫৭

৬০. তদেব, পৃ. ১৭৯

৬১. তদেব, পৃ. ১৮১

৬২. তদেব, পৃ. ১৮২

৬৩. তদেব, পৃ. ৬৯

৬৪. তদেব, পৃ. ৬৯

৬৫. তদেব, পৃ. ৬৯

৬৬. তদেব, পৃ. ৫৮

৬৭. তদেব, পৃ. ১২৮-২৯

৬৮. তদেব, পৃ. ৪৭

৬৯. তদেব, পৃ. ১১৪

৭০. তদেব, পৃ. ৫২

৭১. তদেব, পৃ. ৩৬৪

৭২. তদেব, পৃ. ২৯৮-৯৯

৭৩. তদেব, পৃ. ২৯৯

৭৪. তদেব, পৃ. ৩৩০

৭৫. তদেব, পৃ. ৩০৫-০৬

৭৬. দেবী, আশাপূর্ণা : ‘বকুলকথা’, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

৭৭. তদেব, পৃ. ৩৭

৭৮. তদেব, পৃ. ৪১

৭৯. তদেব, পৃ. ৪৬

৮০. তদেব, পৃ. ৪৮

৮১. তদেব, পৃ. ৬৮

৮২. তদেব, পৃ. ৬৮

৮৩. তদেব, পৃ. ৬৮

৮৪. তদেব, পৃ. ৫১

৮৫. তদেব, পৃ. ৭৭

৮৬. তদেব, পৃ. ২৯২

৮৭. তদেব, পৃ. ৯৫

৮৮. তদেব, পৃ. ৯৬

৮৯. তদেব, পৃ. ৯৬

৯০. তদেব, পৃ. ৯৭

৯১. তদেব, পৃ. ৯৮

৯২. তদেব, পৃ. ৯৮

৯৩. তদেব, পৃ. ৯৯

৯৪. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

৯৫. তদেব, পৃ. ১৪০

৯৬. তদেব, পৃ. ১৭৭-৭৮

৯৭. তদেব, পৃ. ১৭৯

৯৮. তদেব, পৃ. ২৪২

৯৯. তদেব, পৃ. ২৪২

১০০. তদেব, পৃ. ২৬৯

১০১. তদেব, পৃ. ৪১২

১০২. তদেব, পৃ. ৪১২

১০৩. তদেব, পৃ. ৪৩৯

১০৪. তদেব, পৃ. ৪৪৩

১০৫. তদেব, পৃ. ৪৪৫-৪৬

১০৬. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

১০৭. তদেব, পৃ. ১০১

১০৮. তদেব, পৃ. ৪৬

১০৯. তদেব, পৃ. ২১

১১০. তদেব, পৃ. ৬২

১১১. তদেব, পৃ. ৯৩

১১২. তদেব, পৃ. ৪

১১৩. তদেব, পৃ. ৪১

১১৪. তদেব, পৃ. ৬১

১১৫. তদেব, পৃ. ২৩০

১১৬. তদেব, পৃ. ২৫১

১১৭. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৬

১১৮. তদেব, পৃ. ৯৪

১১৯. তদেব, পৃ. ২৩৪

১২০. তদেব, পৃ. ২৩৪

১২১. তদেব, পৃ. ২৪৩

১২২. তদেব, পৃ. ২২৬

১২৩. তদেব, পৃ. ২৪০

১২৪. তদেব, পৃ. ২৪০

১২৫. তদেব, পৃ. ২৪৩

১২৬. তদেব, পৃ. ২৬০

১২৭. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১২৮. তদেব, পৃ. ৭০

১২৯. তদেব, পৃ. ১৯৮

১৩০. তদেব, পৃ. ১৯৯

১৩১. তদেব, পৃ. ১৪৬

১৩২. তদেব, পৃ. ১৪৬-১৪৭

১৩৩. তদেব, পৃ. ১৬৩

১৩৪. তদেব, পৃ. ১০৬

১৩৫. তদেব, পৃ. ১০৭

১৩৬. দেবী, আশাপূর্ণা : 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

১৩৭. তদেব, পৃ. ৫৬

১৩৮. তদেব, পৃ. ৯৮

১৩৯. তদেব, পৃ. ২৫৭

১৪০. তদেব, পৃ. ২৫৭

১৪১. তদেব, পৃ. ২৬১

১৪২. তদেব, পৃ. ২৬৫

১৪৩. তদেব, পৃ. ২৬৫

১৪৪. তদেব, পৃ. ৩৮৭

১৪৫. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৬

১৪৬. তদেব, পৃ. ৩১১

১৪৭. তদেব, পৃ. ৩১১

১৪৮. তদেব, পৃ. ২২৭

১৪৯. তদেব, পৃ. ২৩৪

১৫০. দেবী, আশাপূর্ণা : 'বকুলকথা', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

১৫১. তদেব, পৃ. ১৩১

১৫২. তদেব, পৃ. ২৩৭

১৫৩. তদেব, পৃ. ২৩৮

১৫৪. তদেব, পৃ. ২০৯

১৫৫. তদেব, পৃ. ২১১

১৫৬. তদেব, পৃ. ১১২

১৫৭. তদেব, পৃ. ১১১

১৫৮. তদেব, পৃ. ১৯৪

১৫৯. তদেব, পৃ. ১১২

১৬০. তদেব, পৃ. ৮৬

১৬১. তদেব, পৃ. ২০৭

১৬২. তদেব, পৃ. ১০৭

১৬৩. তদেব, পৃ. ২৪৮

১৬৪. তদেব, পৃ. ২৪৯

১৬৫. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : নিরুপমা বরগোহাঞিঙর উপন্যাস সম্ভার (২), জ্যোতি প্রকাশন, পানবাজার, গুয়াহাটী প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পৃ. পাক্কথন

১৬৬. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ২

১৬৭. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৪

১৬৮. বরগোহাঞিঙ, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১৬৯. তদেব, পৃ. ৬৩

১৭০. তদেব, পৃ. ৪৬

১৭১. তদেব, পৃ. ৮২

১৭২. তদেব, পৃ. ৮১

১৭৩. তদেব, পৃ. ৮১

১৭৪. তদেব, পৃ. ৫৬

১৭৫. তদেব, পৃ. ৫৬

১৭৬. তদেব, পৃ. ৭৪

১৭৭. তদেব, পৃ. ৮১

১৭৮. তদেব, পৃ. ৭৩

১৭৯. তদেব, পৃ. ৮৮

১৮০. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৮

১৮১. তদেব, পৃ. ৬৮৯

১৮২. তদেব, পৃ. ৬৮৯

১৮৩. তদেব, পৃ. ৭১৭-৭১৮

১৮৪. তদেব, পৃ. ৭১৮

১৮৫. তদেব, পৃ. ৭২১

১৮৬. তদেব, পৃ. ৭২১

১৮৭. তদেব, পৃ. ৭২১

১৮৮. তদেব, পৃ. ৭৩৬

১৮৯. তদেব, পৃ. ৭০৩

১৯০. তদেব, পৃ. ৭২৬

১৯১. সাপ্তাহিক নীলাচল, ১৯৭৫

১৯২. ঠাকুর নগেন : 'এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস', জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটী, ২০০০, পৃ. ১৬৬

১৯৩. বরগোহাঞি নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাস সম্ভার (১), জ্যোতি প্রকাশন, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৯৯ পৃ. ৫৮০

১৯৪. তদেব, পৃ. ৫৮১

১৯৫. তদেব, পৃ. ৫৮১

১৯৬. তদেব, পৃ. ৭৭৫

১৯৭. তদেব, পৃ. ৬৭৯

১৯৮. তদেব, পৃ. ৭৭৮

১৯৯. তদেব, পৃ. ৭৫৫

২০০. তদেব, পৃ. ৭৬৭

২০১. তদেব, পৃ. ৭৯৩

২০২. তদেব, পৃ. ৭৯৫-৯৬

২০৩. বরগোহাঞিঃ নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

২০৪. তদেব, পৃ. ৩৪

২০৫. তদেব, পৃ. ৩৯

২০৬. তদেব, পৃ. ৪১

২০৭. তদেব, পৃ. ৪২

২০৮. তদেব, পৃ. ৪৩

২০৯. তদেব, পৃ. ৪৩

২১০. তদেব, পৃ. ৪৩

২১১. তদেব, পৃ. ৪৪

২১২. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০৩-০৪

২১৩. তদেব, পৃ. ৭২৮

২১৪. তদেব, পৃ. ৭২৮

২১৫. তদেব, পৃ. ৭২৯

২১৬. তদেব, পৃ. ৭২১

২১৭. তদেব, পৃ. ৭৪৪

২১৮. তদেব, পৃ. ৭৩৯

২১৯. তদেব, পৃ. ৭৩৯

২২০. বরগোহাঞিঃ, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩৯

২২১. তদেব, পৃ. ৬৪২

২২২. তদেব, পৃ. ৬৫৭

২২৩. তদেব, পৃ. ৭৩২

২২৪. তদেব, পৃ. ৬৫৭

২২৫. তদেব, পৃ. ৬৭১

২২৬. তদেব, পৃ. ৬৭২

২২৭. তদেব, পৃ. ৫৮২

২২৮. তদেব, পৃ. ৫৮৩

২২৯. তদেব, পৃ. ৫৮৪

২৩০. তদেব, পৃ. ৬০৯

২৩১. তদেব, পৃ. ৭০৯

২৩২. তদেব, পৃ. ৭৫৫

২৩৩. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

২৩৪. তদেব, পৃ. ৫৫

২৩৫. তদেব, পৃ. ৫৫

২৩৬. তদেব, পৃ. ৮৬

২৩৭. তদেব, পৃ. ২৩

২৩৮. তদেব, পৃ. ২৫

২৩৯. তদেব, পৃ. ৩০

২৪০. তদেব, পৃ. ৪৩

২৪১. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩২

২৪২. তদেব, পৃ. ৭৩৩

২৪৩. তদেব, পৃ. ৭৩৩

২৪৪. তদেব, পৃ. ৭৩৩-৩৪

২৪৫. তদেব, পৃ. ৭৩৪

২৪৬. তদেব, পৃ. ৭৩৯

২৪৭. দত্ত, বিনীতা (সম্পা.) : 'অসমীয়া সাহিত্যত নারী', সদৌ অসম লেখিকা সমারোহ, তেজপুর, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৩৫, পৃ. ২৬৩

২৪৮. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অন্যজীবন', প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩৮

২৪৯. তদেব, পৃ. ৭৩৮

২৫০. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৩

২৫১. তদেব, পৃ. ৫৮৩

২৫২. তদেব, পৃ. ৫৮৩

২৫৩. তদেব, পৃ. ৫৮৩

২৫৪. তদেব, পৃ. ৬০৬

২৫৫. তদেব, পৃ. ৬০৬

২৫৬. তদেব, পৃ. ৬০৬

২৫৭. তদেব, পৃ. ৬০৯-১০

২৫৮. তদেব, পৃ. ৬৬৪

২৫৯. তদেব, পৃ. ৬৬৪

২৬০. তদেব, পৃ. ৬৬৫

২৬১. তদেব, পৃ. ৬৬৮

২৬২. দেবী, আশাপূর্ণা : প্রথম প্রতিশ্রুতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

২৬৩. তদেব, পৃ. ১২২

২৬৪. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮১

২৬৫. তদেব, পৃ. ৫৮২

২৬৬. দেবী, আশাপূর্ণা : 'সুবর্ণলতা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৯

২৬৭. বরগোহাঞি, নিরুপমা : 'অভিযাত্রী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮

২৬৮. তদেব, পৃ. ৫৮২

২৬৯. মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পা.) : 'শতবর্ষের আলোকে আশাপূর্ণা', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮১

উপসংহার

।। এক।।

সাম্প্রতিক অতীতে মানবিকী বিদ্যাচর্চায় দেশ-কাল কিংবা ভাষার ব্যবধান ঘুচিয়ে দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাই বিভিন্ন ভাষার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তুলনামূলক অধ্যয়নের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ বেড়ে উঠেছে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক সন্ধান, যেখানে তুলনাই প্রধান হয়ে ওঠে। তুলনা হল মানব চিন্তন এবং মননের সঙ্গে জড়িত এক বৌদ্ধিক প্রক্রিয়া।

সাহিত্য অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা পদ্ধতি অন্যতম। কোনো এক ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে অন্য ভাষার সাহিত্যের বিভিন্ন দিক যেমন কলা, রাজনীতি, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন দিকসমূহের প্রতিতুলনা ও বিশ্লেষণের সূত্রে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়ন করা হয়ে থাকে। সমগ্র পৃথিবীর মানবের মনে থাকা একই রকমের অনুভব অনুভূতির প্রকাশ লক্ষ করা যায় সাহিত্যে। দেশকালীন বাস্তবের সঙ্গে সংলাপে মনের প্রতিক্রিয়া, তার প্রকাশের ক্ষেত্রেও যেমন থাকে অনন্যতা, তেমনি থাকে সারূপ্য। সাহিত্যের গুণসমূহ এবং সনাতন মূল্য তথা মানবের শাশ্বত সৃজনীশক্তির প্রকাশ ঘটে তুলনামূলক সাহিত্য বিচারের মধ্য দিয়ে।

তুলনামূলক সাহিত্যের মূল স্বরূপের তিনটি প্রধান দিক হল —

(ক) তুলনামূলক সাহিত্যের ধারণা পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যকে এক অথবা একক সাহিত্যরূপে কল্পনা করে।

(খ) একক সাহিত্য হিসাবে ধারণা করা বিভিন্ন সাহিত্য সমূহের অধ্যয়ন সহজ এবং সুগম করে তোলার জন্য সব সাহিত্যের জন্য গ্রহণযোগ্য 'সার্বজনীন সাহিত্য শাস্ত্র' প্রণয়নের পোষকতা করে।

(গ) এক ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে অন্য ভাষার সাহিত্যের তথা সাহিত্য ভিন্ন বিষয় জড়িত করে সাহিত্যের অধ্যয়নকে অধিক বিস্তৃতি দেওয়ার চেষ্টা করা তুলনামূলক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুই বা ততোধিক ভাষার সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারই তুলনামূলক সাহিত্যের মূল লক্ষ্য। তুলনামূলক সাহিত্যে একটি ভাষার পরিবর্তে একাধিক ভাষার তুলনা করলে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। তুলনামূলক সাহিত্যের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতবিরোধ দেখা গেছে। কারো মতে এ অভিধাটি কৃত্রিম এবং অসার্থক। আবার কেউ কেউ ব্যবহারিক দিক থেকে এর সার্থকতা

বিচার করেছেন। তবে বর্তমান যুগে তুলনামূলক সাহিত্যকে সাহিত্য অধ্যয়নের একটি বিশেষ পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তুলনামূলক সাহিত্য এক ধরনের 'আন্তঃ সাহিত্যিক অধ্যয়ন' যা আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের সামগ্রিক অধ্যয়নকে নির্দেশ করে। ফলে তাৎপর্য ও পরিসর হয়ে উঠেছে ব্যাপক ও গভীর।

'তুলনামূলক সাহিত্য' সংক্রান্ত ধারণার জন্ম হয় ঊনবিংশ শতকের শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। বিখ্যাত ইংরাজ কবি মেথিউ আর্নল্ড 'তুলনামূলক সাহিত্য' (Comparative literature) ধারণাটি ব্যক্ত করেছেন। গ্যাটে তাঁর 'Tasso' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রথম 'বিশ্বসাহিত্যে'র উল্লেখ করেছেন। তিনি 'Welt literature' শব্দ থেকে বিশ্বসাহিত্যের ধারণা নিয়েছেন। তিনি কালিদাসের শকুন্তলার জার্মান অনুবাদ পড়ে প্রশংসাসূচক কবিতা রচনা করেন। গ্যাটের বিশ্বসাহিত্যের ধারণায় ছিল অন্যদেশ তথা ভাষার সাহিত্যকে মুক্ত মনে গ্রহণ করা, বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন তথা আদান প্রদান। রবীন্দ্রনাথ 'Comparative literature' অর্থে বিশ্বসাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করে বলেন যে সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করে প্রকাশ করছে, তাই হল বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে দেখার জিনিস।

বিশ শতকের গোড়ার দিকেই ভারতবর্ষেও তুলনামূলক সাহিত্য সম্পর্কীয় চিন্তা-চর্চার দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯০৭ সনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় সাহিত্য পরিষদে 'Comparative literature' বিষয়ে ভাষণ প্রদান করতে গিয়ে 'Comparative literature' অর্থে 'বিশ্বসাহিত্য' শব্দটিই প্রয়োগ করেছেন।

১৯৫৬ সনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগ শুরু হয়। ভারতীয় তুলনামূলক সাহিত্য সংস্থা (Indian Comparative Literature Association) ১৯৮১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা সাহিত্যে তুলনামূলক অধ্যয়নের কাজ শুরু করেছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর 'শকুন্তলা দেস্‌দিমোনা ও মিরন্দা' প্রবন্ধটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান সন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে বিদ্যাশৃঙ্খলা হিসাবে তুলনামূলক সাহিত্য আলোচনার রীতিপদ্ধতি সম্পর্কে যৎসামান্য আলোচনা করা হয়েছে আমাদের অভিসন্দর্ভের ভূমিকা হিসাবে। কীভাবে আমাদের জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে পারে তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়ন, কীভাবে সার্বভূমিক মানব সভ্যতার বিবর্তন রেখাগুলি 'তুলনামূলক সাহিত্য' নামক বিদ্যাশৃঙ্খলার চর্চাসূত্রে প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠতে পারে, সে সম্পর্কে পণ্ডিতজনদের মতের পাশাপাশি আমাদের সামান্য অনুভবও তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছি।

।। দুই।।

বাংলা ও অসম ভারতের দুই অঙ্গরাজ্য। তবে আধুনিক ভারতবর্ষের মানচিত্রের সঙ্গে অসমের যোগ কিন্তু খুব বেশিদিনের নয়। কামরূপ তথা নিম্ন অসমের সমতল অঞ্চল ছাড়া, সমগ্র উত্তর-পূর্ব

ভারতের মঙ্গোলয়েড অধ্যুষিত ভূখণ্ড কখনোই ভারতবর্ষের সঙ্গে অর্থনীতি, উৎপাদন ব্যবস্থা, সামাজিক প্যাটার্ন, সংস্কৃতি — কোনোদিক থেকেই ভারতভূমির সঙ্গে যুক্ত ছিল না। উত্তর-পূর্ব ভারত একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রশাসনের আওতায় আসে ১৮২৬-এর ইয়াণ্ডাবু সন্ধির পর থেকে। ধীরে ধীরে কলোনিয়াল শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়ীভূত হয়। ব্রিটিশ ভারতে প্রশাসনিক বিভাগ পুনর্গঠনের সূত্রে বাংলার বিভিন্ন অংশ কখনো অসমের সঙ্গে যুক্ত ছিল, আবার কখনো বিচ্ছিন্ন। এই প্রক্রিয়া চলেছে স্বাধীনতা পর্যন্ত।

মধ্যযুগ শব্দবন্ধে যদি মোটামুটিভাবে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সময়কে চিহ্নিত করি, তাহলে সেই সময়ের বাংলা ও অসম এই দুই প্রতিবেশি ভূগোল সীমার সমাজ জীবনে সারূপ্যের কিছু সূত্র খুঁজে পাই। যেমন —

১. দুটি সমাজই ছিল রাজশাসিত।

২. অসম ও বাংলা উভয়েরই মূল উৎপাদন ছিল ভূমিভিত্তিক। উৎপাদন সম্পর্ক স্বভাবতই ছিল সামন্ততান্ত্রিক।

৩. তথাপি, বঙ্গদেশে জমিদারের যে দাপট ছিল, তা অসমে ছিল না।

উনিশ শতকীয় সমস্ত ধর্মীয়-সামাজিক-সাহিত্যিক আন্দোলনের উৎস ছিল কলকাতা নগরী। ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত রামমোহন রায় ও কিছু প্রগতিশীল বাঙালির প্রচেষ্টায় সমস্ত ভারতবর্ষে ইংরাজি শিক্ষার প্রচার ও প্রসার লক্ষিত হয়। তারা ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনের দ্বারা সমাজে প্রচলিত নানা কুসংস্কারকে উৎখাত করার প্রয়াস চালান। এই সমস্ত সংস্কারমূলক আন্দোলনের ফলে বহুদিন থেকে চলে আসা সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা রোধ হয়। বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টি থেকে ধর্মাচরণের বিচার হয়, যুক্তির মাপকাঠিতে নতুন জীবনোপযোগী রচনা ও ধরনের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। এই নবজাগরণের প্রভাব বঙ্গদেশ থেকে অসমেও ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে বঙ্গীয় সমাজ জীবনের একটি অংশের চেতনা ও অভিজ্ঞতা নতুন মাত্রা লাভ করে। পরম্পরাগত ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস, আচার, নীতি-নিয়মের সংস্কার সাধনে প্রয়াসী হন সমাজ সংস্কারক উন্নতমনা মনীষীগণ, নতুন ভাবধারার আলো সঞ্চার করেন তাঁরা। বঙ্গীয় সমাজে এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়, বহন করে আনে নবজাগরণের বার্তা। রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ১৮২৮ সনে কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অস্পৃশ্যতা নিবারণ, স্ত্রী শিক্ষা প্রচলন, জাতিভেদ প্রথা নির্মূল ইত্যাদি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৮৭৫ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী বৈদিক ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টায় সৃষ্ট আর্যসমাজ ও সংস্কারমূলক আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান যুগিয়েছে। সংস্কারমূলক আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা হলেও ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে এবং অসমেও এর প্রভাব লক্ষিত হয়।

বঙ্গীয় নবজাগরণে 'ইয়ং বেঙ্গল' সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। কালোপযোগী এই নবজাগরণ নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ডানা ছড়াতে শুরু করলে এর প্রভাব ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে

অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। অসমেও এই প্রভাব লক্ষিত হয়। প্রথম যে দুজন অসমীয়া ব্যক্তি বঙ্গীয় নবজাগরণের ঘাত-প্রতিঘাতের স্পর্শ পান তাঁরা হলেন হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন এবং যজ্ঞরাম খরঘরীয়া ফুকন। হলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন বাংলা ভাষায় 'অসম বুরঞ্জী' রচনা করেন।

নারীর অবস্থানের ক্ষেত্রে বাংলা এবং অসমে যথেষ্ট সারূপ্য লক্ষিত হয়েছে। সমগ্র মধ্যযুগ জুড়েই বাংলার সমাজে নারী পুরুষের বিস্তর ব্যবধান দেখা গেছে। পুরুষশাসিত সমাজ নারীকে অন্তঃপুরের অন্ধকারে ঠেলে দিতেই বেশি ব্যস্ত থেকেছে। কিন্তু অর্ধ-জনজাতীয় ও অর্ধ-সামন্তীয় অসমীয়া সমাজে নারী পুরুষের মধ্যে ব্যবধান ছিল অপেক্ষাকৃত কম। নারীকেও পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে উৎপাদন কার্যে যোগদান করতে দেখা গেছে অসমীয়া সমাজে। তাছাড়া বঙ্গীয় সমাজের মতো সতীদাহ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা ইত্যাদি কুসংস্কার অসমীয়া সমাজে ছিল না বললেই চলে। তবে বঙ্গীয় সমাজের মতো বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন অসমীয়া সমাজেও ছিল। পরবর্তীকালে আহোম রাজত্বের শেষের দিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক অসমে প্রব্রজিত হলে এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রভাবে জনজাতীয় মাতৃতান্ত্রিক দেশ অসমেও সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব দৃঢ় হয়। ফলে অসমীয়া সমাজেও নারী পুরুষের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান রচিত হয় এবং বঙ্গীয় সমাজের মতো অসমের সমাজেও নানা প্রকার কুপ্রথার সঞ্চার হয়। তবে উনিশ ও বিশ শতকে উভয় সমাজেই উন্নতমনা পুরুষদের দ্বারা নারীর অবস্থা পরিবর্তনের প্রয়াস লক্ষিত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে বাংলা ও অসমে লক্ষিত হয় এক ভয়াবহ সামাজিক জঙ্গমতা। যার আভাস উনিশ শতাব্দী থেকেই শুরু হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তথা কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে যে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল তা বলিষ্ঠতা লাভ করে বিংশ শতাব্দীতে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সংগঠন ও জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করে দেশের উচ্চশ্রেণি ও মধ্যশ্রেণিরা ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে শ্রেণিস্বার্থের আংশিক চরিতার্থতার জন্য আন্দোলন করলেও ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতের কথা তারা চিন্তা করেন নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের দাবানল জ্বলে ওঠে বিংশ শতাব্দীতেই। ইংরাজ সরকারের বঙ্গ বিভাজনের পরিকল্পনার ফলে ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে বিপুল জাতীয়তাবোধের তরঙ্গ বাংলাদেশে দেখা দেয় তা পরবর্তীতে ক্রমে ক্রমে সর্বভারতে ছড়িয়ে পড়ে। দরিদ্র, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর ও মহামারীতে জর্জরিত বাঙালি সমাজের উপর আর একটি ঝড় নিয়ে আসেন ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। ব্রিটিশ সরকার 'Devide and Rule' নীতির দ্বারা ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা চালান।

উনিশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সামনে চাকরির অভাব দেখা দেয়। বিংশ শতাব্দীতে এই অভাব আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। শিক্ষিতের তুলনায়

চাকরির সংখ্যা হ্রাস পায় তার উপর উনিশ শতকের কুটির শিল্প ও কৃষির ধ্বংসের ফলে আসা অর্থাভাব বিংশ শতাব্দীতে আরো প্রবল হয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল সত্যাগ্রহ আন্দোলন। এ সমস্ত সংগ্রাম মেদিনীপুরে তীব্র আকার নেয় 'আগস্ট বিপ্লব' নামে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। একদিকে বাঙালি পেল বহু বিপ্লবীর আত্মবলিদানে অর্জিত স্বাধীনতা অপরদিকে দেখল দেশভাগ, দাঙ্গা, প্রব্রজন, বাস্তুহীনতার অভিশাপ, হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতি অস্বীকার। দেশ স্বাধীনতার ঠিক আগের বছর ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে মুসলিম লিগের সংগ্রাম দিবস পালনের নামে বীভৎস দাঙ্গা সংঘটিত হয়।

উনিশ শতকের কৃষক আন্দোলন বিংশ শতাব্দীতে আরও বলিষ্ঠ রূপ লাভ করে। বিংশ শতাব্দীতে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবেই সংগঠিত হয়েছিল এ সমস্ত কৃষক আন্দোলন। দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ির তিন জেলার যুক্ত অধিবেশনে জোতদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে। পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি মহকুমার দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়িতে ১৯৬৭র বসন্তে মাথা তুলে ওঠে নকশাল আন্দোলন।

বঙ্গদেশের মতো বিংশ শতাব্দীতে অসমবাসীকেও সম্মুখীন হতে হয়েছে নানারূপ অস্থির পরিস্থিতির। সম্পূর্ণ বিংশ শতাব্দী জুড়েই অসমে এক অস্থির পরিস্থিতি লক্ষিত হয়। প্রাক ব্রিটিশ যুগে স্বাধীনতার আন্দোলন অসমের পরিস্থিতিকে চঞ্চল ও অস্থির করে রেখেছে। ১৯০৩ সনে অসম এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে। ১৯১৩ সনে অসম কাউন্সিল গঠিত হয়। ১৯১৭ সনে নতুন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন রূপে অসম সাহিত্য সভার গঠন হয় এবং ১৯১৬ সনে অসম ছাত্র সম্মিলন গঠিত হয়। ফলে অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি এক নতুন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক যুগের সূচনা করে সাংবিধানিক প্রশাসন, স্থানীয় শাসন এবং শিক্ষা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে। ১৯২০-এ কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অসম এসোসিয়েশন অসমের শাসন ব্যবস্থার সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা নেয়। ১৯২০ সনে গঠিত অসম কংগ্রেস কমিটি অসমে জাতীয়তাবোধ জাগরণের চেষ্টা চালায় পূর্বের ধ্যানধারণা ও আনুষ্ঠানিক ভিত্তির উপর। ১৯২১, ১৯৩০ এবং ১৯৪২-এর গণ আন্দোলনসমূহ এই সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

১৯৩৫ সনে অসমে কমিউনিস্ট দল গঠন, ১৯৫৫-এর তেল শোধনাগার আন্দোলন, ষাট সনের ভাষা আন্দোলন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী ভাবধারা শক্তিশালী রূপ ধারণ করে। ভাষিক, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়ে ওঠে। এই জাতীয়তাবাদী ভাবনাকে আরো গাঢ় করে তুলে ১৯৬২ সনের চীনের আক্রমণ, ১৯৬৫ সনের ভারত-পাক যুদ্ধ। ১৯৭১-এর পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনও অসমে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ধীরে ধীরে অসমের পরিস্থিতি আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং অসম বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত হয়ে যায়। ১৯৭৮-৮৩ সালের সুদীর্ঘ অসম আন্দোলন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে গোষ্ঠীগত সংঘর্ষ, অসম চুক্তি, আঞ্চলিক দল গঠন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল, উগ্রপন্থী সমস্যা, পাকিস্তানী কূটাঘাতমূলক কার্যাবলী, বেকার সমস্যা,

দুর্নীতি এবং স্বজন-পোষণের অভিযোগ, সরকারি খণ্ডের বিপর্যস্ত অবস্থা ইত্যাদির ফলে বিংশ শতাব্দীতে অসমে এক ভয়াবহ সংকটপূর্ণ রূপ লক্ষিত হয়।

অসমে ইংরাজ শাসনের পর প্রশাসনিক কার্যের জন্য অসমের নিজস্ব মধ্যবিত্ত গড়ে তোলার আগে ব্রিটিশ সরকার বাইরে থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির আনয়ন করে অসমে বসতি দান করেন নিজ সুবিধার্থে। তাছাড়া কৃষিকার্যের জন্যও বহু বাংলাভাষী মুসলমানকে আনয়ন করা হয়। এই সমস্ত ঘটনার ফলস্বরূপ অসমের ইতিহাসে মারাত্মক রূপ ধারণ করে। তাছাড়া কাজকর্মের সুবিধার জন্য অফিস আদালতে তথা বিদ্যালয়সমূহে বাংলাভাষার প্রবর্তন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অবস্থায় তেমন আলোড়ন না তুললেও পরবর্তীতে ভাষা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। অসমের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মূলত উগ্র ভাষিক জাতীয়তাবাদ যা বিংশ শতাব্দীতে আরো বেশি ভয়াবহ রূপ লাভ করে।

১৯৭৯-১৯৮৫ অসম আন্দোলনে যদিও প্রব্রজন সমস্যাই প্রধান ছিল তথাপি আন্দোলনের প্রাক্ মুহূর্তে অনেক সমস্যা দেখা দেয় অসমে। যেমন খনিজ তেলের সমস্যা, বেকার সমস্যা ইত্যাদি। স্বাধীনতার পর পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে অসমবাসীর প্রথম স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হল শোধনাগার আন্দোলন। ১৯৮৩ সনে গ্রহণ করা হয় আই এম ডি টি আইন যার দ্বারা ১৯৭১ সনের পরে অনুপ্রবেশ করা লোককে বিদেশি বলে ঘোষণা করে অনুপ্রবেশের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়। ১৯৮৫ সনের ১৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার এবং আন্দোলনকারী নেতাদের মাঝে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির সঙ্গেই অন্ত হয় অসম আন্দোলনের। এদিকে আসুর একাংশ কর্মীর উদ্যোগে গড়ে ওঠে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী। ৮০'র দশকে আলফার বিপুল কার্যকলাপ ধীরে ধীরে অন্য জনগোষ্ঠীর কাছেও অনুসরণযোগ্য হয়ে ওঠে। ৯০'র দশকে বড়োল্যাণ্ড এর দাবি সহ বিভিন্ন জনজাতি গোষ্ঠীর উগ্রপন্থী সংগঠনের কার্যকলাপ অসমের রাজনৈতিক পরিসরকে অস্থির, ভয়ংকর করে তোলে। কার্যত অসম হয়ে ওঠে মৃত্যু উপত্যকা। এভাবেই সমগ্র বিংশ শতাব্দী জুড়েই অসমে লক্ষ করা যায় এক অস্থির সামাজিক অবস্থাকে। বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও জঙ্গমতা নানাভাবে ধরা পড়েছে আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞির কথনবিশ্বে।

।। তিন।।

আশাপূর্ণা দেবী এবং নিরুপমা বরগোহাঞি যথাক্রমে বাংলা এবং অসমীয়া ভাষার দুই শক্তিশালী কথাসাহিত্যিক। দুজনেই বিশ শতকের লেখিকা। আশাপূর্ণা দেবী নিরুপমার থেকে ২৭ বছরের বড়। কিন্তু দুজনের প্রথম উপন্যাস বেরিয়েছে ১৮ বছরের ব্যবধানে। আশাপূর্ণার প্রথম উপন্যাস 'প্রেম ও প্রয়োজন' প্রকাশিত হয় ১৯৪৪ সালে, আর নিরুপমার প্রথম উপন্যাস 'সেই নদী নিরবধি' প্রকাশের আলো দেখে ১৯৬৩তে। নিরুপমার শেষ উপন্যাস প্রকাশিত হয় আশাপূর্ণার মৃত্যুর ২ বছর পর। নারী পুরুষ সম্পর্কের বিন্যাসকে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অভ্যস্ত

সংস্কারগুলির যৌক্তিকতাকে উভয় লেখিকাই প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, মানসতার পরিবর্তনের প্রস্তাব রেখেছেন। মেয়েদের সমস্যাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া দুই লেখিকারই নিজের জীবনে ঘটে গেছে বিচিত্র উত্থান পতন, মোকাবিলা করতে হয়েছে নানা প্রতিকূলতার এবং সব সমস্যাকে অতিক্রম করে সৃজনের মধ্য দিয়ে তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন সৃজনশীল সাহিত্যিক রূপে।

আশাপূর্ণা দেবী র(ণশীল একান্নবর্তী পরিবারের মেয়ে এবং বিয়েও হয়েছিল র(ণশীল পরিবারের ছেলে কালিদাস গুপ্তর সঙ্গে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হওয়ার জন্য স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করা তো দূরের কথা গৃহশিক্ষক রেখে বিদ্যার্জনের সুযোগও তিনি পান নি। তাই দাদারা যখন পড়তে বসতেন তখন উল্টো দিকে বসে তিনি তাঁর বিদ্যাশিক্ষার বাসনা পূরণ করেন। তাই তাঁর অক্ষর পরিচয় হয়েছিল উল্টো দিক থেকে। ১৩ বছর বয়সে 'শিশুসাথী' পত্রিকায় বেরিয়ে যায় তাঁর প্রথম কবিতা 'বাইরের ডাক' (১৩২৯ সাল)। ১৫ বছর বয়সে 'স্নেহ' কবিতার জন্য তিনি প্রথম পান সাহিত্য পুরস্কার। দুই পুত্র, এক কন্যার জননী আশাপূর্ণা দেবী সংসারের খুঁটিনাটি সব দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাহিত্য সাধনা চালিয়ে গেছেন। 'প্রেম ও প্রেয়সী' নামের গল্পটি তাঁর বড়দের জন্য লেখা প্রথম গল্প। সমগ্র জীবন ধরে তিনি প্রায় লিখেছেন দেড়শোর বেশি উপন্যাস, দেড় হাজারের বেশি ছোটগল্প, লিখেছেন অজস্র কবিতা, রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ, ধর্মীয় ভাবনামূলক প্রবন্ধ ইত্যাদি। তাঁর সাহিত্য ভাণ্ডারে নাটক মাত্র একটি। তাঁর রচনায় কোনো মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা ও ইতিহাস-ভূগোলের অভিজ্ঞতা তেমন পাওয়া যায় না। তিনি মূলত অন্তঃপুরের রূপকার। তাঁর রচিত উপন্যাসসমূহের মধ্যে ত্রয়ী উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'সুবর্ণলতা' ও 'বকুলকথা' বাংলা কথাসাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এই উপন্যাস তিনটিতে অন্তঃপুরের ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে নারীর উত্তরণের কাহিনি বিবৃত হয়েছে, আর অন্তর্বয়নে রয়েছে সময়ের পর্বান্তরের ভাষ্য। উপন্যাসের পাশাপাশি বত্রিশটি ছোটগল্প সংকলন এবং ঊনপঞ্চাশটি ছোটদের গল্প প্রকাশিত হয়।

আশাপূর্ণা দেবী পেয়েছেন 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুরস্কার (১৯৬৬), ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক (১৯৬২), 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কার (১৯৭৬), ভুবনেশ্বরী পদক (১৯৭৬), ভারত সরকারের 'পদ্মশ্রী' (১৯৭৬), 'হরনাথ ঘোষ পদক' (১৯৮৮), 'শরৎ পুরস্কার' (১৯৮৯), 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' (১৯৯৩) ইত্যাদি নানা সম্মান ও পুরস্কার। আশাপূর্ণা ১৯৯৫ সালের ১৩ জুলাই আপন সমস্ত কর্মের সমাপ্তি টেনে লোকান্তরিত হন। রেখে যান সাহিত্যে নিজের অমর কীর্তি।

অসমীয়া কথাকার নি(পমা বরগোহাত্রি(বিশ শতকের শক্তি(শালী কথাশিল্পী। অসম আন্দোলনের সময়কার নির্ভীক ও সাহসী লেখিকা নিজের লেখার মধ্য দিয়ে এবং সত্রি(য় কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ভিতরের কুটিল রূপকে প্রকাশ করেছেন। নারীর উপর হওয়া অত্যাচারের বি(দ্ধে উচ্চকণ্ঠ নি(পমা বরগোহাত্রি(র জীবনেও এসেছে হতাশা, নিরাশা ও স্বপ্নভঙ্গের মতো ঘটনা। তাঁর জীবনকথাই সংগ্রাম ও উত্তরণের একটি আকর্ষণীয় কাহিনি। নির্ভীক

লেখিকা নি(পমা বরগোহাঞি(র জন্ম হয় ১৯৩২ সনে গৌহাটি মহানগরীতে। তাঁর পিতার নাম যাদব তামুলী ও মাতা কাশী(রী তামুলী। নি(পমা বরগোহাঞি(ছোটবেলা খুবই ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। ছোট ছোট কথাতে ভাবপ্রবণ হয়ে যেতেন তিনি। গান্ধীবাদী আদর্শে বি(াসী পিতার কাছ থেকে তাঁরা ভাইবোনেরা কষ্টের মোকাবিলা করতে শিখেছেন। বিয়ের ব্যাপারেও তিনি স্বাধীনচেতা মনোভাবই পোষণ করেছেন। তিনি নলবারী কলেজে অধ্যাপনা করার সময় হোমেন বরগোহাঞি(র সঙ্গে পরিচিত হন এবং পরে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। নি(পমা বরগোহাঞি(তাঁর চাকরিজীবন শু(করেন পাণ্ডুস্থিত নেতাজী বিদ্যাপীঠ-এ। একবছর পর তিনি চাকরি ছেড়ে স্বামীর সঙ্গে মাজুলিতে চলে যান। স্বামী হোমেন বরগোহাঞি(চাকরি ছেড়ে দিয়ে সাংবাদিকতা শু(করে গৌহাটিতে চলে আসেন। চাকরির জন্য শত চেষ্টায় ব্যর্থ হলে নি(পমা বরগোহাঞি(ও স্বামীর সঙ্গে সাংবাদিকতায় যোগ দেন। দুই ছেলে অনিন্দ্য ও প্রদীপ্তর জন্মের পর একসময় তাঁদের ১৯ বছর বৈবাহিক জীবনের বিচ্ছেদ ঘটে। স্বামীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ, ছেলেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও অর্থাভাবের মধ্যেও নি(পমা বরগোহাঞি('নীলাচল'-এর সম্পাদিকার কাজ ভালভাবেই করছিলেন। অসম আন্দোলনের সময় বিভিন্ন সংবাদপত্র মিথ্যা প্রচার কার্য চালাতে থাকলে তিনি অসম আন্দোলনের ভিতরে চলা সত্য সমূহ উৎঘাটন করতে গিয়ে আত্র(ান্ত হয়েছিলেন। বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে তিনি অনসমীয়াদের দুরবস্থা দেখে তাদের দুঃখে ব্যথিত হন এবং আন্দোলনের নামে নিষ্ঠুরতা যে সুসভ্য জাতিগঠনের সহায়ক নয় সেরূপ মত প্রকাশ করলেন। এ মতের জন্য তাঁকে বিদেশিদের প্রশ্রয়দাত্রী বলে সাপ্তাহিক নীলাচল থেকে বের করে দেওয়া হয়। অসম আন্দোলনের প্রে(িতে জাতীয় সংহতির আলোচনা চত্রে(র জন্য কলকাতা ও আগরতলায় আহ্বান করা সভায় নি(পমা বরগোহাঞি(কে নিমন্ত্রণ করা হয়। শিলচরের 'দিশারী' নামক সংস্কৃতি গোষ্ঠীর আয়োজিত 'মৈত্রী উৎসবে' তাঁকে ডাকা হয়।

তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'বি(াস আ(সংশয়র মাজেদি'-র মধ্যে জীবনের সমস্ত ছোট বড় বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করেছেন। নি(পমা বরগোহাঞি(র রচনায় তাঁর পরিচিত পৃথিবীই স্থান পেয়েছে। তাই তাঁর সম্পূর্ণ জীবনে পরিচিত বিভিন্ন চরিত্রগুলি তাঁর রচনার মধ্যে হাজির হয়েছে। তাঁর সৃষ্টিতে রয়েছে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণ। তিনি রচনার মধ্যে খুঁজেছেন জীবনের অর্থ ও তাৎপর্যকে। তাঁর লেখায় সহমর্মিতার সঙ্গে ফুটে উঠেছে সামাজিক আধিপত্যের জন্য নারীজাতির জীবনে আসা দুঃখ-কষ্ট। সাহিত্য সাধনার মধ্যে তিনি সন্ধান করেছেন অধ্যয়নপ্রিয়, যুক্তি(বাদী, সহানুভূতিশীল, রোমান্টিক, অন্যায়ের বি(দ্ধে জাগ্রত এবং নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন নারীর। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সেই নদী নিরবধি' তিনি ১৯৫১ সনে কলেজে পড়াকালীন সময়েই রচনা করেন। বিয়ের পর ১৯৫৮ সনে 'সেই নদী নিরবধি'র দ্বিতীয় খণ্ড রচনা করেন। উপন্যাসটি ১৯৬৩ সনে প্রকাশ পায়।

তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে উপন্যাস, গল্প, বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদ সাহিত্য। তাঁর বিভিন্ন সময়ের উপন্যাস সমূহ হল — 'সেই নদী নিরবধি' (১৯৬৩), 'এজন বুঢ়া মানুহ' (১৯৬৬), 'দিনর পিছত দিন' (১৯৬৮), 'অন্তঃস্রোতা', (১৯৬৯), 'হৃদয় এটা নির্জন দ্বীপ' (১৯৭০)

, ‘সামান্য-অসামান্য’ (১৯৭১), ‘সময় অসময়ে’ (১৯৭১), ‘ছায়া আরু ছবি’ (১৯৭১), ‘কেক্‌টাচর ফুল’ (১৯৭৩), ‘নামি আহে এই সন্ধিয়া’ (১৯৭৭), ‘তিনকন্যা’ (১৯৭৮), ‘ইপারর ঘর সিপারর ঘর’ (১৯৭৯), ‘ভবিষ্যতর রঙা সূর্য’ (১৯৮০), ‘দিন প্রতিদিন’ (১৯৮২), ‘গোহাঁনী আই গোসাঁনী আই’ (১৯৮৭), ‘চিনাকি অচিনাকি’ (১৯৮৭), ‘অন্যজীবন’ (১৯৮৭), ‘চম্পাবতী’ (১৯৯০), ‘অভিযাত্রী’ (১৯৯৩)। তাছাড়া রয়েছে ‘পুয়ার পূরবী সন্ধ্যার বিভাস’, ‘ব্রহ্মার অস্ত্র’, ‘পখী ঘুরি যায় নিজর পরা নিলগত’, ‘এখন শ্রাদ্ধত আনন্দাশ্রু’, ‘এলবামত হেরোয়া ছবি’, ‘সৌগন্ধ’, ‘অন্যদ্বীপ অন্য ঢৌ’, ‘ইপার সিপার’, ‘মার প্রতি মরম আরু শ্রদ্ধারে’, ‘আলহী পখীর বাহ’, ‘পিতা-পুত্রী’, ‘একেই জোন একেই বেলি’, ‘শত্রু’ ইত্যাদি। তাঁর ভ্রমণমূলক রচনাসমূহ হল — ‘গানর নিসিনা দিন’, ‘সেই দ্বীপ সেই নিরবাসন’ ইত্যাদি।

নি(পমার গল্পসমূহ — ‘রেহাই মূল্য’, ‘এনথোপলজির স্বপনর পিছত’, ‘ঢেকির স্বরগ’, ‘মধ্যবর্তিনী’, ‘আকাশছোয়া’, ‘তেন্তালাচ’, ‘ভাইটির ছবি’, ‘শিল্পী’, ‘জয় পরাজয়’, ‘নালন্দা বি(েবিদ্যালয়র ছাত্র’, ‘এথোপা গোলাপ’, ‘(ণিকা’ ইত্যাদি গল্প। তাঁর ‘তেন্তালাচ’ গল্পটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রালয় থেকে প্রকাশিত ‘Modern Indian Short Stories’ এর অন্তর্ভুক্ত(করা হয়। তাঁর জীবন জোড়া সাহিত্য সাধনার জন্য যে সব পুরস্কারে তিনি সম্মানিত হয়েছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — ‘(া(েতী পুরস্কার’ (১৯৮৭), ‘বাসন্তী দেবী বরদলৈ পুরস্কার’ (১৯৮৯-৯০), ‘হেমব(য়া পুরস্কার’ (১৯৯৪), ‘সাহিত্য একাডমি পুরস্কার’ (১৯৯৬), ‘প্রবীণা শইকীয়া পুরস্কার’ (২০০০), ‘অদ্বৈত মল্লবর্মন স্মৃতি পুরস্কার’ (২০০৩)।

।। চার ।।

আশাপূর্ণা দেবী এবং নিরুপমা বরগোহাঞি — দুজন ঔপন্যাসিকের রচনাতেই নারীজীবনের প্রেক্ষিতে দেশকালীন বাস্তবের বিচিত্র বিভঙ্গ ওঠে এসেছে। আশাপূর্ণা দেবীর কাহিনি মুখ্যত পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে ফলে বাঙালির পারিবারিক জীবনের নানা আচার-সংস্কার বড় জীবন্তভাবে ওঠে এসেছে তাঁর লেখায়। নিরুপমা নারীর জীবনযন্ত্রণার আলেখ্য রচনায় পারিবারিক পরিসীমাতেই আবদ্ধ থাকেন নি। অন্দর ও সদরের দ্বিরালাপে তাঁর উপন্যাসগুলিতে অন্তঃপুরের সমান্তরালে বাইরের জগৎটিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বৃহৎ পরিবারের অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতির মাত্রা নিরুপমার উপন্যাসকে আশাপূর্ণার তুলনায় খানিকটা বেশি ব্যাপ্তি দিয়েছে।

দুজন লেখিকার উপন্যাসবিশ্বেই সমাজে নারীর অবস্থানকে দেখানো হয়েছে। আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসের মতো নিরুপমার ‘অভিযাত্রী’, ‘ইপারর ঘর সিপারর ঘর’ এবং ‘অন্যজীবন’ উপন্যাসেও নারীর উপর হওয়া অত্যাচার অবমাননা ও সমাজে প্রচলিত নারী পুরুষের মধ্যে থাকা ব্যবধানসূচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ মেলে। এ থেকে বোঝা যায় বঙ্গীয় সমাজের মতো অসমীয়া সমাজেও নারীর অবস্থান খুব বেশি উন্নত ছিল না। তবে আশাপূর্ণার ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ ও ‘সুবর্ণলতা’য় নারীর যে

অন্তঃপুর বন্দী অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে নিরুপমার উপন্যাসে সমাজে নারীর সেই বন্দিত্ব প্রতিফলিত হয় নি। নিরুপমার উপন্যাসে গ্রাম্য নারীদের ঘরোয়া কাজের সঙ্গে সঙ্গে ফসলের সময় কৃষিকাজও পুরুষের সঙ্গে করতে দেখা গেছে। কারণ হিসেবে বলা যায় জনজাতীয় প্রভাবে অসমীয়া সমাজে নারীকেও পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কৃষিকাজও করতে দেখা যায়, তারই প্রতিফলন ঘটেছে নিরুপমার উপন্যাসবিশ্বে। 'অন্যজীবন' উপন্যাসে গ্রাম্য নারীর কঠোর পরিশ্রমের ফলে অণিমার শ্বশুরবাড়ির গ্রামের মৌজাদারণীর মৃত্যু হয়েছে। গ্রামের অবস্থাসম্পন্ন ঘরের মেয়ে বউদেরও একইভাবে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। গ্রামের মেয়ে বউদের কৃষিক্ষেত্রে যাওয়া, ঢেঁকি দেওয়া, পলু পোষা, তাঁত বোনা, সূতা কাটা ইত্যাদি বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকতে হয় শোবার আগ পর্যন্ত। নিরুপমার উপন্যাসবিশ্বে অসমের গ্রাম্য নারীর অমানবিক পরিশ্রমের দিকটি এবং পরিশ্রমের ফলে হওয়া তাদের দুঃখময় জীবনকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন লেখিকা। যেভাবে আশাপূর্ণা দেবী তুলে ধরেছেন বঙ্গীয় নারীর বন্দিত্বের জ্বালাকে, দুঃখকে তাঁর উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'তে। তবে আশাপূর্ণা দেবী 'বকুলকথা' উপন্যাসে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নারীর বন্দিত্ব মোচন হয়ে মুক্তির স্বাদ পাওয়ার দিকটির আভাসও দিয়েছেন। 'বকুলকথা'য় আর নারী অন্তঃপুরে বন্দি নেই। পুরুষের মতো নারীও বাইরে বিচরণ করতে পেরেছে। নমিতা লক্ষ্মী বউএর ভূমিকা ত্যাগ করে নায়িকা রূপছন্দা হয়েছে। একইভাবে নিরুপমা বরগোহাঞিও 'অন্যজীবন' উপন্যাসে গ্রাম্য নারীর কঠোর পরিশ্রমের দিক যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে নারীর অবস্থান পরিবর্তনের আভাস। যান্ত্রিক সভ্যতার অগ্রগতিতে নারীর কষ্ট বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে তার আভাস রয়েছে 'অন্যজীবন' উপন্যাসে। ধান ভানা যন্ত্রের আবিষ্কারের পর থেকে গ্রামে গঞ্জে ঢেঁকির ব্যবহার কমেছে। সময়ের অগ্রগতিতে গ্রাম্য নারীর জীবনে আসা পরিবর্তনসমূহ তুলে ধরেছেন লেখিকা এবং মুখপাত্র হয়েছে আইকণ।

বঙ্গীয় সমাজের মতো অসমীয়া সমাজেও বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের মতো কুসংস্কার লক্ষিত হয়েছে। আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' ও 'সুবর্ণলতা'র মতো নিরুপমার 'অভিযাত্রী'তে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের কথা রয়েছে। তাছাড়া 'অন্যজীবন' উপন্যাসে বহুবিবাহ ও রক্ষিতা রাখার আভাস মিলে। রক্ষিতা রাখার কথা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র মধ্যেও রয়েছে। আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে নীলাম্বর বাড়ুয্যের রক্ষিতা রাখার ব্যাপারটি যেমন এলোকেশী মেনে নিয়েছিলেন তেমনি 'অন্যজীবন' উপন্যাসেও রজনীর রক্ষিতা রাখার ব্যাপারটি তার স্ত্রী বিহপুরিয়ানী প্রথম প্রথম মন খারাপ করলেও পরবর্তীতে মেনে নিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় দুটি সমাজই রক্ষিতা রাখার ব্যাপারটিকে একটা সময় পর্যন্ত সাধারণ ব্যাপার বলে মেনে নিয়েছিল।

পরাধীনতার গ্লানি 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্য ও 'সুবর্ণলতা'র সুবর্ণ অনুভব করতে পেরেছিল। বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে রচিত 'সুবর্ণলতা'য় স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা রয়েছে, রয়েছে স্বদেশিদের কথা। বাংলার আকাশ বাতাস বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হওয়ার কথা রয়েছে। একইভাবে বিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে রচিত নিরুপমার 'অভিযাত্রী'তেও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তর বর্ণনা

রয়েছে। 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রসঙ্গ থাকলেও 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের মতো বিস্তৃত নয়। 'অভিযাত্রী' উপন্যাসে মেয়েদের সরাসরি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে তথা সামাজিক কাজে অংশ গ্রহণের এক বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসের প্রথম দিকে মেয়েদের স্বাধীনতা আন্দোলনে সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। তার কারণ 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে যে রক্ষণশীল সমাজকে নিয়ে আসা হয়েছে সেই রক্ষণশীল সমাজে পরিবারের মেয়েদের দেশ স্বাধীনতার জন্য রাজপথে বেরিয়ে আসা সহজ ছিল না। তবে 'সুবর্ণলতা'র শেষের দিকে নারীর উপর থাকা রক্ষণশীল মনোভাব ক্রমশ হ্রাস পাওয়ার আভাস পাওয়া গেছে। তারই সঙ্গে মেয়েদের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণের খবরও পাওয়া গেছে অম্বিকার মুখে।

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বিধবাদের অংশগ্রহণে সামাজিক নিষিদ্ধতা দুই লেখিকার উপন্যাসেই লক্ষিত হয়েছে। তবে আশাপূর্ণার উপন্যাসে বঙ্গীয় সমাজে বিধবাদের উপর যে নীতি নিয়মের বোঝা চাপিয়ে দিতে দেখা গেছে নিরুপমার উপন্যাসে সেটি দেখা যায় নি। আশাপূর্ণার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে প্রেমবিবাহকে দেখানো হয় নি। 'বকুলকথা' উপন্যাসে বকুল নির্মলকে ভালোবাসা সমাজ ও দাদাদের ভয়ে প্রকাশ না পেলেও বকুলের ভাইঝি শম্পার প্রেমবিবাহের মধ্য দিয়ে সময়ের অগ্রগতি, সমাজের পরিবর্তনকে তুলে ধরেছেন লেখিকা। অপরদিকে নিরুপমার উপন্যাসে অনেকগুলি প্রেমবিবাহের মধ্য দিয়ে অসমীয়া সমাজে প্রেমবিবাহের ব্যাপক প্রচলনের কথা ফুটে উঠেছে। চন্দ্রপ্রভার দণ্ডীনাথকে ভালোবাসা, চন্দ্রপ্রভার বোন রজনীপ্রভার বাঙালি ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করা, যোগমায়ার ঘনাবাবাকে ভালোবেসে দ্বিতীয়বার বিয়ে করা, নীলকণ্ঠের মেয়ে বিধবা হবার পর আবার ভালোবেসে বিয়ে করা, পটেশ্বরীর পূজনকে ভালোবেসে পালিয়ে যাওয়া, অণিমা ও মনোজের প্রেমবিবাহ ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে দেখা গেছে কলোনি শাসন বিস্তারের পর্বে শহুরে মধ্যবর্গের উত্থান এবং নতুন নতুন জীবিকার সৃষ্টিকথা। নবকুমার ইংরাজি শিখে গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে চাকরিজীবী হয়েছে। 'সুবর্ণলতা'য় সুবোধ ও প্রবোধকেও চাকরিজীবী রূপেই আমরা পাই। নগরায়নের ফলে কৃষিজীবী গ্রামীণ সভ্যতার পালে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে — এই ইতিহাসকে আশাপূর্ণা উপন্যাসে ধারণ করেছেন। অপরদিকে নিরুপমার উপন্যাসেও দেখা গেছে কৃষি ও কুটির শিল্পভিত্তিক অসমীয়া অর্থনীতি ক্রমশ ধ্বংস হয়ে চলেছে। গ্রামেও প্রব্রজন ঘটেছে গুজরাতি ও মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর ফলে গ্রামে দেখা দিয়েছে জীবিকার সমস্যা। জীবিকার উদ্দেশ্যে গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে গেছে সেখানে গিয়েও তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছে। কেউ প্রেসের কাজে ঢুকেছে, কেউ হোটেল বয় হয়েছে কেউবা মজুর হয়েছে। শহরে যেভাবে গ্রামের লোকের প্রব্রজন হয়েছে তেমনি ব্যবসায়ীর প্রব্রজন ঘটেছে গ্রামে যার ফলে গ্রামীণ সরলতা ধ্বংস হয়ে কুটিলতা, দুর্নীতিগ্রস্ততা প্রবেশ করেছে গ্রামে। ফলে গ্রামের লোকের দরিদ্রতা ও দুর্দশা আরও বেশি করে বেড়ে উঠেছে।

আশাপূর্ণার সমাজভাবনায় অন্যান্য দিকের থেকে মেয়েদের দিকটিই বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে অপরদিকে নিরুপমার লেখায় মেয়েদের সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য দিককেও আমাদের

সামনে তুলে ধরেছেন। আশাপূর্ণার বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা পরবর্তী পটভূমিতে রচিত ‘বকুলকথা’য় নারীর সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক সমাজের নানা সমস্যা বিশেষত আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি, রাজনৈতিক ভণ্ডামী ইত্যাদির ক্রমবর্ধমান স্থিতি, এবং এর ফলে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মধ্যে জন্ম হওয়া আক্রোশ প্রতিনিয়ত বুবুনদের মতো হাজার হাজার ছেলেকে গ্রাস করছে। নিরুপমা বরগোহাঞিও তাঁর উপন্যাসে বিংশ শতাব্দীর সমাজের চঞ্চল পরিস্থিতিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিকাশের ফলে সৃষ্টি হওয়া বেকার সমস্যা, শ্রমিক শ্রেণির আত্মমর্যাদাহীনতা এবং দুঃখময় জীবনের আভাস রয়েছে উপন্যাসে। তারই সঙ্গে ধনিক শ্রেণির শোষণকে দেখিয়েছেন লেখিকা। কালোবাজারি করে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা পুলিশের কাছ থেকেও বেঁচে যায়। আর দরিদ্র শ্রেণি কম অপরাধেও কঠোর শাস্তি পায়। এই দিকগুলিকে লেখিকা সুন্দরভাবে তুলে ধরে শ্রেণিরাষ্ট্রে ধনি দরিদ্রের মধ্যে থাকা বিভেদমূলক দৃষ্টিভঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসে। ‘ইপারর ঘর সিপারর ঘর’ উপন্যাসে লেখিকা অঞ্জলির কথার মধ্য দিয়ে দরিদ্র শ্রেণির সমস্যাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আশাপূর্ণা দেবী ‘বকুলকথা’য় যেমন মানুষের মূল্যবোধের ক্রমশ অবনতির কথা বলেছেন তেমনি ‘ইপারর ঘর সিপারর ঘর’ উপন্যাসে গ্রামের সরলতা ধ্বংস হয়ে ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি ও শোষণ-শাসনের আভাস দিয়েছেন নিরুপমা বরগোহাঞি। আশাপূর্ণা দেবীর ‘বকুলকথা’য় বিবাহ বিচ্ছেদের আভাস দিয়ে বঙ্গীয় নারীর স্বাধীনতা স্পৃহা এবং পুরুষের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ ও মুক্তির আভাস দিয়েছেন। একইভাবে নিরুপমা বরগোহাঞি ‘অন্যজীবন’ উপন্যাসেও বিবাহ বিচ্ছেদের আভাস দিয়ে অসমীয়া সমাজেও নারীর স্বামীর অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার দিকটি দেখিয়েছেন।

১৬.৩.২০১৩ তারিখের তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় বর্তমান প্রতিবেদকের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে বঙ্গীয় সমাজ এবং অসমীয়া সমাজে নারীর অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য কোথায় প্রশ্নের উত্তরে নিরুপমা বরগোহাঞি বলেছেন যে অসমের তুলনায় বঙ্গীয় সমাজে নারী ছিল একটু পিছিয়ে এবং একটু বেশি নির্যাতিতা। বঙ্গীয় নারীর মতো অসমীয়া নারীদের অন্তঃপুরের বন্দিত্বদশা তেমন কাটাতে হয়নি একথাও বলেছেন তিনি। বঙ্গদেশের মতো যৌতুকপ্রথা, সতীদাহ প্রথা ইত্যাদি অসমীয়া সমাজে ছিল না। তবে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রভাবে এসব ব্যাধি অসমীয়া সমাজেও যে প্রবেশ করেছে, তাঁর রচিত উপন্যাসগুলিতে সে আভাস মেলে। ঠিক একইভাবে ‘আর এক আশাপূর্ণা’তে আশাপূর্ণা দেবী বঙ্গীয় সমাজে প্রচলিত নারীপুরুষের মধ্যে থাকা ব্যবধানমূলক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছেন। মেয়েদের সবকিছুতে থাকা অধিকারহীনতা তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। মেয়েদের অবরোধের অন্ধকারময় জীবনযাপন তাঁকে কষ্ট দিয়েছে এবং তিনি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন, তাঁর প্রতিবাদ প্রকাশ পেয়েছে উপন্যাসে। আশাপূর্ণার সমাজভাবনায় মেয়েদের দিকটিই বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচনায় ফুটে উঠেছে মেয়েদের অবমাননার দিক। নিরুপমা বরগোহাঞিও নারীর সমস্যা লিখেছেন তবে তাঁর রচনায় নারী সমস্যার পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব পড়ার কথাও বলেছেন তিনি।

গ্রাম শহরের সংস্কৃতির বৈপরীত্য, শ্রেণি শোষণ, আধিপত্যবাদের প্রবল চাপ — এই বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে নিরুপমা স্থাপন করেছেন তাঁর (আলোচিত) উপন্যাসগুলিতে নারীর জীবনযন্ত্রণার কাহিনি। আশাপূর্ণার উপন্যাসে প্রেক্ষিতের নানা প্রসঙ্গ এলেও, ফ্রেমটি নিরুপমার মতো বৃহৎ নয়। তবু, আন্তরিক পর্যবেক্ষণের শক্তিতে, বয়নের তন্বিষ্ট (objective) বিন্যাসরীতিতে আশাপূর্ণা ও নিরুপমার রচনা দাঁড়ায় একই সমতলে। একে অন্যের পরিপূরক হয়ে। মতাদর্শগত ভিন্নতা সত্ত্বেও সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি এবং পরিবার-প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক উন্মোচনে দুজন লেখিকাই পাঠকচিত্তে জাগিয়ে দেন প্রশ্নমালা। এই লক্ষভেদিতায় সফল হয়ে ওঠেন দুই ভিন্ন ভাষার দুই কথাকার।

।। পাঁচ ।।

ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্বে সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে নারীমুক্তির আন্দোলনও প্রবল হয়ে উঠেছে। সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। নারী পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক চলছে। বিভিন্ন সমাজিক সমস্যার মতো নারীর সমস্যার প্রশ্নেও বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন নারীর সমস্যা বলে স্বতন্ত্র কোনো সমস্যা নেই, তারা শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রমজীবী মানুষের সমস্যার সঙ্গে নারীর সমস্যাকে এক করে দেখেছেন। আর একদল স্ত্রীদের গৃহের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থেকে মা কিংবা স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ থাকাকেই প্রকৃতির নিয়ম বলেছেন, বৈবাহিক বন্ধনকেই তারা গুরুত্ব দিয়েছেন। নারীর পরাধীনতা, দাসত্ব, দুঃখ কষ্টের প্রতি তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। সময়ঘড়ি যত এগিয়ে চলেছে নারী পুরুষ সমানাধিকারের প্রশ্নে চিন্তা তত বিচিত্র, জটিল, এমনকী পরস্পরবিরোধী তাত্ত্বিক অবস্থান নিয়েছে। নারীচেতনাবাদীরা নারীচিন্তার পটবদলকে কয়েকটি পর্যায়ে বা তরঙ্গে পৃথক করেছেন। নারী মুক্তির আন্দোলনে নারী পুরুষ উভয়েই ভাগ নিয়েছে। নারীর অবস্থার উন্নতির পেছনে বহু উদার, সমাজ সচেতন পুরুষেরও অবদান রয়েছে, উনিশ শতকের বাঙালির সামাজিক - সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তার পরিচয় মিলবে।

সমাজ বিকাশের যে স্তরে কৃষির বিকাশ এবং পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা সেই স্তরে নারী ছিল পুরুষের প্রধান ভৃত্য। যার কাজ ছিল সন্তান পালন, পরিধেয় প্রস্তুত, বাসযোগ্য কুটির তৈরি ইত্যাদি। লাঙল আবিষ্কারের পর্বে লাঙল টানা ও ফসল সংগ্রহ করত মেয়েরা। অতিরিক্ত শ্রম ও দাসত্বের দ্বিগুণ বোঝার ভারে নারীর মানসিক দিকটার উন্নতি হল কম। যাযাবরদের মতো নারী আর শুধু পুরুষের নর্মসঙ্গিনী না থেকে হয়ে উঠল জননী, কন্যা, বধূ — দায়িত্ব তার বেড়ে গেল। তাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল সংসার। এই ভূমিকারই স্বীকৃতি পাই 'গৃহিনী গৃহমুচ্যতে' ইত্যাদি প্রবাদে। অথচ এই নারীরাই ছিল পুরুষের কাছে হস্তান্তরযোগ্য, বিনিময়যোগ্য। মালিক কিংবা পিতার কাছ থেকে মূল্যবান বস্তুর বিনিময়ে কিনে আনা হত নারীকে, আর নারী হত পুরুষের হাতের পুতুল। তাই তারা নারীকে ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ ও বর্জন করতে পারত। এইভাবেই নারীর পণ্য হওয়ার সূত্রপাত হয়েছে আজকের বিশ্বায়নের যুগের বহু পূর্বেই।

নারী সারাজীবনই পরাধীন। প্রথমাবস্থায় পিতার অধীন তার পর স্বামীর এবং শেষে পুত্রের অধীন। নারীর নিজস্ব পরিসর বলতে কিছু নেই। কেবল ভোগ্যবস্তু তারা, পুরুষ তাকে নিয়ে নিজের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে পারে। কেবল সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, যৌন সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও নারীকে পুরুষের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। নারীকে প্রাচ্য-পশ্চিমের প্রতিবেদনে, প্লেটো-ডিমিস্থিনিস কিংবা মনু-আপস্তম্ভ-বৌধায়ন — সর্বত্র নারী হলো অকল্যাণের আকর, আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র। নারীর যে ইতিহাসকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজচিন্তায় কেন্দ্র থেকে সরিয়ে গার্হস্থ্য জীবনের গণ্ডিতে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেই বদ্ধ নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞতাকে সর্বসাধারণের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন নারীচেতনাবাদীরা। নারীচেতনাবাদ একটি রাজনৈতিক তর্ক হওয়ায় নারীচেতনাবাদীদের প্রথম দায় নারীর নিপীড়ন, দমন, নিগ্রহ ও অসাম্যের উৎস সন্ধান করা। নারীচেতনাবাদের প্রস্তুতি পর্ব বহু আগে থেকে শুরু হলেও উনিশ শতকের শেষের দিকে নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞান সন্ধান স্পষ্ট প্রত্যয় লাভ করেছে। নারী-পুরুষের নর্মসঙ্গিনী, যৌন পুত্তলিকা হয়ে থাকাকে অস্বীকার করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজমানসতায় কুঠারাঘাত করেছে।

প্রথম তরঙ্গের পাশ্চাত্য নারীচেতনাবাদী ভাবুক পুরুষের জগতের বাইরে এবং গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যে আটক রাখার কথাই ভাবেন। দ্বিতীয় তরঙ্গে সমাজ জীবনকে বিশ্লেষণ করে তাতে যৌনতা ও পারিবারিক সম্পর্ককে যুক্ত করা হয়েছে। পুরুষের আদলে নারীর নিজস্ব অভিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ফুটে ওঠে না। তাই ষাটের দশকে পাশ্চাত্য নারীবাদীরা 'যা ব্যক্তিগত তা রাজনৈতিক' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে গার্হস্থ্য সমস্যাকে রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত করেন। অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলনের মতো নারীচেতনাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনেও নিজস্ব সংঘর্ষ দেখা দেয়। দরিদ্র, কৃষ্ণাঙ্গিনী, লিসবিয়ান, অ-ইউরোপীয়রা প্রথমদিকের ধারাতে নেই বলে তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে কারণ মূলস্রোতে শ্বেতাঙ্গিণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির অধিকারে ছিল।

লিবার‍্যাল বা উদারপন্থী বলা হয়েছে প্রথম নারীচিন্তার স্ফূরণটিকে। লিবার‍্যালিজম শুধু রাজনৈতিক অবস্থাকেই চিহ্নিত করে না, এর সঙ্গে মেটাফিসিক্স বা অধিবিদ্যা এবং জাস্টিসের ধারণাও যুক্ত থাকে। লিবার‍্যাল নারীবাদীরা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের উপর গুরত্ব দিয়েছেন। ষাটের দশকে ইউরোপ আমেরিকার নাগরিক অধিকার ও বামপন্থী আন্দোলন থেকে সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় তরঙ্গ ঃ র‍্যাডিকাল নারীবাদ বা সংস্কারপন্থী নারীবাদ। তারা পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোসহীন। উদারপন্থী ও সমাজবাদীরা পুরুষ দার্শনিকের গড়া কাঠামো মানলেও র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা তা মেনে নেন নি। তারা নারীর ব্যক্তিগত জীবন, দৈহিক ও মানসিক সুখের প্রসঙ্গকে তর্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। উদারপন্থীরা সমাজকাঠামো বহাল রেখেই নারী পুরুষের অসাম্যকে দূর করার চেষ্টা করলেও র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা ব্যক্তিগত সমস্যার উপর বেশি গুরুত্ব দিলেন। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা কমিউন বানানো, নারী উৎসব পালন করা, ব্যবসার উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির উপর বেশি জোর দিয়েছেন। কোনো কোনো র‍্যাডিকাল নারীবাদী সরাসরি পুরুষকে বাদ দেওয়ার কথা বলেছেন। লেসবিয়ান হওয়া বা কুমারী থাকার কথা বলেছেন। লেলিন ও স্তালিনের রূপায়িত

ধ্রুপদী মার্ক্সবাদে নারীকে একটি পৃথক শ্রেণি রূপে স্বীকৃতি না দিয়ে, নারীপুরুষের স্থিতিকে অভিন্ন মনে করা হয়েছে। ধ্রুপদী মার্ক্সবাদ মনে করে নারী শ্রমিক ও পুরুষ শ্রমিক অস্তিত্বের বস্তু স্থিতিকে বিপ্লবের দ্বারা একযোগে মুক্তি লাভ করতে পারে। অ-মার্ক্সীয়রা শ্রেণি বিশেষের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক সন্দেহজনক বলেছেন। তারা পুঁজিবাদের বাজারে গার্হস্থ্য শ্রমকে কীভাবে নেওয়া হচ্ছে তা দেখিয়ে, শ্রমের বাজারে লিঙ্গ ও জাতিভিত্তিক অসাম্যকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

অর্থসামাজিক পরিস্থিতির দ্রুত বদলে সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্বেও পরিবর্তন ঘটেছে এবং নারীচেতনাবাদ তৃতীয় তরঙ্গের থেকেও এগিয়ে গেছে অরও অনেক জটিল প্রবণতা ও অভিঘাতের দিকে। তাই জুলিয়েট মিচেল, কেইট মিলেট, আদ্রিয়েনা রীচ, এলেন রীচ, এলেন শোয়াল্টের, হেলেন সিক্সো, লুসি ইরিগেরে, জুলিয়া ক্রিস্টেভা, তোরিল মোই, টেরি ঈগলটন প্রমুখের চিন্তাস্রোতে অজস্র আবর্ত সত্ত্বেও তাঁরা সহযাত্রী নন, তাদের প্রতিবেদনে রয়েছে বিচিত্র ভিন্নতা। আকরণোত্তরবাদ, উপনিবেশোত্তর চেতনা, আধুনিকোত্তরবাদ এবং বিনির্মাণবাদ নারীচৈতন্যকে সূক্ষ্মতা ও কৌণিকতা দান করেছে। ইউরোপীয় নারীর তুলনায় মধ্যযুগ এমনকি আধুনিক পর্বেও ভারতীয় নারীর জীবন বেশি কঠোর শৃঙ্খলা ও বিধিনিষেধে বন্দী ছিল। বিবাহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছাড়া কোনো প্রকার সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীর যোগদান নিষিদ্ধ ছিল। অসমের সত্রানুষ্ঠানসমূহে এখনও স্ত্রীর প্রবেশাধিকার নেই। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সমাজ সংস্কারকগণ বিধবা বিবাহ [illegible]রোধ ও স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন করলে ছৰদচ্ছৰধুবিহু.ছসাম—ৰল্য সিহলঅজ

উপন্যাসেও দেখতে পাওয়া যায়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সারদার জীবনে নেমে আসা ঘনান্ধকারের মূলে রয়েছে বহুবিবাহ প্রথা। সারদার স্বামী রাসুকে দ্বিতীয়বার পটলীর সঙ্গে বিয়ে করানো হয় পটলীর লগ্নভ্রষ্টা হবার ভয়ে। তারপর থেকেই সারদার জীবনে আসে সতীনের ঘর করার পালা। 'অন্যজীবন' উপন্যাসেও রজকান্তের প্রথমা স্ত্রী লক্ষীমপুরিয়ানী থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিয়ের কথা রয়েছে। দুই তিনটি বিয়ে করা যেন তখনকার অসমীয়া সমাজেও স্বাভাবিক ঘটনাই ছিল।

মেয়েদের অধিকারহীনতা ও নিরুপায়তা, হীন অবস্থান আশাপূর্ণা দেবীকে আঘাত হেনেছে। আশাপূর্ণা দেবী দীর্ঘ সময়ব্যাপী তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে নারীর অন্তরবেদনাকে এত গভীর আর্তি দিয়ে প্রকাশ করেছেন যে তাঁর নারীচেতনাবোধ আমাদের নারীর বন্দিত্ব নিয়ে ভাবিয়েছে। নারীর বন্ধনদশাকে তিনি অন্তঃপুর থেকেই অনুভব করেছেন। বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখেননি তাই তাঁর অনুভব আমাদের অনেক বেশি স্পর্শ করেছে। পুরুষশাসিত সমাজে বন্দিনীদের মধ্যেই আবার কেউ মুক্তির জন্য ছটফট করেছে। তাই কখনো কখনো তারা সমাজে বহমান স্রোতের বিপরীতমুখী অভিযান চালিয়েছে। সুবর্ণর মৃত্যুর পর মেয়ে বকুলের প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়েও লেখিকা সেই বন্দিনীদের বোবা যন্ত্রণাকেই আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তবে 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে আশাপূর্ণা দেবী সুবর্ণকে দিয়ে মেয়েদের অবজ্ঞার প্রতিশোধ নিয়েছেন। সুবর্ণ আপন যন্ত্রণার প্রতিশোধ নিয়েছে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবং ডাক্তারের চিকিৎসাকে গ্রহণ না করে মৃত্যুর দিকে নিজেকে ঠেলে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। অপরদিকে নিরুপমা বাইরে থেকে গ্রামের অন্তঃপুরের জীবনকে দেখেছেন। তাছাড়া নিজের জীবনেও অন্তঃপুরের বন্দিত্বকে অনুভব করেন নি কখনও। নিজ কর্মকাণ্ডেও তিনি বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে পেরেছেন তাই তিনি নারীপুরুষের ব্যবধানকে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটেই অনুভব করেছেন। তাই আশাপূর্ণার মতো নিরুপমার উপন্যাসে অন্তঃপুরবন্দী নারীর করুণ আর্তনাদ না থাকলেও সামাজিকভাবে নারীপুরুষের ব্যবধানজনিত প্রতিবাদের ভাষা রয়েছে। তাছাড়া 'অন্যজীবন' উপন্যাসে রম্ভার উপর হওয়া অত্যাচার তথা অন্যান্য গ্রাম্য নারীর সহ্য করা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর সহ্য করা অত্যাচার-অবিচার, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, তারই সঙ্গে ত্যাগের নামে 'অপর' হিসাবে নারীকে সব কিছুর কেন্দ্র থেকে দূরে সরিয়ে রাখাকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখিকা। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাসেও নারীর নির্যাতিত রূপকে দেখানো হয়েছে। পুরুষশাসিত সমাজে সবকিছুর জন্য নারীকে দায়ী করানোর মানসিকতারও উৎঘাটন ঘটিয়েছেন লেখিকা। তারই সঙ্গে সমাজ মানুষের মানসিকতার পরিবর্তনে নারীর ভূমিকাকে দেখানোর প্রয়াস চালিয়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি দুই লেখিকাই নারীচেতনাবাদী। নারীর অধিকার সম্পর্কে সজাগ, দুজনেই নারীর পুরুষের সামাজিক ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন এবং প্রয়োজনে তাঁদের নারী চরিত্রগুলিকে প্রতিবাদমুখর হতেও দেখা গেছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীকে 'অপর' হিসাবে দূরে সরিয়ে রাখার প্রবণতাকে আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন।

আশাপূর্ণার নারীচরিত্র সমূহ অন্তঃপুরের বন্দিত্ব থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস চালিয়েছে। গৃহবধু আশাপূর্ণা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিলেন অন্তঃপুর বন্দিনী নারীর মনস্তত্বকে, বুঝতে পেয়েছিলেন পুরুষশাসিত সমাজে নারীর অবস্থানকে। তাইতো সুবর্ণলতার মুখ দিয়ে তিনি বলেছেন যে নারীরা হলো চাকরেরও চাকরাণী। মেয়েদের পরাধীনতার কথা সুবর্ণলতার মা সত্যও অনুভব করেছে, তাইতো মেয়ে সুবর্ণকে দেওয়া চিঠির মধ্যে মেয়েদের পরাধীনতার কথা উল্লেখ করেছে। তবে শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তনের আশাও করেছেন আশাপূর্ণা দেবী।

অপরদিকে নিরুপমা বাইরের থেকে গ্রামের অন্তঃপুরের জীবনকে দেখেছেন। তাছাড়া নিজের জীবনেও অন্তঃপুরের বন্দিত্বকে অনুভব করেননি তিনি। কর্মজীবনেও বৃহত্তর সামাজিক পরিসরে তিনি নিজেকে জড়িত রেখেছেন তাই তিনি নারীপুরুষের ব্যবধানকে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটেই অনুভব করেছেন। তাই আশাপূর্ণার মতো তাঁর রচনার অন্তঃপুরবন্দী নারীর করুণ আর্তনাদ নেই, রয়েছে সামাজিকভাবে নারীপুরুষের ব্যবধানজনিত প্রতিবাদের ভাষা। 'অভিযাত্রী' উপন্যাসে পূর্ণশর্মা চন্দ্রপ্রভাকে ছেলেসুলভ চরিত্র বললে চন্দ্রপ্রভা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নগাঁও সাহিত্য সভায় মেয়েদের পর্দার পিছনে বসতে দিলে চন্দ্রপ্রভা প্রতিবাদ জানিয়ে বক্তৃতায় পুরুষপ্রধান সমাজের সামনে প্রশ্ন রেখেছেন যে নারীরা পুরুষের সমান আসনে বসার উপযুক্ত নয় কি?

এভাবেই ভিন্ন প্রেক্ষিতে দুজন লেখিকাই নারীর সমানাধিকার ও মুক্তির সংগ্রামে উদারমনা যুক্তিশীল পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দুই লেখিকাই উদার নৈতিক নারীচেতনার দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। নারীবাদী ভাবুক হিসাবে আশাপূর্ণাকে উদারনৈতিক বা লিবার‍্যাল নারীবাদী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ইউরোপীয় চিন্তায় দ্বিতীয় তরঙ্গের গোড়ার দিকের জিজ্ঞাসাও তাঁর রচনায় পেয়ে যাই আমরা। অন্যদিকে নিরুপমাও লিবার‍্যাল, কিন্তু মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে মার্কসীয় নারীবীক্ষাবাদী করে তুলেছে। উদাহরণ সহযোগে আমরা দেখিয়েছি, গৃহশ্রমের প্রশ্ন, তার আর্থিক মূল্যায়ণ, কর্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের শ্রমের মূল্যের পার্থক্য এসব বিষয়কে তিনি স্পর্শ করেছেন মার্ক্সবাদী অবস্থান থেকেই। তবে, নির্দিষ্ট কোনো তরঙ্গ অথবা 'স্কুল'ভুক্ত করে কোনো কথাকারকে দেখানোর চেষ্টাও খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। দুটি প্রতিবেশী ভাষার দুই প্রজন্মের দুই লেখিকা (প্রজন্ম ব্যবধান আশাপূর্ণা ও নিরুপমার মধ্যে যতখানি সময়গত, তার চেয়ে বেশি মানসিকতার দিক দিয়ে) স্ব-স্ব সমাজের প্রেক্ষিতের (Context) আধারে তাঁদের পাঠকৃতি (text) কে স্থাপন করেছেন, তন্ময় (objective) দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সম্পর্ক, নারীর সমানাধিকার, মানুষ হিসাবে মর্যাদার আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি নিয়ে ভেবেছেন, বিকল্পের প্রস্তাব রেখেছেন। আখ্যানের অন্তর্বয়নে পুরুষতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সমালোচনা মাত্র নয়, বৈপ্লবিক রূপান্তরের এষণাটুকুও গেঁথে রেখেছেন তাঁরা। স্বর ও সুরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এখানেই দুই লেখিকা দাঁড়ান পাশাপাশি, অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবোচ্ছ্বাসকে কনক্রিট উপলব্ধির তটে নিয়ে যায় দুই ভাষার দুই লেখিকার রচনার যুগপৎ অধ্যয়নের অভিজ্ঞতা।

।। ছয় ।।

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞিঃ দুই লেখিকাই নারীর পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যাকেই প্রধান করে দেখেছেন উপন্যাসের মধ্যে। তাই তাদের রচনায় নারী চরিত্রগুলিই বেশি বলিষ্ঠরূপে প্রকাশ পেয়েছে। পুরুষ চরিত্র থেকে নারী চরিত্রগুলিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে দুজনেরই কথাবিশ্বে। আশাপূর্ণার উপন্যাসের দুই একটি পুরুষ চরিত্র যেমন — রামকালী, ভবতোষ মাস্টার, তেমনই নিরুপমার উপন্যাসের দুই একটি পুরুষ চরিত্র যেমন — রাতিরাম মজুমদার, নরেন মাস্টার ছাড়া তেমন কোনো বলিষ্ঠ পুরুষ চরিত্র আমাদের চোখে পড়ে না।

আশাপূর্ণার প্রধান নারী চরিত্র যেমন সত্যবতী ('প্রথম প্রতিশ্রুতি'), সুবর্ণলতা ('সুবর্ণলতা') চরিত্রগুলিকে লেখিকা প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি রূপে সৃষ্টি করেছেন তেমনি নিরুপমার অণিমা ('অন্যজীবন'), চন্দ্রপ্রভা ('অভিযাত্রী') কেও প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি রূপেই গড়ে তুলেছেন। তবে দুই লেখিকার উপন্যাসেই পার্শ্ব নারীচরিত্রের মধ্যেও প্রতিবাদী সত্তা লক্ষিত হয়েছে যেমন আশাপূর্ণার উপন্যাসে সারদা ('প্রথম প্রতিশ্রুতি'), পারুল ('সুবর্ণলতা'), শম্পা ('বকুলকথা') তেমনি নিরুপমার পুতলী ('অন্যজীবন'), আইকণ ('অন্যজীবন'), অঞ্জলি ('ইপারর ঘর সিপারর ঘর') চরিত্রগুলির মধ্যে।

আশাপূর্ণা কিছু কিছু চরিত্রকে অধ্যয়নশীল করে এঁকেছেন, কিন্তু নিরুপমার উপন্যাসে বহু চরিত্রই অধ্যয়নশীল। আশাপূর্ণার লেখায় প্রধান নারী চরিত্রগুলির চেতনাগহনের বিশ্লেষণের প্রবণতা কম। ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় নাটকীয় সংলাপে চরিত্রগুলি স্বয়ংপ্রকাশ হয়ে উঠেছে। কম বেশি এই লেখিকার চরিত্রগুলি একমাত্রিক ও সরলগোত্রের ফ্ল্যাট চরিত্র। নিরুপমা শুধু ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চরিত্র গড়েন না। নাটকীয় পদ্ধতির পাশাপাশি তাঁর শিক্ষিত চরিত্রগুলির গহন অন্তঃপ্রদেশে ডুব দিয়ে চরিত্রের আভ্যন্তর দ্বন্দ্ব সংঘাতের আভাস দিয়েছেন লেখিকা। তাই চরিত্রগুলি নানামাত্রিক ও জটিল গোত্রের।

আশাপূর্ণা দেবী ও নিরুপমা বরগোহাঞিঃ দুজনেই নাগরিক পরিবেশে বড় হলেও আশাপূর্ণা অন্তঃপুরের গণ্ডিকে অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের বিশেষ সুযোগ পান নি অপরপক্ষে নিরুপমা কর্মসূত্রে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের অবকাশ পেয়েছেন। আশাপূর্ণা যেহেতু অন্তঃপুরের গণ্ডিকেই দেখেছেন তাই তাঁর চরিত্রগুলিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই অন্তঃপুরের গণ্ডি থেকেই বিচার করতে দেখা গেছে। তিনি মধ্যবিত্ত অন্তঃপুরের প্রতিনিধি করেই গড়ে তুলেছেন চরিত্রগুলিকে। তবে যেহেতু তিনি অন্তঃপুরকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছেন তাই তাঁর চরিত্রগুলিতে ফুটে ওঠা অন্তঃপুরচারী নারী চরিত্রের আর্তনাদ আমাদের স্পর্শ করেছে অনেক বেশি; তাই তারা হয়ে উঠেছে জীবন্ত মূর্তি। অপরদিকে নিরুপমা বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের সঙ্গে যোগ হেতু সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে তাঁর

উপন্যাসের চরিত্র নির্বাচন করেছেন। নিরুপমা নাগরিক সভ্যতায় বড় হলেও গ্রাম্যজীবনের প্রতি আসক্তি হেতু গ্রাম্য জীবনের নারীর বিভিন্ন ঘরোয়া ও সামাজিক সমস্যাকে ফুটিয়ে তুলেছেন চরিত্রের বয়ানে। তবে তিনি নাগরিক জীবন থেকে উঁকি মেরে গ্রাম্য নারীর জীবনকে দেখার প্রয়াস করেছেন। নাগরিক সভ্যতায় লালিত পালিত হলেও, দূর থেকে গ্রাম জীবনকে উপলব্ধি করলেও চরিত্রগুলির রূপদানে কোনোপ্রকার ফাঁকি আমাদের চোখে পড়ে নি। নিরুপমার চরিত্রগুলির চেতনাগহনের চিন্তাধারা ভাবনা আশাপূর্ণার মতো পারিবারিক গণ্ডিতে আবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। তাই চরিত্রগুলির মধ্যে পারিবারিক সমস্যা ছাড়াও সমাজ পরিবেশের বিভিন্ন সমস্যাও আলোড়ন তুলেছে।

আশাপূর্ণা দেবীর নারীচরিত্র যেমন সত্যবতী, সুবর্ণলতা, পারুল ও বকুল এর মধ্যে মানসিকতায় অমিল থাকলেও গুণগত দিক থেকে মিল রয়েছে। সব কয়টি চরিত্রই নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতন তবে সত্যবতী, সুবর্ণলতা ও পারুল চরিত্রগুলির মধ্যে প্রতিবাদী সত্তা দান করলেও বকুল চরিত্রটিকে প্রতিবাদী রূপে সৃষ্টি করেন নি লেখিকা। তবে প্রত্যেকটি চরিত্রকেই কার্যকলাপ, মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য দান করেছেন লেখিকা। অপরদিকে নিরুপমা বরগোহাঞি বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশ থেকে নারী চরিত্রগুলি নিয়ে এলেও মানসিক গঠনের দিক থেকে চরিত্রগুলির মধ্যে কিছু মিল দেখা যায়। চরিত্রগুলিকে লেখিকা মানবতাবাদী ও নারীবাদী রূপে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালিয়েছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' উপন্যাসের সত্যবতী চরিত্রটির সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে নিরুপমা বরগোহাঞির 'অভিযাত্রী' উপন্যাসের চন্দ্রপ্রভার মিল দেখা যায়। দুজনেই সাহসী, স্পষ্টবাদী ও নারীবাদী ভাবাপন্ন। উভয় চরিত্রকেই প্রতিবাদী, নারীপুরুষের সামাজিক ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন ও প্রয়োজনে প্রতিবাদমুখর হতেও দেখা গেছে। পুণ্যির মুখে বিদ্যা শিখলে মেয়েদের পাপ হয় একথা শুনেও সত্য প্রতিবাদ করে উঠেছে। একই সুর শুনতে পাওয়া যায় চন্দ্রপ্রভার বয়ানে। পুরুষ হলে ডাক্তারি পড়তে পারে আর নারী হলে পারে না কোন ভগবান এই বিধান দিয়েছেন বলে তিনি বোন রামেশ্বরীকে প্রশ্ন করেছেন। এমনকি ছেলেদের মতো করেই স্কুলে তাঁদের শাস্তি দেওয়ার কথা নিয়ে বোন রজনীপ্রভার মুখে বিভেদসূচক কথা শুনলে চন্দ্রপ্রভা প্রতিবাদ করে রজনীপ্রভার বিভেদসূচক দৃষ্টিভঙ্গিকে খণ্ডন করেছেন।

ঊনবিংশ শতকের সত্যবতী ও বিংশ শতাব্দীর চন্দ্রপ্রভা উভয়েই সমাজে নারী পুরুষের সমানাধিকার স্থাপনে তথা নারীর উন্নতির জন্য বিদ্যার প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছে। সত্যবতী ও চন্দ্রপ্রভা দুজনেই নারীর অধিকারহীনতা নিয়ে প্রতিবাদ করলেও দুজনের প্রতিবাদের স্বরূপের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষিত হয়েছে। সত্যবতী সামাজিকভাবে প্রতিবাদ না করলেও নিজের জীবনেও প্রতিবাদী সত্তাকে অব্যাহত রেখেছে। তাই স্বামী না চাইলেও স্বামীকে না জানিয়ে ভবতোষ মাস্টারের প্রতিষ্ঠিত 'সর্বমঙ্গল বিদ্যাপীঠে' পড়াতে গেছে, এমনকি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নবকুমার সত্যর অজান্তে

মেয়েকে অল্পবয়সে বিয়ে দিলে তার প্রতিবাদে স্বামীর সংসার ত্যাগ করতেও দ্বিধাগ্রস্ত হতে দেখা যায় নি সত্যকে। তবে স্বামীর অস্তিত্বকে একেবারে নস্যাৎ করে দিতেও তাকে কখনও দেখা যায় নি তাইতো গৃহত্যাগের পূর্বে রক্ষণশীল মনোভাব লক্ষিত হয়েছে সত্যবতীর স্বামী নবকুমারকে প্রণাম করার মধ্য দিয়ে।

অপরদিকে চন্দ্রপ্রভা নারী পুরুষের বৈষম্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নারীর উন্নতির জন্য স্ত্রী শিক্ষা প্রচারের জন্য দৃঢ় সংকল্প নিয়েছেন, নারীর উন্নতির কল্পে, সামগ্রিকভাবে নারীর উন্নতির জন্য মহিলা সমিতি গঠন করার মধ্য দিয়ে গঠনমূলক কাজ করেছেন, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নারী শিক্ষার বার্তা, অবৈধ সন্তানের জন্মদান, সমাজের অপবাদ সহ্য করা, জাতপাতের উত্তরণের মানসিকতা নিয়ে ব্যতিক্রমী হয়ে উঠলেও নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের কোনো প্রতিবাদ করতে তাঁকে দেখা যায় নি। নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব পোষণ করেছেন তিনি। চন্দ্রপ্রভা দণ্ডীনাথকে ভালোবেসেছেন ও অবৈধ সন্তানের জননী হয়েছেন কিন্তু দণ্ডীনাথের প্রেমের প্রতারণার তিনি প্রতিবাদ করেন নি। বরং সারা জীবন দণ্ডীনাথের নামে সিঁদুর পরেছেন এবং দণ্ডীনাথের মৃত্যুর পর সিঁথির সিঁদুর মুছে ফেলেছেন। দণ্ডীনাথের উপর কোনো কোনো সময় অভিমান করলেও, তাঁকে দোষারোপ করলেও তাঁর হৃদয়ের প্রেমের কোন ঘাটতি হতে দেখা যায় নি এবং দণ্ডীনাথ প্রেরিত সামান্য কিছু টাকাও তাঁকে গ্রহণ করতে দেখা গেছে।

সত্য ও চন্দ্রপ্রভার ব্যতিক্রমী হওয়ার মধ্যে দুজনেরই পিতার যথেষ্ট অবদানের আভাস দিয়েছেন দুই লেখিকাই। সত্যর পৃষ্ঠবল যেমন রামকালী তেমনি চন্দ্রপ্রভার পৃষ্ঠবল ছিলেন পিতা রাতিরাম মজুমদার। সত্য যেমন জীবনের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিতাকে জানিয়ে এবং গৃহত্যাগ করার পর পিতার সঙ্গে কাশীতেই থেকেছে তেমনি চন্দ্রপ্রভাও পিতার মৃত্যুতে নিঃসঙ্গ বোধ করেছেন কারণ তাঁর পিতাই ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠবল। এই পিতাকে শ্রদ্ধা জানিয়েই চন্দ্রপ্রভা লিখেছেন 'পিতৃভিটা' উপন্যাসটি।

আশাপূর্ণা দেবী সুবর্ণকেও প্রতিবাদী রূপেই সৃষ্টি করেছেন। তবে বকুলকথার বকুলকে আমরা প্রতিবাদের প্রতিমূর্তি রূপে পাই নি। সত্যবতী ও সুবর্ণরা যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেছিল সে মুক্তি বকুল অনায়াসেই পেয়ে গেছে, হয়তো বা সে কারণেই বকুলকে তেমন প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখা যায় নি। কিন্তু অনামিকা দেবী হয়ে বকুল পদে পদে অনুভব করেছে মা দিদিমারা যে মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন নিজেদের জীবনকে বিলীন করে দিয়ে, সেই মুক্তির স্বেচ্ছাচারী অপপ্রয়োগকে। অলকা, সত্যভামারা স্ত্রী স্বাধীনতার অপপ্রয়োগ করছে দেখে বকুল ওরফে অনামিকা দেবী প্রতিনিয়ত দগ্ধ হয়েছেন, হয়তোবা লেখিকা অনামিকা দেবীর অন্তরালে পরোক্ষভাবে উগ্র আধুনিকতাকে নীরবে সমালোচনা করেছেন লেখিকা। তাই লেখিকা অলকা, সত্যভামা, রেখা ইত্যাদি চরিত্রকে উগ্র আধুনিক করে গড়ে তুলেছেন। আশাপূর্ণা দেবী নারীর মুক্তি চেয়েছিলেন, অবহেলার অবসান চেয়েছিলেন কিন্তু স্বেচ্ছাচারিতাকে চান নি কখনও। অপরদিকে নিরুপমার কোনো চরিত্রের মধ্যেই

অন্তঃপুরের দাহ, কিংবা উগ্র আধুনিকতা লক্ষ করা যায় না, তাঁর নারীচরিত্রের মধ্যে নারীর সামূহিক সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠেছে। অণিমা, পুতলীরা নারীবাদের সমর্থন করেছে, প্রথমে তারা উগ্র নারীবাদ তথা মৌলবাদকে সমর্থন করলেও পরবর্তীতে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়ে তারা মার্ক্সবাদী তথা সাম্যবাদী নারীবাদের সমর্থক হয়ে উঠেছে। লেখিকার সৃষ্ট চরিত্র পুতলী নিজেকে মার্ক্সবাদী বলে ঘোষণা করেছে। এর মধ্য দিয়ে নিরুপমা বরগোহাঞি মার্ক্সবাদী নারীবাদের সমর্থনই করেছেন।

আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সত্যর মা ভুবনেশ্বরী এবং অভিযাত্রীর চন্দ্রপ্রভার মা গঙ্গাপ্রিয়ার মধ্যেও সাদৃশ্য রয়েছে। উভয়েই মাতৃত্বের আদিকল্পে গড়া স্নেহময়ী ও করুণাময়ী রূপে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়েছেন। ভুবনেশ্বরী যেমন সত্যর দুরন্তপনার জন্য সত্যর ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত তেমনি চন্দ্রপ্রভা মেয়ে হয়েও অতিরিক্ত সাহস দেখানোর জন্যে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে সারা জীবন চিন্তা করেছেন মা গঙ্গাপ্রিয়া। তবে দুজনের মধ্যে একটি তফাৎও রয়েছে। ভুবনেশ্বরী বিদ্যার মূল্যকে অনুভব করতে পারেন নি। তাই মেয়ের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ তাঁকে চিন্তিত করেছে। কিন্তু গঙ্গাপ্রিয়া গ্রাম্য শিক্ষাদীক্ষাহীন নারী হয়েও শিক্ষার মূল্যকে অনুভব করেছেন এবং মেয়েদের শিক্ষালাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন।

অধ্যয়নশীলতার দিক থেকে সুবর্ণ ও অঞ্জলি চরিত্রদুটির মিল রয়েছে। দুজনেই অধ্যয়নশীল। সুবর্ণ অনেক বই পড়েছে। অঞ্জলিও অনেক বইপত্র পড়ে এবং কথায় কথায় বই থেকে উদ্ধৃতি টেনে কথা বলে। নিরুপমার উপন্যাসের অঞ্জলি তথা অণিমাকে সাহিত্য থেকে জীবনরস আহরণ করতে দেখা গেছে। তবে আশাপূর্ণার নারীচরিত্রকে এভাবে বিশ্বসাহিত্য থেকে জীবনরস আহরণ করতে দেখা যায় নি।

আশাপূর্ণার কোনো চরিত্রের মধ্যে তেমন রোমান্টিকতা লক্ষ করা যায় না। বকুলকথায় বকুল নির্মলের প্রেমে পড়লেও সেই প্রেম প্রকাশ্যে আনার সাহস তার হয় নি। শম্পা চরিত্রটির মধ্যে প্রেমিকা সত্তার কিছু আভাস তিনি দিয়েছেন এবং শম্পা প্রেমবিবাহ করেছে। কিন্তু নিরুপমার বেশিরভাগ চরিত্র যেমন অণিমা, অঞ্জলি, চন্দ্রপ্রভাকে রোমান্টিক করে গড়ে তুলেছেন। তারা শুধু রোমান্টিকই নয়, তাদের প্রেমবিবাহও হয়েছে। যদিও চন্দ্রপ্রভার প্রেমবিবাহ সামাজিক মর্যাদা পায় নি। তাছাড়াও 'অভিযাত্রী'র যোগমায়া, রজনীপ্রভারও প্রেমবিবাহ হয়েছে। যোগমায়াতো বিধবা বিবাহেরও উদাহরণ বহন করে এনেছে। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর'-এর পটেশ্বরীর প্রেম করে পূজনের সঙ্গে পালিয়ে গেছে এবং অন্যজীবন'-এর পুতলীও নরেন মাস্টারকে ভালোবেসেছে।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে আমরা এলোকেশী, মুক্তকেশী ও মোক্ষদার মত উপনিবেশগ্রস্ত মানসিকতার নারীচরিত্রও পাই যারা তাদের জীবনকে অতিবাহিত করেছে পুরুষতন্ত্রের ধারক ও বাহক রূপে। নিরুপমার উপন্যাসে পুরুষতন্ত্রের আদলে গড়ে ওঠা নারীচরিত্র আমাদের চোখে পড়ে না। আশাপূর্ণার উপন্যাসে প্রবোধচন্দ্রের মতো অত্যাচারী পুরুষ চরিত্রকে যেমন পাই তেমনি নিরুপমার উপন্যাসেও রম্ভার স্বামী কণদদাইটির মতো অত্যাচারী পুরুষকে নিয়ে এসেছেন লেখিকা। তবে

রম্ভার মতো নির্মম অত্যাচার ভোগ করা কোন চরিত্রই আমরা আশাপূর্ণার উপন্যাসে পাই না এবং কোনো চরিত্রকে আত্মহত্যাও করতে দেখা যায় নি।

আশাপূর্ণার উপন্যাসে 'বকুলকথা'র নির্মল (সুনির্মল) চরিত্রটির সঙ্গে নিরুপমা বরগোহাঞির অভিযাত্রী উপন্যাসের দণ্ডীনাথ কলিতা চরিত্রটির বাহ্যিক মিল রয়েছে। সুনির্মলের মধ্যে তার ও বকুলের প্রেমকে বিবাহ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মতো দৃঢ়তা দেখা যায় নি। সে বকুলকে বিয়ে না করলেও সারা জীবন ভালোবেসেছে এবং স্ত্রীর কাছেও বকুলের প্রেমকে প্রথম প্রেমের স্বীকৃতি দান করেছে। অপরদিকে নিরুপমার 'অভিযাত্রী' উপন্যাসেও দণ্ডীনাথ কলিতা জাতপাতের ঊর্ধ্বে গিয়ে পিতা মাতার ইচ্ছার বিরোধিতা করে চন্দ্রপ্রভাকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিলেও সারাজীবন চন্দ্রপ্রভাকে ভালোবেসেছে অধিকার খাটিয়েছে এবং স্ত্রীর কাছে চন্দ্রপ্রভা ও অতুলের অস্তিত্বকে স্বীকার করেছে।

আশাপূর্ণার কোনো চরিত্রের মধ্যে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের জন্য কোনোরূপ দুর্বলতা দেখতে পাই না এমনকি লেখিকা অনামিকা দেবীর মধ্যেও আমরা প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের প্রতি দুর্বলতা দেখতে পাই না কিন্তু নিরুপমা বরগোহাঞির সৃষ্ট চরিত্র চন্দ্রপ্রভার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্মানের প্রতি দুর্বলতা লক্ষ করে থাকি। আশাপূর্ণার সত্য ও সুবর্ণ দুজনেই পরাধীনতার গ্লানিকে অনুভব করেছে, দেশের স্বাধীনতা কামনা করেছে কিন্তু তারা কেউ স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করে নি। কিন্তু নিরুপমার উপন্যাসে চন্দ্রপ্রভা চরিত্রটি স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেছেন, স্বেচ্ছাসেবী দলের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে গেছেন এবং মহিলা সংগঠনের দলনেত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন। দেশের ও দশের কাজের জন্য সংসারের দায় দায়িত্বকে অবহেলাও করতে তাঁকে দেখা গেছে। এমনকি পিতার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধের আগেই দেশের কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন।

সত্যবতীর পিতা রামকালীর কাশীবাসের কথায় সত্য দুঃখিত হয়েছে, মার মৃত্যুর পর মার প্রতি করা উদাস মনোভাবের জন্য দুঃখ পেয়েছে। মার মৃত্যুর পর সত্যর কাছে বার বার ভেসে উঠেছে ঘোমটায় আবৃত মার মুখ। তেমনি চন্দ্রপ্রভাও পিতার মৃত্যুর পর নিজেকে একা মনে করেছেন, নিঃসঙ্গ মনে করেছেন, এবং পিতার শ্রাদ্ধের আগেই দেশের কাজে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে পিতার মৃত্যুশোকের সঙ্গে সঙ্গে মার ব্যথাকাতর মুখের ছবি তাঁর সামনে ভেসে উঠেছে এবং তারই সঙ্গে বহন করে আনা দুঃখ তাঁকে আরও বেশি বেদনাবিধুর করে দিয়েছে।

এভাবেই দুই লেখিকা নিজ নিজ সমাজ সংস্কৃতির প্রেক্ষিত থেকে বিভিন্ন চরিত্রকে নিয়ে এসেছেন তাঁদের উপন্যাসের বক্তব্যকে আমাদের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে। নিরুপমার উপন্যাসে চরিত্রগুলি আসে ঘটনার বাহক রূপে। তিনি আগে থেকে কোনো চরিত্র ভেবে উপন্যাস রচনা করতে বসেন না। অপরদিকে চরিত্রকে মাথায় রেখে ঘটনাপ্রবাহকে সাজিয়েছেন আশাপূর্ণা দেবী। সত্য কিংবা সুবর্ণর সংগ্রামকে তুলে ধরাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ফলে এদের কেন্দ্র করে সমস্ত ঘটনা গেঁথেছেন তিনি। অপরদিকে নিরুপমা দেশ কাল পরিবেশের বাস্তবতাকেই আখ্যানের রূপ দেন,

ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় চরিত্রগুলি বিকশিত হয়, তাদের চিনে নিতে পারেন পাঠক। দুজন লেখিকার দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র, আশাপূর্ণার লেখনবিশ্বের অভিমুখ চরিত্রমুখ্যতার দিকে, নিরুপমার ঘটনামুখ্যতার দিকে। আশাপূর্ণার চরিত্রগুলি নাটকীয়, মুখর, কিন্তু ততটা অন্তর্দ্বন্দ্বজটিল নয়। অপরপক্ষে আধুনিক কালের চেতনাপ্রবাহ রীতির সঙ্গে পরিচিত উচ্চশিক্ষিত নিরুপমার লেখায় চরিত্রের মনোগহনে দৃষ্টি দেবার প্রবণতা দেখা যায়। আশাপূর্ণা আর নিরুপমা দুজন লেখিকার প্রধান চরিত্রগুলি চরিত্র হিসাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েও, নারী পুরুষ সম্পর্কের নতুন বিন্যাসের প্রস্তাবনায় ও প্রতিবাদে লেখিকাদের নিজস্ব বক্তব্যেরও বাহন হয়ে উঠেছে।

।। সাত।।

ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত সন্দর্ভে বিস্তারিত আলোচনার সংক্ষিপ্ত এই প্রতিবেদনে আমাদের পর্যবেক্ষণ এবং সিদ্ধান্তের সার কথাগুলি উপস্থাপনের প্রয়াস রইল। আমরা দেখেছি, প্রতিবেশি দুটি অঙ্গরাজ্যের সমাজ সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে রয়েছে যথেষ্ট সামীপ্য। বিশ শতকের দুই কথাকার রূপান্তরশীল সময়ের পটে ব্যক্তি ও সমষ্টির দ্বিরালাপকে বোঝবার চেষ্টা করেছেন। নিজেদের মতো করে সমালোচনা করেছেন পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান - রাষ্ট্র ও সমাজবিধির। সাম্প্রতিক অতীতের সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসের জঙ্গমতাকে ধারণ করে আছে আলোচিত দুই শক্তিমান কথাসাহিত্যিকের সৃজনবিশ্ব। সমকালীন সাহিত্যের এই ধরনের তুলনামূলক অধ্যয়ন এই প্রান্তিক প্রদেশে বঙ্গভাষী ও অসমীয়াভাষী মানুষের সম্পর্কের নতুন অভিমুখ রচনা করতে পারে — আমাদের পাঠ অভিজ্ঞতার সূত্রায়নের অন্তিমে এই আন্তরিক উপলব্ধিটুকু নিবেদন করে, এই অভিসন্দর্ভের আপাত সমাপ্তি টানলাম।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

১. দেবী, আশাপূর্ণা : প্রথম প্রতিশ্রুতি, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ফাল্গুন ১৩৭১, পঞ্চান্ন মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৫

২. দেবী, আশাপূর্ণা : সুবর্ণলতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - চৈত্র ১৩৭৩, পঁয়ত্রিশ মুদ্রণ, পৌষ, ১৪১৫

৩. দেবী, আশাপূর্ণা : বকুলকথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৩৮০, অষ্টবিংশতি মুদ্রণ, পৌষ, ১৪১৫

৪. বরগোহাঞি, নিরুপমা : নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাস সম্ভার (১), জ্যোতি প্রকাশন, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৯৯

৫. বরগোহাঞি, নিরুপমা : নিরুপমা বরগোহাঞির উপন্যাস সম্ভার (২), জ্যোতি প্রকাশন, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারি ২০০১

সহায়ক গ্রন্থ :

<u>বাংলা</u> :

১. অশ্রুকুমার সিকদার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - অক্টোবর ১৯৯৩

২. আচার্য, দেবেশকুমার : একালের প্রবন্ধ এবং সমালোচনা, সমীক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, বৈশাখ ১৪০৮

৩. অঞ্জন সেন/উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পা.) : উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৫ আগস্ট ২০১০

৪. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ - ২০০২

৫. ,, : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০১

৬. ,, : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - ২০০০

৭. ,, : বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ২০০১

৮. গুণ, সুমন : তুলনামূলক সাহিত্য একটি তির্যক প্ররোচনা, একুশ শতক, ১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - বইমেলা ২০১১

৯. গুপ্ত, সুশান্ত কুমার (সম্পা.) : আশাপূর্ণা দেবী রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ - ২০০০

১০. গুপ্ত, সুশান্ত কুমার (সম্পা.) : আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ২০০১

১১. ঘোষ, বিনয় : বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, শ্রী সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - নভেম্বর ১৯৬৮

১২. ঘোষ, বিনয় : বাংলার নবজাগৃতি, ওরিয়েন্ট ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - ১৯৭৯

১৩. ঘোষ, সুদক্ষিণা : মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, 'কাহাকে থেকে সুবর্ণলতা', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০৮

১৪. ,, : বাংলার বিদ্বৎসমাজ, শ্রী স্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রকাশ ভবন ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - বৈশাখ ১৩৮০

১৫. ,, : বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, হিমায়াৎনগর, হায়দ্রাবাদ, ১৯৮৪

১৬. চক্রবর্তী, রামী : আশাপূর্ণার উপন্যাসে নারী, দেবাশিস ভট্টাচার্য, রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৭

১৭. চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.) : নারী পৃথিবী : বহুস্বর, প্রদীপ ভট্টাচার্য, উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫, কনভেন্ট রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - নভেম্বর ২০১১

১৮. চৌধুরী, সুবোধ : সাহিত্য শিল্প ও নন্দন তত্ব, জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - ১৯৯৯

১৯. চৌধুরী, ভূদেব : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম পর্যায় - দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - ১৯৯৮

২০. ,, : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় পর্যায় - দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - ১৯৯৫

২১. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ : বাংলা সাহিত্য পরিচয়, তুলসী প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২

২২. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন : সাহিত্য প্রকরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ পরিবেশক, বামা পুস্তকালয়, কলকাতা, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ - পুনর্মুদ্রণ - ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

২৩. চক্রবর্তী, রামী : কথাসাহিত্যে নারী পরিসর ও অন্যান্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ২০১৩

২৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : রবীন্দ্র রচনাবলী, কুমকুম ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা, আশ্বিন ১৩৯৫

২৫. ,, : সাহিত্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - ১৪০১ বঙ্গাব্দ

২৬. দেবী, আশাপূর্ণা : আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৪০১

২৭. ,, : আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ - মাঘ ১৪০১

২৮. দাশ, চিত্তরঞ্জন : পশ্চিমবঙ্গের ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি, উৎপল বসু মার্কসিস্ট লেনিনিস্ট রিসার্চ সেন্টার ১০, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- মে ২০০৯

২৯. দাশ, শিশিরকুমার : প্রথম প্রতিশ্রুতির চতুরঙ্গ ৫৬ সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৪০৩

৩০. দাস, বেলা ও চন্দ, ইপ্সিতা (সম্পা.) : সুবর্ণলতা নারী পরিচিতির খোঁজে, সুমন চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী, ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৪১৮/ ডিসেম্বর ২০১১

৩১. দাস, বিনীতা রাণী : বিবর্তিত নারীসত্তা : আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে নারী, মুদ্রণ ক্যাক্সটন প্রিন্টার্স, আগরতলা, ত্রিপুরা, প্রথম প্রকাশ - বইমেলা ২০০৬

৩২. দাশগুপ্ত, মানসী : আশাপূর্ণা দেবী, সাহিত্য অকাদেমী, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ -২০০৬

৩৩. দাশগুপ্ত, শশিভূষণ : বাঙলা সাহিত্যের একদিক, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ - ১৯৯৩

৩৪. দেবী, সীতা : দেশের কাজে বাংলার মেয়ে, বঙ্গলক্ষ্মী, অগ্রহায়ণ ১৩৩৭

৩৫. পাল, কস্তুরী (সম্পা.) : বরাক নন্দিনী, বরাক নন্দিনী সাহিত্য চর্চাকেন্দ্র, শিলচর, ২৯শে মে ২০০৮

৩৬. দেবী, রাসসুন্দরী : আমার জীবন, প্রয়াস প্রকাশন, ২৫/৩ রাজা মনীন্দ্র রোড,
বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্রিতা (সম্পা.) : কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ২৯শে নভেম্বর ২০০২

৩৭. বসু, বুদ্ধদেব : সাহিত্যচর্চা, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - এপ্রিল ১৯৫৪

৩৮. বিশ্বাস, অনুপমা : মেয়েদের কথা মেয়েদের লেখা, বরাক নন্দিনী প্রকাশনী, অম্বিকাপট্টি, শিলচর, ২২ মে ২০০৫

৩৯. বিদ্যারত্ন, রামকুমার : উদাসীন সত্যশ্রবার আসাম ভ্রমণ, কলকাতা, ১৮৮১

৪০. বিশ্বাস, অনুরূপা (সংকলক) : মেয়েদের কথা আর মেয়েদের লেখা, বরাক নন্দিনী প্রকাশনী, শিলচর, ২২ মে ২০০৫

৪১. বসু, বুদ্ধদেব : প্রবন্ধ সংকলন, সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, মাঘ ১৩৮৮/ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২

৪২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মডার্ণ বুক এসেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ

৪৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার : সমালোচনার কথা, মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ - ২০০২-২০০৩

৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৯৫

৪৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, প্রথম খণ্ড, ওরিয়েন্ট কোম্পানি, কলকাতা, পরিবর্ধিত সংস্করণ - ১৯৯৯

৪৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত কুমার : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত (ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী), মডার্ন বুক এজেন্সী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ - ১৯৯৬

৪৭. বসু, বুদ্ধদেব : প্রবন্ধ সংকলন, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯১৫

৪৮. বসু, বুদ্ধদেব : কালের পুতুল, নিউ এজ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭

বড়ুয়া, অনন্যা : প্রথম প্রতিশ্রুতির বিশ্লেষণী পাঠ, দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬৬/৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - বইমেলা ২০০৬

৪৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর (সম্পা.) : নারীচেতনা মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্র. প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০৭

৫০. ভট্টাচার্য, তপোধীর : প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদের পক্ষে সমীরণ মজুমদার (প্রকাশক), বিধাননগর, মেদিনীপুর, নিউ সুধীর নারায়ণী প্রেস (মুদ্রক), ১৬ মার্কস লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ১৯৯৭

৫১. ভট্টাচার্য, দেবীপদ : উপন্যাসের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - অক্টোবর ১৯৮২

৫২. ভট্টাচার্য, তপোধীর (সম্পা.) : আশাপূর্ণা নারী পরিসর, দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - বইমেলা ২০০৯

৫৩. ,, : আখ্যানের স্বরান্তর, দিবারাত্রির কাব্য, ২০০৭

৫৪. ,, : বাখতিন তত্ত্ব ও প্রয়োগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৪

৫৫. ,, : আখ্যানের সাতকাহন, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, বিধাননগর, মেদিনীপুর, প্রথম প্রকাশ - ২০০৫

৫৬. ভট্টাচার্য, সুকুমারী : মন্থন, দি একজিকিউটিভ্ প্রিন্টার (হরফ বিন্যাস), ৭ এ পি সি রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ২০০০

৫৭. মণ্ডল, ইসলাম নাজিবুল (সম্পা.) : শতবর্ষের আলোকে আশাপূর্ণা দেবী, গিরি প্রিন্ট সার্ভিস, ৯১ এ বৈঠকখানা রোড, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৯

৫৮. মুখোপাধ্যায়, কনক (অনু.) : নারীর অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে (August Bebel Woman in the Past Present and Future) ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, বঙ্কিম চাটার্জী রোড, কলকাতা, প্রথম মুদ্রণ - মার্চ ১৯৮৩

৫৯. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার : মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - ২০০২

৬০. মৈত্র, শেফালী : নৈতিকতা ও নারীবাদ, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ - নভেম্বর ২০০৩

৬১. মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার : সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - জানুয়ারি ২০০৩

৬২. রায়চৌধুরী, সমীর (সম্পা.) : হাওয়া ৪৯, কল্যাণী প্রিন্টার্স, ১/২ রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা, আগস্ট ১৯৯৭

৬৩. রায়, দেবেশ : উপন্যাস নিয়ে, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯১

৬৪. রায়, দিলীপ কুমার : প্রথম প্রতিশ্রুতির কিছু ভাবনা কিছু কথা, বিকাশ সুখুধা, ৯/৩ রামনাথ স্ট্রিট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ২০০৯

৬৫. শ, রামেশ্বর : আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, বসু মুদ্রণ, কলকাতা, ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৬

৬৬. সাঁফুই, অরুণকুমার ও দাস, গৌতম (সম্পা.) : প্রসঙ্গ আশাপূর্ণা দেবী ও প্রথম প্রতিশ্রুতি, শুভেন্দ্র মিশ্র শীতলচন্দ্র লস্কর রোড, তেঁতুলবেড়িয়া, লেজার টাইপসেটিং স্বস্তিকা এন্টারপ্রাইজ, কলকাতা, মে ২০১১

৬৭. সুর, অতুল : বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন (মুদ্রিত), কলকাতা, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৬

৬৮. সিকদার, অক্ষয়কুমার : আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৯৯৩

৬৯. সেনগুপ্ত, নন্দগোপাল : বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ - ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ

৭০. সেন, সুকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১

৭১. সেন, সুকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ

৭২. সেন, সুকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২

৭৩. সেন, সুকুমার : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, পঞ্চম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০২

<u>অসমীয়া</u> :

১. আব্দুল, রহমান ও চৌধুরী, কল্যাণ : অসম আরু ভারত বুরঞ্জী, শ্রী কৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ওরিয়েণ্টেল বুক কোম্পানি, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৮

২. আহমেদ, কুতুবুদ্দিন : ইংরাজী সাহিত্যর চমু বুরঞ্জী, জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটী, দ্বিতীয় প্রকাশ - ১৯৯২

৩. কটকী, প্রফুল্ল : তুলনামূলক সাহিত্য আরু অনুবাদ বিচার, জ্যোতি প্রকাশন, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৮৯

৪. কলিতা, রমেশচন্দ্র : ঔপনিবেশিক আমলত অসম, অশোক বুক ষ্টল, পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ- সেপ্টেম্বর ২০০৮

৫. গোঁহাই, হীরেন আরু বরা, দিলীপ : শ্রী অনন্ত হাজরিকা, বনলতা পানবাজার, গুয়াহাটী, প্রথম সংস্করণ - ২০০১

৬. গোস্বামী, যতীন : অসমীয়া ভাষা আরু সাহিত্যর ইতিহাস, লয়ার্স বুক ষ্টল, গুয়াহাটী, তৃতীয় প্রকাশ - ১৯৯৫

৭. গুহ, অমলেন্দু : অসমর জাতীয় জীবনত মণিরাম দেওয়ানর দান আরু স্থান, গুয়াহাটী, ১৮৭৭

৮. গোস্বামী, ত্রৈলোক্যনাথ : সাহিত্য আলোচনা, বাণী প্রকাশ, গুয়াহাটী, তৃতীয় সংস্করণ - ১৯৯১

৯. গোস্বামী, সত্যেন্দ্রনারায়ণ : অসমীয়া সাহিত্যর কথা, ষ্টুডেন্টস এম্পরিয়াম, ডিব্রুগড়, দ্বিতীয় প্রকাশ - ১৯৯১

১০. গোঁহাই, রাণী (সম্পা.) : অগ্রগামিনী নিরুপমা বরগোহাঞি জীবন আরু সাহিত্য, জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৮

১১. চেতিয়া, তোযেশ্বর (সম্পা.) : প্রগতিশীল সাহিত্য সমীক্ষা নতুন সাহিত্য পরিষদর চতুর্থ

রাজ্যিক সন্মিলনর অভ্যৰ্থনা সমিতি লক্ষীমপুর, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৮

১২. চেতিয়া, তোযেশ্বর : দেশ বিদেশর সাহিত্য আলোচনা, লয়ার্স বুক ষ্টল, গুয়াহাটী, ১৯৯৭

১৩. চৌধুরী, প্রসেনজিৎ : সমাজ আরু সংস্কৃতি, জার্ণাল এম্পরিয়াম, নলবারী, প্রথম প্রকাশ- ১৯৮৩

১৪. চন্দ্রপ্রসাদ, শইকীয়া : গরিয়সী, ট্রিবিউন ভবন, গুয়াহাটী, প্রকাশ

১৫. চৌধুরী, প্রসেনজিৎ : ঊনেশ শতিকা সমাজ আরু সাহিত্য, শ্রী অজয় কুমার দত্ত ষ্টুডেন্টচ্ ষ্ট'রচ্ কলেজ হোষ্টেল রোড, গুয়াহাটী, প্রথম সংস্করণ - নভেম্বর ২০০১

১৬. ঠাকুর, নগেন (সম্পা.) : এশ বছরর অসমীয়া উপন্যাস, জ্যোতি প্রকাশন, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ - ২০০০

১৭. ডেকা, হাজরিকা করবী : অসমীয়া সাহিত্যর রূপ রস, বনলতা, প্রথম প্রকাশ - ১৯৮৫, ডিব্রুগড়

১৮. তালুকদার, নন্দ (সম্পা.) : আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকনর রচনা সমগ্র, লয়ার্স বুক ষ্টল, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ - ১৯৭৭

১৯. দেবী, মীরা : অসমীয়া উপন্যাসত নারীবাদ, লোকায়ত প্রকাশন, গুয়াহাটী, প্রথম প্রকাশ - ১৯৯৬

২০. দেবী, গোস্বামী, হরমোহন : সংস্কৃত সাহিত্যর বুরঞ্জী, বুক লেণ্ড, গুয়াহাটী, তৃতীয় প্রকাশ - ১৯৯২

২১. দেবী, সন্ধ্যা : নারী ঃ বন্ধন আরু মুক্তি, রফিকুজ জামান আই এ এছ, অসম প্রকাশন পরিষদ, গুয়াহাটী, প্রথম সংস্করণ - নভেম্বর ২০০৭

২২. দাস, পুষ্পলতা : বিদ্রোহিনী চন্দ্রপ্রভা, লোকায়ত প্রকাশন, হোমেন বরগোহাঞি রঙালি বিহু সংখ্যা, গুয়াহাটী, ১৯৮২

২৩. দত্ত, বিনীতা (সম্পা.) : অসমীয়া সাহিত্যত নারী, সদৌ অসম লেখিকা সমারোহ, তেজপুর, প্রথম প্রকাশ - ডিসেম্বর ১৯৯৫

২৪. নেওগ, ডিম্বেশ্বর : নতুন পোহরত অসমীয়া সাহিত্যর বুরঞ্জী, শুয়নী প্রকাশ, গুয়াহাটী, অষ্টম সংস্করণ - ১৯৯৯

২৫. নেওগ, মহেশ্বর : অসমীয়া সাহিত্যর রূপরেখা, চন্দ্র প্রকাশ, গুয়াহাটী, অষ্টম প্রকাশ - ১৯৯৫

২৬. নাথ, প্রফুল্ল কুমার : তুলনামূলক ভারতীয় সাহিত্য বিচার আরু বিশ্লেষণ, শ্রী অনন্ত হাজরিকা, বনলতা পানবাজার, গুয়াহাটী-১, প্রথম প্রকাশ - ফেব্রুয়ারী ২০০৫

২৭. নেওগ, মহেশ্বর : অসমীয়া সাহিত্যর ৰূপৰেখা, শ্ৰী ৰাজেন্দ্ৰ মোহন শৰ্মা, চন্দ্ৰ প্ৰকাশ, পানবাজাৰ, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ - অক্টোবৰ ১৯৬২

২৮. ফুকন, চিত্ৰলতা (সম্পা.) : অসমীয়া সাহিত্য আৰু লেখিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, লয়াৰ্চ বুক ষ্টল, গুৱাহাটী, ১৯৯৮

২৯. বৰগোহাঞি, হোমেন (সম্পা.) : অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, ষষ্ঠ খণ্ড, আনন্দৰাম বৰুয়া ভাষা কলা-সংস্কৃতি সংস্থা, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ - ১৯৯৩

৩০. বৰুয়া, বিৰিঞ্চিকুমাৰ : অসমীয়া কথা সাহিত্য, জাৰ্ণাল এম্পৰিয়াম, নলবাৰী, চতুৰ্থ সংস্কৰণ - ১৯৮৮

৩১. বৰা, মহেন্দ্ৰ : সাহিত্য আৰু সাহিত্য, বনলতা, ডিব্ৰুগড়, প্ৰথম প্ৰকাশ - ১৯৮৮

৩২. বৰগোহাঞি, নিৰুপমা : বিশ্বাস আৰু সংশয়ৰ মাজেদি, জ্যোতি প্ৰকাশন, পানবাজাৰ, গুৱাহাটী, তৃতীয় প্ৰকাশ - মে ২০০০

৩৩. বৰুয়া, বিৰিঞ্চিকুমাৰ : অসমীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতি, লয়াৰ্চ বুক ষ্টল, গুৱাহাটী, ১৯৭২

৩৪. বৰুয়া, গুণাভিৰাম : অসম বুৰঞ্জী, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, গুৱাহাটী, প্ৰকাশকাল - ১৯৭২

৩৫. বৰদলৈ, ৰজনীকান্ত : ৰহদৈ লিগিৰী, সাহিত্য প্ৰকাশন, গুৱাহাটী, ১৯৮২

৩৬. বৰপূজাৰী, হেৰম্বকান্ত : অসমৰ নবজাগৰণ অনা অসমীয়াৰ ভূমিকা, যোৰহাট, ১৯৮৭

৩৭. বৰা, হেম : অসমীয়া সাহিত্যলৈ মহিলা লেখকৰ দান, শতাব্দী প্ৰকাশন, গোলাঘাট, প্ৰথম প্ৰকাশ - ১৯৯৪

৩৮. ভট্টাচাৰ্য, মুকুট (সম্পা.) : সাহিত্য নিৰ্মাণ প্ৰসঙ্গ, বুক হাউস, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ - ১৯৯৮

৩৯. ভট্টাচাৰ্য, বসন্তকুমাৰ : অৰুণোদই যুগৰ সাহিত্য, সমন্বল গ্ৰন্থালয়, নলবাৰী, তৃতীয় সংস্কৰণ - ১৯৯৯

৪০. ভট্টাচাৰ্য, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ : ডেৰশ বছৰৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত এভুমুকি, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া সচিব, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ - মাৰ্চ ১৯৭৮

৪১. ভট্টাচাৰ্য, নন্দিতা : 'মনুৰ দৃষ্টিত নাৰী', প্ৰকাশ আলোচনী, চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া (সম্পা.)

৪২. ভূঞা, যোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ (সম্পা.) : জ্ঞানদাভিৰাম বৰুয়া ৰচনাবলী, অসম সাহিত্য সভা, যোৰহাট, ১৯৮১

৪৩. ভূঞা, যোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ (সম্পা.) : ৰত্নেশ্বৰ মহন্ত ৰচনাবলী, গুৱাহাটী, ১৯৭৭

৪৪. মহন্ত, বেজবৰা, নীৰাজনা : তুলনামূলক ভাৰতীয় সাহিত্য, বনলতা, ডিব্ৰুগড়, প্ৰথম প্ৰকাশ - ১৯৯৯

৪৫. মজুমদার, পৰমানন্দ : বৌদ্ধিক ঐতিহ্য, ভবানী প্ৰিন্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যন্‌চ, হাতীশিলা, পানীখাইতি, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ - ডিসেম্বৰ ২০১১

৪৬. মহন্ত, প্ৰফুল্ল : অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ইতিহাস, ভবানী প্ৰিন্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যন্‌চ, হাতীশিলা, পানীখাইতি, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ - সেপ্টেম্বৰ ১৯৯১

৪৭. মজুমদাৰ, পৰমানন্দ : বৌদ্ধিক ঐতিহ্য যুক্তিবাদী চিন্তাৰ অন্বেষণ, ভবানী প্ৰিন্ট এণ্ড পাব্লিকেশ্যন্‌চ, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ - ডিসেম্বৰ ২০১১

৪৮. ৰাজবংশী, পৰমানন্দ : অসমীয়া জাতি আৰু সংস্কৃতি, এম. টেচ ওফসেট, কলেজ ৰোড, গুৱাহাটী, ২২ অক্টোবৰ ২০০৩

৪৯. শৰ্মা, সতেন্দ্ৰনাথ : অসমীয়া উপন্যাসৰ ভূমিকা, সৌমাৰ প্ৰকাশ, গুৱাহাটী, চতুৰ্থ প্ৰকাশ - ১৯৯২

৫০. শৰ্মা, হেমন্তকুমাৰ : অসমীয়া সাহিত্যত দৃষ্টিপাত, বাণী লাইব্ৰেৰী, গুৱাহাটী, ষষ্ঠ প্ৰকাশ - ১৯৯২

৫১. শৰ্মা, শশী : সাহিত্যত বাস্তবৰ স্বপ্ন, জাৰ্ণাল এম্পৰিয়াম, নলবাৰী, প্ৰথম প্ৰকাশ - ১৯৮৭

৫২. শৰ্মা, সতেন্দ্ৰনাথ : অসমীয়া উপন্যাসৰ গতিধাৰা, প্ৰতিমা দেবী সৌমাৰ প্ৰকাশ, ৰিহাবাৰী, গুৱাহাটী, প্ৰথম প্ৰকাশ - ১৯৭৬ সন

৫৩. শৰ্মা, গোবিন্দ প্ৰসাদ : নাৰীবাদ আৰু অসমীয়া উপন্যাস, ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ মজুমদাৰ, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, গুৱাহাটী, প্ৰথম সংস্কৰণ - ডিসেম্বৰ ২০০৭

৫৪. শৰ্মা, সত্যেন্দ্ৰনাথ : অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, সৌমাৰ প্ৰকাশ, ৰিহাবাৰী, গুৱাহাটী, দশম সংস্কৰণ - জুন ২০১১

৫৫. শৰ্মা, দলৈ, হৰিনাথ : অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ গতিপথ, প্ৰথম খণ্ড, পদ্মপ্ৰিয়া লাইব্ৰেৰীৰ হকে শ্ৰী শশীবালা দেবী, বৰপেটা, প্ৰথম প্ৰকাশ - ১৯৯২

ইংৰাজি :

১. Barpujari H. K. (Ed.) : Political History of Assam, Guwahati, 1977

২. Bright W. Games : The Comparative Study of Literature, Publications of Modern Language of America, 1896

৩. Chatterjee S. K. : World Literature and Tagore, Biswa Bharati, 1971

৪. Gadgil D. R. : Industrial Education of India, London, 4th edition, 1946

৫. Jost Francois : Introduction to Comparative Literature, Indianapolics, Bobbs Mearill, 1974

৬. Quoted in Gait Sir Edword : A History of Assam, 1981

৭. Spear Percival : The Nobobs London, 1963

৮. Sarma Kiran : Manu Samhita with Assamese Translation, Asom Ved Vidyalaya Vedapuran 1998

৯. Thorlby Anthony : Yearbook of Comparative and General Literature XVIII, 1968

১০. Wellek Rene : Discrimination, New Delhi, 1970

১১. Wellek Rene : Theory of Literature, Penguine Books, 1976

পত্র-পত্রিকা

বাংলা :

১. অমৃতলোক, নারীবিশ্ব বিশেষ সংখ্যা, Vol. 30, Issue 4th (১০৪)

২. আভা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৮৭, ১৩৯৩

৩. আভা, শারদীয়া সংখ্যা, ২২৫

৪. উত্তরধ্বনি, ২৫ বর্ষ, শারদ সংখ্যা, ১৪০৯

৫. পরিকথা, (সম্পা.) দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, Vol.-2, No. 2, ২, মে, ২০০০

৬. প্রমা, ৯ বর্ষ, ৩ এপ্রিল-জুন, ১৯৮৭

৭. শুভশ্রী, (সম্পা.) পুলক কুমার সরকার, ৪২ বর্ষ, ২০০৩-০৪

৮. শুভশ্রী, নারী বাংলা কথাসাহিত্য, ৪৩ বর্ষ, ২০০৪-০৫

৯. সাহিত্য আকাশ, আশাপূর্ণা দেবী সংখ্যা, ৭ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, শারদীয় ১৪০২

১০. সান্যাল, কানু : তরাইয়ের কৃষক আন্দোলনের সম্পর্কে রিপোর্ট, সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

অসমীয়া :

১. বরা, লক্ষ্মীনন্দন (সম্পা.) : গরিয়সী, সাহিত্য প্রকাশ, ট্রিবিউন ভবন, গুয়াহাটী, মে ২০০৯

২. বরগোহাঞি, নিরুপমা : সাপ্তাহিক নীলাচল, ১৯৭৫

৩. শইকীয়া, চন্দ্রপ্রসাদ : গরিয়সী, সাহিত্য প্রকাশন, ট্রিবিউন ভবন, গুয়াহাটী, সেপ্টেম্বর ২০০১

৪. শইকীয়া, চন্দ্রপ্রসাদ : প্রকাশ আলোচনী, সপ্তম সংখ্যা ১৯৮৭, (নন্দিতা ভট্টাচার্য), 'মনুর দৃষ্টিত নারী'

ইংরাজি :

১. Monthly Atlantic : What is Comparative Literature, 92, 1903

Internet

Gagoi, Ditimani : 'Fair and Fearless an profile of Nirupama Borgohain' downloaded from Internet.

পরিশিষ্ট - ১

অন্তরঙ্গ আলাপনে নিরুপমা বরগোহাঞিঃ একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

আমি নিরুপমা বরগোহাঞির সঙ্গে ১৬.০৩.২০১৩ তারিখে তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় সাক্ষাৎ করেছি। তিনি যথেষ্ট সহযোগিতাপূর্ণভাবে এবং স্নেহের সঙ্গে আমার সঙ্গে আলাপ করেছেন। নিরুপমা বরগোহাঞি আশাপূর্ণা দেবীর রচনা পড়েছেন এবং পড়ে ভালো লাগে বলেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর রচনায় থাকা 'নারীর বিদ্রোহ' তাঁকে বেশি প্রভাবিত করেছে, বলেছেন তিনি। তিনি এটিও বলেছেন যে অসমীয়া সমাজ ও বঙ্গীয় সমাজে মৌলিকভাবে নারীর সমস্যা প্রায় একই তবে অসম থেকে বঙ্গীয় নারীসমাজ একটু পিছিয়ে রয়েছে। অসমে ট্রাইবেল বা জনজাতীয় প্রভাবের ফলে অসমের নারীসমাজের অন্তঃপুরের বন্দিত্বদশা দেখতে পাওয়া যায় না। যৌতুক প্রথাও নেই এবং তুলনামূলকভাবে তারা স্বাধীন। তিনি বঙ্গদেশে পূর্বে প্রচলিত সতীদাহ প্রথার কথা বলতে গিয়ে 'পুড়ে নারী উঠে ছাই / তবে নারীর গুণ গাই' এ ধরনের কথার প্রচলন থাকার কথা বলেছেন এবং অসমে সতীদাহ প্রথা না থাকার কথাও বলেছেন।

বর্তমানে বঙ্গীয় সমাজের প্রভাব অসমীয়া সমাজে তেমন বেশি দেখা না গেলেও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে যথেষ্ট প্রভাব ছিল বলে মনে করেন নিরুপমা বরগোহাঞি। তৎকালীন নিম্ন অসমের সংস্কৃতি, খাদ্য, ভাষার উপর যথেষ্ট বঙ্গীয় প্রভাব পড়ার কথা বলেছেন তিনি। প্রসঙ্গত কয়েকটি শব্দের উল্লেখও করেছেন। তিনি বলেছেন যে অসমীয়া ভাষায় মশারি শব্দের অর্থে 'আঠুয়া' (দেশি শব্দ) ব্যবহার হলেও বাংলার মশারি শব্দের প্রভাবে কামরূপে মহরি শব্দের প্রচলন রয়েছে। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর', 'অন্যজীবন' এবং 'অভিযাত্রী' উপন্যাসসমূহ রচনার উৎস সম্পর্কে বলেছেন 'অন্যজীবন' উপন্যাসের প্রেরণা তিনি পেয়েছেন শ্বশুরবাড়ি ঢকুয়াখানার গ্রামে তাঁর খুড়শাশুড়ির উপর হওয়া অমানবিক অত্যাচার থেকে। সেই খুড়শাশুড়ির চরিত্রটিই রম্ভা খুড়ীদেও চরিত্র রূপে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তাঁর খুড়শাশুড়িকে খুড়শ্বশুর মইতে বেঁধে পাথরের পাকা রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। খুড়শাশুড়ি অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন ছিপজড়ি লাগিয়ে, যা টুনটুনী নদীর জলে আত্মহত্যা বলে উপন্যাসে রয়েছে। শাশুড়ির এই করুণ পরিণতি তাঁকে অনেক কষ্ট দেয়, তাঁর আত্মাকে আহত করে এবং তিনি 'অন্যজীবন' উপন্যাস রচনা করতে আরম্ভ করেন। এছাড়াও উজান অসমের গ্রাম্য মহিলাদের গৃহকার্য থেকে আরম্ভ করে নদী থেকে জল আনা, তাঁত বোনা এবং চাষবাসের ক্ষেত্রেও পুরুষের

সমানেই শ্রম দান করতে হয়। এত কষ্ট করার পরও পুরুষশাসিত অসমীয়া সমাজ নারীর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন এবং অবহেলাই করে থাকে। নারীর উপর হওয়া অত্যাচার, অবহেলা, অবমাননা তাঁকে 'অন্যজীবন' উপন্যাস রচনার প্রেরণা দান করেছে। উপন্যাসটি সত্য ঘটনার উপর আধারিত হলেও আখ্যানের প্রয়োজনে কিছু পরিমাণে কল্পনার ডালপালা বিস্তার করেছেন বলে তিনি স্বীকার করেছেন। তবে তিনি এটিও বলেছেন যে কল্পনার রস থাকলেও তা খুবই সামান্য। বাস্তবতাই বেশি পরিমাণে রয়েছে উপন্যাসটিতে। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে তাঁর পিতার গ্রামে পিতৃমাতৃহীন একটি মেয়ে ছিল যার চরিত্রটি পটেশ্বরীর চরিত্রের সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে। তবে উপন্যাসটি মূলত কল্পনাশ্রিত। উপন্যাসে থাকা পাগলাদিয়া নদী, ভোগীবাবার আশ্রম এ সমস্ত কল্পনা নয়, বাস্তব। 'অভিযাত্রী' উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন যে এটি হল জীবনীমূলক উপন্যাস। স্বাধীনতা সংগ্রামী চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানীর জীবনের উপর ভিত্তি করে রচিত। এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ তথ্যভিত্তিক। উপন্যাসে থাকা দণ্ডীনাথের চিঠিগুলো সব সত্যি। কিছু ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর নিজের কথা যুক্ত করলেও তা অত্যন্ত নগণ্য এবং তা করেছেন উপন্যাসের শিল্পরূপের প্রয়োজনেই।

রেকর্ড ধৃত প্রশ্নোত্তরের সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে তুলে ধরা হল। প্রশ্ন করেছেন বর্তমান প্রতিবেদক।

প্রশ্ন-উত্তর :

প্রশ্ন - আপুনি লেখার প্রেরণা কর পরা পালে বা কী ঘটনায় আপোনাক ঔপন্যাসিক হিচাপে প্রতিষ্ঠিত হোয়ার বাট মুকলাই দিলে?

উত্তর - বিশেষ কোনো ঘটনা বা মানুহ মোর লেখার ক্ষেত্রত তেনেকুয়া প্রেরণা যুগোয়া নাছিল তবে সরুরে পরা আমার ঘরত বহুত শিশুসাহিত্য আহিছে আরু সেইবোর মই পড়িছু, সেইবোরেই মোক সাহিত্য রচনাত উৎসাহী করিছে।

প্রশ্ন - আপুনিতো বহুদিন কলিকতাত কটাইছে; বিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সমাজ আরু বঙ্গীয় সমাজর মাজত কি সংযোগ আরু পার্থক্য অনুভব করিছে?

উত্তর - বঙ্গীয় সমাজ বৈদিক কালর পরাই অসমতকৈ অলপ উন্নত আছিল আরু চিন্তা-ভাবনা বেছি গভীর আছিল। রবীন্দ্রনাথ যি দরে বঙ্গীয় সাহিত্য সংস্কৃতিক উন্নত করিছে তেনেদরে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিক ঐতিহ্য দান করিছে শংকরদেব।

প্রশ্ন - পারিপার্শ্বিক সমাজ আরু পরিবেশর প্রভাব আপোনার উপন্যাস 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' (১৯৭৯), 'অন্যজীবন' (১৯৮৭) আরু 'অভিযাত্রী' (১৯৯৩) ত কিমান পরিছে?

উত্তর - হয় পারিপার্শ্বিক সমাজ আরু পরিবেশর যথেষ্ট প্রভাব মোর এই তিনিটা রচনাত পরিছে। সমাজত থকা নারীর সমস্যা, বর্ণভেদ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা আদি মোর এই উপন্যাসবোরত আহিছে। 'ইপারর ঘর সিপারর ঘর' উপন্যাস বেশিরভাগেই কাল্পনিক, কিন্তু পাগলাদিয়া নদী, ভোগীবাবার আশ্রম ইত্যাদি কিন্তু জীবন্ত আরু সচা। পটেশ্বরী চরিত্রটোর লগত সম্পূর্ণ ভাবে নহলেও মোর পিতার গাঁওর মা দেউতা নথকা ছোয়ালি এজনির চরিত্রর যথেষ্ট মিল আছে। 'অন্যজীবন' উপন্যাসটো

সত্য ঘটনা, মোর খুৰীশাশুৰিৰ উপৰত হোৱা অত্যাচাৰেই মোক প্ৰেৰণা যুগাইছে আৰু খুৰীশাশুড়ি চৰিত্ৰটোই ৰম্ভা খুৰীদেও ৰূপে উপন্যাসত স্থান লাভ কৰিছে। 'অভিযাত্ৰী' উপন্যাস হ'ল জীৱনীমূলক তাৰ বেশিখিনিই তথ্যভিত্তিক।

প্ৰশ্ন - 'বিশ্বাস আৰু সংশয়ৰ মাজেদি' নামক আত্মকথাত আপুনি ৰবীন্দ্ৰৰচনা প্ৰীতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, আপুনি আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ ৰচনা পঢ়ি কেনেকুৱা পাইছিল?

উত্তৰ - মই আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ ৰচনা পঢ়ি ভাল পাইছিলোঁ। আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ 'প্ৰথম প্ৰতিশ্ৰুতি'ৰ সত্যবতীৰ প্ৰতিবাদ মোক আপ্লুত কৰিছে। আশাপূৰ্ণাৰ লিখাত নাৰীৰ অন্তৰ বেদনাৰ গভীৰতম প্ৰকাশ মোক আকৃষ্ট কৰিছে।

প্ৰশ্ন - আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ ৰচনা আপোনাৰ সাহিত্যক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰভাৱ পেলাইছে নে?

উত্তৰ - আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ ৰচনা পঢ়ি মই ভাল পাইছিলোঁ, তবে আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ ৰচনাৰ প্ৰভাৱ মোৰ ৰচনাত তেনেকৈই নাই।

প্ৰশ্ন - আশাপূৰ্ণা দেৱীৰ ত্ৰয়ী উপন্যাসত নাৰীৰ সমস্যা যিদৰে দেখুওৱাইছে তাতকৈ আপোনাৰ 'ইপাৰৰ ঘৰ সিপাৰৰ ঘৰ', 'অন্যজীৱন' আৰু 'অভিযাত্ৰী' উপন্যাস তিনিটাত দেখুওৱা নাৰীৰ সমস্যা অলপ বেলেগ ধৰণৰ কাৰণ হিচাপে আপুনি সামাজিক প্ৰেক্ষাপট বুলি ভাবে নে?

উত্তৰ - মৌলিকভাৱে নাৰীৰ সমস্যা হ'ল নিৰ্যাতিত হোৱা। তবে বিভিন্ন সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত এই সমস্যা কম বেছি হব পাৰে। আশাপূৰ্ণাৰ ৰচনাৱলীত নাৰীৰ সমস্যা আৰু অন্তৰবেদনা গভীৰ হৈ উঠিছে কাৰণ অসমীয়া নাৰীৰ তুলনাত বঙ্গীয় সমাজত নাৰী আছিল বেছি পৰাধীন।

প্ৰশ্ন - বিংশ শতাব্দীৰ বঙ্গীয় ও অসমীয়া সমাজৰ মাজত সংযোগ সাৰূপ্য ও স্বাতন্ত্ৰ্যৰ স্বৰূপ আপুনি কী বুলি ভাবে?

উত্তৰ - একবিংশ শতাব্দীৰ অসমীয়া সমাজত বঙ্গীয় সমাজৰ বেছি প্ৰভাৱ না থাকিলেও বিংশ শতাব্দীৰ নামনিৰ অসমীয়া সমাজৰ সংস্কৃতি, খাদ্য, ভাষা আদিৰ ওপৰত বঙ্গীয় সমাজ, সংস্কৃতি, খাদ্য আৰু ভাষাৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পড়িছিল যেনে — অসমীয়া ভাষাত মশাৰি শব্দৰ অৰ্থে আঠুয়া ব্যৱহাৰ হলেও বাংলা ভাষাৰ মশাৰি শব্দৰ পৰা কামৰূপত কিন্তু মহৰি শব্দ প্ৰয়োগ লক্ষিত হয়। মইদা (অসমীয়া) বাংলাত বঠী যাৰ ব্যৱহাৰ অসমৰ নামনিৰ বহু স্থানত শোনা যায়।

প্ৰশ্ন - বঙ্গীয় সমাজ আৰু অসমীয়া সমাজত নাৰীৰ সমস্যা ও নাৰীৰ স্থানৰ মাজত কী পাৰ্থক্য আছে বুলি আপুনি ভাবে?

উত্তৰ - অসমৰ তুলনাত বঙ্গৰ নাৰী আছিল বেছি পিছপৰা আৰু নিৰ্যাতিতা। অসমত বিভিন্ন tribal জনগোষ্ঠীৰ প্ৰভাৱত নাৰী আছিল তুলনামূলক ভাৱে স্বাধীন ও কম নিৰ্যাতিতা। বঙ্গৰ দৰে অসমত যৌতুক প্ৰথা, সতীদাহ প্ৰথা আদি নাছিল। পূৰ্বৰ বঙ্গত 'পুৰে নাৰী উঠে ছাই/ তবে নাৰীৰ গুণ গাই' এধৰণৰ প্ৰবাদ প্ৰচলিত আছিল।

প্ৰশ্ন - বহুতে আপোনাক অসমৰ প্ৰথম নাৰীবাদী মহিলা সাহিত্যিক বুলি কয় কিন্তু আপোনাৰ বহু ৰচনাত নাৰীবাদ গভীৰভাৱে প্ৰকট হৈ উঠা নাই। আপুনি নিজকে নাৰীবাদী লেখিকা হিচাপে পৰিচয় দিয়েনে?

উত্তৰ - মই নিজকে প্ৰধানকৈ মানৱতাবাদী লেখিকা হিচাপে ভাবোঁ ; নাৰীবাদ তাৰ এটা অংশ। সমাজত এক শ্ৰেণিৰ পুৰুষ আছে যি নিপীড়িত, অত্যাচাৰিত, অবদমিত। সেই সকল পুৰুষৰ কথাও মই লেখোঁ কিন্তু নাৰী সকল সেই অৱহেলিত পুৰুষতকৈ বেছি অৱহেলিত অত্যাচাৰিত। এনেকেই সমাজৰ তলৰ শ্ৰেণিৰ অত্যাচাৰিত পুৰুষসকলেও সামাজিক মতাদৰ্শগত সুবিধা অনুসৰি নাৰী সকলক অত্যাচাৰ কৰে। গতিকে নাৰীসকল দেখিলু সমাজত বেছি অত্যাচাৰিত। সেই কাৰণে মই তেঁওলোকৰ ওপৰত লেখোঁ কিন্তু মুঠতে মই সামগ্ৰিক ভাৱে সমাজত নিপীড়িত মানুহ সকলক লৈ হে লিখোঁ — সেই বাবে মই নিজকে নাৰীবাদী নহয়, মানৱতাবাদী বুলি ভাবোঁ।

[*সাক্ষাৎটির প্রাসঙ্গিক অংশই শুধু এখানে সংকলিত হল।*]

পরিশিষ্ট - ২

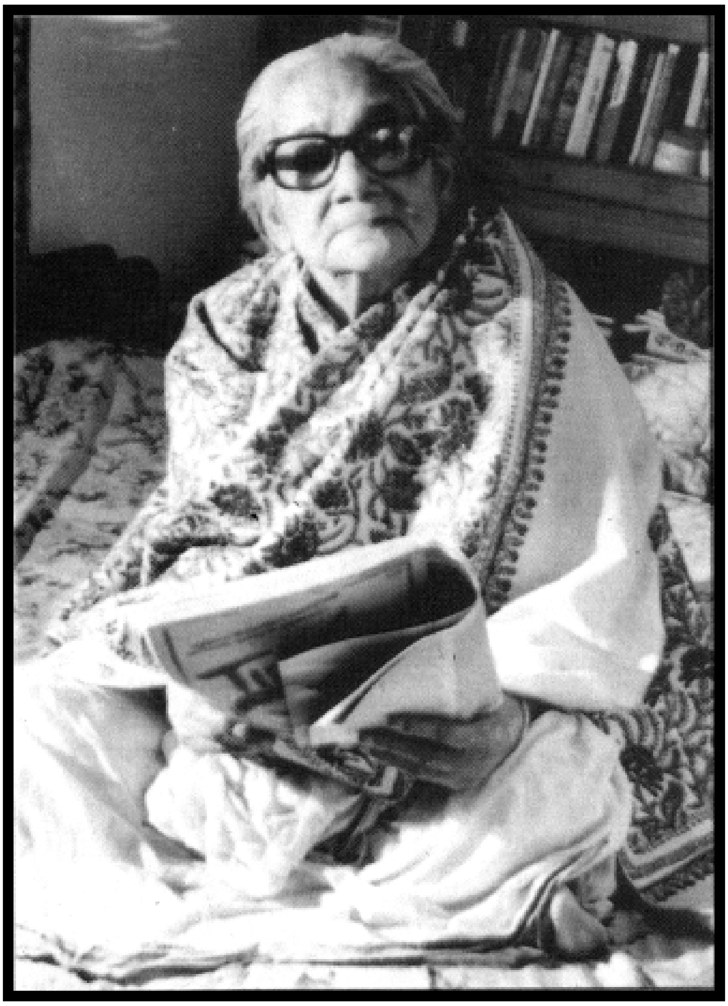

আশাপূর্ণা দেবী

নিরুপমা বরগোহাঞি

প্রথম প্রতিশ্রুতি
আশাপূর্ণা দেবী

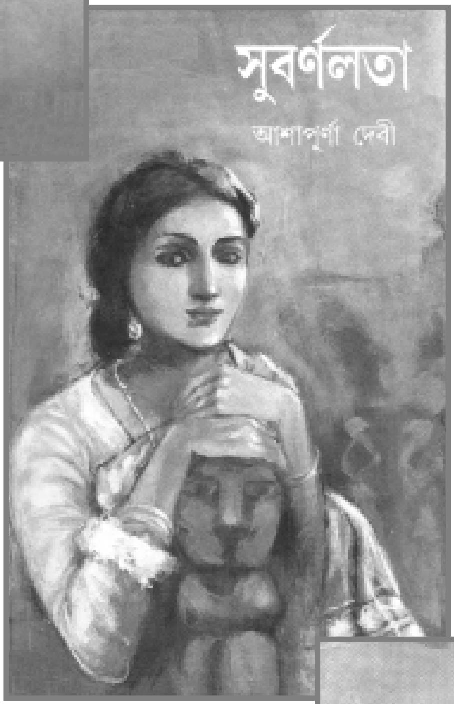
সুবর্ণলতা
আশাপূর্ণা দেবী

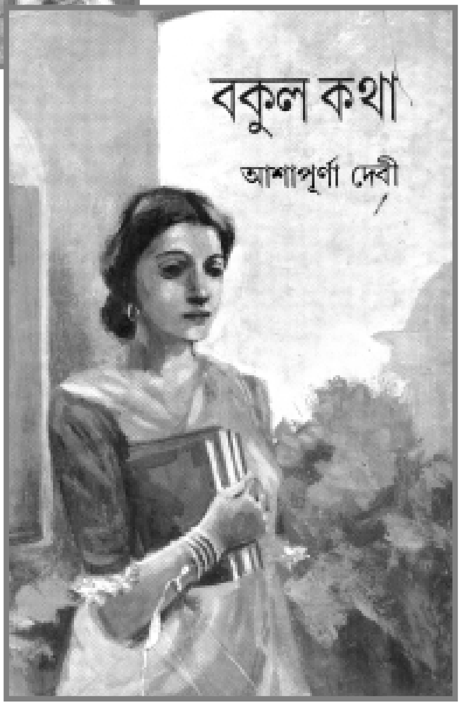
বকুল কথা
আশাপূর্ণা দেবী

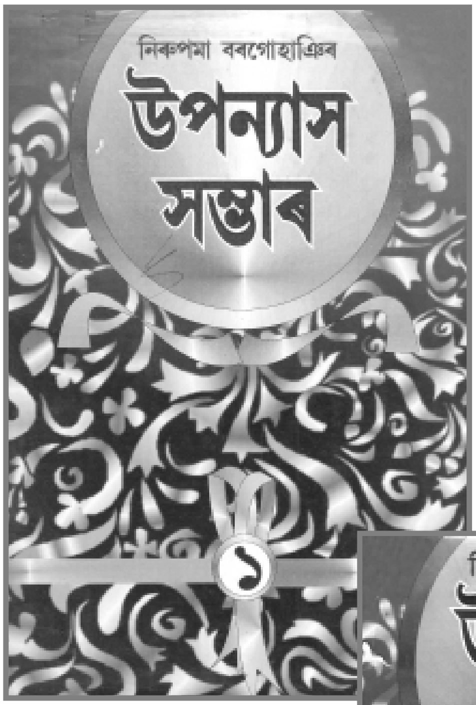
নিৰুপমা বৰগোহাঞিৰ
উপন্যাস
সম্ভাৰ
১

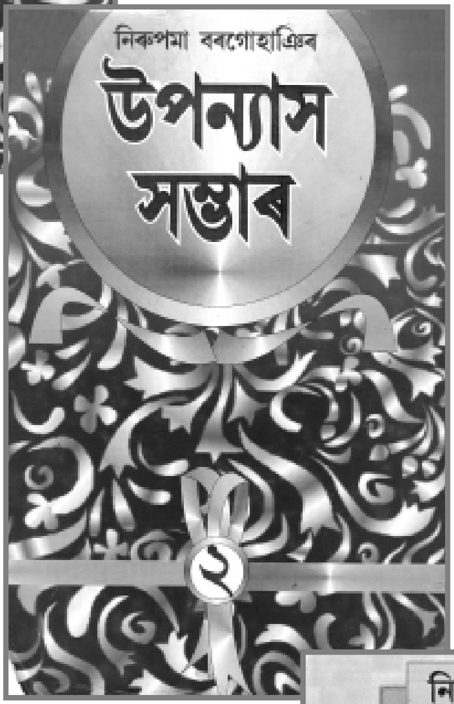
নিৰুপমা বৰগোহাঞিৰ
উপন্যাস
সম্ভাৰ
২

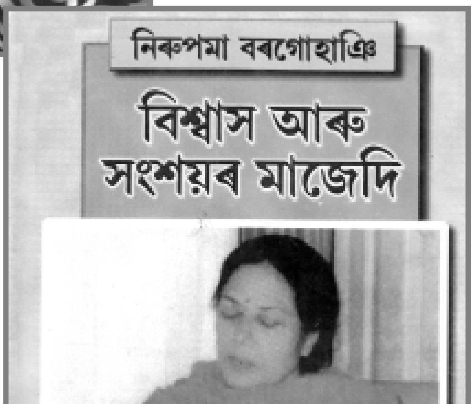
নিৰুপমা বৰগোহাঞি
বিশ্বাস আৰু
সংশয়ৰ মাজেদি